বসুমতী-গ্রন্থাবলী-সিরিজ।

নারায়ণচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বসুমতী-গ্রন্থাবলী-সিরিজ

নারায়ণ চন্দ্রের গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

[১] অভিমান, [২] মণির বর, [৩] ঘর জামাই, [৪] দাদা মহাশয়,
[৫] মায়ার অধিকার, [৬] জেল ফেরত, [৭] ব্রহ্মশাপ,
[৮] ঠাকুরের মূল্য।

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-মুদ্রণ-যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

অভিমান

(সামাজিক উপন্যাস)

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত

উৎসর্গ

সমদুঃখভাগিনী অভিমানস্পর্শলেশশূন্যা

সহধর্ম্মিণীর হস্তে

প্রদান করিলাম।

গ্রন্থকার

বিজ্ঞাপন

সমাজ জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। সমাজের সামান্য ত্রুটীও ব্যক্তিগত জীবনে ঘোরতর অনিষ্ট সংসাধন করে। দোষ গুণ সকল সমাজেই আছে। দোষের সংশোধনই সমাজের উন্নতির লক্ষণ, গতানুগতিকতায় অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

সমোজিক ছোট গল্প লিখিলেও সমাজিক উপন্যাস লিখিবার চেষ্টা আমার এই প্রথম। প্রথম চেষ্টায় যে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিব, এরূপ আশা করিতে পারি না।

এই গ্রন্থে অধিকাংশ স্থলে কথোপকথনের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে। পাত্রপাত্রীর উক্তিতে সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা সাধারণ কথোপকথনের ভাষাই ভাল মানায় বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং আমি সেইরূপ চেষ্টাই করিয়াছি। ইতি—

কলিকাতা
ফাল্গুন, ১৩২৩

শ্রীনারায়ণচন্দ্র শর্ম্মা।

বৃদ্ধা বলিলেন, "তা হ'লেও বাছা, সত্যি বলতে গেলে আমি ছেড়ে আমার বাবাও বড়লোক ছিল না।"

রাণী বলিল, "কিন্তু তোমার সেই গরীব বাবা তোমার বুকের ভিতর এমন একটা জিনিস দিয়ে গেছেন, যা টাকা দিয়েও পাওয়া যায় না, রাজার রাজ্য দিলেও সে জিনিস মেলে না।"

বৃদ্ধা দুই হাত দিয়া জড়াইয়া বধুকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন; তাঁহার দুই চোখ দিয়া স্নেহের তরল ধারা গড়াইতে লাগিল।

দিন একটু কষ্টে চলিতে লাগিল। সাত আট বিঘা নাখরাজ জমি ছিল। তাহা ভাগে বিলী করিয়া যে ধান পাওয়া যাইত, তাহাতে সংবৎসরের খোরাকটা চলিত। তা ছাড়া রাণী পৈতা তুলিত, ছেঁড়া কাপড়ের উপর ফুল তুলিয়া আসন প্রস্তুত করিত, একটি গাই ছিল, রাণী তাহার সেবা করিয়া যে দুধ পাইত, শাশুড়ীর মত রাখিয়া বাকীটুকু বিক্রয় করিত, বাড়ীতে শাক-পাতা গাছ-গাছড়া জন্মাইয়া তরকারির অভাব পূরণ করিত। এইরূপে দুইটি প্রাণী কোন প্রকারে আপনাদের দিন চালাইয়া দিত।

বধূর এই বিরামবিহীন কঠোর পরিশ্রম দর্শনে শাশুড়ীর মনে বড় কষ্ট হইত, কিন্তু রাণী ইহাতে একটুও কষ্টবোধ করিত না, বরং সে ইহার মধ্যে একটা সগর্ব্ব আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত এবং তাহার এই গর্ব্বটুকু অব্যাহিত রাখিবার জন্য দিনরাত ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিত। কিন্তু ঈশ্বর তাহার এই ক্ষুদ্র প্রার্থনাটুকু শুনিতে পাইলেন না।

সে বৎসর ভাদ্র মাসে দামোদরের বন্যা আসিয়া মাঠের ধান সব ভাসাইয়া লইয়া গেল। দেশে হাহাকার পড়িল, পৌষ মাসে রাণী এক মুঠা ধানও ঘরে তুলিতে পারিল না। তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সেই দুর্বৎসরে রাণীর যে দুই একখানা গহনা ছিল, তাহা গেল, ঘরের ঘটী-বাটিতেও টান পড়িল, তবুও দিন চলে না। রাণী হতাশ হইয়া পড়িল।

নিজের জন্য ততটা ভাবনা ছিল না, যত ভাবনা বৃদ্ধা শাশুড়ীর জন্য। সে কেমন করিয়া চক্ষের সম্মুখে তাঁহাকে উপবাস করিতে দেখিবে? ভগবান্! আমি অনাহারে মরিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু মা'র একটা উপায় ক'রে দাও ঠাকুর!

ভগবান্ কিন্তু কোন উপায়ই করিয়া দিলেন না। রাণী অকূলপাথারে পড়িল। হায়, তাহার গর্ব্ব, অভিমান সবই বুঝি যায়, এবার বুঝি পরের দ্বারে হাত পাতিতে হয়। কথাটা ভাবিতেই রাণীর সর্ব্বাঙ্গে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিল। কিন্তু হাত-পাতা ছাড়া আর যে উপায় নাই।

এই দুর্দ্দিনে এক একবার স্বামীর কথা তাহার মনে পড়িত। কিন্তু সে কথা মনে পড়িলেই অভিমানে, লজ্জায় তাহার সমস্ত হৃদয়টা ক্ষুব্ধ—সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত; তাহার নিজের উপরই এমন একটা রাগ হইত যে, নিজেই তাহা সামলাইতে পারিত না। সে একবার যাহার দান সগর্ব্বে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এখন তাহার নিকট আবার সেই প্রত্যাখ্যাত দান ফিরাইয়া লইতে চাহিবে? রাণী ভাবিত, প্রাণ গেলেও তাহা পারিব না।

কিন্তু এখন কেবল নিজের প্রাণ লইয়া কথা নয়, তাহার সঙ্গে শাশুড়ীর প্রাণটাও অবিচ্ছিন্নভাবে জড়াইয়া আছে। নিজের জন্য না হইলেও অন্ততঃ শাশুড়ীর জন্যও তাহাকে এখন পরের দ্বারে হাত পাতিতে হইবে। এই বিষম সঙ্কটস্থলে উপস্থিত হইয়া রাণী অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, যখন হাত পাতিতেই হইবে, তখন অন্যের নিকট হাত না পাতিয়া, তাঁহার নিকট হাত পাতাই ঠিক।

সঙ্কল্প স্থির করিয়া রাণী স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল। স্বামীর নিকটেই সে একটু আধটু লেখাপড়া শিখিলেও স্বামীকে পত্র লেখা এই তাহার প্রথম। সুতরাং সে কাজ বড় সহজে সম্পন্ন হইল না। অনেক কষ্টে মোটা মোটা আঁকাবাঁকা অক্ষরে পত্রখানা শেষ করিল। পত্রে লিখিল,—

"শ্রীচরণেষু,—

প্রায় দু'বছর পরে তোমার কাছে আবার সাহায্য চাইছি। নিজের জন্য বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয়—এমন কাজ কর্‌তাম না, কিন্তু চোখের উপর মাকে অনাহারে মর্‌তে দেখি কেমন ক'রে? আমাদের বড় কষ্টে দিন কাটছে। ঘরে আর বেচবার মত কিছুই নাই, শুধু ঘরখানা আছে! তোমার যেমন বিবেচনা হয় কোরো। ইতি

রাণী।"

পত্রখানা ভোঁমার মা'র দ্বারা তাড়াতাড়ি ডাকে দিবার বন্দোবস্ত করিয়া রাণী নিশ্বাস ফেলিল।

তাহার পর এক মাস কাটিয়া গেল, কিন্তু পত্রের উত্তর বা সাহায্য কিছুই আসিল না। লজ্জায় ঘৃণায় রাণীর মরিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল।

শাশুড়ী বলিলেন, "কি হবে রাণী।"

রাণী এ কথার কি উত্তর দিবে? সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বৃদ্ধা পুনরায় বলিলেন, "তাই তো, আর যে উপায় নাই।"

রাণী বলিল, "তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে মা, না ?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "আমার কষ্ট ? আমার কষ্ট কে বুঝবে রাণি ? উপযুক্ত ছেলে থাকতে আজ আমাকে উপোস দিতে হচ্ছে ; তোর মত সতীলক্ষ্মী বৌ খেটে খেটে সারা হয়ে যাচ্ছে। আমার এ কষ্ট কে দেখবে, কে বুঝবে ?"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিলেন। রাণীর বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল ; সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "মা, না হয় কল্‌কাতায় চল।"

বৃদ্ধা বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই যাবি ?"

রাণী বলিল, "তুমি বল তো যাই।"

রাণীর মনের ভাব বুঝিতে বৃদ্ধার বাকী রহিল না। তথাপি তিনি স্বীয় মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "তা আমি বলছি, চল।"

রাণী মৃদু হাস্যপূর্ণ দৃষ্টিতে শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া, তাঁহার পায়ে একটা হাত রাখিয়া বলিল, "সত্যি ? আমাকে ছুঁয়ে বলছ ?"

বৃদ্ধা আপনার পা টানিয়া লইয়া সক্রোধে বলিলেন, "সরে যা আবাগী ; আবাগের বেটী নিজেও মর্‌বে, আমাকেও মার্‌বে।"

রাণী হাসিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। বৃদ্ধা তুলসীতলায় মাথা খুঁড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "হে ঠাকুর, বুড়া বয়সে এ শিকল আমার পায়ে জড়িয়ে দিলে কেন ? আমার যে মরণেও সোয়াস্তি নাই।"

দিন চলিতে লাগিল। এক বেলা বা আধপেটা খাইলেও দিন বসিয়া থাকিবার নয়। রাণী প্রাণান্ত পরিশ্রমে শাশুড়ীকে আধপেটা খাওয়াইয়াও আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিল, ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিল।

ঘোর কলিকালেও শাশুড়ীর জন্য তাহার এই কঠোর আত্মত্যাগ দেখিয়া পাড়ার মেয়েরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বিধুর ঠাকুরমা বলিল, "আহা, সতীলক্ষ্মী !"

কিন্তু এই সতীলক্ষ্মী কথাটা কাহারও কাহারও গায়ে একটু বিপরীতভাবে বিঁধিল। তাহাদের মধ্যে নিস্তার দিদি এক জন। সে প্রতিবাদের ইচ্ছায় শ্লেষের সুরে বলিল, "আহা, কি সতীলক্ষ্মী গো! যাকে সোয়ামী নিয়ে ঘর করলে না, আবার একটা বিয়ে করলে, তিনি হ'লেন সতী-সাবিত্রী ?"

বিধুর ঠাকুরমা রাগিয়া বলিল, "অমন কথা বলিস না নিস্তার, জিভ খ'সে যাবে।"

নিস্তার নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সত্যি কথায় জিভ খসে খস্‌বে, তা' ব'লে আমি খোসামুদে কথা বল্‌তে পার্‌ব না। আমি চিরকেলে ঠোঁটকাটা নিস্তার।"

সঙ্গে সঙ্গে সে বিধুর ঠাকুরমার মুখের কাছে আপনার ডান হাতটা নাড়িতে ভুলিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"সই-মা কোথায় গো !"

রাণী দেখিল, মাথায় টেড়ী, হাতে ছড়ি, গায়ে পাঞ্জাবী, পায়ে সু, এক নব্য-ভব্য যুবক আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়াছে। বৃদ্ধা ঘরের ভিতর ছিলেন ; তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা ?"

"আমায় চিনতে পাচ্ছ না সই-মা ? আমি সারদা।"

বৃদ্ধা ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "সারদা! এস বাবা, এস। আর চোখে তেমন ঠাওর পাই না। বৌমা, একখানা আসন দাও তো গা। কবে এলে বাবা ?"

রাণী গলা পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া, একখানা আসন পাতিয়া দিয়া ঘরে ঢুকিল। সারদাচরণ সে দিকে একটা বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া আসনে বসিয়া বলিল, "আজ তিন দিন এসেছি। কাজের ভিড়ে আসতে পারি নি। তাই আজ ভাবলেম, দুপুরবেলাটা না ঘুমিয়ে সই-মাকে একবার দেখে আসি।"

আনন্দের হাসি হাসিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "তা আসবে বৈ কি বাবা, আস্‌বে বৈ কি। আজ যদি সই থাকতো। তা ভাল আছ তো ?"

ঈষৎ হাস্যসহকারে আপনার কুশল জ্ঞাপন করিয়া সারদা বলিল, "বেহারী-দা আবার না কি বিয়ে করেছে ?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "তার কথা আর ব'লো না বাবা, সে ছেলে নয়—শত্রু।"

সারদাচরণ কৌতুহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, "ব্যাপার কি সই-মা ?"

বৃদ্ধা তখন চাপিয়া বসিয়া একে একে সব কথা বলিতে লাগিলেন। বেহারীর কলিকাতাবাসের ইচ্ছা, তাঁহার তাহাতে অসম্মতি, বধূর সহিত বেহারীর কলহ, তাহার পুনরায় বিবাহ, এখানে বধূর প্রাণপণে তাঁহার সেবা, ইত্যাদি কোন কথাই বাকী রাখিলেন না। এক জন আগন্তুকের নিকট ঘরের খুঁটিনাটি কথা প্রকাশ করিতে দেখিয়া শাশুড়ীর উপর রাণীর রাগ হইল ; তাহার চেয়েও বেশী রাগ হইল সেই আগন্তুকের উপর, যে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া

আগ্রহের সহিত পরের ঘরোয়া কথা জানিয়া লইতেছে। তাহার ইচ্ছা হইল, সে আসিয়া শাশুড়ীকে নিরস্ত করে; কিন্তু উপায় নাই, বাহিরে সারদা বসিয়া আছে।

বক্তব্য শেষ করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "সব আমার অদৃষ্ট! আমি পোড়াকপালী যদি কাল না হব, তা হ'লে কি এমনটা হয়? বৌমা, সারদাকে দু'টো পান দাও তো গা।"

রাণী পরিধেয় দ্বারা আপাদমস্তক উত্তমরূপে ঢাকিয়া ঘরের বাহির হইল এবং পানের ডিবাটা শাশুড়ীর কাছে রাখিয়া নিঃশব্দগতিতে আবার ঘরে ঢুকিল।

সারদা একটা পান মুখে দিয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল, এবং জোরে টান দিয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "ছি ছি, বেহারী-দা এমন অন্যায় কাজ কর্‌লে? এমন সুন্দরী স্ত্রী!"

সারদা আপনার তীক্ষ্ণ কটাক্ষটা একবার ঘরের ভিতর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু সেখানে কাহারও প্রশংসমান কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টির সন্ধান না পাইয়া হতাশ চিত্তে মুখ ফিরাইয়া লইল। তার পর সিগারেটে আরও গোটা কয়েক টান দিয়া তাহার ছাইটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "এবার কল্‌কাতায় গিয়ে বেহারী-দাকে এমন গোটাকতক কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেব যে, সে বুঝ্‌তে পার্‌বে, তার কাজ কতদূর অন্যায় হয়েছে!"

তার পর আরও দুই চারি কথা কহিয়া সারদা সে দিনের মত বিদায় হইল এবং ভবিষ্যতে আসিবারও আশা দিয়া গেল। যাইতে যাইতে সারদাচরণ সেই পুরাতন "সরাসজমনুবিদ্ধং" শ্লোকটা একবার আবৃত্তি করিয়া লইল।

সারদা চলিয়া গেলে রাণী বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "লোকটা কে মা?"

বৃদ্ধ বলিল "ওকে চিনিস্ না? আর চিন্‌বিই বা কেমন ক'রে, ও তো এখন এখানে থাকে না। ও অনন্ত ভটচাযি্যর ছেলে। ওর মা আমার সই ছিল। সে কি আজকের কথা! বেহারী তখন তিন বছরেরটি। সে বছর গাঁয়ে মায়ের খুব কৃপা হয়। তখন তো এত ডাক্তার বদ্যি ছিল না, থাকলেও যা করেন মা। তাই গাঁয়ের প্রধানরা চাঁদা তুলে খুব ধুমধামে মায়ের পূজা দেয়। পূজার পরদিন সেখানে 'সয়লা' হয়। সেই সওলাতলায় ওর মা আমার সঙ্গে সই পাতিয়েছিল। আগে ওদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। ওর মা মারা যাওয়া অবধি আর ততটা নাই।"

বৃদ্ধা সারদাচরণের যেটুকু পরিচয় দিলেন, আমরা তদপেক্ষা একটু বেশী পরিচয় দিতে চাই।

সারদাচরণের পিতা অনন্তরাম ভট্টাচার্য্য এক জন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, কিন্তু তিনি শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন না। তিনি কখন কোন সভায় গিয়া ঘোরতর তর্কজালে কোন পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়া আপনার জিগীষা-বৃত্তি চরিতার্থ করেন নাই; কোন জিগীষু পণ্ডিত তাঁহার নিকট আসিয়া তর্ক উত্থাপিত করিলে তিনি তাহার যথাশাস্ত্র মীমাংসা করিয়া দিতেন, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী বৃথাতর্কে উদ্যত হইলে সবিনয়ে আত্মপরাজয় স্বীকার করিতেন। তিনি চারি পাঁচটি ছাত্রকে বিদ্যা ও অন্ন দান করিতেন, কিন্তু সমাজের নিকট হইতে কিছুমাত্র প্রতিদান লইতেন না। এই প্রতিগ্রহ-বিমুখ ব্রাহ্মণ আপনার কয়েক বিঘা নিষ্কর জমীর আয়েই সন্তুষ্ট থাকিয়া জ্ঞানালোচনাতেই শান্ত জীবনটি কাটাইয়া দিতেছিলেন, তিনি সমাজের সহিত মিশিতেন না, সামাজিক ব্যাপারেও যোগ দিতেন না।

লোকেও তাঁহার সহিত বড় একটা মিশিত না। কেন না, তাঁহার অসামাজিক প্রকৃতির সহিত সামাজিক লোকের প্রকৃতি ঠিক খাপ খাইত না। কেহ কোন ব্যবস্থা লইতে গেলে তিনি তাহার যথাশাস্ত্র বিধান দিতেন; তা সে বিধান যতই কঠিন বা কোমল হউক, সে জন্য তিনি কাহারও মুখের দিকে চাহিতেন না। ইহাতে লোকে মনোমত ব্যবস্থা না পাইয়া অসন্তুষ্ট হইত। ক্রমে তাহারা এই অসামাজিক পণ্ডিতকে পণ্ডিতমূর্খ আখ্যা দিয়া তাঁহার সান্নিধ্য ত্যাগ করিল।

এই পণ্ডিতমূর্খের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ সারদাচরণ এবং কনিষ্ঠ শিবচরণ। সারদাচরণ উপনয়নান্তে যখন পিতৃ-আজ্ঞায় কলাপের সন্ধিবৃত্তির সহিত পরিচয়ের চেষ্টা করিতেছিল, তখন তাহার নিঃসন্তানা পিতৃষসা সারদাচরণকে প্রতিপালন করিয়া অতৃপ্ত পুত্র-বাৎসল্যের কিয়দংশ পরিতৃপ্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা ভ্রাতার নিকট প্রকাশ করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনুজার উপরোধ এড়াইতে পারিলেন না। সারদাচরণও সন্ধিবৃত্তির হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া সানন্দে পিতৃষসার অনুগামী হইল।

কলিকাতায় আসিয়া সারদাচরণ ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার আকৃতি-প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। সে ছোট বড় করিয়া চুল ছাঁটিল, পৈতৃক শিখাটিকে গঙ্গায় ভাসাইয়া দিল; সকালে উঠিয়া কোশাকুশীর পরিবর্ত্তে চায়ের পিয়ালা ধরিতে অভ্যস্ত হইল। ক্রমে তাহার পকেটে সিগারেটের বাক্স আসিয়া আশ্রয় লইল।

সারদাচরণের প্রতিভা অসাধারণ। সেকেণ্ড ক্লাসে

উঠিয়া সে সেক্সপীয়ার হইতে হার্ব্বার্ট স্পেনসার, কোমৎ, কান্ট প্রভৃতি কবি ও দার্শনিকগণের অভিজ্ঞতার সারমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইল। ক্রমে তাহার হিন্দুধর্ম্মের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিল। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলেও সে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিত; সেখানে বক্তৃতা, সংকীর্ত্তন এমন গম্ভীরভাবে বসিয়া শুনিত যে, কেহই মনে করিতে পারিত না, এই যুবক ধর্ম্মভাবে বিভোর হয় নাই। সে এখন চিঠির মাথায় শ্রীশ্রীদুর্গার পরিবর্ত্তে ওঁ তৎসৎ লিখিত এবং মাঝে মাঝে চক্ষু মুদিয়া নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে একটা অচিন্ত্য অব্যক্ত প্রকাণ্ড জ্যোতির্ম্ময় পদার্থকে খুঁজিয়া বেড়াইত।

মধ্যে মধ্যে সারদাচরণ বনপুরেও আসিত। সে আসিলে গ্রামের মধ্যে একটা হৈ-চৈ বাধিয়া যাইত। তাহার চালচলন দেখিয়া, তাহার বক্তৃতা শুনিয়া লোকে স্তম্ভিত-চিত্তে তাহাকে 'অসাধারণ' আখ্যা প্রদান করিত। পিতা কিন্তু পুত্রের পরিণাম চিন্তা করিয়া বিমর্ষ হইতেন।

সারদাচরণ বলিত, "স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দাও, বিধবার বিবাহ দাও; ব্রাহ্মণ-শূদ্রে কোন প্রভেদ নাই; সকলেই সেই এক অদ্বিতীয় অচিন্ত্য অব্যক্ত নিরাকার পরমব্রহ্মের সন্তান, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ভ্রাতা-ভগ্নী।"

কিন্তু এইখানেই বড় গোল বাধিত। স্ত্রীজাতি-মাত্রেই যে কিরূপে ভগ্নীস্থানীয়া হইতে পারে, তাহা বনপুরের অশিক্ষিত লোকেরা বুঝিতে পারিত না। আর এই জন্যই সারদাচরণ এক দিন নেত্য গোয়ালিনীকে 'প্রিয় ভগ্নী' সম্বোধন করিয়া সেই ভগ্নীর হস্তে এরূপ নির্য্যাতিত হইয়াছিল যে, সে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে এই ভ্রাতা-ভগ্নী কথাটা উঠাইয়া দিবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিল।

এইরূপে সারদাচরণ মাঝে মাঝে ধূমকেতুর ন্যায় জন্মভূমিতে উদিত হইয়া, সেখানে একটা বিপ্লবের কোলাহল তুলিয়া দিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই আবার অন্তর্হিত হইত। সে চলিয়া গেলে গ্রামের লোক দিনকতক তাহার বিষয় লইয়া আলোচনা করিত, তাহার পর নিরীহ পল্লী আবার স্তব্ধ হইয়া যাইত।

এবার গ্রামে আসিয়া সারদা কিন্তু ততটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে পারিল না! বহু দিন পরে তাহার সইমার উপর বিস্মৃতপ্রায় স্নেহটা এমন ভাবে জাগিয়া উঠিল যে, তাহাকে দিনের অনেকটা সময় বাধ্য হইয়া বেহারীর বাটীতে কাটাইতে হইত, এবং পান, জল প্রভৃতির প্রয়োজন জানাইয়া বৌদিদির দুঃখের ভারে অবসন্ন মনটাকে সজীব করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিত। মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৌদিদির গুণগান এবং বেহারী-দার কার্য্যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া এই অর্ধ-গুণ্ঠনাবৃতা দুঃখভার-প্রপীড়িতা বধূটির সানুরাগদৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেও ছাড়িত না। কিন্তু বৌদিদির মনটা ইহাতে যে ক্রমেই তিক্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহা জানিতে পারিত না। বাস্তবিকই রাণী তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। সে যতক্ষণ থাকিত, ততক্ষণ রাণীকে চোরের মত ঘরের কোণে বসিয়া থাকিতে হইত; ইহাতে কেবল কষ্ট নয়, সংসারের কাজেরও ক্ষতি হইত। তা ছাড়া মেয়েমানুষের বাড়ীতে এক জন যুবকের এরূপ গতিবিধি সে পছন্দ করিত না। সে এক দিন শাশুড়ীকে মনের কথা বলিয়াছিল। কিন্তু শাশুড়ী বলিয়াছিলেন, "এক জন বাড়ীতে আসছে, তাকে কি বলা যায়, তুমি এসো না? আর ও ক'দিনই বা থাকবে?"

যে বনপুরের জলবায়ু অসহ্য বলিয়া সারদাচরণ তথায় এক সপ্তাহ কালও থাকিতে পারিত না, এবারে সেখানে তাহার এক পক্ষ কাটিয়া গেলেও যাইবার কোন উৎসাহ দেখা গেল না, বরং আরও যে কিছু দিন কাটাইবে, এরূপ সম্ভাবনাও প্রকাশ পাইল। সে কাহারও কাহারও নিকট বলিল, "কলিকাতার রুদ্ধ বায়ুতে প্রাণটা হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, তাই সে দেশের মিঠে ফাঁকা হাওয়াটার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছে না।"

রাণী কিন্তু ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। তখন সে স্থির করিল, "মা বলিতে না পারেন, ঘরের ভিতর হইতে আমিই স্পষ্ট বলিব। এত ভয়ই বা কি? শেষে কি একটা কলঙ্ক কিনিব?" সঙ্কল্প স্থির করিলেও রাণী কিন্তু বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিল না।

পাড়ার লোকে কিন্তু তখন রাণীর সম্বন্ধে দুই এক কথা বলাবলি করিতেছিল। কতকগুলি প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনী যাহারা নিঃস্বার্থভাবে পরের শুভাশুভ চিন্তা করিয়াই দিন কাটায়, তাহারা অনেক দিন হইতেই একটা মহা সমস্যার মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল। সে সমস্যাটা এই—যাহার স্বামী এত টাকা রোজগার করে, সে এমন কষ্ট করিয়া দুঃখময় দরিদ্র-জীবন যাপন করে কেন? আর তাহার স্বামীই বা এমন সুন্দরী সুরূপা স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া কি জন্য দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিল? ইহার কারণটা অপ্রকাশিত হইলেও যে গুরুতর, তদ্বিষয়ে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না; কিন্তু কোন অতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও সেই গুহ্য কারণটার আবিষ্কার করিয়া কলম্বসের প্রতিযোগী হইতে পারিল না।

এই সময় সারদাচরণকে টেড়ী কাটিয়া, কোঁচা দুলাইয়া, সিগারেট ফুঁকিয়া বেহারীর বাড়ীতে যাতায়াত করিতে দেখিয়া অনেকে যেন এই দুস্তর সমস্যাসাগরের একটা কূল দেখিতে পাইল। তবে কেহ কেহ বলিল, "না না, এও কি সম্ভব ?" কিন্তু অন্নপরিপাকের এমন উপাদেয় ভেষজ কেহ পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সে দিন মধ্যাহ্নে সারদা যখন সইমাকে ডাকিতে ডাকিতে বাড়ী ঢুকিল, রাণী তখন মনের ভিতর একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া দাবার একপাশে বসিয়া পৈতা তুলিতেছিল, তাহার শাশুড়ী মুমুর্ষু বিধুর ঠাকুরমাকে দেখিতে গিয়াছিল। পূর্ব্বদিনে সারদা সইমার অনিচ্ছা-সত্বেও যখন একখানা দশ টাকার নোট তাঁহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া গিয়াছিল, তখন হইতেই রাণী সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, তাহার অপমানক্ষুব্ধ হৃদয় ক্রোধে মোরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। তাই শাশুড়ীর অনুপস্থিতেও সারদাকে দেখিয়া সে আজ উঠিয়া পলাইল না ; গায়ের কাপড় সাম্‌লাইয়া লইয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

সারদা দাঁড়াইয়া এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সইমা কোথায় ? . বাড়ীতে নাই বুঝি ?"

রাণী কোন উত্তর দিল না। তখন সারদা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা বৌদি, দুপুরবেলা অতিথি ব্রাহ্মণকে বস্‌তে একটা জায়গাও দেবে না বুঝি ?"

রাণী উঠিল না, একটু নড়িলও না। সারদা বিনা আসনেই দাবার উপর বসিয়া পড়িল। রাণী আস্তে আস্তে উঠিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। সারদা যেন ঈষৎ অভিমানের সুরে বলিল, "আমায় দেখে অত মাথার কাপড় কেন বৌদি ? আমি বাঘ, না ভালুক ?"

রাণী মনে মনে বলিল, "তারও বেশী।"

একটা কথারও উত্তর না পাইয়া সারদা একটু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল ; সে আপন মনে শিষ দিতে দিতে তালে তালে পা নাচাইতে লাগিল। একটু পরে শিষ থামাইয়া, একটু কাসিয়া সারদা বলিল, "বৌদি, বেহারী-দা বোধ হয় তোমায় ভালবাস্‌তো না ?"

ভিতর হইতে চুড়ীর ঠন্-ঠন্ শব্দ আসিয়া কানে বাজিল। উৎসাহিত হইয়া সারদা বলিল, "চোখ চাই, রত্ন চিন্‌বার চোখ চাই। জহুরীতেই জহর চিনে।"

রাণীর আর সহ্য হইল না। সে ঘরের ভিতর হইতে মৃদু অথচ গম্ভীর স্বরে বলিল, "আপনি এখানে আসেন কেন ?"

সারদা ইহার সহজ উত্তরটাই দিতে যাইতেছিল— "তোমাকে দেখ্‌তে।" কিন্তু তাহাতে একেবারে অভদ্রতা প্রকাশ পায় বুঝিয়া আপাততঃ সে উত্তরটা চাপিয়া বলিল, "কেন আস্‌তে কি নাই ?"

রাণী বলিল, "না, মেয়েমানুষের বাড়ীতে এ রকম ভাবে যাওয়া আসা করতে আপনার লজ্জা হওয়া উচিত।"

সারদা একটা কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "তুমি কি আমাকে এতটা অপবিত্রভাবে দেখ বৌদি ?"

"হাঁ, সম্পূর্ণ অপবিত্রভাবে দেখি।"

"কিন্তু ঈশ্বর জানেন, আমি তোমার দুঃখে কত দুঃখিত।"

"আমার একটুও দুঃখ নাই। আপনি আর আস্‌বেন না।"

"যখন বারণ কচ্চ, তখন আর আস্‌ব না ; কিন্তু বৌদি, আমি যে তোমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধু, এ কথা মনে রেখ।"

"মিথ্যা কথা" বলিয়াই রাণী ঘরের ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া ভাঁজ-করা নোটখানা তাহার দিকে ছুড়িয়া দিল।

সারদা বলিল, "এ কি ?"

"আপনার টাকা।"

"এ টাকা তো আমি তোমাদের দিয়েছি।"

"দরকার নাই। যারা চায়, তাদের এই ক'টা টাকা দিয়ে কৃতার্থ করবেন।"

ঘরের দিকে একটা হর্ষসমুজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সারদা হাসিয়া বলিল, "রাগ ক'রো না বৌদি, আপাততঃ হাতে আর কিছু নাই ; এখন এই রাখ, এর পর যা দরকার হয়—"

"উঠে যাও।"

রাণী বিদ্যুদ্বেগে বাহিরে আসিয়া সারদার সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন তাহার মাথার কাপড় সরিয়া গিয়াছে, মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দিয়া যেন আগুন ঠিকরিয়া পড়িতেছে। সে বাহিরের দরজার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে আদেশ করিল, "উঠে যাও !"

সারদা তৃষিত-নেত্রে তাহার রোষরক্ত সুন্দর মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিল। রাণী কণ্ঠস্বর আরও উচ্চে তুলিয়া বলিল, "যদি অপমানের ভয় থাকে, এখনি উঠে যাও।"

বেগতিক দেখিয়া সারদা ছড়িগাছটি তুলিয়া লইয়া উঠিল; আর একবার রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে উঠানে নামিল।

"দিদি কোথায় গো" বলিয়া নিস্তার সদর-দরজায় পা দিতেই সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিতে পাইল, তাহাতে সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না; লজ্জায় জিহ্বা-দংশন করিয়া পাছু হাটিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। নির্লজ্জ সারদা মৃদু শিষ দিতে দিতে ছড়ি ঘুরাইয়া বাটীর বাহির হইল।

রাণী তখনও সেই ভাবে দাঁড়াইয়া। একটু পরে সে কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

সেইদিন নিস্তার সন্দেহতিমিরাচ্ছন্ন প্রতিবেশী-দিগকে অভ্রান্ত সত্যের আলোক প্রদর্শন করিয়া যে তাহাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইল, ইহা বলাই বাহুল্য। লোকগুলি অনেক দিন পরে নিশ্চিন্তাভাবে ঘুমাইয়া বাঁচিল।

কথাটা আগুনের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে বিলম্ব হইল না, এবং তাহা ঠিক আগুনেরই একটা তীব্র হল্কার মত আসিয়া রাণীর শাশুড়ীর কানে ঢুকিল। শুনিয়া বৃদ্ধা রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া প্রতিবাসীদের গালাগালি, অভিসম্পাত দিতে লাগিলেন। প্রতিবাসীরা আপাততঃ তাহার কোন প্রতিবাদ না করিয়া, কিরূপে এই গালাগালির প্রতিশোধ লওয়া যায়, তাহারই উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইল। রাণী বহু কষ্টে শাশুড়ীকে শান্ত করিল।

বৃদ্ধা বাহিরে শান্ত হইলেন বটে, কিন্তু ভিতরে আর শান্তি পাইলেন না, তাঁহার শোক-তাপ-জীর্ণ বক্ষ অশান্তির আগুনে পুড়িতে লাগিল। তবে এ যন্ত্রণা তাঁহাকে অধিকদিন ভোগ করিতে হইল না, সর্ব্ব-সন্তাপহর মৃত্যু আসিয়া দুঃখদীর্ণা বৃদ্ধাকে আপনার ক্রোড়ে টানিয়া লইল। সমদুঃখভাগিনী বধূর মাথায় হাত রাখিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তাঁহার দুঃখদগ্ধ আত্মা এমন একটা সুখদুঃখহীন স্থানে চলিয়া গেল, যেখানে প্রতিবাসীদের প্রতিশোধস্পৃহা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

নিরাশাক্ষুব্ধ প্রতিবাসীরা বৃদ্ধাকে হাতছাড়া হইতে দেখিয়া তাঁহার প্রাণহীন দেহটার উপরেই প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করিবার সঙ্কল্প করিল।

শাশুড়ীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য রাণী প্রতি-বেশীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিল, কিন্তু কেহই এই অধর্ম্মা-চারিণীর শাশুড়ীর পাপ-সংস্রব-কলুষ শবদেহ স্পর্শ করিয়া ধর্ম্মের অপমান করিতে পারিল না; সকলেই সমাজের দোহাই দিয়া স্ব স্ব গৃহদ্বার অর্গলবদ্ধ করিল। রাণীর কাতর ক্রন্দনে সে সুদৃঢ় অর্গল মুক্ত হইল না।

কোন উপায় নাই দেখিয়া রাণী যখন শেষে নিরুপায়ের উপায়কে প্রাণপণে ডাকিতেছিল, তখন কয়েক জন বয়াটে ছোঁড়া—যাহারা সমাজের ধার ধারে না, কেবল অভিভাবকগণের তাড়না ও ভাঙ্-গাঁজা খাইয়া দিন কাটাইয়া দেয়, তাহারাই আসিয়া বুড়ীর সৎকারে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। কেহ কাঠ কাটিল, কেহ মড়া বহিল, কেহ চিতা সাজাইয়া দিল। রাণী শাশুড়ীর মুখাগ্নি করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিল; ছোঁড়ারা গাঁজা খাইয়া, মড়া পোড়াইয়া, স্নানান্তে হরিবোল দিতে দিতে যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গেল।

পরদিন তাহারাই চেষ্টা করিয়া বেহারীর নিকট লোক পাঠাইয়া দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রাদ্ধের তিন দিন পূর্ব্বে একখানা গরুর গাড়ী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইতেই রাণী ছুটিয়া বাহির হইল, এবং গাড়ীর ভিতর হইতে এক পঞ্চদশবর্ষীয়া হাস্য-ময়ী যুবতীকে এক প্রকার টানিয়া নামাইয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। বেহারী গাড়োয়ানকে দিয়া মোটঘাট নামাইতে লাগিল

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া যুবতী রাণীকে প্রণাম করিতে গেল। রাণী তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নামটি কি ভাই?"

যুবতীও হাসিয়া উত্তর করিল, "সুহাসিনী, কিন্তু সবাই হাসি ব'লে ডাকে।"

"বেশ নামটি। তা তুই ভাই আমার চেয়ে ছোট, আমি তোকে হাসি ব'লেই ডাকব।"

"আর আমি তোমায় দিদি বল্‌ব।"

বেহারী আসিয়া ডাকিল, "ওগো, মোটঘাটগুলা ঘরে নাও।"

রাণী এক গলা ঘোমটা টানিয়া বাহিরে আসিল, এবং মোটঘাটগুলা তুলিয়া ঘরে ফেলিতে লাগিল। মোটে নূতন হুঁকা কলিকা ছিল। রাণী তাড়াতাড়ি তামাক সাজিয়া হুঁকায় জল ভরিয়া বেহারীর সম্মুখে ধরিল। বেহারী হাত বাড়াইয়া হুঁকা লইয়া টানিতে টানিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

বেহারীর আগমনবার্ত্তা পাইয়া পাড়ার দুই চারি জন মাতব্বর আসিয়া জুটিলেন। তাঁহারা কলিকাতার

তামাকের সুমিষ্ট ধূম প্রাণ ভরিয়া উদ্‌গিরণ করিতে করিতে সকলেই যে নিয়ত বেহারীর হিতকাঙ্ক্ষা করেন এবং তাহাকে দেখিয়া যার-পর-নাই সুখী হইয়াছেন, ইহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে বেহারীর পুণ্যবতী জননীর শ্রাদ্ধটা যথেষ্ট সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে দেখিলেই যে তাঁহাদের চক্ষু জুড়ায়, এ কথাও জানাইয়া গেলেন। যাইবার-সময় অহিফেন-ভক্ত ঘোষাল মহাশয় একটু কলিকাতার অম্বুরী তামাক সংগ্রহ করিয়া লইতে ভুলিলেন না।

রাণী হবিষ্যের যোগাড় করিয়া দিল, সুহাসিনী রাঁধিল। রাণী শাশুড়ীর মুখাগ্নি করিয়াছে, সুতরাং সে রাঁধিলে চলিবে না। বেহারী হবিষ্য শেষ করিয়া শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে পরামর্শের জন্য ঘোষাল মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইল।

ঘোষাল মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে তখন মুখুয্যে মহাশয়, চক্রবর্ত্তী মহাশয়, রায় মহাশয়, ঘোষজা মহাশয়, বোসজা মহাশয় প্রভৃতি অনেক মহাশয়েরই শুভাগমন হইয়াছিল। বেহারী উপস্থিত হইলে তাহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়া বসান হইল। বেহারী একপাশে কুশাসনে বসিয়া, কিরূপে সে এই দায় হইতে উদ্ধার হইতে পারে, সানুনয়ে সকলকে তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল।

পরামর্শের অভাব হইল না। ঘোষাল মহাশয় বড় গলা করিয়া জানাইয়া দিলেন, তিনি এই বয়সে কত বৃষোৎসর্গ, কত দানসাগর প্রভৃতি বড় বড় কাজ হাসিতে হাসিতে নির্ব্বাহ করিয়া দিয়াছেন, কোথাও তিলমাত্র ত্রুটী বা গোলযোগ ঘটে নাই। অতএব তিনি সশরীরে বিদ্যমান থাকিতে বেহারীর চিন্তার কিছুমাত্র কারণ নাই। তবে কাজটা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাই এক্ষণে বিচার্য্য। তখন অনেক আন্দোলন অনেক বিচারের পর স্থির হইল যে চার পাঁচ শত টাকার মধ্যে যখন কাজ সারিতে হইবে, তখন বৃষোৎসর্গে কাজ নাই, একটি ষোড়শ করিয়া তিলকাঞ্চনশ্রাদ্ধ করিলেই চলিবে। আর গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নবশাখগুলিকে শ্রাদ্ধের দিনে পকান্ন অর্থাৎ লুচি এবং পরদিনে ভাত করিয়া খাওয়াইতে হইবে। নিয়মভঙ্গের দিনে বেহারী সাধ্যমত আত্মীয়-স্বজন পাড়াপ্রতিবাসী লইয়া কাজ সারিবে। বেহারীকে কিছুই ভাবিতে বা করিতে হইবে না, সে কেবল টাকা দিবে, ঘোষাল মহাশয়, চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং ঘোষজা মহাশয় দাঁড়াইয়া কাজ উদ্ধার করিয়া দিবেন। আহা, সে কি তাঁহাদের পর!

তখনই ঘোষাল মহাশয় ঘি, ময়দা, চাল, ডাল, দই, সন্দেশ, তরকারী প্রভৃতির ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। ফর্দ্দে লঙ্কা, হলুদ পাঁচফোড়নটি পর্য্যন্ত বাদ গেল না। ফর্দ্দ করার জন্য বরাবরই তাঁহার একটা খ্যাতি ছিল।

ফর্দ্দ লইয়া বেহারী যখন উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল, তখন মুখুয্যে মহাশয় পিছন দিকে হাত বাড়াইয়া ঘোষজা মহাশয়ের গা টিপিলেন, ঘোষজা রায় মহাশয়কে চোখ ঠারিলেন, রায় মহাশয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিতম্বদেশে একটি মৃদু চিমটি কাটিলেন; চক্রবর্ত্তী মহাশয় একবার যন্ত্রণাসূচক উঃ শব্দ করিয়াই তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইলেন এবং ঘোষজা মহাশয়ের হাঁটুতে বাঁ হাতের তর্জ্জনীর একটা টিপ দিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ গা-টেপাটেপি ও চোখঠারাঠারির পর ঘোষাল মহাশয় মুখ খুলিলেন। তিনি একবার কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "সবই ঠিক হ'লো, কিন্তু বাপু, ভিতরে যে একটু গোল আছে।"

বেহারী উঠিতেছিল, ঘোষাল মহাশয়ের কথা শুনিয়া আবার বসিল এবং বিস্ময়ের সহিত গোলটা কি, তাহা জানিতে চাহিল।

ঘোষাল মহাশয় চক্রবর্ত্তীর হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া বলিলেন, অপর কিছু নয়। তবে কি জান—ওহে বোসজা, বল না!"

বোসজা বলিলেন, "আপনিই বল্‌ছেন, বলুন না।"

চক্রবর্ত্তী বলিয়া উঠিলেন, "আপনিই বলুন। পাঁচজনের কথা, বিশেষ সত্যকথা বল্‌বেন, তাতে আর দোষ কি?"

বেহারী বিস্ময়ে, ভয়ে সকলের মুখের দিকে এক একবার চাহিতে লাগিল।

অবশেষে ঘোষাল মহাশয় হুঁকায় একটা জোর টান মারিয়া কলিকাটা বোসজা মহাশয়ের হাতে দিয়া দুই একবার কাসিয়া বলিলেন, "কি জান বাপু, অপর কিছু নয়; তবে এই গাঁয়ে—এই পাড়ায় বৌমার নামে একটা দুর্নাম রটেছে। সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন।"

রায় মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "কেবল ভগবান্ জানেন কেন, পাড়ার সকলেই জানে। কে এ কথা না শুনেছে?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ঠিকই তো, সকলেই শুনেছে। আর এ তো শুধু শোনা কথা নয়, চোখে দেখা। নিস্তার নিজে স্বচক্ষে দেখেছে, বেহারীর স্ত্রী দুপুরবেলা গায়ের মাথার কাপড় খুলে সারদার সঙ্গে হাসি-তামাসা কচ্ছে। নিস্তারকে ডাকাব?"

বেহারীর মাথাটা তখন নত হইয়া প্রায় বুকে আসিয়া ঠেকিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, যদি

এই সময় ভূমিকম্প বা সেইরূপ কোন একটা আকস্মিক কারণে নীচের মাটীটা সরিয়া যায়, তাহা হইলে সে দালালী, মাতৃশ্রাদ্ধ সব ফেলিয়া চিরদিনের জন্য অতলে নিমজ্জিত হইতে প্রস্তুত।

ঘোষাল মহাশয় তাহার অবস্থাটা বুঝিয়া ঈষৎ করুণার স্বরে বলিলেন, "থাক থাক, আর ডাকাডাকিতে কাজ নাই। কি জানেন রায় মহাশয়, এ সব ঘরের কেলেঙ্কারী যত চাপা পড়ে, ততই ভাল। নেবু চট্‌কালেই তেতো হয়।"

তার পর বেহারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাবা বেহারী, সংসারে এ রকমটা ঘটেই থাকে। সত্যই হোক, আর মিথ্যাই হোক, পাঁচজনে যখন বল্‌ছে, তখন এর একটা যা হয় বিহিত করা উচিত।"

বেহারী মাথা না তুলিয়াই জড়িত-কণ্ঠে বলিল, "কি কর্‌তে বলেন?"

ঘোষাল মহাশয় কি উত্তর দিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। তখন স্পষ্টভাষী চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "এর আর করা-করি কি, শাস্ত্রমত কাজ কর্‌তে হবে, শাস্ত্রের অন্যথা তো হবে না। তোমার স্ত্রীকে বাড়ী হ'তে তাড়াতে হবে, আর তোমাকে একটা প্রায়শ্চিত্ত ক'রে সমাজের কাছে কিছু দণ্ড দিতে হবে।"

বেহারী এবার মাথা তুলিয়া রুক্ষস্বরে বলিল, "তা যদি না করি।"

চক্র। তোমার বাড়ীতে একটি পিঁপড়ে পর্য্যন্ত পাত পাড়্‌বে না।

রায়। নিশ্চয়, নিশ্চয়! সমাজ ব'লে, ধর্ম্ম ব'লে একটা জিনিষ তো আছে। আমরা ত আর অধর্ম্ম কর্‌তে পার্‌ব না।

বেহারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া রোষ-ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলিল, "বেশ, আমি গঙ্গাতীরে মায়ের শ্রাদ্ধ কর্‌বো।"

বেহারী উঠিয়া যায় দেখিয়া ঘোষাল মহাশয় তাহার হাত ধরিয়া বসাইলেন। তখন সমাজপতিগণের মধ্যে কানে কানে একটা পরামর্শ চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরামর্শের পর ঘোষাল মহাশয় বেহারীকে বল্‌লেন, "এ সব কাজে কি রাগ কর্‌তে আছে বাপু? মাতৃদায় না হাড়ীদায়! রাগ কর্‌লে কি চলে?"

রায় মহাশয় বলিলেন, "স্পষ্ট কথা বেহারি, জাল ছিঁড়ে পালাতে পার্‌বে, কিন্তু পুকুর ছেড়ে যেতে পার্‌বে না। আজ তুমি সমাজ ছড়াবে, কিন্তু দু'দিন পরে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, পৈতে দিতে হবে। তখন?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "ছাড়্‌বে কি? তুমি ছাড়লেও আমরা তোমাকে ছাড়ব কেন? তুমি কি আমাদের পর? ও সব বাজে কথা যেতে দাও। তবে কথাটা যখন রটেছে, তখন একটা কিছু কর্‌তে হবে। বৌমাকেও তাড়াতে হবে না, প্রায়শ্চিত্তেরও দরকার নাই, তুমি আমাদের বারোয়ারীতে পঞ্চাশটি টাকা দাও গে।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "কিন্তু পাঁচজনে শুন্‌বে কেন?"

ঘোষাল মহাশর রাগিয়া আসনের উপর একটা চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "একশোবার শুন্‌বে। পাঁচজন আবার কে হে? আমরাই পাঁচজন, আমরাই সমাজ, আমরাই সব। আমরা যা কর্‌ব, তার উপর কথা কয় কোন্ বেটা? কি বল হে বোসজা?"

বোসজা বলিলেন, "কার ঘাড়ে দু'টো মাথা আছে?"

তখন ঘোষাল মহাশয় বেহারীকে বলিলেন, "যাক্ বাবাজি, যা বল্‌লাম, তাই কর্‌লেই হবে। বৌমাকে একটু সাবধানে থাক্‌তে ব'লে দিও, খাবার-দাবারগুলো না ছোঁয়।"

সে দিন এই পর্য্যন্ত হইয়াই সভাভঙ্গ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"দিদি!"

"কেন হাসি?"

"তুমি কি আমার সতীন?"

"তোর কি মনে হয়?"

"আমার মনে হয়, তুমি কখনো সতীন হ'তে পার না।"

"তবে কি হ'তে পারি?"

"আমার দিদি।"

হাসিকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া রাণী স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সত্যি হাসি, আমি তোর দিদি।"

হাসি দিদির আলিঙ্গন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া কানের পাশের চুলগুলা সরাইতে সরাইতে সহাস্যে বলিল, "কিন্তু দিদি, একটা কথা বল্‌ব, রাগ কর্‌বে না?"

রাণী। না; কি কথা?

হাসি। আমি আগে কিন্তু তোমাকে ঠিক সতীনের মতই মনে করতাম।

রাণী হাসিয়া বলিল, "সে আবার কি রকম?"

হাসি। আমার মনে হতো, খুব দজ্জাল গোছের

একটা মেয়েমানুষ, কথায় কথায় গাল দেয়, ঝগড়া করে; মুখখানা যেন হাঁড়ীর মত—

রাণী। কপালটা উঁচু, দাঁতগুলা বড় বড়, চোখ কটা, খাটো খাটো চুল, কালো কালো ঠোঁট।

হাসি হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে হাসিটা সামলাইয়া লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "মাইরি দিদি, অতটা নয়, তবে ঐ রকমের একটা মনে হতো।"

রাণী। এখন কি মনে হয়?

হাসি। এখন মনে হয়, তুমি আমার সত্যিকার দিদি, মায়ের পেটের বোন।

রাণী স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে হাসির হর্ষসমুজ্জ্বল মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল। একটু পরে হাসি বলিল, "আচ্ছা দিদি, তুমি একটা কথা সত্যি বল্‌বে?"

রাণী। কি কথা?

হাসি। আমাকে বিয়ে করেছে শুনে তোমার খুব রাগ হয়েছিল?

রাণী। রাগ হয় নি, একটু দুঃখ হয়েছিল।

হাসি। মোটেই রাগ হয় নি?

রাণী। মোটেই না।

হাসি। সে কি?

রাণী। আমার রাগ কর্‌বার অধিকার ছিল না।

হাসি। আমার কিন্তু দিদি, খুব রাগ হয়েছিল। বিয়ের পর যখন শুন্‌লাম, আমার সতীন আছে, তখন আমি রাগে তিনি দিন ওঁর সঙ্গে কথা কইনি।

রাণী। সে রাগ গেল কিসে?

হাসি। আপনিই গেল। যখন দেখলাম, আমাকে কথা কওয়াতে না পেরে উনি মুখটি ভার ক'রে ব'সে থাকেন, ব'সে ব'সে কি ভাবেন, তখন আর থাকৃতে পার্‌লাম না, নিজেই সেধে কথা কইলুম।

বলিয়া হাসি হাসিয়া ফেলিল, রাণীও হাসিল।

হাসি বলিল, "হাঁ দিদি, মা তোমায় খুব ভালবাসতেন, না?"

রাণী বলিল, "হাঁ।" একটু থামিয়া বলিল, "আপনার মায়ের কাছেও বোধ হয় এত ভালবাসা পাই নাই।"

রাণীর চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। হাসি বলিল, "আমি সব শুনেছি, মায়ের জন্যই তুমি যাও নাই, তাইতেই ওঁর রাগ।"

রাণী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'ভাগ্যে যাই নাই; গেলে তো তোর মত বোনটি পেতাম না।"

হাসি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, মুখের কাছে মুখটি রাখিয়া বলিল,—"আর আমিও তো এমন একটি দিদি পেতাম না। কিন্তু দিদি, এবার তোমায় না নিয়ে যাব না, তা ব'লে রাখছি। যাবে তো?"

রাণী তাহার রুক্ষ চুলের রাশির ভিতর অঙ্গুলী চালনা করিতে করিতে বলিল, "আমি গেলে তোর কি হবে?"

হাসি তাহার গলা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মুখ ভার করিয়া বলিল, "যাও, আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব না।"

রাণী স্নেহপ্রফুল্ল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এতদিন তাহার বুকে যে একটা দুঃখের ভারী বোঝা চাপিয়া ছিল, আজ যেন তাহা মুহূর্ত্তে নামিয়া গেল। সরলতার প্রতিমূর্ত্তি হাসিকে দেখিয়া সে ভাবিত, "এমন সতীনের হাতে স্বামীকে বিলাইয়া দিয়াও সুখ আছে।"

বেহারীর গলার আওয়াজ পাইয়া রাণী মাথায় কাপড় দিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল। বেহারী ঢুকিয়াই রাণীকে সম্মুখে দেখিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "এ সব কি শুন্‌ছি?"

রাণী কোন উত্তর করিল না, মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিল। বেহারী আরও উচ্চকণ্ঠে বলিল, "এ সকল কথা কি সত্যি?"

রাণী নীরব, নিশ্চলভাবে দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হাসি ঘরের ভিতর হইতে একবার উঁকি দিয়া স্বামীর রোষরক্ত নেত্র ও ভ্রূকুটীকুটিল মুখের ভীষণতা দেখিয়া ভয়ে ভয়ে দরজার পাশে সরিয়া গেল। রাণীকে নিরুত্তর দেখিয়া বেহারী আরও রাগিয়া উঠিল; দাঁতে দাঁত চাপিয়া শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, "আমার কাছে এত লম্বা ঘোমটা, কিন্তু সারদা ভট্টাচার্য্যের সামনে দিনে দুপুরে গায়ের মাথার কাপড় খুলে বেশ হাসি-তামাসা কর্‌তে পার।"

রাণীর মুখের ঘোমটা সরিয়া গেল; পদাহতা ভুজঙ্গীর ন্যায় গ্রীবা উন্নত করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "কাকে এ সব কথা বল্‌ছ? আমি না তোমার স্ত্রী?"

বেহারী তেমনি কর্কশ স্বরে উত্তর করিল, "স্ত্রী ব'লেই আজ পাঁচ জনের কাছে মাথা কাটা গেছে, অপর পর হ'লে যেতো না।"

রাণী বলিল, "পাঁচজনে বল্‌লেও তোমার কি বলা উচিত? তুমি পাঁচজনের কথায় বিশ্বাস কর?"

বেহারী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া "উঃ" বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, তার পর অবসন্নভাবে দাবার উপর বসিয়া পড়িল। বাঁ হাতের উপর মাথাটা রাখিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আপন মনে বলিল, "দোষ তোমার নয়—আমার।

আমি যদি তোমায় এমন ভাবে ফেলে না যেতাম; তবে আজ আমাকে স্ত্রীর ব্যভিচারের দণ্ড দিতে হতো না। উঃ, গলায় দড়ী দিতে ইচ্ছা হচ্ছে।"

ব্যভিচারের দণ্ড! ব্যভিচারিণী। আর তাহার স্বামী সে কথায় বিশ্বাস করিয়াছে। এতদিন পাঁচ-জনের মুখের কথায় রাণীর যে হৃদয় টলে নাই, আজি স্বামীর মুখে সে কথার প্রতিধ্বনি শুনিয়া তাহার অটল হৃদয় বিচলিত হইল। ঘৃণায়, লজ্জায়, অভি-মানে তাহার বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে সেখানে আর দাঁড়াইল না, স্বামীর দিকে একটা তিরস্কারপূর্ণ তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সগর্ব্ব পদক্ষেপে চলিয়া গেল।

হাসি ধীরে ধীরে আসিয়া বেহারীর পাশে দাঁড়া-ইল; ধীর মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি কি পাগল হয়েছ?"

বেহারী কোন উত্তর করিল না, হাসির দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। হাসি স্বরটাকে একটু তীব্র করিয়া বলিল, "ছি ছি, লোকের কথা শুনে দিদিকে তোমার এ সকল কথা বলা কি ভাল হয়েছে?"

বেহারী রুক্ষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া হাত-যোড় করিয়া বলিল, "রক্ষা কর হাসি, আমায় মাপ কর। পাগল হবার যেটুকু বাকী আছে, সেটুকু আর সম্পূর্ণ ক'রে দিও না।"

হাসি ম্লানমুখে একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে রাণীর ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

রাণী তখন ঘরের মেঝেয় উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। হাসি গিয়া তাহার মাথার কাছে বসিয়া মৃদু-কোমল কণ্ঠে ডাকিল, "দিদি!"

রাণী কোন উত্তর দিল না। তখন হাসি তাহার মাথাটা আস্তে আস্তে আপনার কোলের উপর তুলিয়া লইয়া কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, ছি দিদি, তুমিও ওঁর কথা শুনে রাগ করলে?"

রাণী কি বলিতে গেল, কিন্তু বলিতে পারিল না; তাহার দুই চোখ দিয়া বন্যার প্রবাহ ছুটিল। হাসিও তাহার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সহানুভূতির অশ্রু-ধারায় সপত্নীর বুকের ব্যথা ধুইয়া দিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হইয়া গেল। দীয়তাং ভুজ্যতাং না হইলেও পল্লীগ্রামের পক্ষে সমারোহ মন্দ হইল না। অনেক ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, শূদ্র খাওয়ান হইল, দুই চারিজন অধ্যাপকও কিছু কিছু বিদায় পাইলেন। মাতার জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে সাহায্য না করিয়া বেহারী যেটুকু ত্রুটী করিয়াছিল, তাঁহার পারলৌকিক কার্য্যে যথেষ্ট ব্যয় করিয়া সেটুকু সংশোধন করিয়া লইল। গ্রামের সকলেই একবাক্যে বেহারীর মাতাকে রত্নগর্ভা বলিয়া সুখ্যাতি করিল।

রাণী এ কয়দিন ঘরের বাহির হয় নাই। সেই যে অশৌচান্ত দিনে ঘাটে স্নান করিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল, শ্রাদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আর সে বাহিরে আইসে নাই। এক পাশে একটা ঘরের ভিতর চুপ করিয়া পড়িয়াছিল, আর মাঝে মাঝে, "মা, মা গো!" বলিয়া দীর্ণ হৃদয়ের অব্যক্ত যাতনা প্রকাশ করিতে-ছিল। হাসিও এ কয়দিন তাহার কাছছাড়া হয় নাই। সে এক একবার বাহিরে আসিয়া স্বামীর প্রয়োজনীয় আদেশ পালন করিত, বাকী সময়টুকু রাণীর মাথার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া কাটাইত। দিনান্তে জোর করিয়া রাণীকে কিছু খাওয়াইত। রাণীর খাইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যখন দেখিত, সে না খাইলে হাসিও অনাহারে থাকিবে, তখন উঠিয়া বহুকষ্টে চোখের জল মুছিয়া কিছু খাইত।

ঘোষাল-গৃহিণী আসিয়া কর্ত্রীর পদ অধিকার করিয়াছিলেন। নিস্তার দিদি, ক্ষেমা পিসী, ভুলোর মা প্রভৃতি পল্লীবাসিনীরা তাঁহার সহকারিণী হইয়া-ছিল। সুতরাং রাণী বা হাসির অনুপস্থিতিতেও কার্য্যের কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিল না। তবে সকল জিনিসই কিছু বেশী বেশী খরচ হইয়াছিল। তা এত নিক্তির ওজনে হিসাব করিয়া মেয়েমানুষে কি কাজ করিতে পারে? তবু ঘোষাল মহাশয় মধ্যে মধ্যে আসিয়া গৃহিণীকে সতর্ক করিয়া দিতেন, "দেখো গিন্নি, একটি তিল যেন বরবাদ না যায়।" চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভাবিতেন, "হায় হায়, তাঁহার প্রথম পক্ষ যদি থাকিত? দ্বিতীয় পক্ষ যে ছেলেমানুষ; আর সে এত ঝঞ্ঝাটে যেতেই চায় না।"

কার্য্য-শেষে ঘোষাল-গৃহিণী বেহারীকে ভাঁড়ার বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

কাজের গোলযোগ শেষ হইলে বেহারী এক দিন রাণীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আসল কথাটা কি, বল দেখি?"

রাণী বলিল, "আমার মুখেই শুনবে?"

বেহারী বলিল, "হাঁ।"

রাণী তখন সারদাচরণের আগমন হইতে বিতাড়ন ব্যাপার পর্য্যন্ত সব কথা খুলিয়া ব'লল, বেহারী চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল। বক্তব্য শেষ করিয়া

রাণী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বিশ্বাস হয়?"

বেহারী বলিল, "হয়।"

রাণী। কিসে বিশ্বাস হ'লো?

বেহারী। তোমার কথায়।

রাণী। আমি তো মিথ্যাকথাও বল্‌তে পারি?

রাণীর দিকে তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বেহারী বলিল, "তুমি বল্‌তে পার, কিন্তু আমি এখনও এতটা নীচ হই নাই রাণি, যে তোমাকে মিথ্যাবাদিনী মনে করব।"

রাণী লজ্জিত হইল, মনে মনে স্বামীর প্রশংসা করিল। একটু ভাবিয়া বেহারী বলিল, "তা হ'লে তুমি এখন কি কর্‌বে?"

রাণী। তুমি কি কর্‌তে বল?

বেহারী। আমি যা বলি, তাই কর্‌বে?

বেহারীর স্বরে একটু শ্লেষের আঘাত ছিল। রাণী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, "ভাল বুঝ্‌লে কর্‌তেও পারি।"

বেহারী। তবে আমার সঙ্গে কল্‌কাতায় চল।

রাণী। সেখানে গিয়ে কি কর্‌ব?

বেহারী মনে মনে বলিল, "আমার শ্রাদ্ধ কর্‌বে।" মুখে বলিল, "স্ত্রী স্বামীর ঘরে গিয়ে কি করে?"

রাণী। স্বামীকে নিয়ে ঘর-সংসার করে।

বেহারী। তুমিও না হয় তাই কর্‌লে?

রাণী। আমার সে উপায় নাই।

বেহারী। কিসে নিরুপায় হলে?

রাণী। আমি সমাজে পতিতা।

ঈষৎ হাসিয়া বেহারী বলিল, "সেখানে সমাজের 'স'ও নাই।"

রাণী বলিল, "কিন্তু এখানে আছে।"

বেহারী। এখানে কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য দিলেই সব চ'লে যায়।

রাণী। কিন্তু সেটা কি অপমানের কথা নয়?

বেহারী। সে মান অপমান আমি বুঝবো।

রাণী। আমি তোমার স্ত্রী। আমারও সেটা বুঝা উচিত।

বেহারী রাগিয়া বলিল, "আমি এত ন্যায়শাস্ত্রের তর্ক কর্‌তে চাই না। এখন তুমি যাবে কি না বল।"

রাণী স্থির স্বরে বলিল, "যাব না।"

বেহারী। তবে এত কথা আমায় বুঝিয়ে বলবার কি দরকার ছিল?

রাণী। তোমার মনে কোন সন্দেহ না থাকে।

বেহারী। আমি মেয়েমানুষ নই যে, একটুতেই সন্দেহ হবে। আমার মনে আদৌ সন্দেহ ছিল না।

রাণী। তবু আমার নির্দ্দোষতা বুঝিয়ে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।

উত্তেজিত কণ্ঠে বেহারী বলিল, "আর স্বামীর ঘর করাটাই বুঝি তোমার যত অকর্ত্তব্যের মধ্যে?"

রাণী শান্ত স্বরে বলিল, "রাগ করো না। হাসি তোমার স্ত্রীর অনুপযুক্ত নয়।"

বেহারী। হাসি হাসি—সে রাণী নয়।

রাণী। জগতে সবাই রাণী পায় না। হাসিকে নিয়ে তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

বেহারী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল, "বুঝেছি রাণি! কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, তোমার মনে সপত্নী-বিদ্বেষ স্থান পায় না।"

রাণী বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল; স্বামীর উপর একটা জ্বলন্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "পুরুষ তুমি, স্ত্রীলোকের হৃদয় কি বুঝবে? আমার মনে যদি এতটুকুও সপত্নী-বিদ্বেষ স্থান পেতো, তা হ'লে আমিই তোমার পায়ে ধ'রে তোমার সঙ্গে যেতাম।"

কথা শেষ করিয়াই রাণী স্বামীর সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল; বেহারী স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল, "রমণী-হৃদয় প্রহেলিকাময়; সত্যই আমরা তাহার কিছুই বুঝি না!" বেহারী চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

সহসা স্কন্ধদেশে কাহার কোমল করস্পর্শ অনুভব করিয়া বেহারী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল,—দেখিল, হাসি। স্বামীকে চাহিতে দেখিয়া হাসি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সেই একটু হাসিতেই বেহারীর অন্তরের দুশ্চিন্তার ভারটা যেন লঘু হইয়া আসিল। বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হাসি?"

হাসি বলিল, "কি এত ভাবছ?"

বেহারী। কত কি—আকাশ, পাতাল, মানুষ, পশু, পক্ষী, ভূত, প্রেত।

শেষের কথাটা শুনিয়া হাসি শিহরিয়া উঠিল; ঈষৎ ভীতিপূর্ণ স্বরে বলিল, "ওগুলার কথা আবার কেন?"

মৃদু হাসিয়া বেহারী বলিল, "কেন, ভয় হয়?"

হাসি। ভয় সন্ধ্যাবেলা ও সব নাম করতে নাই। কেন, ও ছাড়া আর ভাববার কিছু নাই না কি?

বেহারী। আর কি আছে?

হাসি। কেন, আমি আছি, দিদি আছে।

বেহারী। তোমার দিদির কথাই ভাবছিলাম হাসি।

হাসি ঘাড়টি একটু হেলাইয়া ঠোঁটটি ঈষৎ ফুলাইয়া বলিল, "তবু ভাল, দিদির কথাও ভাব্‌তে শিখেছ।"

বেহারী মনে মনে বলিল, "কি বুঝবে তুমি হাসি,

তার কথা আজ তিন বৎসর কত ভেবে আস্‌ছি। তোমার হাসির তরঙ্গে আমার মনের অনেক ব্যথা ধুয়ে গেছে, কিন্তু সে চিন্তাটুকু তো মুছে নাই? বরং আরও পরিষ্কার, আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমি তোমাকে এক মুহূর্ত্তে বোধ হয় ভুলতে পারি হাসি, কিন্তু তার চিন্তাটুকুও বোধ হয় যুগযুগান্তে ভুল্‌তে পার্‌ব না।"

হাসি পুনরায় স্বামীকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া তাহার হাতখানি নিজের হাতে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, সত্যি?"

বেহারী। কি সত্যি হাসি?

হাসি। তুমি দিদির কথা ভাবছ?

বেহারী। হাঁ।

হাসি। দিদিকে এবার সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

বেহারী। সে যাবে না।

হাসি মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "হাঁ, যাবে না বৈ কি, তুমি নিয়ে যাবে না?"

বেহারী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না হাসি, সত্যই আমি নিয়ে যেতে চাই, কিন্তু সে যাবে না।"

হাসি। কে বল্‌লে?

বেহারী। সে নিজে এইমাত্র ব'লে গেল।

হাসি। তা আর হ'তে হয় না। এই আমি বল্‌ছি, দিদি কখনো আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে না। তুমি না পার, আমি নিয়ে যাব,—জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাব।

বেহারী সহাস্যে বলিল, "পার্‌বে?"

হাসি। নিশ্চয় পারব।

বেহারী। কিন্তু সে নিশ্চয় যাবে না।

হাসি স্বামীর হাত ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; জোর গলায় বলিল, "যাবে গো যাবে, নিশ্চয় যাবে। আমি কাঁদ্‌লেই যাবে। এই দেখ, আমি তার মত নিয়ে আসি।"

হাসি "দিদি," "দিদি" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বাহির হইয়া গেল। বেহারী একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার চিন্তামগ্ন হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এ কয়েক দিন রাণীকে মনের সহিত যে কি ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইল, তাহা সেই জানিল। তাহার একদিকে স্বামী—সংসারের সার, প্রাণের আরাধ্য, জীবনের পূর্ণসাধ, নারীত্বের সুদৃঢ় আশ্রয় স্বামী, অপর দিকে অভিমান,—নারীত্বের দুর্জ্জয় অভিমান। দূর হউক অভিমান, রসাতলে যাউক গর্ব্ব; স্বামীর ভালবাসার প্রবল প্রবাহে সে কি এ সব ভাসাইয়া দিতে পারিবে না? দিলে ক্ষতি কি? বরং লাভই যথেষ্ট। তবে সে এই লাভের আশা কেন ছাড়িবে? কোন্ অপ্রত্যাশিত সুখের আশায় সে স্বামীর সাদর আহ্বান উপেক্ষা করিবে? সংসারের কোন্ সুদৃঢ় আকর্ষণে সে নারী-জীবনের সকল সুখসাধ বিসর্জ্জন দিয়া উপেক্ষিত, ব্যথিত, ভারাক্রান্ত জীবন বহন করিতে যাইবে? অসহায়া রমণী সে, কোন্ সাহসে এমন নির্ভর আশ্রয় ত্যাগ করিবে?

রাণী এই কয়দিনেই বুঝিয়াছিল, স্বামী পুনরায় বিবাহ করিলেও তাহাকে হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন নাই; হাসির মত স্ত্রীও সেখানে স্বীয় অধিকার পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। এখনও সে ইচ্ছা করিলে তথায় আপনার স্থায়ী সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম, শত শত হাসিও তাহাতে বিন্দুমাত্র বাধা দিতে পারিবে না। তবে কেন সে স্বেচ্ছায় তেমন সুখের পথে কণ্টক রোপণ করিয়া জীবনটাকে দুঃখের নিদারুণ ভারে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবে? সে স্বামীর অপার অতলস্পর্শ ভালবাসার সাগরে আপনার জীবন-তরণীখানি ভাসাইয়া দিয়া কৃতার্থম্মন্য হইবে, নারীজন্ম সার্থক করিবে!

কিন্তু রাণী তাহা করিতে পারিল না; নারীত্বের গর্ব্ব, রমণী-হৃদয়ের দুর্জ্জয় অভিমান আসিয়া অটল পর্ব্বতের মত সম্মুখে দাঁড়াইল। ছি, ছি, যে স্বামী একটা তুচ্ছ অপরাধে তাহাকে এমন গুরুতর শাস্তি দিয়াছেন, তাহার অধিকৃত আসনে অপরকে আনিয়া বসাইয়াছেন, তাহার প্রাণঢালা ভালবাসাকে উপেক্ষা করিয়া—পদদলিত করিয়া জগতের নিকট তাহাকে হাস্যাস্পদ করিয়াছেন, সেই স্বামীর—রূপযৌবনবিমুগ্ধ সেই নির্ম্মম-হৃদয়ের দুইটা মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হইয়া পালিত কুক্কুরের মত সে তাঁহার অনুসরণ করিবে, জগৎসমক্ষে আপনার হীনতা, দৈন্য প্রকাশ করিয়া দিবে? তাহা হইতেই পারে না। সে স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে পারিবে, কিন্তু ক্ষমা করিয়া আপনার দৈন্য দেখাইতে পারিবে না।

এ সকলের উপর আর একটা বাধা হাসি। হাসি যদি ঠিক সপত্নীর মত হইত, রাণী যদি তাহাকে সপত্নীর ক্রূর দৃষ্টিতে দেখিতে পারিত, তাহা হইলে সে কি করিত বলা যায় না। কিন্তু হাসি তো সপত্নী নয়, সে একটি মুগ্ধা সরলা বালিকা; সে বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি যেন এই পৃথিবীর উপাদানে নির্ম্মিত নয়, তাহাতে ঈর্ষা

নাই, দ্বেষ নাই, কপটতা নাই, ছলনা নাই; আছে শুধু প্রেম—অগাধ অনন্ত অপরিমেয় প্রেম; যে প্রেমে পর আপন হয়, শত্রু মিত্র হয়, পাষাণের কঠিন বুক চিরিয়া নির্ঝরিণীর তরল ধারা প্রবাহিত হয়, সেই প্রেমে তাহার হৃদয় ভরা। রাণী সব পারে, কিন্তু নিজের জন্য হাসিকে কাঁদাইতে পারে না। সে স্বীয় অধিকার-প্রতিষ্ঠার জন্য অন্ততঃ যুদ্ধ করিতেও অগ্রসর হইত, কিন্তু যে আপনা হইতেই বিপক্ষের গলায় বিজয়-মাল্য পরাইয়া দেয়, তাহার সঙ্গে তো যুদ্ধ চলে না।

তা এত যুদ্ধ-হাঙ্গামেরই বা কি প্রয়োজন ছিল? হাসি যখন প্রস্তুত, তখন দুই জনে আপোষে আপনাদের অধিকারটা ভাগাভাগি করিয়া লইলেই তো সব গোল-যোগ মিটিয়া যাইত। কিন্তু সংসারে এমন লোক অনেক আছে, যাহারা ভাগাভাগির ভিতর যাইতে চায় না। হয় নিজে সবটা লইবে, নতুবা স্বেচ্ছায় অপরকে সবটাই বিলাইয়া দিবে। ভাগ করিয়া পূর্ণ অধিকারের একটা টুক্‌রা লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। রাণীর প্রকৃতি-টাও ঠিক সেইমত। তাহাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "এক বৃন্তে কি দুটি ফুল ফুটে না?" তবে সে গর্ব্বিতা লুৎফউন্নিসা বা পদ্মাবতীর মতই গর্ব্বিতস্বরে উত্তর করিবে, "অন্য ক্ষুদ্র ফুল ফুটিতে পারে, কিন্তু একবৃন্তে দুইটি পদ্ম ফুটে না।" সুতরাং রাণী ভাগাভাগির দিকে না গিয়া সবটাই সপত্নীকে বিলাইয়া দিল। এই দানে সে কি সুখ পাইল, তাহা সে-ই জানে; বোধ হয়, বদান্য ধনী আপনার সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া রিক্তহস্তে পর্ণকুটীরবাসে যে সুখ পায়, তেমনই একটা কিছু সুখ পাইল।

কিন্তু হাসি বড় গোল বাধাইল। সে দিদিকে লইয়া যাইবার জন্য কাঁদাকাটা করিয়া, পায়ে মাথা কুটিয়া বেহারীকে এমনই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল যে, বেহারী সাধ্যসত্ত্বে তাহার দিকে ঘেঁষিত না। স্বামীর ধরা না পাইয়া হাসি শেষে রাণীকে ধরিয়া বসিল। রাণী তাহাকে অনেক বুঝাইল, অনেক আশ্বাস দিল, কিন্তু হাসি কিছুতেই বুঝিল না। সে রাণীর পায়ে পড়িয়া, চোখের জল ঢালিয়া, মাথার দিব্য দিয়া এমন একটা কাণ্ড করিয়া তুলিল যে, রাণী ভাবিল, সকল দিক্ সাম্‌লাইয়াছি, কিন্তু হাসির দিক্ দিয়া বুঝি আর সাম্‌লাইতে পারিলাম না।

শেষে রাণী তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, "কি কর্‌ব ভাই, আমার যে এখান ছেড়ে যাবার উপায় নাই।"

হাসি বলিল, "কেন, এখানে তোমার কি আছে?"

রাণী। শ্বশুরের ভিটা আছে। জানিস্ তো, এই ভিটার মায়াতেই মা সব ছেড়ে এখানে প'ড়ে ছিলেন। আমি গেলে এ ভিটায় সন্ধ্যা দেবে কে?

হাসি। বেশ, আমিও তোমার কাছে থাক্‌ব। আমারও তো শ্বশুরের ভিটে, আমিও সন্ধ্যে দেব।

রাণী। তাও কি হয়?

হাসি জোর করিয়া বলিল, "কেন হবে না, নিশ্চয়ই হবে। আমি এখানেই থাক্‌ব।"

রাণী তখন একটু ভাবিয়া বলিল, "কিন্তু তুই এখানে থাক্‌লে ওঁকে কে দেখ্‌বে? ওঁর যে কষ্ট হবে।"

হাসি মুখ ভার করিয়া রহিল। রাণী বুঝিল, ঔষধ ধরিয়াছে। তখন সে ঔষধটাকে আরও একটু তীব্র করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "উনি সেখানে একা থাক্‌বেন, ভেবে দেখ দেখি, সে কি কষ্ট। যদি একটু অসুখ-বিসুখ হয়—"

হাসি ভার-ভার মুখখানা তুলিয়া ধরা গলায় বলিল "বুঝেছি, তুমি যাবে না। বেশ আমি যদি আর তোমার সঙ্গে কথা কই, দিদি ব'লে তোমার কাছে আসি, তবে আমাকে কটু দিব্যি।"

বলিতে বলিতে হাসি কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া পলাইল। রাণী স্নেহসজলনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আপন মনে বলিল, "হায় হাসি, তোর ঐ ক্ষুদ্র সরল হৃদয়খানি যদি আমি পাই-তাম।"

তার পর যখন বিদায়ের পালা আসিল, মোটঘাট লইয়া বেহারী প্রস্তুত হইল, দরজায় গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, তখন হাসি দুই হাতে রাণীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বুঝেছি দিদি, আমি বেঁচে থাকতে তুমি যাবে না; বেশ, আমি ম'লে কিন্তু যেও।"

রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ও কি কথা লা আবাগী, ষাট্ ষাট্!"

হাসি তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; রাণীর চোখের জলে তাহার মাথা ভিজিয়া গেল।

বেহারী ডাকিয়া বলিল, "ওগো, বেলা হয়ে যায়।"

রাণী বহুকষ্টে হাসির নিবিড় বাহুবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিল; তার পর তাহাকে লইয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। গাড়ীতে উঠিয়া হাসি এক-বারমাত্র রাণীর দিকে চাহিয়াই মুখে কাপড় চাপা দিল। রাণীও আঁচলে চক্ষু চাপিয়া সরিয়া দরজার পাশে আসিল।

গাড়ীতে উঠিবার সময় বেহারী রাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "যদি দরকার হয়, আমাকে সংবাদ

দিও।" রাণী সে কথার কোন উত্তর দিল না। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

গাড়ী যতক্ষণ না মোড় ঘুরিয়া অদৃশ্য হইল, ততক্ষণ রাণী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। শেষে যখন আর কিছুই দেখা গেল না, চাকার শব্দও ক্রমে বাতাসে মিশাইয়া আসিল, তখন রাণী ঘরে আসিয়া; মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

মধ্যাহ্ন অনেকক্ষণ অতীত হইয়াছে; গাছের ছায়া ঈশান কোণে হেলিয়া পড়িয়াছে, উঠানের রৌদ্র সরিয়া গিয়া প্রাচীরের কাছাকাছি হইয়াছে। রাণী তখনও সেই ঘরের মেঝেয় পড়িয়া আছে। এমন সময় শান্তি আসিয়া ডাকিল, "সই, ওলো সই ?"

রাণী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াই আহ্লাদে বলিয়া উঠিল, "এঁ্যা, সই! কখন্ এলি সই ?"

বলিয়াই রাণী ছুটিয়া আসিয়া শান্তির হাত ধরিল এবং তাহাকে টানিয়া ঘরে আনিল। শান্তি মেঝের উপর বসিয়া বলিল, "আজ সকালে এসেছি। কিন্তু তোর এমন দশা কেন? শুন্লাম, জ্যাঠাইমা মারা গেছেন।"

রাণী বলিল, "হাঁ ভাই।"

শান্তি। মরে তিনি বেঁচেছেন। তা তুই এমন ক'রে প'ড়ে কেন? মুখ ভারী, চোখ রাঙ্গা, গলা ভার ভার; অসুখ করেছে না কি ?

"না, অসুখ নয়" বলিয়া রাণী এলো চুলগুলাকে দুই হাতে ধরিয়া গোটা দুই পাক দিয়া মাথায় জড়াইল। তার পর শান্তির দিকে চাহিয়া বলিল, "সেখানে কেমন ছিলি? রোগা হয়ে গেছিস যে?"

শান্তি হাসিয়া বলিল, "তুই বা কোন্ হাতীটা হয়েছিস? সত্যি, তোর চেহারাটা এমন কেন বল্ দেখি? খাওয়া হয়েছে ?"

রাণী। এখনও হয় নি।

শান্তি। আর কখন্ হবে? বেহারী দা এসেছিল না ?

রাণী। হাঁ।

শান্তি। চ'লে গেছে ?

রাণী। গেছে।

শান্তি। কবে গেল ?

রাণী। আজ।

মৃদু হাসিয়া শান্তি বলিল, "ওঃ, তাই বুঝি রাই ধরাসনে? তা' তুই সঙ্গে গেলি না যে?"

রাণী। গিয়ে কি হবে ?

শান্তি। তোমার শ্রাদ্ধ হবে।

রাণী। সেটা এখানে হ'লেই ক্ষতি কি?

শান্তি। এখানে পিণ্ডী দেবে কে ?

রাণী। তুই।

শান্তি। মুখে আগুন! সত্যি, সঙ্গে গেলি না কেন ?

রাণী। ইচ্ছে হ'লো না।

শান্তি একটু রাগিয়া বলিল, "মরণ আর কি; স্বামীর সঙ্গে যেতে ইচ্ছা হ'লো না ?"

মৃদু হাসিয়া রাণী বলিল, "কি কর্ব ভাই, ইচ্ছাটা তো আমার হাত-ধরা নয়!"

শান্তি। না, রাগটাই কেবল তোমার হাতধরা। আর কে এসেছিল ?

"আর—আর এসেছিল—" রাণী কি বলিয়া যে হাসির পরিচয় দিবে, তাহা ঠিক করিতে পারিল না। শান্তি হাসিতে হাসিতে বলিল, "বুঝেছি, সতীন।"

রাণী বলিল, "না, সে হাসি।"

শান্তি। সে আবার কে ?

রাণী। সে হাসি, সতীন, না না, সতীন নয়, ছোট বোন।

শান্তি। মর্ পোড়ারমুখী, সতীন বুঝি আবার বোন্ হয় ?

রাণী। হয়। আগে জান্তেম না, কিন্তু এখন জেনেছি—হয়।

রাণীর চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল। শান্তি বলিল, "ও কি, কাঁদ্‌ছিস্ যে।"

অনেকক্ষণ পরে রাণী প্রকৃতিস্থ হইল। আঁচলে চোখ-মুখ মুছিয়া বলিল, "দূর হোক ছাই! এখন তোর কথা বল্। সেখানে কেমন ছিলি ?"

শান্তি। ঢেঁকি স্বর্গে গিয়ে কি করে ?

রাণী। শুনেছি, ধান ভানে।

শান্তি। আমারও তাই, বরং কিছু বেশী।

রাণী। তাই বুঝি স্বর্গ ছেড়ে আবার মর্ত্ত্যে এলি ?

শান্তি। কাজেই। এখানে তবু ধান-ভানার গীত শুনবার লোক আছে।

রাণী। সে আবার কে ?

শান্তি। সই।

রাণী হাসিয়া বলিল, "তা সেখানেও একটা সই জোটালি না কেন ?"

শান্তিও হাসিয়া উত্তর করিল, "জুটেছিল, তবে সে সই নয়—সয়া।"

রাণী। সে তো আরও ভাল। ছেড়ে এলি যে?

শান্তি। আমি কি ছাড়ি? লোকে ছাড়ায়। ননদী কুটিলা দেখলে বে-গতিক, রাই বুঝি এবার যমুনায় জল আন্‌তে ছোটে। তাই পগদ চার আনা খরচ ক'রে তাড়াতাড়ি যমুনা পার ক'রে দিলে।

রাণী। বেশ ক'রেছে; আমি হ'লে রাইকে যমুনার মাঝখানে রেখে দিতাম।

শান্তি। তোর ভাই বড় দয়ার শরীর।

শান্তি হাসিয়া উঠিল। রাণীও হাসিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, "রেখে দে তোর হাসি। এখন হেঁয়ালী ছেড়ে সোজা কথায় ব্যাপারটা কি বল্ দেখি।"

সহসা শান্তির মুখের হাসি কোথায় মিলাইয়া গেল। একটা জোর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এর আর সোজা উল্‌টো কি ভাই, বিধবার বাপের বাড়ীই কি, শ্বশুর-বাড়ীই কি, কোথাও সোয়াস্তি নাই। এখানে সৎ-মা, সেখানে জা, তিনি আবার এঁর চেয়ে এক কাঠী সরেশ। দেখে শুনে ভাবছিলাম, গলায় দড়ি দিয়ে মরা সহজ, কি আফিং খেয়ে মরা সহজ? কিন্তু অদৃষ্টে আত্মহত্যার পাপ নাই, তাই আবার এখানে এসে পড়লাম। ইহকাল তো গেছেই, শেষে আত্মঘাতী হ'লে পরকালটাও যেত।"

একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাসে শান্তির বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। রাণীও সহানুভূতির দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া করুণকণ্ঠে বলিল, "সত্যি ভাই, তোর বড় দুঃখ!"

দুঃখে ম্লান হাসি হাসিয়া শান্তি বলিল, "বিধবা আবার কবে কোথায় সুখ পেয়েছে? চুলোয় যাক্ সুখ-দুঃখ, আমার সই বেঁচে থাক্।"

রাণীও হাসিয়া বলিল, "সেই ভাল, সুখ চাই না, আমরা দু'টি সইয়ে বেঁচে থাকি আয়। সত্যি বল্‌তে কি ভাই, তুই এলি না আমি বাঁচলাম। তবু দু'দণ্ড কথা ক'য়ে বাচব।"

শান্তি। কাজেই! যখন কথা কইবার সঙ্গী ছেড়ে দিয়েছ, তখন দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটাতে হবে।

রাণী। অমন জ'লো দুধের চেয়ে আমার ঘোলই ভাল।

শান্তি। যদি না মাথায় পড়ে।

দুই সখীতেই হাসিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে উভয়ের দুঃখতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে একটু সুখের আলো ফুটিল।

এই আখ্যায়িকার সহিত শান্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং তাহার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

দশম পরিচ্ছেদ

বেহারীচরণের বাড়ীর পাশে রামসদয় চক্রবর্ত্তীর বাড়ী। পৌরোহিত্য তাঁহার ব্যবসায়; গ্রামের অনেক কায়স্থ নবশাখ তাঁহার যজমান। অনেকে মনে করেন, ব্যবসায়মাত্রেই কিছু মূলধনের আবশ্যক। আমরা কিন্তু জানি, অন্য ব্যবসায়ে মূলধনের আবশ্যকতা থাকি-লেও পৌরোহিত্য ব্যবসায়ে ইহার কিছুমাত্র প্রয়ো-জনীয়তা নাই। প্রাচীনকালে ইহাতে বিদ্যা নামক একটা মূলধনের আবশ্যক ছিল বটে, কিন্তু এখন এই বিদ্যাপ্লাবিত দেশে বিনা মূলধনেই ব্যবসায় চলে। এখন কেবল স্ত্রীলোকদিগের মন-ভুলান মিষ্ট কথা, কার্য্যের আড়ম্বর প্রদর্শন, শনিস্তোত্র, নবগ্রহস্তোত্র, সত্যপীরের পাঁচালী প্রভৃতি কতকগুলা সংস্কৃত অসংস্কৃত বিষয় জানিলেই বেশ কাজ চলিয়া যায়। 'প্রতিপদে অর্থহানিঃ কুষ্মাণ্ডভক্ষণ,' 'রবৌ বর্জ্জ্যং চতুঃপঞ্চ' 'সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী' প্রভৃতি কতকগুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণ কণ্ঠস্থ করিতে পারিলেই, আর পাঁজি দেখিয়া যাত্রা শুভ, যাত্রা নাস্তি, নক্ষত্রামৃতযোগ ঠিক করিতে জানিলেই অনেক মহামহোপাধ্যায়কেও তাঁহাদের সৌভাগ্যদর্শনে ঈর্ষান্বিত হইতে হয়। তাঁহারা অনেক সময়েই স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের অধ্যাপকনিমন্ত্রণের পত্রখানা ভ্রমবশতঃ এইরূপ পুরোহিত মহাশয়দের হাতেই দিয়া ফেলেন।

রামসদয়ের পুরোহিতের উপযুক্ত পূর্ব্বোক্ত গুণগুলি ছিলই, অধিকন্তু তিনি কয়েক দিন সংক্ষিপ্তসার ব্যাক-রণের সন্ধিবৃত্তি বগলে পুরিয়া অনন্ত ভট্টাচার্য্যের টোলেও যাতায়াত করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে আর পায় কে? সেই এক সন্ধিবৃত্তির জোরেই তিনি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, অশৌচ ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রদান করিতেন এবং তজ্জন্য নিয়মিত তৈলবটও পাইতেন। রামসদয় তাঁহার পাণ্ডিত্যের মূল সন্ধিবৃত্তিখানিকে লাল খেরোয় মুড়িয়া যত্নসহকারে সিন্দুকে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন; এবং মাঝে মাঝে রোদে দিয়া তাহাকে কীটের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন।

গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে যেমন এক জন দশকর্ম্মা-ন্বিত বলিয়া জানিত, তেমনই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াও সম্মান করিত। সে বৎসর বোসেদের বাড়ীতে দুর্গোৎ-সবের সময় কৃষ্ণনগর হইতে জনৈক ভট্টাচার্য্য আসিয়া চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন। তিনি পড়িতেছিলেন, "অযুধ্যতাযুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাহনুঃ।" রামসদয় "হাঁ হাঁ, করেন কি, থামুন, থামুন" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ভট্টাচার্য্য অবাক্। তিনি বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মহাশয়, কি দোষ হয়েছে?"

রামসদয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সম্পূর্ণ দোষ, একেবারে অশুদ্ধ। মহাহনূ? চণ্ডীতে হনুমান্ আস্‌বে কোথা হ'তে? সে তো রামায়ণের কথা। আর হনুমান্ ত্রেতাযুগে জন্মেছিল, কিন্তু এটা হচ্ছে সত্যযুগের কথা। শম্ভু নিশম্ভু বধ সত্যযুগেই হয়েছিল, বুঝেছেন?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় রামসদয়ের বিদ্যার দৌড় বুঝিলেন এবং এরূপ পণ্ডিতের সহিত তর্ক করা যে কিরূপ বিপজ্জনক, তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং তিনি রামসদয়ের কথাতেই সায় দিয়া সহাস্যে বলিলেন, "ঠিক কথা, হনূ চণ্ডীতে এসে উৎপাত বাধাবে কেন? নিশ্চয়ই ওটা ভুল। কিন্তু ওটা কি হতে পারে, বলুন দেখি?"

রামসদয় একটুও না ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "ভানু, ভানু, বুঝলেন, মহাভানু। হনূ কেটে ভানু ক'রে দিন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বহুকষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া তাঁহার মনরক্ষার জন্য পড়িলেন, "অযুধাতাযুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাভানুঃ।"

রামসদয়ের এই অগাধ পাণ্ডিত্য দর্শনে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হইলেন। বোসজা মহাশয় তাঁহার আট আনা বৃত্তি বাড়াইয়া এক টাকা করিয়া দিলেন।

রামসদয় আর একটা বিষয় আবিষ্কার করিয়া সকলের নিকট, বিশেষতঃ গ্রাম্য মণ্ডলদিগের নিকট সবিশেষ আদরণীয় হইয়াছিলেন। তাঁহার আবিষ্কারটা এই—"গ্রাম্য মণ্ডলদের মত নারায়ণও দেবসমাজে মোড়লী করিয়া বেড়ান।" মাইনর স্কুলের হেড পণ্ডিত এক দিন ইহার প্রমাণ চাহিলে রামসদয় বলিয়াছিলেন, "কেন, ঐ যে তাঁর ধ্যানেই আছে, "ধ্যেয়ে সদা সবিতরি মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ তিনি দেবতাদের মাঝখানে মোড়লী করিতেন।"

পণ্ডিত মহাশয় না বুঝিয়া বলিলেন, "সে কি মহাশয়, ওখানে যে মণ্ডল অর্থে পরিবেষ অর্থাৎ—"

রামসদয় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "রেখে দাও তোমার অর্থাৎ। এ কি ব্রাহ্মণ-ভোজন না কি যে, পরিবেশন কর্‌বে? মণ্ডল মানে যে মোড়ল, এ কথা কে না জানে? কি বল হে ঘোষের পো, কি গো দত্তজা, কি বল দামু খুড়ো?"

সকলেই একবাক্যে রামসদয়ের বাক্যের পোষকতা করিল। পণ্ডিত মহাশয় হারিয়া গেলেন, রামসদয়েরই জয়-জয়কার হইল। তোমরাও একবার রামসদয়ের মত পুরোহিত মহাশয়দিগের জয়ধ্বনি কর।

সংসারে একটি পুত্রের অভাব ছাড়া রামসদয়ের আর কোন অভাব ছিল না। কন্যা শান্তি ছিল, কিন্তু সে তো দুই দিন বাদে পরের ঘরে চলিয়া যাইবে। বিশেষতঃ সে পিতৃপুরুষদিগের জল-পিণ্ডদানের অধিকারী নহে। জলপিণ্ডদানের উপযোগী একটি সন্তান আসিয়াছিল, কিন্তু সে দুই বৎসরের অধিক কাল সংসারসুখভোগের সুযোগ পাইল না। তার পর রামসদয় কত দুষ্প্রাপ্য ঔষধ-কবচ আনিয়া গৃহিণীর কণ্ঠদেশ ও কটিদেশ ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিলেন, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। শুধু শান্তি একাই মাতা-পিতার অবিভক্ত স্নেহ ভোগ করিতে করিতে বাড়িতে লাগিল।

শান্তির বয়স যখন একাদশ বর্ষ, তখন দ্বাদশবর্ষীয়া রাণী প্রথম স্বামীর ঘর করিতে আসে। সেই সময়েই সমবয়স্কতা প্রযুক্ত উভয়ের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপিত হইয়াছিল এবং চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী করিয়া তাহারা সই পাতাইয়াছিল। শান্তি তখনও অবিবাহিতা।

তার পর শান্তি যখন একাদশ পার হইয়া দ্বাদশে পদার্পণ করিল, তখন তাহার বিবাহের যোগ চলিতে লাগিল। রামসদয় কুলীন নহেন, শ্রোত্রিয়, সুতরাং কন্যার বিবাহে পণ লইতে কোন বাধা ছিল না। তিনিও বিবাহের সময় শ্বশুরকে সাড়ে তিনশত টাকা গণিয়া দিয়াছিলেন। এখন কন্যার বিবাহে তাহা সুদ সমেত আদায় করিবার জন্যই যে তিনি শান্তিকে বড় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা নহে, তবে বাধা যখন নাই, তখন পরের পয়সা ঘরে আনিতে দোষ কি? শান্তি দেখিতে মন্দ ছিল না, তাহার উপর বয়স্থা। রামসদয় আশা করিয়াছিলেন, মেয়ের বিবাহ দিয়া তিনি নিতাই জোলার বড় জমাটা খরিদ করিবেন।

ইহাতে কিন্তু প্রধান যজমান হরিহর বোস বড় গোল বাধাইল। সে বলিল, দাদাঠাকুর, শুক্র-বিক্রয় মহাপাপ। বিশেষ আজকাল আর ও প্রথা নাই। একটি লেখাপড়া-জানা গরীবের ছেলে দেখে মেয়েটি দান কর। খরচ কিছু লাগে, আটকাবে না।"

রামসদয় এমন মাতব্বর যজমানের কথাটা ঠেলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইহার উপর গৃহিণীও যখন ধরিয়া বসিলেন, "সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, ঐ একটা মেয়ে; ওকে জলে ফেলো না, একটি ভাল ছেলে দেখে অমনি দাও। টাকায় আর আমাদের কি দরকার!" তখন অগত্যা রামসদয় তারা ব্রহ্মময়ীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া ভাল ছেলে খুঁজিতে লাগিলেন।

ভাল ছেলে সহজে মিলিল না। লেখাপড়া জানে, কিছু সংস্থান আছে, এরূপ ছেলের অভিভাবকেরা যাহা চাহিয়া বসিল, তাহা শুনিয়া রামসদয়কে বার বার হরি স্মরণ করিতে হইল। এ দিকে তিনি যখন এক পয়সাও গ্রহণ করিবেন না, তখন যেমন তেমন পাত্রের হাতেও তো মেয়ে দেওয়া যায় না। অগত্যা তাঁহাকে অনেক খুঁজিতে হইল।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি পাত্র পাওয়া গেল। পাত্রের বিষয় সম্পত্তি মন্দ নয়, কিছু তেজারতী কারবার আছে; দোষের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ। দ্বিতীয়-পক্ষ হইলেও বয়স তেমন বেশী হয় নাই, চল্লিশের মধ্যে। পাত্রের মা-বাপ নাই, প্রথমপক্ষের সন্তান-সন্ততিও নাই। শুধু ছোট ভাই আছে। ছোট ভায়ের দুইটি ছেলে।

রামসদয় এই পাত্রের হস্তেই কন্যাদান করিলেন। বিবাহে যাহা খরচ হইল, হরিহর বোসই তাহা দিল। গ্রামের লোকে রামসদয়ের এই নির্লোভতা দর্শনে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। কেবল কতকগুলা দুষ্ট লোক সন্দেহ করিল, রামসদয় ঘরখরচ বলিয়া জামাতার নিকট হইতে গোপনে একশত পঁচাত্তর টাকা লইয়াছেন। কিন্তু তাহাদের এই সন্দেহের কোন সন্তোষজনক প্রমাণ ছিল না।

বিবাহের সময় তিন দিন শ্বশুর-বাড়ীতে থাকিয়া শান্তি সেই যে বাপের বাড়ী আসিল, আর তাহাকে শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইল না। বিবাহের পাঁচ মাস পরে সংবাদ আসিল, জামাতা তাঁহার পুর্ব্বসঞ্চিত হাঁপানি রোগের আকস্মিক প্রাবল্যে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। শান্তির মা কাঁদিয়া পাড়া মাথায় করিল। রামসদয় কন্যার বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থার জন্য সত্বর জামাতৃগৃহে গমন করিলেন।

কিন্তু সেখানে গিয়া রামসদয় যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। জামাতা মৃত্যুর পুর্ব্বে উইল করিয়া কনিষ্ঠ ষষ্ঠীচরণকেই সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে স্ত্রীর জন্য এইমাত্র বন্দোবস্ত আছে, স্ত্রী যদি সচ্চরিত্রভাবে তাঁহার বাড়ীতে থাকে, তাহা হইলে সে যাবজ্জীবন খোরপোষ পাইবে এবং সম্ভবমত বার-ব্রতাদির খরচ পাইতে পারিবে।

রামসদয় উইলের সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য পাড়ার দুই এক জন প্রবীণ লোকের কাছে গেলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই বলিলেন, উইল জাল নহে, মৃত্যুর দুই এক দিন পুর্ব্বে তাঁহাদেরই সাক্ষাতে ঘনশ্যাম সজ্ঞানে উইল করিয়া গিয়াছে।

রামসদয় হতাশ হইয়া বলিলেন, "তখন তার মাথার ঠিক ছিল না।"

প্রবীণেরা বলিলেন, "মাথার ঠিক ছিল কি না, সে কথা আপনি আদালতে গিয়া প্রমাণ করতে পারেন। আমরা যা জানি, তাই বল্লাম, পরেও বল্‌বো।"

কিন্তু এই প্রমাণের স্থান আদালত জিনিসটা যে কিরূপ ভয়ঙ্কর, সেখানে টাকা লইয়া কিরূপ ছিনিমিনি খেলা হয়, তাহা রামসদয়ের অজ্ঞাত ছিল না। অগত্যা তিনি নিতান্ত হতাশচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মৃত জামাতার উপর তাহার ভয়ানক রাগ হইল। হায়, হতভাগা এই বয়সে বিবাহ করিয়া অবীরা স্ত্রীর জন্য কিছুই সংস্থান করিয়া গেল না? সব সম্পত্তি ভাইকে দিয়া যদি কেবল দশ বিঘা জমীও স্ত্রীকে দিয়া যাইত, তাহা হইলেও যে অন্ততঃ দেড় হাজার টাকা হাসিতে হাসিতে তাঁহার ঘরে আসিত। হাতে ধরিয়া বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে এমনই ফাঁকি দিয়া যাইতে হয়! কলি-কাল হইলেও ধর্ম্মে কি এতটা সইবে!

কিন্তু ধর্ম্ম জামাতার সম্বন্ধে পরলোকে কি ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং তাঁহার রাগটা অলক্ষ্য স্থানে প্রস্থিত জামাতাকে ত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষস্থিতা কন্যার উপরেই পড়িল। কি হতভাগিনী সে! বিবাহের পর একটা বৎসরও পার হইল না। জামাতা যদি কিছু দিন তাহাকে লইয়া ঘর করিবার সময় পাইত, তাহা হইলে কি এমনটা ঘটিত! হয় তো সেই সমগ্র সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া দাঁড়াইত কিন্তু হায়, অলক্ষণা মেয়ে দুর্ভাগ্যের জন্য সব হারাইল। কেবল হারাইল না, বাপের গলায় ফাঁস ঝুলাইল। এখন হয় তো তাহাকে যাবজ্জীবন পুষিতে হইবে। ছি ছি, মেয়ে না শত্রু!

ঘরে ফিরিয়াই রামসদয় মেয়ের হাতের অবশিষ্ট কাচের চুড়িগুলা ভাঙ্গিয়া দিলেন, কানের মাকড়ি, গলার হার খুলিয়া লইলেন, পেড়ে কাপড় ছাড়াইয়া থান পরাইলেন। তার পর তাহাকে বিধবার অবশ্য-কর্ত্তব্য ব্রহ্মচর্য্য পালনের আদেশ দিয়া হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা করিলেন। গৃহিণী মাথা খুঁড়িতে লাগিল। প্রতি-বাসিনী বেহারীর মা আসিয়া বলিলেন, "একেবারে এতটা কেন ঠাকুরপো, "আহা, ছেলেমানুষ!"

রামসদয় গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া উত্তর করিলেন, "ধর্ম্মের কাছে ছেলে বুড়ো সব সমান। বিধবার ব্রহ্ম-চর্য্য শাস্ত্রের বিধান, আমার কাছে তার এক চুল এ-দিক ও-দিক্ হবে না। আমি সকলকে ব্যবস্থা দিয়া থাকি, আমি যদি শাস্ত্রের বিধান না মানি, তবে আর পাঁচজনে

মানবে কেন? নিজের মেয়ে ব'লে আমি শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করতে পারব না!"

শান্তির মা এতটা সহিতে পারিলেন না; তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া শয্যা লইলেন। তার পর কন্যাকে একটা একাদশীর উপবাস করিতে দেখিয়াই তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, দ্বিতীয় একাদশী পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার মত ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না।

স্বামী হারাইয়া শান্তি কাঁদে নাই। কিন্তু মাকে হারাইয়া কাঁদিয়া ভাসাইল। আজ যেন সে সত্যই সংসারের মমতার ক্রোড় হইতে বিচ্যুতা হইয়া ব্রহ্মচারিণী হইল। রামসদয়ও হৃদয়ে একটা আঘাত পাইলেন; প্রৌঢ় বয়সে পত্নীকে হারাইয়া তিনি সংসার অন্ধকার দেখিলেন। সংসার তাঁহার তিক্ত বোধ হইল। শান্তির প্রাণপণ যত্নও তাঁহার হৃদয়ের সে তিক্ততা দূর করিতে পারিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কালে সবই সহিয়া যায়। আজ যাহা তীব্র শেলাঘাত বলিয়া বোধ হয়, কালে তাহাকেই হৃদয়ের এক পাশে বিদ্ধ কণ্টকের একটু পুরাতন ক্ষতচিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। একদিন যে সংসারকে দাবানলদগ্ধ অরণ্যানী মনে করিয়া ছুটিয়া পলাইতে যায়, কালে সেই আবার হাসি-মুখে ত্যক্ত সংসারকে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরে। কালের ইহাই নিয়ম, সংসার-চক্রের গতির ইহাই গূঢ়রহস্য। এ রহস্য না থাকিলে বুঝি সংসার-চক্র কোন্ দিন অচল হইয়া পড়িত।

রামসদয়ও এই চিরন্তন সংসারনীতির বহির্ভূত নহেন, সুতরাং তাঁহারই হৃদয়ে শোকের আধিপত্য স্থায়ী হইবে কেন? ক্রমে যখন শোকের তীব্রতা কমিয়া আসিল, যখন তিনি বুঝিলেন, সংসারে এক যায়, আর আসে, যে যায়, তাহার জন্য সংসার কোন দিনই তিলমাত্র অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে না, তখন তাঁহার উদাস মনোভৃঙ্গ সংসারের তিক্তরসের মধ্যে আবার কিঞ্চিৎ মধুর রসের অন্বেষণে রত হইল। কিন্তু আধার না পাইয়া সে পথভ্রান্তের মত কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রামসদয় অনেক ভাবিলেন। এ বয়সে বিবাহ না করিয়া বনগমনই উচিত এবং ইহাই শাস্ত্রাদেশ, এ কথা সত্য, কিন্তু উপযুক্ত বনের অভাবে সে কাজটা ইদানীং কাহারও দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এমন তো শুনা যায় না। বিশেষতঃ তিনি শান্তিকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইবেন? শান্তির জন্য তাঁহাকে সংসারে থাকিতেই হইবে। যখন সংসারে থাকিতে হইবে, তখন সংসারীর মত থাকাই দরকার, মনের ভিতরে সন্ন্যাসীর তীব্র বৈরাগ্য লইয়া সংসারে থাকা চলে না। "ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।"—ঠিক কথা, গৃহিণী বিনা গৃহে অরণ্যে প্রভেদ কি?

এ সকল যুক্তির কথা। অতঃপর শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া রামসদয় তাহা হইতে দুইটি রত্ন উদ্ধার করিলেন। তাহার একটি—"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।" হায়, স্ত্রী না থাকিলে তিনি যে ধর্ম্ম-কার্য্যের অধিকারীই নহেন। তার পর "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড-প্রয়োজনম্।" সত্যই তো, তাঁহার পুত্র কোথায়? তাঁহার অবর্ত্তমানে তদীয় চতুর্দ্দশ পুরুষ যে জলপিণ্ডের অভাবে হাহাকার করিয়া বেড়াইবে। সেই যে কোন্ ঋষি বিবাহ না করায় দেখিয়াছিলেন, তাঁহার পিতৃপুরুষেরা এক গভীর গহ্বরমুখে কুশের মূল ধরিয়া ঝুলিতেছিলেন, আর তাঁহাকে অভিসম্পাত করিতেছিলেন। ঋষি তাড়াতাড়ি বিবাহ করিয়া তাঁহাদিগকে গহ্বরমধ্যে পতন হইতে এবং আপনাকে পিতৃলোকের অভিশাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

রামসদয় সব পারেন, কিন্তু শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করিতে পারেন না। এই শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষার জন্যই তিনি সাড়ে চারি শত টাকা পণ দিয়া এক ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকাকে আপনার গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শান্তি চোখের জল মুছিয়া নববধূকে বরণ করিয়া ঘরে আনিল।

বধূর নাম দামিনী। মেঘের মত কালো চুলের রাশি ছাড়া তাহার দেহে দামিনীর আর কোন লক্ষণই দেখা যাইত না। তবে তাহার ভিতরে যে দামিনীর মতই একটা ভীষণ তীব্রতা ছিল, কয়দিনেই শান্তি তাহা বুঝিতে পারিল।

বিবাহের পাঁচ ছয় মাস পরেই দামিনী আপনার গৃহিণীপদ অধিকার করিতে আসিল। আসিবার সময় সে মাতৃদত্ত কতকগুলি অমূল্য উপদেশ ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে আনিতে পারে নাই।

রামসদয় এই বালিকা পত্নীর গৃহিণীপণা ও তদুপযোগী বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। দামিনী আসিয়াই তাঁহার বাক্সের চাবিটা হস্তগত করিল। তিন পয়সার কাজ কেমন করিয়া এক পয়সায় সারিতে হয়, তাহা রামসদয়কে বুঝাইতে ও কার্য্যে প্রদর্শন করিতে লাগিল। বালিকা শান্তি সংসারের সব কাজ একা পারে না বলিয়া রামসদয় একটি ঝি রাখিয়াছিলেন। খাওয়া-পরা ছাড়া তাহাকে মাসে চারি আনা মাহিনা দিতে হইত। সে মাহিনা কখন

আতপ তণ্ডুলে, কখন গামছায় বা সাত হাতি কাপড়ে শোধ যাইত। দামিনী আসিয়াই তাহাকে ছাড়াইয়া দিল। স্বামীকে বলিল, "গরীব গেরস্ত ঘরে আবার ঝি-চাকর! কেন, আমরা কি রাজারাজড়ার মেয়ে?" আমরা অর্থে সে ও শান্তি।

রাজারাজড়ার ঘরের মেয়ে না হইলেও দামিনী যে স্বহস্তে গৃহস্থালীর কাজ করিত, এমন কথা অবশ্য কেহ মনে আনিতেই পারে না। তাহা হইলে যে তাহার গৃহিণীপদের অবমাননা হয়। নিজের হাতে কাজ না করিলেও সে শান্তিকে দিয়া সংসারের সমস্ত কাজ এমন নিপুণভাবে করাইয়া লইত যে, কোথাও একটু ক্রটী থাকিত না। এইরূপে আপনার গৃহিণীপণার নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া চূর্ণ-তাম্রকূটমিশ্র তাম্বুলরঞ্জিত অধরে হাসির লহর তুলিয়া, ঈষৎ কপিলাভ নয়নের অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে রামসদয়ের মুগ্ধ চিত্তটাকে উদভ্রান্ত করিতে করিতে দামিনী সগর্ব্বে সোহাগের স্বরে বলিত, "ঝি-চাকর না রেখেও সংসারের কাজকর্ম্ম চল্‌ছে কি না দেখ। আমাকে কিন্তু এবার মাস মাস সে ঝিয়ের খাওয়া-পরা আর মাইনের খরচটা হিসেব ক'রে দিতে হবে।"

রামসদয় পত্নীকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া আহ্লাদগদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিতেন, "তোমারই যে সব দামিনী, আমি আর তোমায় দিব কি?"

দামিনীর এই আশ্চর্য্য গৃহিণীপণা দেখিয়া রামসদয় মাঝে মাঝে ভাবিতেন, "হায় হায়, এমন বুদ্ধিমতী স্ত্রী আমার কপালে বাঁচলে হয়!"

শান্তি বয়ঃকনিষ্ঠ বিমাতাকে মা বলিতে পারিত না, বৌমা বলিয়া ডাকিত। এক দিন দামিনী তজ্জন্য তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "বৌমা আবার কি? মা ব'লে ডাকবে; কেন, আমি কি তোমার মা বলার যোগ্য নই?"

সে যে তাহার সেই স্নেহময়ী মাতার কোন অংশেই যোগ্য নয়, তাহা জানিলেও শান্তি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না কিন্তু মা বলিয়াও ডাকিল না, ডাকিতে গেলে কথাটা যেন গলায় বাধিয়া যাইত। তাহার এই গর্ব্বিত আচরণে দামিনী তাহার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া উঠিল।

শান্তির এখন আর কাজের বিরাম নাই। সে প্রভাতে উঠিয়া গোময় দ্বারা গৃহসংস্কার, বাসনমাজা প্রভৃতি কাজ একাই সম্পন্ন করিত। তার পর স্নান করিয়া ঠাকুরঘরে পূজার উদ্যোগ করিয়া দিয়া রাঁধিতে যাইত। পিতা ও বিমাতার আহার শেষ হইলে সে সকল পরিষ্কার করিয়া, কাপড় কাচিয়া আহ্নিক করিতে বসিত। আহ্নিক সারিয়া আপনার হবিষ্যান্ন চাপাইত। যখন আহার শেষ করিয়া উঠিত, তখন সূর্য্যদেব পশ্চিমগগনে অনেকটা নামিয়া গিয়াছেন।

রাণী আসিয়া ডাকিত, "সই, জল আন্‌তে যাবি না?" নদী হইতে জল আনিয়া তাহাকে আবার বৈকালিক গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইত; যে দিন ইহার মধ্যে একটু সময় পাইত, সেই দিন রাণীর কাছে গিয়া একটু বসিত।

শান্তি পরিশ্রমে কাতর ছিল না। এত খাটিয়াও সে যদি কোন দিন বিমাতার মুখে একটুও স্নেহসম্ভাষণ শুনিতে পাইত, তাহা হইলেও সে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিত। কিন্তু সেটুকুও তাহার অদৃষ্টে প্রায় ঘটিত না, তৎপরিবর্ত্তে অবিরাম তীব্র বাক্যবাণ আসিয়া তাহার দুঃখদীর্ণ হৃদয়কে আরও বিদীর্ণ করিয়া দিত। সকল দিন তাহার অদৃষ্টে অন্নও জুটিত না, এক এক দিন তাহাকে পাতের ভাত ফেলিয়া দিয়া উপবাসে দিন কাটাইতে হইত।

কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া শান্তি যখন আহারে বসিত, তখন দামিনী মাধ্যাহ্নিক নিদ্রা শেষ করিয়া, সংসারে কোথায় কি হইতেছে, তাহার তদন্তে প্রবৃত্ত হইত। কোন কোন দিন সে শান্তির প্রস্তুত অন্নরাশির দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটু অন্তরালে গিয়া আপন মনে বলিত, "মা গো, ভাতের কাঁড়ি দেখ, বেরালে ডিঙ্গুতে পার্‌বে না। এত খাওয়া কি ভাল? ও সব রাক্ষুসে খাওয়া। আর তা না হ'লেই বা এমন দশা হবে কেন?"

অন্তরালে বলিলেও কথাগুলা এমত নিম্ন স্বরে বলা হইত যে, শান্তির তাহা শুনিবার পক্ষে কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না। শুনিয়া শান্তির হাতের ভাত হাতেই থাকিত, চোখের জলে কোলের ভাত ভিজিয়া যাইত; মুখের অর্দ্ধচর্ব্বিত ভাতগুলা কিছুতেই গলার নীচে যাইতে চাহিত না,—রুদ্ধ বাষ্প তাহাদিগকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিত। শান্তি ভাতগুলি তুলিয়া লইয়া পুকুরের জলে ঢালিয়া দিয়া আসিত। ক্ষুধার তীব্রদাহ দুঃখের প্রচণ্ড বহ্নির সহিত মিশিয়া যখন তাহার বুক-টাকে ছাই করিয়া দিতে উদ্যত হইত, তখন সে শুধু আকুল-কণ্ঠে ডাকিত, "মা, মা, মা!"

দুঃখ, দৈন্য ও হতাশার তীব্র পীড়নে মৃত্যুটা যখন শান্তির নিকট নিতান্ত লোভনীয় হইয়া উঠিত, তখন সে সব কাজ ফেলিয়া রাণীর কাছে ছুটিয়া যাইত।

রৌদ্রদগ্ধের নিকট যেমন স্নিগ্ধ বটচ্ছায়া, তৃষ্ণার্ত্তের নিকট যেমন স্বচ্ছ সলিলবিন্দু, দরিদ্রের নিকট যেমন অমূল্য স্পর্শমণি, তেমনই শান্তির নিকট রাণী।

শান্তি যতক্ষণ রাণীর নিকট থাকিত, ততক্ষণ সে সকল যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইত, একটা গভীর সান্ত্বনার ছায়ায় তাহার নৈরাশ্যদগ্ধ প্রাণটা যেন জুড়াইয়া যাইত। কিন্তু সে অবসরই বা কতক্ষণ? যতক্ষণই হউক, সেইটুকু সময়ই শান্তির নিকট অমূল্য। এই সময়টুকু অপব্যবহারের জন্য তাহাকে দামিনীর নিকট তিরস্কৃত হইতে হইলেও সে তিরস্কার সে মাথা পাতিয়া লইত।

শান্তির কষ্ট দেখিয়া এক দিন রাণীর শ্বাশুড়ী রামসদয়কে বলিয়াছিলেন, "আহা, ঠাকুরপো, কচি মেয়েটা খেটে খেটে যে সারা হয়ে গেল।"

রামসদয় তদুত্তরে একটা সুদীর্ঘ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া বৃদ্ধাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, বিধবার পক্ষে শারীরিক পরিশ্রম অত্যাবশ্যক। এই পরিশ্রম দ্বারা তাহার মনের পবিত্রতা রক্ষা হয়। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে তাহার মনে নানা কুচিন্তার আবির্ভাব হইতে পারে।

এমন যুক্তির উত্তরে বৃদ্ধা আর কোন কথাই বলিতে পারেন নাই, কেবল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন মাত্র।

রামসদয়ের নিকট বৃদ্ধার এই সহানুভূতি প্রকাশের কথা শুনিয়া দামিনী সে দিন তাঁহার উদ্দেশে যে সকল কথা বলিয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে তাহা বৃদ্ধার কর্ণগোচর হয় নাই, নতুবা সেই দিনই উভয় পরিবারের মধ্যে মুখ-দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইত।

শান্তিও সে দিন বাদ যায় নাই। সে-ই যে পাড়ায় পাড়ায় বিমাতার এই সকল কুৎসা রটনা করিয়া বেড়ায়, ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া দামিনী সে দিন শান্তির উদ্দেশ্যেও এমন কতকগুলি চোখা চোখা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল, যাহার প্রত্যেকটি শান্তির বুকের হাড়গুলিকে পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিতেছিল। শান্তি কিন্তু তাহার একটিরও উত্তর দেয় নাই। সে শুধু পড়িয়া পড়িয়া তাহার স্বর্গগতা জননীকে স্মরণ করিতেছিল, আর ভাবিতেছিল, "আত্মহত্যা যদি পাপ হয়, তবে ভগবান্ কি বিধবাদের জন্য আর কোন উপায়ই করিয়া দেন নাই?"

ইহার উপর দামিনী যখন সন্তানের জননী হইল, তখন শান্তির নির্য্যাতন চরম সীমায় উঠিল। ক্রমে অসহ্য হইলে শান্তি ভাবিল, "দূর হউক, একবার শ্বশুরবাড়ীটা দেখিয়া আসি। সেখানে তো আমার খোরপোষেরও দাবী আছে।"

রাণী শুনিয়া বলিল, "আবার শ্বশুরবাড়ী কেন সই?"

শান্তি হাসিয়া উত্তর করিল, "সে জায়গা যমের বাড়ী চেয়ে ভাল কি মন্দ, একবার দেখে আসি।"

রাণী আর কোন বাধা দিল না। তখন শান্তি পিতার নিকট এই প্রস্তাব করিল। রামসদয় ভাবিয়া দেখিলেন, মন্দ যুক্তি নয়। দিনকতক সেখানে থাকিয়া যদি খোরাক-পোষাকের একটা বন্দোবস্ত করিয়া আসিতে পারে, তাহাতে আমার লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই।

রামসদয় রাজী হইলেন, দামিনী কিন্তু ইহাতে সম্মতি দিল না। সে স্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বলিল, "ও মা, তাও কি হয়! ধর্ত্তে গেলে ও আমারই মেয়ে। ওকে কোথায় পাঠাব? সেখানে ওর কে আছে? আমাদের এক মুঠা জুটে তো ওরও জুটবে।"

আসল কথা, শান্তি চলিয়া গেলে সংসারের কি হইবে, ইহাই তাহার ভাবনা।

কিন্তু শান্তির জেদের নিকট দামিনীর আপত্তি টিকিল না। রামসদয় এক দিন সকালে নিজে কন্যাকে লইয়া তাহার শ্বশুর-বাড়ীতে রাখিয়া আসিলেন। বনপুর হইতে শান্তির শ্বশুরবাড়ী বামুনহাটি দুই ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। রামসদয় কন্যাকে রাখিয়া বাড়ী ফিরিয়া স্নানাদি করিলেন। দামিনী তখন রান্না চাপাইয়া ধোঁয়ায় চোখমুখ লাল করিয়া আপনার অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিতেছিল, বড় ঘরের দাবায় পড়িয়া ছেলেটা চেঁচাইতেছিল। রামসদয় ঠাকুরঘর হইতে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপারটা কি?"

দামিনী রাগে চীৎকার করিয়া বলিল, "ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু। মেয়েকে আমি বড় অযত্নে রেখেছিলাম, তাই সোহাগ দেখিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি শ্বশুরবাড়ী রেখে এলে। এখন পিণ্ডী চটকায় কে?"

"সর, সর, নেহাত ছেলেমানুষ, আমি দেখছি" বলিয়া রামসদয় হাসিতে হাসিতে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শান্তির দেবর ষষ্ঠীচরণ ভ্রাতৃজায়ার সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াই ছিল, কিন্তু সহসা তাহার উপস্থিতিতে একটু চিন্তিত হইল। পত্নী মোক্ষদা ভাবিল, "এ আপদ আবার কোথা হ'তে এল?"

পাড়ার পাঁচজন মেয়ে শান্তিকে দেখিয়া বলিল, "আহা, ডাগরটি হয়েছে, তাই আপনার ঘর করতে এসেছে।" কেহ বা বলিল, "মেয়ে নয় তো, যেন

সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-ঠাকরুণ; যেমন রূপ, তেমন গড়ন। কিন্তু বরাত মন্দ!"

প্রতিবাসিনীদের এই সকল সমালোচনায় শান্তি লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল, আর মোক্ষদার সর্ব্বাঙ্গ রাগে জলিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু প্রতিবাদের কোন উপায় না থাকায় অগত্যা চুপ করিয়া গেল।

সহসা একটা অপরিচিত সংসারের মধ্যে আসিয়া শান্তির প্রথমটা যেন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। কিন্তু ক্রমেই সে সঙ্কোচ দূর হইল; তখন সে আপনারই সংসারের মত কাজকর্ম্ম করিয়া যাইতে লাগিল। মোক্ষদা যখন দেখিল, এ আপদ থাকিতেই আসিয়াছে, তখন সে গৃহস্থালীর ভারটা অল্পে অল্পে শান্তির ঘাড়েই ফেলিয়া দিয়া আপনার ছেলে-মেয়েদের সেবা-যত্নে মনোনিবেশ করিল। মোক্ষদা সম্পর্কে ছোট হইলেও বয়সে বড় বলিয়া শান্তি তাহাকে দিদি বলিয়া ডাকিত, মোক্ষদা তাহাকে বৌ বলিত।

জমিজাগয়া যাহা ছিল, তাহাতে একটি গৃহস্থের স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও পুরুষ-মানুষ হইয়া বসিয়া থাকা যায় না। এজন্য ষষ্ঠীচরণ পার্শ্ববর্ত্তী নন্দনপুর গ্রামের জমীদার রায়েদের কাছারীতে মুহুরিগিরী করিত। সকালে যাইয়া সন্ধ্যায় আসিত। মধ্যাহ্ন-ভোজনটা বাবুদের ঠাকুরবাড়ীতেই হইত। বেতন ছিল আট টাকা, কিন্তু মাসে পনর কুড়ি টাকা ঘরে আসিত।

ঘরে ছেলে-মেয়ে তিনটি, আর গৃহিণী। চাষের জন্য দুইটি বলদ এবং দুগ্ধের জন্য একটি গাভী ছিল। তাহাদের সেবার জন্য একটি চাকরও ছিল। এ সকল ছাড়া ষষ্ঠিচরণের আর একটিও প্রতিপাল্য ছিল। সে মোক্ষদার ভ্রাতা গোপীনাথ।

গোপীনাথ গ্রাম্য স্কুলে ফোর্থক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। তার পর মা-বাপ দু-ই মারা গেল। বিষয়-আশয় বা অন্য অভিভাবক কেহ ছিল না। অগত্যা সে ভগিনী-গৃহে আসিয়া আশ্রয় লইল, এবং তাসপাশা খেলিয়া, গান-বাজনা করিয়া, মাছ ধরিয়া, মধ্যে মধ্যে গাঁজায় দম দিয়া নিশ্চিন্তভাবে কাল কাটাইতে লাগিল। সংসারের কাজের মধ্যে ছিল, বাজার করা আর চাকরের অসুখ করিলে গরু-বাছুর দেখা। এগুলাকে গোপীনাথ কাজের মধ্যে গণ্য করিত না। মোক্ষদা ভাইকে মানুষ করিবার জন্য মাঝে মাঝে তিরস্কার করিত, উপদেশ দিত, কিন্তু গোপীনাথ দিদির কথায় বড় একটা কান দিত না। "খাও দাও মজা উড়াও" এই নীতিবাক্য তাহার মূলমন্ত্র ছিল।

শান্তি যে আশা করিয়া এখানে আসিয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইল না। বিমাতার বাক্যযন্ত্রণা হইতে মোক্ষদার বাক্যযন্ত্রণার জালা কিছু কম বলিয়া বোধ হইত না। বরং সময়ে সময়ে তাহা পূর্ব্বের মাত্রা ছাপাইয়া উঠিত। দেখিয়া শুনিয়া শান্তি ভাবিল, বিধবার কোথাও সুখ নাই, সুতরাং তাহাকে এ কষ্ট সহ্য করিতেই হইবে।

ষষ্ঠীচরণ ভ্রাতৃজায়ার উপর পত্নীর অত্যধিক রূঢ় ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে শান্ত হইবার জন্য উপদেশ দিত। কিন্তু তাহাতে মোক্ষদার উগ্রভাব না কমিয়া বরং বাড়িয়াই উঠিত। আসল কথা, বাড়ীতে এরূপ ষোড়শী সুন্দরী বিধবাকে রাখিয়া মোক্ষদা কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না। যদিও এ পর্য্যন্ত ষষ্ঠীচরণের চরিত্রের কেহ কোন দোষ দেখিতে পায় নাই, তথাপি মোক্ষদা পুরুষমানুষকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিত না। শান্তির অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য এবং যৌবনের মৃদুমন্দ হিল্লোল ষষ্ঠীচরণের হৃদয়ে না হউক, মোক্ষদার হৃদয়ে এমন একটা ঝড় তুলিয়া দিয়াছিল যে, মোক্ষদা ভাবিত, তাহার সর্ব্বনাশ নিকটবর্ত্তী। ইহার উপরে ষষ্ঠীচরণ যখন ভ্রাতৃবধূর উপর সদ্‌ব্যবহার করিতে উপদেশ দিত, তখন মোক্ষদার সন্দেহের ছায়াটা যেন আরও বেশী হইয়া আসিত; তাহার ক্রোধাগ্নিটা আরও বেশী জলিয়া উঠিত। সে অগ্নির উত্তাপ ষষ্ঠীচরণকে ততটা স্পর্শ করিতে না পারিলেও নিরীহ শান্তিকে দগ্ধ করিয়া ফেলিত।

ষষ্টিচরণ যে কেবল দয়ার বশবর্ত্তী হইয়াই শান্তির উপর সদাচরণ করিতে বলিত, তাহা নহে। সে অনেক ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল, হাজার হউক, দাদার স্ত্রী, কুলের বৌ, তাহাকে ফেলা যায় না; ফেলিলে লোকে কি বলিবে? বিশেষতঃ উইলে তাহার ভরণপোষণের ব্যবস্থা আছে। এখন সে যদি সেই দাবী করিয়া বসে, দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় ব্যাপারটা যদি আদালত পর্য্যন্ত যায়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া তাহাকে মাসে মাসে নগদ টাকা গণিয়া দিতে হইবে। এমত অবস্থায় একটু সদ্‌ব্যবহার করিলে যদি সব গোল মিটিয়া যায়, তাহাতে ক্ষতি কি? সে তো শুধু বসিয়া বসিয়া খাইতেছে না?

মোক্ষদা কিন্তু এত কথা বুঝিত না। সে আপনার মনের আগুন লইয়া আপনি জলিয়া মরিত, আর শান্তিকেও জালাইত। নিরীহপ্রকৃতি ষষ্ঠীচরণ যখন দেখিল, উপদেশে কোন ফল নাই, বরং বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়, তখন সে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া হাল

ছাড়িয়া দিল। ঘরাঘরি বিবাদ করিয়া একটা গোল-যোগ বাধাইতে তাহার প্রবৃত্তি বা সাহস হইল না। সুতরাং মোক্ষদার কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার আর কেহ রহিল না। তবে গোপীনাথ যে শান্তির পক্ষ হইয়া সময়ে সময়ে দুই এক কথা বলিত, মোক্ষদা তাহা কানেই তুলিত না। গুপে আবার একটা মানুষ, তার আবার কথা।

শান্তিকে দেখিয়া অবধি গোপীনাথের মনের ভিতর কেমন একটা গোলমাল হইয়া গিয়াছিল। সে গুপ্ত কটাক্ষে অনেক বার অনেক গৃহস্থকন্যার মুখ দেখিয়াছে, কিন্তু এমন মুখ তাহার চোখে একটাও পড়ে নাই। সে অনেক রমণীর দীপ্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াছে, কিন্তু এমন শান্ত স্থির মধুর সৌন্দর্য্য কখনও দেখে নাই। সে বর্ষার কুলপ্লাবিনী তরঙ্গিণীর তীব্র তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখিয়াছে, কিন্তু শরতে তাহার শান্তোজ্জ্বল অনাবিল মূর্ত্তি এই প্রথম দেখিল। নিবিড়নীলজলদান্তর্ব্বর্ত্তী সৌদামিনীর রুদ্রোজ্জ্বল ছটায় তাহার চক্ষু ঝলসিত হইয়াছে, কিন্তু দূর চক্রবালপ্রান্তে শ্বেতাম্বুদের অন্তরালে ক্ষীণ বিদ্যুতের এই মৃদু হাস্য দেখিয়া সে নূতন তৃপ্তি অনুভব করিল। সে মুগ্ধদৃষ্টিতে শান্তির মনোমোহন সৌন্দর্য্য দেখিত, কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের সম্মুখে তাহার বাসনাকলুষ হৃদয় আপনা হইতে সঙ্কুচিত হইয়া যাইত; সে শান্তির মুখখানি দেখিবার জন্য হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিত, কিন্তু শান্তি মুখ তুলিলেই তাহার দৃষ্টি সভয়ে নত হইয়া পড়িত। অনাথা বিধবার দুঃখম্লান মুখখানির ভিতর সে যেন জগতের সমষ্টীভূত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইত। তাহার মনে হইত, "হায়! এমন সুন্দর মুখখানি হইতে দুঃখের কালিমাটুকু কি মুছিয়া দেওয়া যায় না? এই অনাথা বিধবাকে কি সুখী করা যায় না?" অপরকে সুখী করিবার ইচ্ছা গোপীনাথের এই প্রথম। জানি না, কোথা হইতে এই ভাবটা তাহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল।

শান্তিকে দেখিলেই গোপীনাথের বুকটা বেদনায় ভরিয়া উঠিত। যখন দিদির অন্যায় তিরস্কারে ব্যথিতা হইয়া, মুখখানি ম্লান করিয়া শান্তি এক পাশে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহার চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া মাটীতে পড়িত তখন গোপীনাথের ইচ্ছা হইত, সে কাছে গিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলে, "কেঁদো না শান্তি।" কিন্তু লজ্জায় সে তাহা পারিয়া উঠিত না, শুধু দিদির উপর একটা নিষ্ফল আক্রোশ মনের ভিতর চাপিয়া চুপ করিয়া থাকিত। নিতান্ত অসহ্য হইলে কখন কখন দিদিকে দুই কথা শুনাইয়া দিত; কিন্তু দিদির তীব্র কণ্ঠকে তীব্রতর হইতে দেখিয়া ভয়ে ভয়ে পলাইয়া যাইত। মোক্ষদা ভাবিত, "সর্ব্বনাশ, ছোঁড়া এবার গেল দেখ্‌ছি।"

শান্তি কিন্তু গোপীনাথের এই সহানুভূতিটুকু প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিত না। নির্ম্মম সংসারে অন্ততঃ একটি হৃদয়কেও তাহার জন্য ব্যথিত হইতে দেখিয়া যদিও মনে একটু প্রফুল্লতা আসিত, তথাপি সে তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিত না, বরং এই জন্যই গোপীনাথের উপর সে ভয়ানক রাগিয়া উঠিত। সে বিধবা সংসারের সকল দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিবার জন্যই তাহার সৃষ্টি; তবে মাঝে হইতে এক জন আসিয়া তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে কেন? গোপীনাথ তাহার কে? সে তো তাহার সহানুভূতি চায় না।

শান্তি জানিত না, সহানুভূতি জিনিসটা চাহিলেই পাওয়া যায় না; উহা অপ্রার্থিত রূপেই আসিয়া থাকে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গৃহস্থালীর অন্যান্য কার্য্যের সহিত রন্ধনশালার ভারটাও শান্তির স্কন্ধেই পড়িয়াছিল। দুই বেলা তাহাকে রাঁধিতে হইত। মোক্ষদা তাহা বণ্টন করিয়া দিয়া তাহাকে একটু সাহায্য করিত। ষষ্ঠীচরণ সন্ধ্যার পর কাছারী হইতে ফিরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িত; তাড়াতাড়ি আহ্নিক সারিয়া আহার করিয়া শুইতে যাইত। মোক্ষদার আহার-কার্য্যটাও সেই সঙ্গে শেষ হইয়া যাইত। ছেলেরা সন্ধ্যার আগেই খাইয়া শুইয়া পড়িত। বাকী থাকিত কেবল গোপীনাথ। পাড়া বেড়াইয়া গল্প করিয়া ফিরিতে তাহার রাত্রি হইত। এজন্য তাহার বাড়া ভাত চাপা থাকিত। কিন্তু শান্তির আসা অবধি সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। গোপীনাথের অপেক্ষায় শান্তিকে বসিয়া থাকিতে হইত। সে আসিলে তাহাকে খাওয়াইয়া, নিজে একটু জল খাইয়া শুইতে যাইত। তখন চৌকীদার পাড়ায় হাঁক দিয়া ফিরিয়া যাইত।

অন্য দিন ইহাতে কষ্ট না হইলেও একাদশীর দিন কিন্তু বড়ই কষ্ট হইত; সমস্ত দিনের উপবাস ও কঠোর পরিশ্রমের পর রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে তাহার ক্লেশের সীমা থাকিত না। শান্তি একা রান্না-ঘরের দাবায় আঁচল পাতিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িত। গোপীনাথ আসিয়া ডাকিলে উঠিয়া ভাত দিতে যাইত। কিন্তু পা আর উঠিতে চাহিত না, শরীর যেন ভাঙ্গিয়া

পড়িত, মাথা ঘুরিতে থাকিত। গোপীনাথ ক্রমে তাহা বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া এক দিন সে বলিল, "আমার জন্যে ব'সে থাক কেন শান্তি, আমার ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে তুমি শুতে যেও।"

শান্তি বলিল, "তাও কি হয় ?"

শান্তি ইদানীং গোপীনাথের সহিত কথা কহিত, এবং তাহাকে গুপীদা বলিয়া ডাকিত।

শান্তির কথা শুনিয়া গোপীনাথ বলিল, "কেন হবে না ? আমার জন্য দিদি বরাবরই ভাত ঢাকা দিয়ে রাখতো।"

শান্তি বলিল, " আমি তা পারব না।"

সেই দিন গোপীনাথ স্থির করিল, একাদশীর দিন আর সে বেশী রাত্রি বাহিরে থাকিবে না। কিন্তু সঙ্কল্পমত কার্য্য হইল না। পাঁচজনের সঙ্গে গল্প করিতে, তামাক খাইতে কখন যে রাত্রি হইয়া যায়, তাহা সে জানিতে পারিত না। সুতরাং পরবর্ত্তী একাদশীতেও রাত্রি হইল।

ইহার পরের একাদশীতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাহির হইবার সময় গোপীনাথ বলিয়া গেল, সে আজ রাত্রিতে কিছু খাইবে না, তাহার শরীর অসুস্থ।

দ্বিতীয় একাদশীতেও যখন গোপীনাথ অসুস্থতার ভাণ করিয়া খাইবে না বলিয়া গেল, তখন শান্তি তাহার না খাইবার কারণটা বুঝিতে পারিল। তাহার বড় লজ্জা হইল, গোপীনাথের উপর রাগও হইল; আহারের সময় মোক্ষদা ভাত বাড়িতে গিয়া বলিল, "হাঁড়িতে এখনও এত ভাত যে ?"

শান্তি বলিল, "এখনও গুপীদা আছে।"

মোক্ষদা। সে তো খাবে না ব'লে গেল ?

শান্তি। না, খাবে।

"হুঁ" বলিয়া মোক্ষদা আপনার আহার শেষ করিয়া শুইতে গেল।

অনেক সময় একটি সামান্য কথার ভিতর অনেক অর্থ লুকান থাকে। মোক্ষদারও এই একটি 'হুঁ' কথার ভিতরেও যে অনেক অর্থ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছিল, শান্তি তাহা কতকটা বুঝিতে পারিল। একবার ভাবিল, "চুলোয় যাক্ তার খাওয়া, আমি গিয়ে শুয়ে পড়ি।" আবার ভাবিল, "আমার জন্য বামুনের ছেলে উপোস থাকবে ?" শান্তি স্থির করিল, আজ সে গোপীনাথকে এমন কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিবে যে, সে আর যেন এ রকম কাজ না করে, আর যেন তাহাকে দয়া দেখাইতে না যায়।

সে দিন গোপীনাথ যথাসময়ে বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, শান্তি পূর্ব্ববৎ রান্নাঘরের দাবায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে, অদূরে একটা কেরোসীনের ডিবা মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। গোপীনাথ ডাকিল, "শান্তি!"

শান্তি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। গোপীনাথ বলিল, "এখনও এখানে প'ড়ে যে!"

শান্তি দুই হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "তোমাকে খেতে দিতে হবে না ?"

গোপী। আমি তো খাব না ব'লে গেছি।

শান্তি। কেন বলেছ, তা আমি বুঝেছি।

সহসা গোপীনাথের মুখখানা একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; ঈষৎ প্রফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বুঝেছ ?"

শান্তি বলিল, "আমি যাই বুঝি। আমার জন্য কাউকে উপোস করতে হবে না!"

শান্তি কথাটা একটু রাগিয়াই বলিয়াছিল। গোপীনাথও অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমিও বলছি, আমার জন্য কাউকে কষ্ট ক'রে ব'সে থাকতে হবে না।"

শান্তি বাঁ হাতে কেরোসীনের ডিবাটা উঠাইয়া লইয়া উপবাসখিন্ন মুখখানা তুলিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "তোমরা সবাই মিলে কি আমায় টিকতে দেবে না ? আমাকে কি শেষে গলায় দড়ী দিতে হবে ?"

ভীতিপূর্ণ স্বরে গোপীনাথ বলিল, "কেন শান্তি, হয়েছে কি ?"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে শান্তি বলিল, "কেন তুমি আমার জন্য এতটা কর ? আমি তোমার কি করেছি ?"

শান্তির চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। গোপীনাথ অপরাধীর ন্যায় কাতর স্বরে বলিল, "আমাকে মাপ কর শান্তি, আমি বুঝতে পারি নাই, ভাত দেবে চল।"

শান্তি তখনও চোখের জল সামলাইতে পারে নাই। সে বাম হাতে আলোটা ধরিয়া ডানা হাতের উল্টা পিঠ দিয়া চোখ রগড়াইতে লাগিল। গোপীনাথ বলিল, "চুপ কর শান্তি, আর কখন আমি এমন কাজ করব না।"

"পায়ে ধর্ রে হতভাগা, পায়ে ধর্।"

চমকিত হইয়া গোপীনাথ ফিরিয়া চাহিল; দেখিল, পশ্চাতে দিদি। মোক্ষদা গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ওরে হতভাগা, তাই তোর অসুখ ? তাই ভাত খাবি না ? তাই রাত-দিন শান্তি, শান্তি, শান্তি।"

গোপীনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইল; ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তুমি কি বলছ দিদি ?"

মোক্ষদা চীৎকার করিয়া বলিল, "বলছি আমার মাথা আর মুণ্ড; বলছি, ঐ অভাগীর গলায় দড়ী যোটে

না ? হাঁ রে পোড়াকপালী, একটু সম্পর্কও বাছলি না ; আমার ভাই আর তোর ভাই কি আলাদা ?"

শান্তির হাত হইতে কেরোসীনের ডিবাটা পড়িয়া গেল, সে দুই হাতে খুঁটি ধরিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মোক্ষদা সমান গর্জ্জনে বাড়ী কাঁপাইয়া বলিতে লাগিল, "দাঁড়ালি কেন? ভাত দে না। যা রে অভাগা, আদরিণীর আদরের ভাত খেয়ে আয়।"

গোপীনাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আর নয় দিদি, তোমার অন্ন, পাপ অন্ন ; এ অন্ন আর মুখে তুল্‌ব না।"

মোক্ষদা তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "তা বল্‌বি বৈ-কি রে গুপে, এখন বাড়ীতে সাক্ষাৎ পুণ্যবতী এসেছেন কি না, তাই আমার অন্ন পাপ অন্ন হয়েছে। গলায় দড়ী তোদের। কিন্তু কালই যদি এই পুণ্যবতীকে বাড়ী হ'তে বিদেয় না করি, তবে আমার নাম মোখি বাম্‌নী-ই নয়।"

গোপীনাথ ভগিনীর দিকে একটা জলন্ত দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া নীরবে আপনার ঘরে চলিয়া গেল।

মোক্ষদার চীৎকারে ষষ্ঠীচরণের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে জানালা দিয়া ডাকিয়া বলিল, "কি হয়েছে গো, বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে না কি ?"

মোক্ষদা সে দিকে চাহিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "যে গুণের বৌ-ঠাকুরুণ ঘরে পুষেছ, তাতে ডাকাত পড়্‌বার আর দেরী নাই।

"আঃ" বলিয়া ষষ্ঠীচরণ জানালা বন্ধ করিয়া দিল। শান্তি থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

পরদিন মোক্ষদা এক জন মেয়েমানুষ সঙ্গে দিয়া শান্তিকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল, শান্তির যাইবার কিছুক্ষণ পরে গোপীনাথও আপনার ছাতা কাপড় লইয়া বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় দিদিকে একটা প্রণাম করিল, কিন্তু দিদি ফিরিয়া চাহিল না।

ষষ্ঠীচরণ কাছারী হইতে ফিরিয়া মোক্ষদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গুপে গেল যে ?"

মোক্ষদা বলিল, "দেবী গেলেন, আর দেবা থাক্‌বেন ?"

ষষ্ঠীচরণ তিরস্কারের স্বরে বলিল, "গুপে না তোমার ভাই ?"

মো। অমন ভায়ের কপালে ঝাঁটা।

ষ। ছিঃ! তোমার মনটা বড় অশুদ্ধ।

মোক্ষদা মুখ ঘুরাইয়া শ্লেষপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "তা তো হবেই, আমি তো আর ষোল-বছুরী ক'ড়ে রাঁড়ী নই ?"

ঈষৎ হাসিয়া ষষ্ঠীচরণ বলিল, "হ'তে সাধ যায় না কি ?"

মো। দায় পড়েছে আমার, যাদের বাতাস, তাদের জন্ম জন্ম থাক।

মোক্ষদা রাগে গর্‌-গর্‌ করিতে করিতে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

"সই, সই, কৈ লো সই ?"

"আয় সই, আমি তোরেই ভেবে সারা হই, বলি, আমার প্রাণের সই, এখনো এলো না কই।"

"ভয় কি সই, আমি তোমা ছাড়া আর কারো নই।"

"তবু মন মানে কই ?"

"পোড়া মনের দোষই অই। ভাবে, সে কর্‌লে বুঝি জল-সই।"

শান্তি গিয়া রাণীর গলা জড়াইয়া ধরিল। তখন দুই সখীর মধ্যে খুব একটা হাসির ধূম পড়িল। হাসিতে হাসিতে রাণী সহসা শান্তির মুখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল ; একটু বিস্ময়ের সহিত বলিল, "এ কি, তোর মুখ এত শুক্‌নো কেন সই ?"

শান্তি পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আজ আর অদৃষ্টে জুটলো না খই।"

রাণী তাহার গাল টিপিয়া ধরিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "থাম পোড়ারমুখ, ও শুক্‌নো ঠোঁটের কাঠ হাসি আর ভাল লাগে না।"

শান্তি সহাস্যে বলি, "এর মধ্যেই অরুচি! তবে আমি কোথায় দাঁড়াব সই ?"

"চুলোয়" বলিয়া রাণী বাহির হইয়া গেল।

রান্নাঘরে উনানের উপর কড়ায় দুধ ফুটিতেছিল। রাণীর এখনও গাভীটি আছে। দুধের খাতিরে রাখে নাই, স্নেহের খাতিরেই রাখিয়াছে। গাভীটিও অকৃতজ্ঞ নয়, রাণীর স্নেহের প্রতিদানে সে খানিকটা করিয়া দুধ দিয়া আপনার ভালবাসা জানাইত।

রাণী একটা বাটি আনিয়া কড়া হইতে প্রায় সব দুধটাই ঢালিয়া লইল। তার পর ঘরে গিয়া দুধের বাটি শান্তির মুখের কাছে ধরিয়া বলিল, "খেয়ে ফেল্‌, আমার মাথা খাস্‌।"

শান্তি বলিল, "দু'টা জিনিস তো খেতে পার্‌ব না ভাই, বিশেষ আমি বিধবা, হবিষ্যি করি। কাজেই মাথাটা থাক, শুধু দুধটুকু খাই।"

শান্তি দুধটা খাইয়া তৃপ্তির একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আঃ, বাঁচ্‌লাম। সত্যি ভাই, ক্ষিদেয় বুকটা যেন জ্বলে জ্বলে উঠ্‌ছিল। আচ্ছা সই, বিধবার সব যায়, ক্ষিদে-তেষ্টা যায় না কেন?"

ঈষৎ হাসিয়া রাণী বলিল, "ওটা বিধাতার ভুল বল্‌তে হবে। আজ আবার কি হয়েছে?"

শান্তি। যা নিত্যি হয়, তাই, তবে আজ একটু বাড়াবাড়ি।

রাণী। এ বাড়াবাড়ির কারণ?

শান্তি। কারণটা যে নেহাৎ ছোটখাট, তা নয়। বৌমা খেয়ে দেয়ে খোকাকে নিয়ে শুয়েছিলেন। আমি আহ্নিক সেরে মাত্র হবিষ্যি চড়িয়েছি। এমন সময় খোকা খেলা কর্‌তে কর্‌তে তক্তপোষ হ'তে নীচে প'ড়ে যায়। তার চীৎকারে গিন্নীর ঘুম ভেঙ্গে গেল, বাবা ও ঘর হ'তে ছুটে এলেন। এই আর কি, গিন্নী পড়্‌লো আমার উপর। 'আমি খোকাকে দুটি চোখে দেখ্‌তে পারি না, দিন-রাত তার মরণ কামনা কচ্চি, কেউ ম'লেও আমি ফিরে চাই না,' এই রকম কত কথা। আমি যেমন রোজ চুপ ক'রে শুনি, তেমনই শুন্‌ছি, আর মনে মনে বল্‌ছি, "হে ভগবান্‌, আমাকে কালা ক'রে দাও।" এমন সময় বাবা চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন, ও নিজের পিণ্ডীর জন্যই ব্যস্ত, এ সব দেখ্‌বে কখন্‌? থাম, এবার আমি ওর পিণ্ডী চট্‌কাচ্ছি। আমার ভাই আর সহ্য হ'লো না, উনানে জল ঢেলে দিয়ে তোর কাছে পালিয়ে এলাম।

রাণী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "উঃ, ধন্য মায়ের প্রাণ!"

ম্লান হাসি হাসিয়া শান্তি বলিল, "মা কোথায় তাই? মা থাকলে কি আজ—"

শান্তির চোখ দু'টা জলে ভরিয়া উঠিল, গলা দিয়া কথা বাহির হইল না। রাণী বলিল, "সত্যি, এ যে সৎ-মা। কিন্তু বাপের প্রাণও কি কঠিন!"

শান্তি চোখ মুছিয়া বলিল, "তার চেয়ে কি কঠিন বিধবার প্রাণ!"

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসে শান্তির বুকটা কাঁপিয়া

রাণী বলিল, "তার আর কি কর্‌বি ভাই, এ তো টেনে বের কর্‌বার নয়?"

শান্তি। আমার কিন্তু সময়ে সময়ে তাই ইচ্ছা হয়।

রাণী। দূর পোড়ারমুখী, আর জন্মে কত পাপের ফলে এ জন্মে এই কষ্ট, তার উপর আত্মঘাতী হ'য়ে মরেও যন্ত্রণা ভোগ!

শান্তি। আমার মনে হয়, এর চেয়ে আর বেশী কষ্ট নাই।

রাণী রাগিয়া বলিল, "মরণ আর কি, ও কথা মনে করাও মহাপাপ। শুনেছি, যারা আত্মহত্যা করে, তাদের আর জন্ম হয় না, যুগ-যুগান্তর ধ'রে কেবল হা হা ক'রে ঘুরে বেড়াতে হয়।"

শান্তি বলিল, "ঐ একটা মহাপাপ। চুলোয় যাক ও সব কথা। এখন তুই একটু রামায়ণ পড়, শুনি!"

রাণী তখন তাকের উপর হইতে রামায়ণখানি লইয়া পড়িতে বসিল। শান্তি বলিল, "সেই অশোক-বনের কথাটা পড়। ঐখানটা আমার বড় ভাল লাগে।"

রাণী পাতা উল্‌টাইয়া লঙ্কাকাণ্ড বাহির করিয়া সুরের সহিত পড়িতে লাগিল,—

"ঘরে গেলা দশানন তিরস্কারি চেড়ী।
সীতারে মারিতে সবে করে হুড়াহুড়ি॥
চেড়ী সব বলে, সীতা শুন হিতবাণী।
রাবণের মত স্বামী না পাইবে তুমি॥
অল্প ধনে ধনী রাম অল্পই জীবন।
চোদ্দযুগ রাজ্যরক্ষা করিবে রাবণ॥
সীতা বলে, অল্পধন অত্যল্প জীবন।
সেই সে আমার স্বামী কমললোচন॥
শুনিয়া সীতার কথা ক্রোধে সব চেড়ী।
কার হাতে খাণ্ডা আর কার হাতে বাড়ী॥
সকলে ধাইরা যায় সীতারে মারিতে।
শ্রীরামে স্মরণ সীতা করয়ে মনেতে॥"

অশ্রু গদগদ-কণ্ঠে শান্তি বলিল, "আহা!"

রাণী বলিল, "তোর কষ্ট কি এর চেয়েও বেশী?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শান্তি বলিল, "না; তুই পড়।"

রাণী পড়িতে লাগিল,—

"নিদয় বচন বলে সীতারে রাক্ষসী।
কেটে ফেল, সীতারে কিসের তরে তুষি।
সূর্পনখা রাঁড়ী তবে হানে বাক্যবাণ।
গলে নখ দিয়া এর বধহ পরাণ॥
বজ্রধারী নামে আর চেড়ী সে আসিল।
চুলে ধরি সীতারে সে ঘুরাইয়া দিল॥
মারিতে কাটিতে যায় কারো নাহি ব্যথা।
প্রাণে আর কত সহে কাঁদিছেন মাতা॥
বস্ত্র না সংবরে সীতা কেশ নাহি বাঁধে।
শোকেতে ব্যাকুল হয়ে লুটাইয়া কাঁদে॥"

তখন শ্রোত্রীর অশ্রুধারায় বুক ভাসিয়া যাইতেছে;

পাঠিকাও চোখের জলে পুঁথির লেখা কিছু দেখিতে পাইতেছে না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

এক প্রকার কষ্টে-সৃষ্টে রাণীর দিন চলিত। প্রজাদের নিকট যে সকল জমী ভাগে বিলি ছিল, তাহার পুরা ফসল পাওয়া গেলে একটা পেট অনায়াসে চলিয়া যাইত। কিন্তু স্ত্রীলোক দেখিয়া প্রজারা পাইয়া বসিল। অর্দ্ধেক ফসল দিবার কথা, কিন্তু অনেকেই অর্দ্ধেকেরও অর্দ্ধেক দিত কি না সন্দেহ। রাণী ইহা বুঝিত, বুঝিয়াও তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইত। একবার এক জন প্রজা অতিরিক্ত কম ধান দিয়াছে দেখিয়া রাণী তাহার নিকট হইতে জমী ছাড়াইয়া লইবার ভয় দেখাইয়াছিল। তাহাতে প্রজা উত্তর করিয়াছিল, "জমী বেহারী বাবুর নিকট কবুলতি করিয়া লইয়াছি, তিনিই মালিক। আপনি যদি বেশী গোলযোগ করেন, আপনাকে ধান না দিয়া বেহারী বাবুকে খাজনা দিয়া আসিব।"

অগত্যা রাণীকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

একা হইলেও রাণীকে দুইটা পেটের খোরাক জোগাইতে হইত। দিনমানটা এক রকমে কাটিয়া গেলেও রাত্রিকালে সে একটা অসহায় অবস্থায় থাকিতে সাহস করিত না তাহারই প্রজা দীনু কৈবর্ত্তের মা আসিয়া কাছে শুইত। কিন্তু দীনুর মা সহজে তাহার ভাঙ্গা ঘরের ছেঁড়া চাটায়ের মায়া ত্যাগ করিয়া, রাণীর ঘরে পরিষ্কার মেঝেয় বিছানা পাতিয়া শুইতে সম্মত হয় নাই, রাণীকে তাহার দুই বেলার খোরাক যোগাইতে হইত। সুতরাং দুইটা পেট চালাইতে রাণীকে একটু কষ্ট পাইতে হইত। কিন্তু এ কষ্টে রাণী অভ্যস্ত। আর হাজার কষ্ট হইলেও সে কাহারও নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইতে চায় না, বেহারীর নিকটেও নয়। সে ভাবিত, "পোড়া পেটের জন্য মাথা হেঁট করিব? এই যে শাস্তির না-খেয়েও দিন কাটে।"

কলিকাতায় গিয়া এই সাত আট মাসের মধ্যে হাসি রাণীকে অনেকগুলি পত্র দিয়াছিল। আগে তাহার প্রতি পত্রেই থাকিত, "দিদি, তুমি এস, তোমার জন্য বড় মন কেমন করে, কিছুই ভাল লাগে না," ইত্যাদি। রাণী উত্তরে তাহাকে সান্ত্বনা দিত। ইদানীং আর হাসি এ সব কথা লিখিত না, বোধ হয়, তাহার অনুরোধটা সম্পূর্ণ নিষ্ফল বোধেই সে উহা ত্যাগ করিয়াছিল।

হাসি এতগুলা চিঠি লিখিল, কিন্তু স্বামী তো একখানাও পত্র দিলেন না! তিনি বোধ হয় রাগ করিয়াছেন। কিন্তু রাগ করিয়া কি মানুষ এত দিন থাকিতে পারে? এই তো সে দিন রাণীর সম্মুখে তিনি যে ভাব দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হইয়াছিল, রাণীকে ছাড়িয়া তিনি এক দিনও থাকিতে পারিবেন না, রাণী তাঁহার অন্তরের সঙ্গে যেন গাঁথা হইয়া আছে! কিন্তু এখন সে ভাব কোথায়? তেমন অনুরাগের সম্মুখে রাগ কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারে? তবে কি সে সকলই ভাণ মাত্র? রাণী ভাবিল, পুরুষের হৃদয়ে অনুরাগ যতটুকু, তাহার অপেক্ষা ছলনার ভাগ অধিক! ধিক্ পুরুষের ভালবাসায়!

কিন্তু তিনি না দিলেও রাণীও তো তাঁহাকে দুই একখানা পত্র দিতে পারিত? এ ক্ষেত্রে পত্রই যদি ভালবাসার প্রমাণ হয়, তবে রাণীও কি তাহাকে ভালবাসে না? রাণী ভালবাসে, কিন্তু সাধিয়া পত্র দিয়া তাঁহার অবজ্ঞার পাত্রী হইতে চায় না। ধনী সুহৃদকে সাধিয়া বন্ধুত্ব স্মরণ করাইয়া দিয়া দরিদ্র বন্ধু যেমন চাটুকারিতার অপবাদ স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না, রাণীও ঠিক সেই কারণে স্বামীকে পত্র লিখিতে পারে না। ইহাই নারীহৃদয়ের অভিমান।

কিন্তু এক দিন রাণীকে এই অভিমান বিসর্জ্জন দিতে হইল। স্বামীর জন্য তাহাকে সব ফেলিয়া কলিকাতায় ছুটিতে হইল।

এক দিন হাসির একখানা পত্র আসিল। পত্রখানা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অতি ভীষণ। হাসি লিখিয়াছে, "দিদি, বুঝি সর্ব্বনাশ হয়, সব যাইতে বসিয়াছে। উনি এখন আর এক মানুষ, সাতদিন অন্তরও একবার দেখা পাই না। কোথায় থাকেন, জানি না। তুমি শীঘ্র এস; আমার মাথা খাও, দেরী করিও না।"

পত্র পড়িয়া রাণী স্তম্ভিত হইল। ভাবিল, "এ আবার কি? তবে কি তাঁর অধঃপতন হয়েছে? বিশ্বাস হয় না। কিন্তু হাসি তো তাই লিখেছে। আমাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য ইহা তো হাসির একটা কৌশল নয়? না না, হাসি কখনও এত বড় একটা ঘৃণিত কৌশল অবলম্বন করিতে পারে না। তবে সত্যই তাই?"

রাণী আর থাকিতে পারিল না; হৃদয়ে উদ্দীপ্ত অভিমান আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। সে ঘরের জিনিসপত্র গুছাইল, গাইটিকে দীনুর কাছে রাখিল, তাহার খোরাকের জন্য তিনটি টাকা

দিয়া গেল। তার পর কাঁদিতে কাঁদিতে শান্তির নিকট বিদায় লইয়া দীনুর মা'র সঙ্গে গাড়ীতে উঠিল।

সহসা রাণীর কলিকাতা-যাত্রার উদ্দেশ্যটা জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সে কৌতূহল নিবৃত্ত হইল না। শান্তি ছাড়া রাণী কাহাকেও চিঠির কথা জানাইল না। ছি ছি! স্বামীর এই অধঃপতনের কথা কি প্রকাশ করা যায়। হাসিকে দেখিতে যাইতেছে, ইহাই সকলের কাছে বলিল। লোকে কিন্তু তাহাতে বিশ্বাস করিল না। সতীনকে আবার কে সাধ করিয়া দেখিতে যায়? তবে সতীনের মাথা খাইবার উদ্দেশ্যে যাইতেও পারে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বাস্তবিকই বেহারীর অধঃপতন হইয়াছিল। এবার কলিকাতায় গিয়া অবধি তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল। তাহার কিছুই যেন ভাল লাগিত না, সকলই কেমন ছাড়া ছাড়া বোধ হইত। মাঝে মাঝে একা চুপ করিয়া ভাবিত, হাসি কাছে গেলে বিরক্ত হইত; আবার এক এক সময় হাসিকে কাছে ডাকিয়া এত অধিক আদর করিত যে, তাহাতে হাসি আনন্দ না পাইয়া বরং ভীত হইয়া পড়িত। স্বামীর এই ভাবান্তর দেখিয়া হাসি কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিত না। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর পাইত না, উত্তরের পরিবর্ত্তে তাহার দৃষ্টিতে এমন একটা তীব্রতা দেখিতে পাইত যে, সে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িত।

রাগের মাথায়, জেদের বশে পুনরায় বিবাহ করিলেও বেহারী রাণীকে ভুলে নাই, ভুলিতে পারে নাই। সেই প্রথম যৌবনের সঙ্গিনী, সেই তাহার অগাধ অপরিমেয় ভালবাসা, এ সকল কি সহজে ভুলা যায়? তথাপি বেহারী ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। হাসির ক্ষুদ্র সরল হৃদয়ের ভালবাসার নির্ম্মল স্রোতে রাণীর ভালবাসার দাগটা একটু একটু করিয়া মুছিয়া আসিতেছিল। তাহার স্মৃতি হৃদয় হইতে একটু একটু দূরে সরিয়া যাইতেছিল। যদি আরও কিছুদিন এই ভাবে কাটিত, তাহা হইলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু তিন বৎসর পরে আবার রাণী সম্মুখে আসিল, সাক্ষাতে পূর্ব্বস্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার নারীহৃদয়ের সেই স্বাভাবিক দর্প, সেই সুগভীর আত্মাভিমান বেহারীর হৃদয়ে একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগাইয়া দিল। বেহারী তখন প্রবল আগ্রহে আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়া রাণীকে জড়াইয়া ধরিতে গেল, কিন্তু পারিল না। সে যেন তখন সুলভ হইয়াও অপ্রাপ্য, আপন হইয়াও পর। বেহারীর কামনা-ভরা উন্মাদ হৃদয় প্রত্যাখ্যাত হইয়া ক্রোধে ক্ষোভে অধীর হইয়া পড়িল। তাহার সমাজের উপর রাগ হইল, রাণীর উপর রাগ হইল, শেষে সব রাগটা তাহার নিজের উপর আসিয়া পড়িল। হায়! সে যে স্বেচ্ছায় স্বীয় সুখের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়াছে। বেহারীর হৃদয়ে অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

অনুতাপের ফল দুই প্রকার দেখা যায়। কেহ বা অনুতাপের আগুনে পুড়িয়া বহ্নি-পরীক্ষিত বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় বাহির হয়, কেহ বা সে আগুনে আপনার জ্ঞান, বুদ্ধি, মনুষ্যত্ব, সব ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। বেহারী শেষের পথের পথিক হইল।

হৃদয়ের সহিত যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া বেহারী শান্তি-স্থাপনের জন্য সুরাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রথম প্রথম ঘরে বসিয়া একটু একটু খাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ক্রমে একা আর ভাল লাগিল না, দুই এক জন বন্ধু জুটিল। তখন বৈঠকখানায় আড্ডা জমিল, বোতলের পর বোতল উজাড় হইতে লাগিল। কিন্তু কেবল মদের বোতলে আর আড্ডা ভাল জমে না, তাহার অনুপানের আবশ্যক হইল এবং সনাতন কাল হইতে যে স্থানে এরূপ আড্ডা জমিয়া আসিতেছে, বন্ধুবর্গসহ বেহারী সেই স্থানে গিয়া আশ্রয় লইল।

হাসি যদি অন্যান্য চতুরা রমণীর ন্যায় আপনার গণ্ডা বুঝিয়া লইতে জানিত, তাহা হইলে বোধ হয় বেহারী এত শীঘ্র অধঃপতনের নিম্নস্তরে নামিতে পারিত না। কিন্তু হাসির প্রকৃতি অন্যরূপ। সে শুধু স্বামীকে ভালবাসিতে জানে, স্বামীর নিকট ভালবাসা লইতে জানে, তাঁহাকে পথ দেখাইতে জানে না, নিজের পথই সে চেনে না। আদরের পরিবর্ত্তে স্বামীর মুখে বিরক্তির ছায়া দেখিলেই ভয়ে ছুটিয়া পলায়, মত্তাবস্থা দেখিলে কোথায় লুকাইবে, খুঁজিয়া পায় না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় যাহা হইতে পারে, তাহাই হইল; বেহারী অধঃপতনের সোপানে এক এক করিয়া আরোহণ করিতে লাগিল; আর হাসি ঘরের ভিতর লুকাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। শেষে হাসি আর কোন উপায় না দেখিয়া রাণীকে সংবাদ দিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রাণী আসিল। হাসি যেন অকূলে কূল পাইল। সে চোখের জল মুছিয়া হাসিয়া দিদির অভ্যর্থনা করিল।

রাণী দেখিল, সে হাসি আর নাই, যে আছে, সে তাহার ছায়া। তাহার আর সে অগাধ অসংযত প্রাণ-ভরা হাসি নাই, তাহার হাসি এখন ঠোঁটের কোলে না আসিতেই মিলাইয়া যায়। তাহার প্রফুল্ল চোখের দিকে চাহিলে আর তাহা তেমন আনন্দে নাচিয়া উঠে না, জলভরে নত হইয়া পড়ে। শিশিরাহত বিশীর্ণ পঙ্কজের মত হাসিকে দেখিয়া রাণীর কান্না আসিল।

রাণী আসিয়া হাসিকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল, হাসি কিন্তু সব কথার উত্তর দিতে পারিল না; বলিল, "আমি অত জানি না দিদি, তুমি এসেছ, নিজে সব দেখে শুনে লও।"

রাণী জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কোথায়?"

হাসি বলিল, আজ তিনদিন দেখা নাই।"

বিস্ময়ের সহিত রাণী বলিল, "তিন—দিন?"

ম্লান হাসি হাসিয়া হাসি বলিল, "তিনি দিন শুনেই অবাক্ হ'লে যে? সে বারে আট দিন পরে বাড়ী ঢোকেন।"

রাণী। এতদিন থাকেন কোথায়?

হাসি। তা কি আমি দেখেছি? তবে শুনেছি, সে এক মজার জায়গায়। সেখানে মেয়েমানুষ নাচে, গান গায়।

রাণী রাগিয়া বলিল, "আর তোমার মাথা খায়। যাক্, তোর এমন দশা কেন? অসুখ হয়েছিল?"

হাসি। একদিনও না। তোমাকে ছুঁয়ে বল্‌ছি দিদি, এক দিনও একটু অসুখ—

তাহার গালে ঠাস করিয়া এক চড় পড়িল। রাগত স্বরে রাণী বলিল, "চুপ আবাগী, আমাকে ছুঁয়ে আর দিব্যি কর্‌তে হবে না। অসুখ হয়নি তো এত রোগা হয়েছিস্ কেন? শুধু যে হাড় কখানায় ঠেকেছে।"

হাসি মুখ নামাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা আমি কি জানি।"

সে দিন বেহারী বাড়ী আসিল না। পরদিন মধ্যাহ্নকালে রাণী শুনিল, বেহারী আসিয়াছে; বাড়ীর ভিতর আসে নাই, বাহিরের ঘরে আছে। রাণী চাকরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সে ঘরে তখন বিহারী ছাড়া আর কেহ নাই। রাণী তখন আস্তে আস্তে গিয়া সেই ঘরে ঢুকিল। বেহারী শুইয়াছিল, কিন্তু ঘুমায় নাই। পদশব্দে চমকিত হইয়া সে ফিরিয়া চাহিল; দেখিল, ঘরে রাণী। বেহারী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল; আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি, তুমি? রাণী?"

মৃদু হাসিয়া রাণী বলিল, "হাঁ, ভয় নাই, আমি রাণী।"

বেহারী ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিল, "ভয়? আমি কাউকে ভয় করি না।"

রাণী। নিশ্চয়ই না। ভয় থাক্‌লে কি এতটা কর্‌তে পার্‌তে?

বিরক্তভাবে বেহারী বলিল, "কেন, কি করেছি আমি? তুমিও বুঝি আমায় উপদেশ দিতে এসেছ?"

রাণী হাসিয়া বলিল, "না, উপদেশ নিতে এসেছি। কেমন আছ? প্রণামটা যে করা হয় নি।"

রাণী গলায় আঁচল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। বেহারী হাসিতে হাসিতে বলিল, "তবু ভাল, তা হ'লে আমি এখনও প্রণাম পেতে পারি।"

রাণী। স্বামী সকল অবস্থাতেই স্ত্রীর প্রণম্য।

বেহারী। মদ খেলেও? বেশ্যাসঙ্গ করলেও?

রাণী। জাতিচ্যুত, ধর্ম্মচ্যুত হলেও স্বামী স্ত্রীর মহাগুরু।

বেহারী। মন্দ কথা নয়। দেখছি, তোমরা ধর্ম্মের সারটুকু ছেঁকে নিয়ে গলায় ঢেলেছ। যাক্, হঠাৎ কি মনে করে?

রাণী। আস্‌তে কি নাই?

বেহারী। তোমার বোধ হয় তো নাই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুকের কাছে ঠেলিয়া উঠিল, রাণী সেটাকে চাপিয়া, জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "তবে এলাম কেন?"

বেহারী। তা তুমিই বলতে পার। হাসি বোধ হয় আস্‌তে লিখেছিল।

রাণী। যদিই লিখে থাকে, তাতে দোষ কি?

বেহারী। দোষ কিছু নাই। তবে হাসি কেবল আমার শত্রু নয়, দেখছি সে তোমারও শত্রু।

রাণী। সে তোমার ঘরের লক্ষ্মী।

বেহারী। আমি অনেক দিন লক্ষ্মীছাড়া হয়েছি। লক্ষ্মীছাড়া হয়েই—

কথাটা বলিতে বলিতে বেহারী তাহা চাপিয়া গেল; রাণীর কাছে এতটা দৈন্য প্রকাশ করা সে সঙ্গত বোধ করিল না। কিন্তু তাহার অসমাপ্ত কথা-টুকু বুঝিতে রাণীর বিলম্ব হইল না। তাহার চোখ দুইটা বড় কর্-কর্ করিতে লাগিল; সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। বেহারীও আবার শুইয়া পড়িল।

রাণী চোখ দুইটাকে পরিষ্কার করিয়া, আরও একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "আবার শুলে যে?"

বেহারী। কি করতে বল, উঠে দাঁড়াব?

রাণী। হাঁ, উঠে বাড়ীর ভিতর চল।

বেহারী। না, এখনি আমায় বেরুতে হবে, কাপড়-জামাগুলা ময়লা হয়েছিল, তাই বদ্‌লাতে এসেছিলাম।

রাণী। আজ আর বেরিয়ে কাজ নাই।

বেহারী। মন্দ কথা নয়! কিন্তু তার কারণ?

রাণী। কারণ, হাসি যে গেল!

বেহারী। শুধু এই কথা?

রাণী আরও একটু সরিয়া আসিল। পাশে একখানা পাখা পড়িয়াছিল; সেখানা তুলিয়া লইয়া নিজে বাতাস খাইবার ছলে স্বামীকে বাতাস করিতে করিতে বলিল, "নেও, উঠ।"

বেহারী কোন উত্তর করিল না। সে চক্ষু বুজিয়া বাতাসের সুখস্পর্শ অনুভব করিতে লাগিল। রাণী বলিল, "ছি ছি, তুমি হয়েছ কি? তোমার এ চেহারা দেখ্‌লে কান্না আসে।"

বেহারী চোখ মেলিল; রাণীর চোখের উপর চোখ রাখিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "কি? কি বল্‌লে? আবার বল তো শুনি।"

রাণী যেন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "এটা কি আর নূতন কথা?"

বেহারী। যেন নূতন বলেই মনে হচ্চে।

রাণী। তা হোক, এখন উঠে চল।

বেহারী। না, আমার অবকাশ নাই

রাণী। যথেষ্ট অবকাশ আছে। আজ আর তোমায় বেরুতে দেব না।

বেহারী হাসিয়া বলিল, "জোর ক'রে ধ'রে রাখ্‌বে?"

রাণীও হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "যদি তাই রাখি?"

বেহারী স্বরটাকে গম্ভীর করিয়া বলিল, "সমাজে দোষ দেবে না?"

রাণী আর বুক-ভাঙ্গা নিশ্বাসটাকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। বেহারী আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিল, রাণী নীরবে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

"বেহারীদা!"

রাণী সচকিতে দরজার দিকে চাহিয়াই তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিল, এবং পাখাখানা ফেলিয়া দিয়া এক কোণে গিয়া দাড়াইল। যে ডাকিয়াছিল, সে-ও যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া দরজার পাশ হইতে সরিয়া গেল। বেহারী উঠিয়া জুতা পারিল, এবং রাণীর দিকে একটা বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইয়া গেল। রাণী অবসন্নভাবে শয্যার উপর বসিয়া পড়িল।

আগন্তককে রাণী চিনিয়াছিল, সে সারদাচরণ। রাণী ভাবিল, "এ আবার এখানে কেন? সারদা কি আমার অদৃষ্টাকাশে ধূমকেতু? একবার তো আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, আবার এখানেও কি সর্ব্বনাশ ঘটাইবার জন্য উহার উদয় হইয়াছে?"

রাণী বাড়ীর ভিতর গেলে হাসি জিজ্ঞাসা করিল, "দেখা হয়েছে দিদি?"

রাণী বিষণ্ণ-মুখে সংক্ষেপে বলিল, "হয়েছে।"

হাসি। কি বল্‌লে?

রাণী। কিছু না।

হাসি। বেরিয়ে গেল?

রাণী। হাঁ।

হাসি। তোমার আবার এ কি হলো?

"কিছু না" বলিয়া রাণী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সারদাচরণ অনেক দিন হইতেই বেহারীর সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। কেবল বন্ধুত্ব নহে, উভয়ের মধ্যে উপকারক ও উপকৃতের সম্বন্ধও একটু ছিল। সারদা অনেক সময়েই বেহারীর নিকট আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত হইত; তদ্ভিন্ন বেহারীর চেষ্টায় এবং সুপারিশের জোরে সে একটি চাকরীও পাইয়াছিল। সারদাও যে ইহার প্রত্যুপকারে কিছু করে নাই, এমন নহে, বেহারী যে কলিকাতায় তত শীঘ্র দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার মূলে সারদাচরণের অনেকখানি ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল।

বেহারী মাতৃশ্রাদ্ধের সময় দেশে গিয়া সারদার বিরুদ্ধে যে সকল কথা শুনিল, তাহাতে সারদার উপর মর্ম্মান্তিক ক্রোধ হওয়াই স্বাভাবিক; হইয়াছিলও তাহাই। বেহারী ভাবিয়াছিল, সে আর পাপিষ্ঠ সারদার মুখ দর্শন করিবে না, সারদাও তাহাকে মুখ দেখাইতে সাহসী হইবে না।

কিন্তু বেহারীর এ ধারণা ঠিক না! তাহার কলিকাতায় ফিরিবার কয়েকদিন পরেই সারদা যখন 'বেহারীদা' বলিয়া অসঙ্কোচে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বেহারীর বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। ইহার পর সারদা যখন স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষা প্রয়োগে আপনার নির্দ্দোষতা ও মহৎ উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিল, তখন বেহারীও তাহাকে নির্দ্দোষ না ভাবিয়া থাকিতে পারিল না। সে বুঝাইয়া দিল যে, বেহারীর মাতা ও স্ত্রী যখন কষ্টের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, এবং এত কষ্ট সত্ত্বেও যখন তাহারা বেহারীর সাহায্য গ্রহণ করিবে না

বলিয়া সারদা বুঝিতে পারিয়াছিল, তখন সে বেহারীর হইয়াই তাহাদিগকে দুর্দ্দশার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু জগতে নিন্দাপ্রিয় লোকের অভাব নাই, বরং তাহাদের সংখ্যাই অধিক। ইহারা সকল কার্য্যের অন্ধকারের দিক্‌টাই আগে দেখে, আলোকের দিকে চাহিতে সাহস করে না। এই সকল কুৎসাপ্রিয় লোকের কথায় যদি তাহাকে বিনা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি এবং ধর্ম্মের প্রতি সম্পূর্ণ অবিচার করা হইবে। আর সারদাচরণ যে স্ত্রীলোক মাত্রকেই ভ্রাতার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে, ইহাও বেহারীর অবিদিত নাই।

সারদার কথায় বেহারী বিশ্বাস করিল। সে রাণীর মুখেও এমন কোন কথা শুনে নাই, যাহাতে সারদাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়। সে প্রকৃতই সাহায্য করিতে গিয়াছিল, এবং গর্ব্বিত রাণী তাহাতে আপনাকে অবমানিতা জ্ঞান করিয়া তাহার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, এবং তাহাকে বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিয়াছিল, ইহাতে সারদার দোষ কোথায়?

সারদাকে ক্ষমা করিয়া বেহারী তাহাকে আবার বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিল।

অতঃপর বেহারী যখন মানসিক চিন্তায় ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল, তখন সারদাচরণই বিজ্ঞ চিকিৎসকের স্থান অধিকার করিয়া তাহার এই চিন্তা-জ্বরের প্রতীকারকল্পে সুন্দর ঔষধ-বিশেষের ব্যবস্থা করিয়া দিল। সে ঔষধের প্রভাব বেহারীর হৃদয়ে যতই আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল, ততই সারদাচরণ বিবেকান্ধ বন্ধুর হাত ধরিয়া তাহাকে অধঃপতনের এক এক স্তরে নামাইতে নামাইতে শেষে কীর্ত্তনওয়ালী হরিদাসীর পবিত্র মন্দিরে আনিয়া উপস্থিত করিল। বেহারী বুঝিয়াও বুঝিল না; তাহার অভিমানক্ষুব্ধ হৃদয় বিবেকের রাশ ছাড়িয়া দিয়া আপনাকে নিরুদ্দিষ্ট পথে লইয়া চলিল। প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় সারদাচরণ আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল।

এমনই সময়ে সহসা রাণীকে উপস্থিত দেখিয়া বেহারী যেন একটু কুণ্ঠিত হইল, সারদাচরণও একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিল। সে দুর্গজয় করিয়াছে, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে দুর্গজয়ের চেষ্টা, তাহাতে এখনও সফল হয় নাই। এমন সময়ে রাণীর সম্মুখে তাহার ছদ্মবেশের মুখোসটা খুলিয়া যাওয়ায় সে উদ্দেশ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

হাসি যে শীঘ্রই সন্তানের জননী হইবে, ইহা রাণী আসিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল, বুঝিয়া তাহার একটু আনন্দও হইয়াছিল। কিন্তু হাসির অবস্থা দর্শনে তাহার সে আনন্দ বিষাদে পরিণত হইল। দিন দিন হাসি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছে; তাহার কণ্ঠার হাড় বাহির হইয়াছে, চোখের নীচে কালি পড়িয়াছে, স্ফীত গণ্ড ক্রমেই প্রকটাস্থি হইয়া উঠিতেছে; যেন একটি নব প্রস্ফুটিত ফুল্লদলশালিনী সূর্য্যমুখী সূর্য্যের অদর্শনে সঙ্কুচিতশরীর মাটীর দিকে ঝুলিয়া পড়িতেছে। তবু হাসি হাসে; অন্ততঃ রাণীকে কাছে পাইলেও শুষ্ক অধরে বিষাদের হাসি হাসে। কিন্তু সে হাসিটুকুও বুঝি আর থাকে না, তাহা চিরদিনের জন্য নিবিয়া যায়। রাণী বড় চিন্তিত হইল।

রাণী আর এক দিন বেহারীকে পাইয়া ধরিয়া বসিল; মিনতি করিয়া বলিল, "হাসির দিকে ফিরে চাও, হাসি যে যায়!"

বেহারী হাসিয়া বলিল, "যে যায়, তাকে যেতে দাও।"

রাণী। এইজন্যই কি আবার বিয়ে করেছিলে?

বেহারী। খুব সম্ভব, তা নয়।

রাণী। নয় তো তাকে এমন ভাবে মারছ কেন?

বেহারী। তাকে মার্‌বার আমার একটুও ইচ্ছা নাই।

রাণী। ইচ্ছা করিয়াই তুমি তাকে হত্যা করছ।

বেহারী। বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

রাণী। সে তোমার স্ত্রী, তুমি তার স্বামী, এটাও কি বুঝ্‌তে পার না?

বেহারী। ও সব ভুল ধারণা। সংসারে কেউ কারো নয়; নয়ন মুদিলে সব অন্ধকার।

বেহারী হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। রাণী গরম হইয়া বলিল, "তোমার এত তত্ত্বজ্ঞান কবে হ'লো?"

বেহারী। যে দিন হ'তে পেটে মদ পড়েছে। মদের মত তত্ত্বজ্ঞানদায়ক জিনিস সংসারে আর নাই। বুঝেছি?

রাণী। বেশ বুঝেছি। তা হ'লে হাসি যাবে?

বেহারী। যায় যাক্, ক্ষতি কি?

রাণী। ক্ষতি এই যে, সে তোমার স্ত্রী।

বেহারী। তুমি কি আমার স্ত্রী নও।

রাণী। আমার কথা স্বতন্ত্র।

বেহারী। তোমার কাছে স্বতন্ত্র হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে এক।

রাণী। আমি সমাজচ্যুতা।

বেহারী। আর আমিও ঐ শব্দটার পুংলিংঙ্গে যা হয় তাই, তর্থাৎ সমাজ চ্যুত।

রাণী বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। ঈষৎ হাসিয়া বেহারী বলিল, "বুঝ্তে পারছ না? অর্থাৎ তুমি এক জন পরপুরুষের সঙ্গে কথা ক'য়েই যদি পতিতা হও, তবে আজি বেশ্যাসঙ্গ ক'রেও কি পতিত নই?"

রাণী। তুমি পুরুষমানুষ।

বেহারী। আইনের দৃষ্টিতে স্ত্রী-পুরুষ সব সমান; বরং স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের শাস্তির বিধান আরও কঠিন।

রাণী। কিন্তু সমাজের আইনে তা বলে না।

বেহারী। ভয়ে বলে না, স্বার্থের খাতিরে বলে না, কিন্তু ধর্ম্মে তাই বলে, শাস্ত্রেও ঠিক তাই বলে।

রাণী প্রশংসমান দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে তর্কে পেরে উঠ্‌ব না।"

বেহারী হাসিয়া বলিল, "আমিও তর্কে রাজি নই।"

রাণী। যাই হোক, এখন হাসিকে একবার দেখ্‌বে চল।

বেহারী। ঐটি পারব না রাণি, পতিত হয়ে আমি সাধ্বী স্ত্রীকে স্পর্শ কর্‌তে পার্‌ব না।

রাণী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছ?"

রাণী। ভাবছি, যার এত জ্ঞান, তার অধঃপাতে মতি হয় কেন?

বেহারী হাসিয়া উঠিল; বলিল, "তুমি হিন্দুর মেয়ে, অদৃষ্ট মান না?"

রাণী। মানি, কিন্তু তোমার মত হাত-পা ছেড়ে দিয়ে তার স্রোতে ভেসে যেতে চাই না।

বেহারী। আমার মত অবস্থায় পড়লে বোধ হয় যেতে চাইতে।

রাণী বুকের ভিতর দাবানল চাপিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইরা রহিল। সে স্বামীর অবস্থা বুঝিল, আপনার অবস্থা বুঝিল, হাসির অবস্থা বুঝিল; আর সে-ই যে এই সকল অবস্থার কারণ, তাহাও বুঝিতে পারিল। রাণীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল, সে অশ্রুধারায় স্বামীর চরণ ধৌত করিয়া মুখ ফুটিয়া বলে, "ওগো, তুমি ফিরে এস, ফিরে এস; আমি তোমারই, তুমি ফিরে এস।" কিন্তু রাণী সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না।"

রাণীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বেহারী উঠিয়া দাঁড়াইল। দেওয়ালের পাশ হইতে ছড়িটা টানিয়া লইয়া বলিল, "আর কোন কথা আছে?"

রাণী উত্তর করিল, "না।"

বেহারী দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। রাণী বিদ্যুদ্দীপ্তনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি এত নিষ্ঠুর?"

বেহারী। আশ্চর্য্য এই যে, এমন সোজা কথাটা এত দিনও বুঝ্‌তে পার নাই।

বেহারী হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। রাণী সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এতটা নিদারুণ অবজ্ঞার আঘাতে তাহার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

হাসি ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া ভগ্ন রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "দিদি!"

চমকিয়া রাণী ফিরিয়া চাহিল; তার পর সে হাসির কাছে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "ভয় কি হাসি?"

হাসি তাহার কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুর ক্ষীণ তুলিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "কি হবে দিদি?"

রাণী বলিল, "ভাবিস্ না, ভগবান্‌কে ডাক; তিনি বোধ হয় মানুষের মত এত নিষ্ঠুর হবেন না।"

হাসিকে আশ্বাস দিলেও রাণী আপনার মনকে কিছুমাত্র আশ্বাস দিতে পারিল না। সে বেশ বুঝিয়াছে, তাহারই উপেক্ষা বেহারীর জীবনকে বিষময় করিয়া দিয়াছে, বেহারী স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করিতেছে। বেহারীর এই অধঃপতনের জন্য যেন রাণীই সম্পূর্ণ দায়ী। রাণীর মনে ঘোর অনুতাপ আসিল, সমস্ত নারী-প্রবৃত্তি আসিয়া তার অভিমানক্ষুব্ধ হৃদয়কে তিরস্কার করিতে লাগিল। রাণী অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, দুর হউক অভিমান! স্বামী জীবনের সর্ব্বস্ব, নারীর দেবতা; এই তুচ্ছ অভিমানকে বলি দিয়া দেবতাকে প্রসন্ন করিতে পারিব না? তাঁহাকে অধঃপতনের অতলগর্ভ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইব না?

বিংশ পরিচ্ছেদ

রাণীর হাত ছাড়াইয়া বেহারী হরিমতীর গৃহে উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু রাণীর কথাগুলা তাহার বুকের ভিতর এমন ভাবে বিঁধিয়াছিল যে, সে কথাগুলার হাত হইতে কিছুতেই মুক্তিলাভ করিতে পারিল না। মদের প্রবল স্রোতেও কথাগুলা ভাসিয়া গেল না, হরিমতীর

গানেও তাহা চাপা পড়িল না। কথাগুলা থাকিয়া থাকিয়া মনের চারিপাশ দিয়া উঁকি দিতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া বেহারী হরিমতীর গৃহ ত্যাগ করিল।

বেহারী দেখিল, রাণী তাহার সর্ব্বনাশের মূল; সে-ই তাহাকে অধঃপতনের অতলগর্ভে ফেলিয়া দিয়া এখন সাধুর ন্যায় দূরে দাঁড়াইয়া তিরস্কার করিতেছে, তাহাকে ত্যাগ করার ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত দেখিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে গর্ব্ব অনুভব করিতেছে। রাণী কে ? রাণী কি ? রাণী তাহার বিবাহিতা পত্নী, তাহার আজ্ঞার অধীনা, ইচ্ছার দাসী। কিন্তু সেই দাসী আজ তাহার প্রভুর স্থান অধিকার করিয়া নির্ব্বোধ পশুর ন্যায় তাহাকে চালনা করিতেছে। আর বেহারী—ধিক্ তাহাকে! সে পুরুষ হইয়া এই রমণীর অঙ্গুলী-চালনে ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে। কি লজ্জার ব্যাপার! বেহারীর মনে হইল, সমস্ত পৃথিবীটা যেন তাহার এই হীন পরাভব দেখিয়া হো হো শব্দে হাসিতেছে।

সুরামত্ত-চিত্তে বেহারী স্থির করিল, রাণীর এই গর্ব্ব—এই বিজয়াভিমান চূর্ণ করিতে হইবে; সে যে সামান্য রমণী; তাহার স্ত্রী, দাসী, ইহাই প্রমাণিত করিয়া আপনার এই লজ্জা দূর করিতে হইবে।

বেহারী দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে চলিল।

অনেক দিন পরে বেহারীকে সন্ধ্যার পর বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়া হাসি ও রাণী বিস্ময়ে পরস্পর মুখের দিকে চাহিল। হাসি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কপাল ফিরেছে।"

রাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কার ? তোর ?"

হাসি বলিল, "না, তোমার।"

রাণী উনানের উপর হইতে তরকারির কড়াটা নামাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমাদের কারও নয়, বোধ হয়, যে ফিরেছে তার।"

বেহারী একেবারে আপনার উপরের ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "রাণি!"

রাণী বলিল, "দেখ তো হাসি, কি চায় ?"

হাসি বলিল, "না দিদি, তুমি যাও।"

রাণী তাহার দিকে এমন একটা সক্রোধ কটাক্ষ-পাত করিল যে হাসি আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না, সে মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া, প্রথম স্বামি-সম্ভাষণ গমনোদ্যতা নববধূর ন্যায় ধীরে সঙ্কুচিত-পদে উপরে গিয়া ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ভিতরে মুখ বাড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল, "ডাকছ ?"

বেহারী কর্কশ-কণ্ঠে বলিল, "হাঁ, রাণী কোথায় ?"

হাসি দৃষ্টি নত করিয়া বলিল, "রান্না-ঘরে আছে।"

"চুলোয় আছে" বলিয়া বেহারী খাটের উপর বসিয়া পড়িল। হাসি ছুটিয়া নীচে পলাইল।

রাণী বলিল, "পালিয়ে এলি যে ?"

হাসি কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল, "তুমি যাও দিদি।"

"দূর আবাগী!" বলিয়া রাণী হাত ধুইয়া কাপড়-খানাকে একটু গুছাইয়া লইয়া আঁচলে মুখ মুছিতে মুছিতে উপরে উঠিল এবং বেহারীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "কি হয়েছে!"

বেহারী খাটের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল। একটা বালিস টানিয়া লইয়া তাহাতে হাতের ভর রাখিয়া বলিল, "কিছুই না।"

রাণী। তামাক দেব ?

বেহারী। দরকার নাই।

রাণী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বেহারীও নীরব; কি কথা কোথা হইতে আরম্ভ করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া রাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ডাক্‌ছিলে ?"

বেহারী ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিল, "তাতে কিছু দোষ হয়েছে কি ?"

রাণী। দোষ আর কি ? তবে এখন অনেক কাজ আছে, তাই বল্‌ছি।

বেহারী। তা আমি জান্‌তাম না। কাজ থাকে যেতে পার।

রাণী বুঝিল, বেহারীর কি একটা বলিবার আছে, কিন্তু সে তাহা বলিতে পারিতেছে না। সুতরাং সে গেল না। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি রাত্রে কি খাবে ? ভাত না লুচি ?"

বেহারী একটা হাই তুলিয়া বলিল, "যা বিধাতা জোটাবে।"

রাণী দরজা হইতে মুখ বাড়াইয়া হাসিকে ময়দায় জল দিতে বলিল।

বেহারী পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল এবং তাহাতে একটা টান দিয়া বলিল, "তুমি কি এখানে এখন থাকবে ?"

রাণী। তোমার মত কি ?

বেহারী। তোমার কাছে আমার মতামতের কোন মূল্য নাই।

রাণী মাথা হেঁট করিয়া রহিল। বেহারী বলিল, "এই জন্যই তোমার মতটা জান্‌তে চাই।"

রাণী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি এখানে থাক্‌লে তোমার কোন ক্ষতি আছে ?"

বেহারী। আমার ক্ষতিবৃদ্ধির কথা ছেড়ে দাও। তোমার নিজের কথা বল।

রাণীর মাথাটা আরও একটু নীচু হইল; একটু ভাঙ্গা গলায় বলিল, "তোমার কথা আর আমার কথা কি স্বতন্ত্র?"

বেহারী। আমার তো তাই বোধ হয়। আমি মরি বা বাঁচি, তাতে যেন তোমার কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই!

রাণী স্বামীর পদতলে বসিয়া পড়িল। অশ্রু-সজল নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন তুমি এমন কথা বল্‌ছ?"

উত্তেজিত কণ্ঠে বেহারী বলিল, "কেন বল্‌ছি? কার জন্য আজ আমার এই দশা হয়েছে, কি দুঃখে আমি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যায় উদ্যত হয়েছি, তা বুঝেছ কি? বুঝবার চেষ্টা করেছ কি?"

রাণী আর থাকিতে পারিল না; সে দুই হাতে স্বামীর পা দুইটা জড়াইয়া অবরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "আমি জ্ঞানহীনা রমণী, আমায় ক্ষমা কর।"

বেহারী পা টানিয়া লইয়া শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল, "তুমি যে পায়ে ধর্‌তে পার, তা আমার জানা ছিল না। সুতরাং তুমি ক্ষমার পাত্রী।"

রাণীর বুকে যেন বিষাক্ত শেল বিদ্ধ হইল; সে বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "তুমি কি আমাকে উপহাস কর্‌বার জন্যই ডেকেছ?"

বেহারী সোজা হইয়া বসিল; গম্ভীর-স্বরে বলিল, "না, তুমি যে আমার স্ত্রী, আমার দাসী, তাই বুঝাবার জন্য ডেকেছিলাম। শুন রাণি, যদি তুমি এখানে থাক্‌তে ইচ্ছা কর, থাক, কিন্তু আমার স্ত্রীর মত থাক্‌তে হবে। পার্‌বে?"

রাণী কঠোর স্বরে উত্তর দিল, "না।"

রাণী ধীরে ধীরে নীচে চলিয়া গেল। বেরারীও অবিলম্বে বাটীর বাহির হইল।

হাসি তখন ঘিয়ের কড়া উনানে চাপাইয়া লুচি বেলিতেছিল। বেহারীকে বাহির হইতে দেখিয়া বলিল, "আবার যে বেরিয়ে গেল দিদি?"

চড়া গলায় রাণী উত্তর করিল, "আমি কি ধ'রে রাখব?"

রাণী উনান হইতে ঘিয়ের কড়াটা নামাইয়া দুম্‌ করিয়া একপাশে বসাইল। গরম ঘি ছিটকাইয়া হাসির পায়ে লাগিল, সে উহু উহু করিয়া উঠিল। রাণী সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বাল্‌তির জলটা উনানে ঢালিয়া দিল। হাসি অবাক্ হইয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া রাণী একখানা গাড়ী ডাকাইল এবং আপনার কাপড়-চোপড় লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। হাসি বাধা দিতে গিয়া একটা ধমক খাইয়া কাঁদিতে লাগিল। রাণী চলিয়া গেল।

মধ্যাহ্নকালে বেহারী ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "রাণি!"

হাসি এক পাশে পড়িয়া কাঁদিতেছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "রাণী কোথায়?"

হাসি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "চলে গেলে।"

বেহারী জামা-চাদরটা মেঝেয় ছুড়িয়া ফেলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। একবার হাসির দিকে ফিরিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "তাই বুঝি কান্না হচ্ছে? সে কে? তার জন্য কাঁদতে হয়, বাইরে যাও।"

হাসি ফুলিতে ফুলিতে বাহিরে গেল। বেহারী পাশ ফিরিয়া শুইল। একটু পরেই উঠিয়া জামাটা কাঁধে ফেলিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

রাণী বাড়ীতে পৌঁছিয়া একটু বিশ্রাম করিয়াই শান্তির সহিত দেখা করিতে গেল। কিন্তু দেখা পাইল না; শুনিল, শান্তি নাই, এক দিন রাত্রিকালে সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। রামসদয় কুলত্যাগিনী কন্যার অনুসন্ধান আবশ্যক বোধ করে নাই।

রাণী বুঝিতে পারিল, হতভাগিনী শান্তি এত দিনের পর চরম শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়াছে। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঘরে ফিরিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

রাণী কলিকাতায় গেলে শান্তির দিন বড়ই কষ্টে কাটিতে লাগিল। রাণীকে হারাইয়া সে দুঃখে সহানুভূতি, শোকে সান্ত্বনা, নিরাশায় আশা, সব হারাইল। তাহার জীবনভার দুঃসহ হইয়া উঠিল। নিরন্তর লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান সহিতে সহিতে সে হৃদয়ের ধৈর্য্যটুকুও হারাইয়া ফেলিল। তাহার রহিল কেবল বিমাতার বাক্যযন্ত্রণা, রহিল কেবল অসহ্য হৃদয়বেদনা, রহিল কেবল নৈরাশ্যের নিদারুণ নিবিড়তা।

ক্রমে শান্তির প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তন দেখা দিল। ধৈর্য্যহারা হওয়ায় সে এখন আর বিমাতার তিরস্কার নীরবে সহ্য করে না, তাহার প্রতিবাদ করে; দামিনীর চড়া কথার উত্তরে সেও দুই একটা চড়া কথা শুনাইয়া দেয়। ইহার ফল বড় ভয়ানক হইল। আগে শান্তি নীরব থাকায় একা দামিনীর কথায় ঝগড়া হইত না, কিন্তু এখন দিন-রাত্রি বাড়ীতে ঝগড়া-কলহ চলিতে লাগিল। সে ঝগড়ায় রামসদয় ত দূরের কথা, প্রতিবাসীরাও বিরক্ত হইয়া উঠিল।

এক দিন রামসদয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আর তো বাড়ীতে টেঁকা যায় না।"

দামিনী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "বেশ, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, সব চুকে যাবে।"

রামসদয় বলিলেন, "আমি কি ছাই তাই বল্‌ছি। পাড়ার পাঁচজনে যে নিন্দে করে।"

দামিনী রাগিয়া উত্তর করিল, "আমাকে কি তাদের মুখে সরা-চাপা দিতে বল?"

রামসদয় বলিলেন, "তা নয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আজকাল এত বাড়াবাড়ি হয় কেন?"

দামিনী মুখভার করিয়া বলিল, "হয় আমার জন্য। আমি ঝগড়াটে, কুঁদুলী, কাউকে দেখতে পারি না। আমিই যত আপদ্-বালাই হয়েছি কি না।"

দামিনী চোখে আঁচল চাপা দিল। রামসদয় এতটুকু হইয়া গেলেন। তিনি পত্নীর হাত ধরিয়া তাহার চোখের চাপা খুলিতে গেলেন, দামিনী আরও জোরে আঁচল চাপিয়া ধরিল। রামসদয় আদর করিয়া পত্নীকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন; দামিনী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। রামসদয় তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "ছি ছি, তুমি এখনও নেহাত ছেলেমানুষ, একটুও বুদ্ধিশুদ্ধি হ'ল না।"

স্বামীর বুক হইতে মাথা সরাইয়া লইয়া দামিনী বলিল, "বেশ, তোমার তো বুদ্ধি আছে, তোমার মেয়ের তো খুব বুদ্ধি আছে? তাই হ'লেই ভাল।"

রাম। আমি মেয়ের কথাই জিজ্ঞাসা করছি। বলি, সে ইদানীং এত বাড়াবাড়ি করে কেন?

দামিনী। কেন করে, তা আমি কি বল্‌ব? তুমি পুরুষমানুষ, তোমার বুদ্ধি আছে, বিদ্যে আছে, তুমি জান না, আর আমি জান্‌ব?

রাম। মেয়েমানুষেই ভাল বুঝতে পারে।

দামিনী। বুঝতে পার্‌লেও আমি কিছু বল্‌ব না। হাজার হোক্, সতীন-ঝি। আমি কোন কথা বল্‌লে লোকে তা বিশ্বাস কর্‌বে কেন? তুমিই বা কি ভাববে?

দামিনীর কথার মধ্যে যেন কিসের একটা ইঙ্গিত ছিল। সে ইঙ্গিতে রামসদয়ের মনের ভিতর বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। তিনি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথাটা কি দ.মু.?"

"কি কথা আবার?" বলিয়া দামিনী স্বামীর মুখের উপর একটা স্নেহপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। রামসদয়ের সন্দেহ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। তিনি অধিকতর আগ্রহের সহিত বলিলেন, "না না, তোমায় বল্‌তেই হবে।"

দামিনী দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি কিছুই জানি না। আদার ব্যাপারী হয়ে আমার জাহাজের খবরে কাজ কি? আমি সাতেও নাই, পাঁচেও নাই।"

রামসদয় পত্নীর হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন, "না না, তুমি যা জান, বল। আমার মাথা খাও, আমার মরা মুখ দেখ।"

দামিনী হাত ছাড়াইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিল; বলিল, "ছি ছি! ও সব কি কথা!"

রামসদয় অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "তবে কি হয়েছে, বল।"

দামিনী তখন স্বামীর কাছে চাপিয়া বসিয়া এদিকে ওদিকে চাহিয়া একটু চাপা গলায় বলিল, "তুমি স্বামী, গুরুলোক, তুমি যখন জিজ্ঞাসা করছ, তখন কাজেই বল্‌তে হবে। তা না হ'লে বুক ফাট্‌লেও আমার মুখ ফুট্‌তো না। হাজার হ'ক, ঘরের কলঙ্ক তো।"

কলঙ্ক! রামসদয় শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "কলঙ্ক! কার? শান্তির?"

দামিনী। চুপ কর, শুনতে পাবে। ওকে তো শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়েছিলে?

রাম। হাঁ।

দামিনী। কিন্তু তারা আবার রেখে গেল কেন?

রাম। বোধ হয়, বনিবনাও হ'ল না।

দামিনী। কেন হ'ল না?

রাম। তা কেমন ক'রে জান্‌ব?

দামিনী। জানা তো দরকার।

রাম। তুমি কি জেনেছ?

দামিনী। আমি অনেক জেনেছি। সে অনেক কীর্ত্তি।

রাম। কে বল্‌লে?

দামিনী। ওর শ্বশুরবাড়ার পাশেই ক্ষান্তর বোনঝির শ্বশুরবাড়ী। ক্ষান্ত নিজে সব শুনে এসেছে।

রাম। কি শুনে এসেছে?

দামিনী। সে অনেক কথা। সে সব কথা তোমার শুনে কাজ নাই।

দামিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া রামসদয় বলিলেন, "না না, কি হয়েছে, সব খুলে বল।"

দামিনী। রাগ করবে না?

রাম। না।

দামিনী তখন ক্ষান্তর নিকট যাহা শুনিয়াছিল, সব একে একে বিবৃত করিল। কিরূপে শান্তি উহার জায়ের ভাই গোপীনাথের সঙ্গে মজিয়াছিল, কিরূপে

উহার জা হাতে-নাতে উহাদের গুপ্ত প্রণয়ের ব্যাপার ধরিয়া ফেলিয়া শান্তিকে এখানে পাঠাইয়া দেয়, আর সেই হতভাগা ছোঁড়াটাকে বাড়ীছাড়া করে, তাহা সালঙ্কারে বর্ণনা করিল। রামসদয় নিশ্বাস রোধ করিয়া সমস্ত শুনিলেন, শুনিয়া রাগে জলিয়া উঠিলেন। ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "এত দূর! আমি আজ রাত্রেই ও পাপিষ্ঠাকে বাড়ী হ'তে তাড়াব।"

রামসদয় চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "শান্তি।"

শান্তি তখন জল খাইয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছিল, সহসা পিতার ক্রুদ্ধ আহ্বান শুনিয়া সে দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল; উত্তর করিল, "কি?"

রামসদয় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আমার মাথা আর তোর শ্রাদ্ধ। তুই আমার বাড়ী হ'তে দূর হয়ে যা।"

শান্তি বলিল, "কেন? আমি কি করেছি?"

রামসদয় লাফাইয়া শয্যা হইতে নীচে নামিলেন; দরজার নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "কি করেছি? নিজের মুখ পুড়িয়েছ, আর আমারও মুখে কালি দিয়েছ।"

দামিনী স্বামীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে ঘরের ভিতর টানিয়া আনিয়া বলিল, "কর কি, মেয়ে তো বটে!"

রামসদয় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "অমন মেয়ের মরণই ভাল। আমি যদি কাল সকালেই ও হতভাগীকে ঝাঁটা মেরে বাড়ীর বা'র না করি—"

বাধা দিয়া দামিনী বলিল, "অমন যদি কর, তবে আমি গলায় দড়ী দেব।"

রামসদয় বলিলেন, "তবে কি তুমি বল্‌তে চাও, ঐ কুলটার হাতের জল খেতে হবে, ওর হাতের পাপ অন্ন ঠাকুরকে দেব?"

দামিনী বলিল, "তাও কি হয়? আমিও ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, আমার কি আর পাপপুণ্যির ভয় নাই? তবে সকল কাজই ভেবে-চিন্তে করা ভাল। ঘরের কেলেঙ্কারী পাঁচ জনে জানাজানি হ'লে আমাদেরই যে মুখ পুড়্‌বে।"

দামিনী স্বামীকে শয্যার উপর বসাইয়া দিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিল।

শান্তির সর্ব্বশরীর তখন ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে দরজার উপরে বসিয়া পড়িয়া আকুল প্রাণে ডাকিল, "কে কোথায় আছ দেবতা, আমাকে বাঁচাও; আত্মহত্যার মহাপাপ হ'তে আমায় রক্ষা কর।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার অল্পকাল পরে জনৈক যুবক নদীতীরের পথ ধরিয়া রেল-ষ্টেশন হইতে গ্রামের দিকে আসিতেছিল। যুবকের গায়ে একটা সাদা কোট, বগলে ছাতা, এক হা'তে একটা পুঁটুলী, অপর হাতে জুতা, হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলায় ভরা। রাত্রি বেশী না হইলেও পল্লীপথ নিস্তব্ধ হইয়াছিল; বিশেষতঃ গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী নদীতীরের পথে কেহই ছিল না। যুবক একা নির্জ্জন পথ অতিবাহন করিতেছিল।

যুবক ক্রমে গ্রামের নদীঘাটে উপস্থিত হইল। ঘাটের অনতিদূরে একটা প্রাচীন বটগাছ শাখাপত্রে তলদেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দণ্ডায়মান। যুবক গাছের তলায় গিয়া জুতা, ছাতা, পুঁটুলী ফেলিয়া বিশ্রাম করিতে বসিল।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর যুবক ঘাটে হাত-পা ধুইবার জন্য বাম হাতে জুতা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিল, শ্বেতবস্ত্রাবৃত, এক স্ত্রীলোক ঘাটে নামিতেছে। অগত্যা যুবক ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বস্থানে বসিল। কিন্তু ভাবিল, এমন সময়ে এই নির্জ্জন নদীঘাটে একা স্ত্রীলোক কেন? ঘাটের কাছাকাছি লোকের বসতি নাই। তবে এই রমণী কোন্ সাহসে একা এখানে আসিল? কোন গৃহস্থের মেয়ের তো এত সাহস হয় না। পেত্নী নয় তো?

ভূতপেত্নীর ভয় ততটা না থাকিলেও এই নির্জ্জন নদীতীরে—ভূতযোনির প্রধান আবাসস্থান বটবৃক্ষের তলে বসিয়া যুবকের গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল; সুতরাং রমণীর দিকে দৃষ্টিপাত অবিধেয় হইলেও সে মাঝে মাঝে সে দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারিল না। দেখিল, রমণী কোন দিকে না চাহিয়া সোজা গিয়া জলে নামিল। হাঁটু জলে গিয়া একবার এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিল, তার পর বরাবর অধিক জলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার কোমর ডুবিল, বুক ডুবিল, গলা ডুবিল, তথাপি রমণী থামিল না। ক্রমে চিবুক ডুবিল, নাসিকা ডুবিল, মাথা ডুবিল, তার পর আর কিছুই নাই। পরক্ষণেই জলের উপর হাত-পা আছড়াইবার একটা শব্দ উঠিল। যুবক এতক্ষণ রুদ্ধনিশ্বাসে এই ব্যাপার দেখিতেছিল, এখন তাহার আর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ঘাটে গেল, এবং গায়ের জামাটা টানিয়া খুলিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শরতের নদী; স্রোতের টান বেশী ছিল না, এ জন্য

রমণীর দেহ তখনও অধিক দূরে যায় নাই। তখনও সে আসন্ন মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, জলতল হইতে উঠিবার জন্য প্রাণপণে হাত-পা ছুড়িতেছিল, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইতেছিল না, মৃত্যু তাহাকে ক্রমেই আপনার দিকে টানিয়া লইতেছিল। স্রোত একটু ছিল বলিয়াই তখনও সে ডুবে নাই, নতুবা এতক্ষণ অতলে চলিয়া যাইত।

যুবক সাঁতারিয়া গিয়া রমণীকে ধরিল এবং অল্প আয়াসেই তাহাকে লইয়া তীরে উঠিল। তীরে আসিয়া সে রমণীর উদরটা আপনার মাথার উপর রাখিয়া তাহাকে শূন্যে কয়েকবার ঘুরাইল। রমণীর মুখ দিয়া খানিকটা জল বাহির হইয়া গেল। যুবক তখন রমণীকে সৈকতভূমির উপর শোয়াইয়া দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আপনার পরিধেয় নিঙড়াইতে লাগিল।

অল্পক্ষণমধ্যেই রমণী সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিতে গেল। যুবক তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল, "উঠ না, আর একটু থাক।"

রমণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "আমি কোথায়?"

ক্ষীণ চন্দ্রকিরণ বৃক্ষপত্রান্তরাল ভেদ করিয়া রমণীর মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া যুবক ত্রস্তে রমণীর মুখের দিকে চাহিল; চাহিয়াই বিস্ময়জড়িত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এ কি, শান্তি?"

শান্তি বলিল, "কে, গুপী-দা?"

"জয় জগদীশ্বর!" বলিয়া গোপীনাথ সেইখানে বসিয়া পড়িল।

শান্তি উঠিয়া বসিল। ভিজা কাপড়ের আঁচলটা মাথায় তুলিয়া দিয়া বলিল, "তুমি এখানে কেন গুপীদা?"

গোপীনাথ সহর্ষে বলিল. "ভগবান্ এনেছেন। তোমাকে বাঁচাবার জন্য ভগবান্ আমাকে এখানে এনেছেন।"

শান্তি। তুমিই কি আমাকে বাঁচালে?

গোপী। ভগবান্ বাঁচিয়েছেন, আমি উপলক্ষ মাত্র।

ঈষৎ রুক্ষস্বরে শান্তি বলিল, "কেন আমায় বাঁচালে? আমি তোমার কাছে এমন কি দোষ করেছি?"

কিছু বুঝিতে না পারিয়া গোপীনাথ বিস্মিতভাবে শান্তির দিকে চাহিয়া রহিল। শান্তি বলিল, "মরণের পথেও তুমি বাদী! কেন এমন অন্যায় কাজ কর্‌লে

গোপীনাথ বিস্ময়ের সহিত বলিল, "অন্যায়?"

শান্তি। হাঁ, অন্যায়, হাজারবার অন্যায়।

গোপী। আত্মহত্যার চেয়েও অন্যায়?

শান্তি রাগিয়া উত্তর করিল, "আমি আত্মহত্যা কর্‌ব, তাতে তোমার ক্ষতি কি?"

গোপী। তোমারই বা লাভ কি?

শান্তি। আমার লাভ—আমার সকল জ্বালা জুড়াবে।

গোপী। জুড়াবে না আরও বাড়িবে?

শান্তি। মরণের পর তো? আমি তা দেখ্‌তে যাব না।

গোপী। ওটা ভুল, তোমাকেই দেখতে হবে, ভুগ্‌তেও হবে।

শান্তি। আমি তোমার সঙ্গে তর্ক কর্‌তে চাই না।

গোপী। আমারও সে ইচ্ছা নাই। তার চেয়ে এখন উঠে ঘরে চল; আর ভিজে কাপড়ে থেকে কাজ নাই।

শান্তি একবার নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "ঘরে জায়গা থাকলে আমি আজ নদীর গর্ভে জায়গা খুঁজ্‌তে আস্‌তাম না।

গোপীনাথ চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি হঠাৎ এখানে কোথা হ'তে এলে?"

গোপী। কলকাতা হ'তে আস্‌ছি।

শান্তি। সেখানে কেন গিয়েছিলে?

গোপী। আমি এখন কলকাতাতেই থাকি, সেখানে চাকরী করি।

শান্তি। দিদির কাছে থাক না?

গোপী। না, তুমি যে দিন চ'লে এলে, আমিও সে দিন সেখান ছেড়ে চ'লে যাই।

শান্তি। কেন গেলে?

গোপী। ভগ্নীপতির অন্নদাস হয়ে থাকৃতে ইচ্ছা হ'ল না।

শান্তি। এ দিকে কোথা যাচ্ছিলে?

গোপীনাথ একটু ভাবিয়া মিথ্যা কথা কহিল, বলিল, "একবার দিদিকে দেখ্‌তে যাচ্ছিলাম।"

শান্তি নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। গোপীনাথ বলিল, "তা হ'লে এখন কোথায় যাবে।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শান্তি বলিল, "সংসারে আমার স্থান নাই।"

গোপী। যেখানে কীট-পতঙ্গেরও স্থান আছে, সেখানে তোমার স্থান নাই?

শান্তি। আমি কীটপতঙ্গ নই, মানুষ।

গোপী। ভগবান্ মানুষের উপযুক্ত স্থানও ঠিক ক'রে দিয়েছেন।

শান্তি। আমার স্থানটা ঠিক্ করতে বোধ হয় ভুলে গেছেন।

গোপীনাথ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল; ভাবিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে ডাকিল, "শান্তি!"

শান্তিও তেমনই স্নিগ্ধস্বরে উত্তর দিল, "গুপী-দা!"

গোপী। আমাকে বিশ্বাস হয়?

শান্তি। এ পর্য্যন্ত অবিশ্বাসের কিছু দেখি নাই।

গোপী। আমার সঙ্গে যেতে পার?

শান্তি। কোথায়?

গোপী। কলকাতায়।

শান্তি। তার পর?

গোপী। তার পর আমি যে মাইনে পাই, তাতে তোমাকে এক মুঠা ভাত দিতে পারব।

শান্তি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গোপীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন দেবে?"

গোপী। দিতে কি নাই?

শান্তি। সম্পর্ক থাকলে দিতে আছে।

গোপী। তোমার সঙ্গে কি আমার কোন সম্পর্ক নাই?

শান্তি। কিছুই না।

গোপীনাথের হৃদয় ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। সে ভগ্ন রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "নিঃসম্পর্কীয়কে কি কেউ খাওয়ায় না?"

শান্তি। খাওয়ায়—দয়া ক'রে।

গোপী। সে দয়ায় কিছু দোষ আছে কি?

শান্তি। আছে, যদি তার সঙ্গে স্বার্থের সম্বন্ধ থাকে।

গোপী। আমাকেও কি তাই মনে কর?

শান্তি। বোধ হয় করি।

গোপী। কি জন্য?

শান্তি। জগতে এত অনাথ আতুর থাকতে আমার উপরই বা তোমার এত দয়া কেন?

কম্পিতকণ্ঠে গোপীনাথ বলিল, "তুমি এত খুঁত ধরলে আমি পেরে উঠবো না। কিন্তু দোহাই তোমার, একবার নিজের অবস্থাটা ভেবে দেখ।"

স্থির, স্বরে শান্তি উত্তর করিল, "আমার ভাববার কিছুই নাই, সোজা পথ প'ড়ে রয়েছে।"

গোপী। কি, আত্মহত্যা?

শান্তি। হাঁ।

গোপীনাথ বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল; শান্তির মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিল, "স্ত্রীলোক বিধবা হ'লে যে এত পাপিষ্ঠা হয়, তা আমার জানা ছিল না। সত্যই আমি তোমাকে বাঁচিয়ে অন্যায় কাজ করেছি। তুমি মর, তোমার মরাই উচিত।"

গোপীনাথ আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে নদীর পাড়ের উপর উঠিল।

শান্তি ডাকিল, "গুপী-দা!"

গোপীনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইল। শান্তি বলিল, "আমার আর একটা উপকার করবে?"

গোপীনাথ বলিল, "কি বল।"

শান্তি। আমাকে আমার সইয়ের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে?

গোপী। সই কে?

শান্তি। বেহারীদার স্ত্রী।

গোপী। কোথায় থাকে?

শান্তি। কলকাতায়।

গোপী। আর কিছু ঠিকানা জান?

শান্তি। জানি, তারা চাঁপাতলায় থাকে।

গোপী। রাস্তার নাম? বাড়ীর নম্বর?

শান্তি। তা জানি না।

একটু ভাবিয়া গোপীনাথ বলিল, "খুঁজে বের করবার চেষ্টা করব। কিন্তু তত দিন?

শান্তি। তত দিন কি?

গোপী। তত দিন কোথায় থাকবে?

শান্তি। তোমার কাছে।

গোপী। উত্তম, কিন্তু বিশ্বাস হবে?

শান্তি। তোমার উপর বোধ হয় ততটা অবিশ্বাস নাই।

"তবু ভাল" বলিয়া গোপী একটু হাসিল।

তার পর গোপীনাথ যে পথে আসিয়াছিল, শান্তিকে লইয়া সেই পথে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

এখন গোপীনাথের আগেকার কথা একটু বলা দরকার। ভগ্নী-গৃহ ত্যাগ করিয়া গোপীনাথ দিনকতক এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু তাহা আর ভাল লাগিল না। তাহার মনের ভিতর এমন একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল, যাহাতে তাহার চিরাভ্যস্ত জীবন আর একটা নূতন পথে ছুটিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। এখন আর তাহার তাস-পাশা ভাল লাগিত না; গান গাহিতে গাহিতে গানের অন্তরা ভুলিয়া যাইত, বাজাইতে গেলে তাল কাটিয়া যাইত। একসঙ্গে তিন ছিলিম গাঁজা টানিলেও নেশা হইত না। বিরক্ত হইয়া গোপীনাথ এ সকল ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল।

কলিক্যতায় তাহাদের গ্রামের হৃদয় দত্তের

কাপড়ের দোকান ছিল। গোপীনাথ দিনকতক সেই দোকানে কাজ করিল। তার পর এক বন্ধুর চেষ্টায় হাবড়ার রেলগুদামে একটা কাজ পাইল। বেতন হইল ১৫ টাকা। দুই তিন মাস পরে গোপীনাথ প্রায় কুড়ি টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিল। এক গৃহস্থের বাড়ীতে দুইখানি খোলার ঘর সাড়ে তিন টাকায় ভাড়া লইয়াছিল। একখানিতে রাঁধিত অপরখানিতে শয়ন করিত।

গোপীনাথের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা সচ্ছল হইল। বন্ধুবান্ধবও জুটিল, এবং তাহাদিগের নিকট হইতে কুৎসিৎ আমোদ-প্রমোদের প্রলোভন আসিতে লাগিল। কিন্তু গোপীনাথ তাহাতে টলিল না। তাহার মনের উপর শান্তির মুখের যে একটা ছাপ পড়িয়াছিল, সে কিছুতেই তাহাকে সরাইতে পারিল না। পারিলে বোধ হয়, বন্ধুবান্ধবদিগের প্রলোভনে ভুলিত।

এইরূপে সাত আট মাস কাটিয়া গেল, কিন্তু গোপীনাথ শান্তিকে ভুলিতে পারিল না। সেই নিরভরণা বিধবার বিষাদ-মলিন মুখখানা তাহার মানসনেত্রের সম্মুখে দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। সে মুখখানা আর একবার দেখিবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ হইত, গোপীনাথ কষ্টে তাহা দমন করিয়া থাকিত। শুধু দেখা—দূর হইতে বা নিকট হইতে শুধু একবার দেখিবার আকাঙ্ক্ষা; এ দেখায় দোষ কি?

দোষ থাক, আর নাই থাক, গোপীনাথ আর আগ্রহ দমন করিতে পারিল না। সে তিন দিনের ছুটী লইয়া শান্তির পিত্রালয় অভিমুখে যাত্রা করিল।

শান্তি যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে এ দিকে কোথায় যাইতেছ, তখন সে বলিতে পারিল না যে, শান্তিকে দেখিবার আশাতেই সে দূর কলিকাতা হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। এ কথা কি শান্তির সম্মুখে বলা যায়? ছি! তাই সে মিথ্যা কথাটা বলিল, দিদিকে দেখিতে যাইতেছে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় আসিবার পর এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। শান্তি প্রত্যহই গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করিত, বেহারী-দার কোন সন্ধান হইল কি না? গোপীনাথ বলিত, "এখনও হয় নাই, তবে চেষ্টা দেখিতেছি।"

শান্তিই গোপীনাথের সংসারে এখন গৃহকর্ত্রী। শান্তি রাঁধিত, গোপীনাথ তাহা অমৃতজ্ঞানে খাইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে কার্য্যস্থলে যাইত, আবার সন্ধ্যাকালে কর্ম্মক্লান্তদেহে আপনার ক্ষুদ্র গৃহখানিতে উপস্থিত হইবার একটা আগ্রহ লইয়া ফিরিয়া আসিত। গোপীনাথ প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আনিত, শান্তি সে সব গুছাইয়া তুলিত, এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিষ আনার জন্য গোপীনাথকে বকাবকি করিত। সে তিরস্কারের মধ্যে গোপীনাথ এমন একটা অভূতপূর্ব্ব পুলক, অনাস্বাদিত মাধুর্য্য অনুভব করিত যে, সে জন্য অপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আনিবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিত না। আফিস হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইলে শান্তি যখন উদ্বিগ্নভাবে তাঁহার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিত, তখন তাহার হৃদয়ে আনন্দের এমনি একটা তুফান উঠিত যে, সে সহসা কোন উত্তর করিতে পারিত না। তাহার পর খাইতে বসিলে শান্তি যখন 'এটা খাও, ওটা খাও' বলিয়া অনুরোধ করিত, তখন চোখের জল রোধ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। আহারান্তে সে শয্যায় পড়িয়া স্বর্গরাজ্যের কোন্ এক অজ্ঞাত আনন্দময় কল্পনায় নিরত হইত।

ইহার মধ্যে শান্তি যখন বেহারীর কোন সন্ধান হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিত, তখন কিন্তু গোপীনাথের কল্পনার সূত্রগুলা একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িত, তাহার কল্পিত স্বর্গরাজ্য সহসা কঠোর মর্ত্ত্যের আকারে পরিণত হইয়া যাইত। এইরূপে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে গোপীনাথ এক পক্ষকাল অতিবাহিত করিল।

সে দিন কিন্তু শান্তি বড় চাপিয়া ধরিল। গোপীনাথ আফিস হইতে ফিরিতেই সে জিজ্ঞাসা করিল, "বেহারীদার কোন সন্ধান পেলে?"

গোপীনাথ পূর্ব্ববৎ সহজভাবে উত্তর করিল, "না।"

শান্তি। খোঁজ করেছ?

গোপীনাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "হাঁ, না,—করেছি, তবে ভালরকম করা হয় নি বটে।"

মুখ ভার করিয়া শান্তি বলিল, "বোধ হয়, হবেও না।"

গোপী। হবে না কেন?

শান্তি। কে খোঁজ করবে?

গোপী। আমি।

শান্তি। তুমি পারবে না।

গোপী। কে বলে, পারব না?

শান্তি। আমি বলি। গুপীদা, তুমি কি আমায় এতই খুকী মনে কর?

ঈষৎ হাসিয়া গোপীনাথ বলিল, "নিশ্চয়ই না।"

শান্তি রাগিয়া উঠিল; বলিল, "তোমার হাসি রাখ, এখন তাদের খোঁজ করবে কি না বল।"

শান্তির রাগ দেখিয়া গোপীনাথের মুখের হাসি মুখে মিলাইয়া গেল। সে ঈষৎ ভীতভাবে বলিল, "কেন শান্তি, এখানে কি তোমার কষ্ট হচ্চে?"

শান্তি পূর্ব্ববৎ উগ্রভাবে বলিল, "হাঁ, আমি তোমার কাছে সুখে থাকবার জন্য আসি নাই।"

গোপীনাথের মুখের উপর কে যেন কালী মাড়িয়া দিল। সে তখনও আফিসের জামা খুলে নাই, জুতাটা খুলিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে গিয়া জুতো পায়ে দিল। শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাও?"

গোপীনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "বেহারী-বাবুর খোঁজে।"

শান্তি বলিল, "এখন থাক্।"

"না" বলিয়া গোপীনাথ অগ্রসর হইল। শান্তি বলিল, "একটু জল খেয়ে যাও।"

"ফিরে এসে খাব" বলিয়া গোপীনাথ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। শান্তি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় গোপীনাথ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, "শান্তি একটি আলো জ্বালিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। গোপীনাথ বলিল, "খোঁজ হয়েছে শান্তি, বেহারী বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে।"

শান্তি সে কথায় কান না দিয়াই তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িতে গেল।

সে দিন গোপীনাথের খাওয়া যে ভাল হইল না, তাহা শান্তি বুঝিতে পারিল। বুঝিলেও পূর্ব্ববৎ অনুরোধ করিতে পারিল না। গোপীনাথও নীরবে আহার শেষ করিয়া বলিল, "কাল দুপুরবেলা বেহারী বাবু চাকর আর গাড়ী পাঠাবে, তুমি যেও। ঘরের চাবীটা—"

চোখটা একবার রগড়াইয়া লইয়া গোপীনাথ পুনরায় বলিল, "চাবীটা বাড়ীর কারও কাছে রেখে যাবে।"

মুখ নীচু করিয়া পায়ের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে শান্তি মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তুমি রাগ করেছ গুপীদা?"

গোপীনাথ বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল, "না শান্তি; তুমি যদি আমার উপর রাগ ক'রে থাক, তবে তা ভুলে যেও। আর—"

শান্তি। আর কি?

গোপী। আর যদি কখন দরকার পড়ে, তোমার গুপীদাকে মনে করো। ভগ্নী যেমন ভাইকে বিশ্বাস করে, মা যেমন ছেলেকে বিশ্বাস করে, তেমনি বিশ্বাস নিয়ে এসো; দেখবে, তোমার গুপীদা বিশ্বাসঘাতক নয়।

গোপীনাথ উঠিয়া গেল। শান্তির বোধ হইল, গোপীনাথ যেন কাঁদিতেছে। তাহার নিজের চক্ষুও তখন শুষ্ক ছিল না।

পরদিন সন্ধ্যাকালে গোপীনাথ অলস-মন্থর-পদে আসিয়া বাড়ী ঢুকিতেই যখন বাড়ীওয়ালার স্ত্রী দরজার পাশ হইতে তাহার ঘরের চাবীটা ফেলিয়া দিল, তখন গোপীনাথের ইচ্ছা হইল, সে ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়; ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলে, "ওগো, আমার কেউ নাই, সংসারে আমার কেউ নাই।"

বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া গোপীনাথ ঘরের চাবী খুলিল, এবং জামা-কাপড় ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। সে রাত্রে গোপীনাথ আর উঠিল না, কিছুই খাইল না।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

"সই কোথায় বেহারীদা?"

"সে দেশে চ'লে গেছে।"

"চ'লে গেছে?"

"হাঁ, চ'লে গেছে, ঘৃণার সহিত আমাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে।"

শান্তি নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

বেহারী ডাকিল, "শান্তি!"

শান্তি। কেন বেহারীদা?

বেহারী। তুমি—তোমার এখানে কোন কষ্ট হবে না।

শান্তি বিস্মিতভাবে বেহারীর মুখের দিকে চাহিল। বেহারী দৃষ্টি নত করিয়া বলিল, "আমি—তোমায় আমি খুব সুখে রাখব শান্তি।"

মৃদু হাসিয়া শান্তি বলিল, "আমার আবার সুখ-দুঃখ কি বেহারীদা?"

বেহারী। মানুষমাত্রেরই সুখ-দুঃখ আছে।

শান্তি। সে তোমাদের মত মানুষের আছে।

বেহারী। তুমিও মানুষ।

শান্তি। আমি বিধবা।

বেহারী। বিধবা হ'লেই জীবনের সব সুখসাধ ফুরিয়ে যায় না।

শান্তি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বেহারীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কি বলছ বেহারীদা? বিধবার আবার সুখসাধ কি? বিধবার মরণই পরম সুখ।"

বেহারী। মরণ—সে তো আছেই। কিন্তু যত দিন বাঁচা যায়, তত দিন জীবনের সুখভোগে বঞ্চিত থাকা কেন? জীবন অমূল্য।

শান্তি। জীবন তোমার কাছে অমূল্য হ'তে পারে, আমার কাছে তার এক কড়াও মূল্য নাই।

বেহারী নীরবে নতমস্তকে বসিয়া রহিল। শান্তি স্থির-গম্ভীর-কণ্ঠে ডাকিল, "বেহারীদা!"

বেহারী মাথা তুলিয়া চাহিল। শান্তি বলিল, "আমি অনেক বিশ্বাস নিয়ে তোমার কাছে এসেছি বেহারীদা।"

বেহারী বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "এসে ভালই করেছ। এখানে তোমার কোন ভয় বা ভাবনা নাই।"

সহাস্যে শান্তি বলিল, "ভায়ের কাছে ভগ্নীর ভয় কি? তোমার দ্বিতীয়া স্ত্রী কোথায়?"

বেহারী। হাসি? সে আমার বাড়ীতেই আছে।

শান্তি। এটা তবে কার বাড়ী?

বেহারী। এটা—এটা সারদার পিসীর বাড়ী? আমি ভাড়া নিয়েছি।

শান্তি। কেন, তোমার বাড়ীতে কি জায়গা নাই?"

বেহারী। জায়গা আছে। কিন্তু সেখানে তোমার অনেক অসুবিধা হ'তে পারে।

শান্তি। কোন অসুবিধাই হবে না; আমায় সেইখানেই নিয়ে চল।

বেহারী দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "হাসিকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়ে যাব।"

শান্তি। জিজ্ঞাসা? জিজ্ঞাসা কেন?

বেহারী। সে যদি আপত্তি করে?

শান্তি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি সইয়ের মুখে শুনেছি, সে তেমন নয়। সে নিশ্চয়ই আমায় থাকৃতে দেবে।"

ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বোধ হয় না।"

উৎকণ্ঠার সহিত শান্তি বলিল, "কেন?"

"সে অনেক কথা। তুমি—যাক্, এখানে তোমার কোন ভয় নাই, কোন কষ্ট হবে না।"

বেহারী চলিয়া গেল। শান্তি দাঁড়াইয়া ভাবিল, "আমায় থাকৃতে দেবে না? কেন? আমি কি? কি করেছি আমি?" গাঢ় অন্ধকারমধ্যে তীব্র বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় সহসা এমন একটা কথা শান্তির মনে আসিল যে, শান্তি তাহার তীব্রতা সহ্য করিতে পারিল না, সে কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল; তাহার রুদ্ধ কম্পিতকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "ভগবান্!"

বেহারীর যেন একটু চৈতন্য হইয়াছিল। এ চৈতন্যের কারণ অর্থাভাব। বেহারী দালালী করিয়া এত টাকা সঞ্চয় করিতে পারে নাই, যাহাতে বহুদিন বিলাস-স্রোতে ভাসিতে পারে। তাহার সঞ্চিত অর্থ অল্পদিনেই নিঃশেষ হইয়া আসিল। কাজকর্ম্মে মন না থাকায় নূতন সঞ্চয়ও হইতেছিল না, সুতরাং হাত খালি হইতে বেশী বিলম্ব হইল না। হাত খালি হইলে বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট ধার আরম্ভ হইল। কিন্তু কলিকাতায় বেহারীর বাড়ী-ঘর বা এমন কোন সম্পত্তি ছিল না, যাহাতে বেশী টাকা ধার পাওয়া যায়। বন্ধু-বান্ধবেরা পাঁচ সাত শত টাকা দিয়াই হাত গুটাইল। এ দিকে হরিমতীর তাগাদাও ক্রমে কড়া হইতে লাগিল।

নিরুপায় হইয়া বেহারী হাসির গহনায় হাত দিল। হাসি দুই একখানা বিনা প্রতিবাদে দিল, কিন্তু বাড়াবাড়ি দেখিয়া এক দিন প্রতিবাদ করিল। আপনার গহনা বেচিয়া স্বামীর বেশ্যালয়ের খরচ যোগাইতে কোন্ স্ত্রীলোক পারে? রাগিয়া বেহারী হাসিকে কতকগুলা কড়া কথা শুনাইল। হাসিও সে দিন—যাহা কখনও করে নাই, তাহাই করিল। স্বামীর মুখে মুখে জবাব করিল। বেহারী রাগে নেশার ঝোঁকে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া হাসিকে প্রহার করিল। রোগে জীর্ণা হাসি প্রহৃতা হইয়া শয্যা লইল। নেশার ঘোর কাটিয়া গেলে হাসির অবস্থা দেখিয়া বেহারী শঙ্কিত হইল।

এ দিকে দুই একখানা হ্যাণ্ডনোটের নালিশ রুজু হইল। বেহারী প্রমাদ গণিল। হাসি বিছানায় পড়িয়া সব শুনিল, শুনিয়া গহনার বাক্সের চাবি বেহারীকে ফেলিয়া দিল। স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করিয়া বেহারী কথঞ্চিৎ ঋণ-মুক্ত হইল।

অতঃপর বেহারী স্থির করিল, সে আপনার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিবে, কাজে মন দিয়া চরিত্রের দুর্ব্বলতা সংশোধন করিয়া লইবে।

বেহারী আবার কাজে মন দিল, কিন্তু পূর্ব্বের মত আর হইল না। তথাপি যাহা উপার্জ্জন হইতে লাগিল, হিসাব করিয়া চলিলে তাহাতে তাহার সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু অভ্যাস সহজে ছাড়া যায় না। যে দিন কিছু বেশী উপার্জ্জন হইত, সে দিন আর সংকল্প স্থির রাখিতে পারিত না; হরিমতীর ঘরে গিয়া পকেট খালি করিয়া টলিতে টলিতে বাড়ী ফিরিত। হাসি আপনার রোগজীর্ণ দেহ কোনরূপে খাড়া করিয়া স্বামীর পরিচর্য্যা করিত। তাহার সেই ঐকান্তিক সেবা, অসীম স্নেহ, একাগ্র ভালবাসা দেখিয়া বেহারী সময়ে সময়ে হাসির সম্মুখেই কাঁদিয়া ফেলিত। হাসি নানা কথায় স্বামীকে সান্ত্বনা দিত, কিন্তু তাহাতে বেহারীর হৃদয়ে অশান্তির জ্বালা আরও বাড়িয়া উঠিত।

বেহারীর মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন এক-দিন গোপীনাথ আসিয়া তাহাকে শান্তির সংবাদ দিল, এবং শান্তি যে এখানে তাহারই আশ্রয়প্রার্থিনী, ইহা জানাইল। বেহারী শান্তিকে ছেলেবেলা হইতে জানিত, তবে সম্প্রতি চারি পাঁচ বৎসর দেখে নাই। গোপীনাথের মুখে তাহার দুঃখকাহিনী শুনিয়া বেহারী তাহাকে স্বগৃহে আনিতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু গোপী-নাথ চলিয়া গেলে সারদাচরণ তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, কেবল ঐ ছোঁড়াটার কথায় বিশ্বাস করিয়া শান্তিকে একেবারে ঘরে স্থান দেওয়া উচিত নয়। বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় রাখা যাইবে?"

সারদা পরামর্শ দিল, "তাহার পিসীর ভাড়াটে বাড়ীটা খালি আছে, আপাততঃ সেইখানেই রাখা হউক। তার পর তাহার চরিত্র যদি প্রকৃতই নির্দ্দোষ হয়, তখন তাহাকে ঘরে আনিলেই চলিবে। নতুবা শেষে একটা দুর্নাম রটিতে পারে।"

বেহারী সারদাচরণের যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাতেই স্বীকৃত হইল।

শান্তিকে আনিয়া পৃথক্ বাটীতে তোলা হইল।

বেহারী শান্তিকে যখন দেখিয়াছিল, তখন সে বালিকা। তাহার পর চারি পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই দীর্ঘকাল পরে তাহাকে দেখিয়া বেহারী স্তম্ভিত ও বিমুগ্ধ হইল। তাহার সেই পরিস্ফুট যৌবন, অনাঘ্রাত কুসুমবৎ সৌন্দর্য্য, শত কষ্টেও বিধ-বার অপরিম্লান লাবণ্য দেখিয়া বেহারী আত্মহারা হইল, তাহার হৃদয়ে নির্ব্বাপিতপ্রায় কামনার অনল আবার তীব্রবেগে জ্বলিয়া উঠিল। সারদাচরণ ইহা দেখিল, বুঝিল, বুঝিয়া মনে মনে হাসিল।

শান্তিকে সুখে রাখিবার জন্য বেহারী প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, এক জন দাসী নিযুক্ত করিয়া দিল, অশন বসনের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিল। কিন্তু শান্তি তো এ সকল চায় না। সে চায় শুধু একটু নির্ভয় আশ্রয়। কিন্তু শান্তি শীঘ্রই বুঝিতে পারিল, সে যাহা চায়, এখানে তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার চিরপরিচিত বেহারীদাকেও বিশ্বাস করা যায় না; সে যাহাকে স্নিগ্ধচন্দনতরুভ্রমে আশ্রয় করিতে আসিয়াছে, সে জ্বালাময় বিষবৃক্ষ মাত্র। হায় কুটিল সংসার!

সংসারের কুটিল আবর্ত্তে পড়িয়া শান্তি শুধু একা ভুল করে নাই, বেহারীও ভুল করিল; শান্তির কথা শুনিয়া, তাহার হৃদয়ের দৃঢ়তর পরিচয় পাইয়াও বেহারী আশা ত্যাগ করিল না। সে ভাবিল, "আমার অর্থ গিয়াছে, সম্মান গিয়াছে, চরিত্র গিয়াছে, রাণী গিয়াছে, হাসিও যায় যায়! হৃদয়ের সুখ-শান্তি সবই চলিয়া গিয়াছে। তথাপি এ সময়ে যদি শান্তিকে পাই, তাহা হইলে আবার আমি সুখী হইব, শান্তিলাভ করিব।" বেহারী বিষের উপর আকণ্ঠ বিষপান করিয়া নীলকণ্ঠ হইবার সঙ্কল্প করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

"তুমি কি চাও শান্তি?"

"কিছুই চাই না।"

"কিছুই না?"

"না। হাঁ, চাই, একটা জিনিষ চাই।"

"কি চাও বল। তুমি যা চাও, আমি তাই দেব।"

"দিতে পার্‌বে?"

"পার্‌ব।"

শান্তি ঈষৎ হাসিল। সে হাসিতে মাধুর্য্য ছিল না, তীব্রতা ছিল; আনন্দ ছিল না, বিষাদের কারুণ্য ছিল। শান্তি বলিল, "আমি চাই, আমার বেহারী-দাকে—ঠিক বেহারীদার মত দেখ্‌তে।"

বেহারী শান্তির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শান্তি বলিল, "বুঝ্‌তে পার্‌লে না?"

বেহারী বলিল, "বুঝেছি, কিন্তু তা আর হয় না।"

শান্তি। তবে কি হয়?

বেহারী। তুমি আমার হও।

শান্তি। আমি তোমারই। তুমি আমার দাদা, আমি তোমার ছোট বোন। আমারও একটা অনুরোধ, তুমি মানুষ হও।

বেহারী। আমি তোমাকে পেলে মানুষ হব।

শান্তি। রাণীর মত স্ত্রী পেয়ে মানুষ হ'লে না, হাসিকে পেয়ে মানুষ হ'লে না, একটা বেশ্যাকে নিয়ে অধঃপতনের চরম সীমা পর্য্যন্ত দেখে মানুষ হ'লে না, শেষে একটা বিধবাকে নিয়ে মানুষ হবে?

বেহারী। আমি তোমাকে নিয়ে এ দেশ ত্যাগ কর্‌ব।

শান্তি। কোথায় যাবে?

বেহারী। কাশী।

শান্তি। তোমার সেখানে যাওয়াই উচিত। পার তো সেখানে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের পায়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর।

বেহারী। আমি তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

শান্তি। আর হাসি, রাণী, এরা কোথায় যাবে?

বেহারী। চুলোয়।

শান্তি। যে আপনার বিবাহিতা স্ত্রীকে চুলোয় দিতে পারে, সে যে দু'দিন পরে আমাকে যমালয়ে পাঠাবে না, তার ঠিক কি ?

বেহারী উঠিয়া দাঁড়াইল; সুরাবিজড়িতকণ্ঠে সকাতরে বলিল, "না শান্তি, আমি তোমাকে বুকে ক'রে রাখ্‌ব। আমি তোমায় বড় ভালবাসি শান্তি,—বড় ভালবাসি।"

বেহারী বাহুদ্বয় বিস্তৃত করিয়া শান্তিকে ধরিতে অগ্রসর হইল।

"বেহারীদা!"

সে কুলিশকঠোর তীব্রস্বরে বেহারী থমকিয়া দাঁড়াইল।

"আজ কতটা মদ খেয়েছ বেহারীদা ?"

"মদ ? হাঁ, না, খেয়েছি, বেশী নয়—খেয়েছি।"

শান্তি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বেহারীর হাত ধরিল। বেহারী বিস্মিত, স্তম্ভিত, নির্ব্বাক্‌। শান্তি হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বিস্ময়বিমূঢ় বেহারীকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল, তাহার চোখে, মাথায় জলের ছিটা দিয়া পাশে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে লাগিল। জড়িতকণ্ঠে বেহারী ডাকিল, "শান্তি!"

শান্তি বলিল, "চুপ ক'রে একটু ঘুমাও।"

অল্পক্ষণমধ্যেই বেহারী নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পরে ঘুম ভাঙ্গিলে বেহারী উঠিয়া বসিল। শান্তি তখনও পাশে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছে। বেহারী ডাকিল, "শান্তি!"

স্নিগ্ধকণ্ঠে শান্তি উত্তর করিল, "বেহারীদা!"

বেহারী। তুমি কে ?

শান্তি। তোমার ছোট বোন্‌।

বেহারী। তোমার কি ভয় নাই ?

শান্তি সহাস্যে বলিল, "ভাইকে যদি ভয় কর্‌ব, তবে অভয় পাব কোথায় ?"

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বেহারী মাথা টিপিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় থাক্‌তে চাও ?"

শান্তি। তোমার কাছে।

বেহারী। আমার কাছে থাকা হবে না।

শান্তি। কেন ?

বেহারী। নিজের উপর আমার আর বিশ্বাস নাই।

শান্তি। আমার কিন্তু সে বিশ্বাস আছে।

বেহারী। আমি কিন্তু এখানে থাক্‌ব না। তোমার আর কোথাও স্থান আছে ?

একটু ভাবিয়া শান্তি বলিল, "আছে; গুপীদার কাছে আমায় পাঠিয়ে দাও।"

বেহারী উটিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "তাই হবে। আর একটা কথা—"

শান্তি। কি ?

বেহারী। তোমার বেহারীদাকে ভুলে যেও। কেবল আজকার ঘটনাটুকু নয়, তোমার স্মৃতি হ'তে বেহারীর নামটা মুছে ফেল।

কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বেহারী নীচে নামিয়া গেল। নীচের একটা ছোট ঘরে সারদা পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়া উভয়ে বাটীর বাহির হইল। সারদা জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম বুঝলে ?"

বেহারী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "গোপীনাথের বাসা জান ?"

সারদা। কে, সেই ছোঁড়াটা ?

বেহারী। হাঁ।

সারদা। জানি।

বেহারী। কাল শান্তিকে সেখানে পৌছে দিও।

বিস্মিতভাবে সারদা বলিল, "ব্যাপার কি ?"

বেহারী বলিল, "কিছুই না। তুমি না পার, ঠিকানাটা আমায় দিও। আমিই পৌছে দিয়ে তার পর যাত্রা কর্‌ব।"

সারদা। আমিই পৌছে দিয়ে আস্‌ব। কিন্তু তুমি কোথায় যাবে ?

বেহারী। তার এখন ঠিক নাই। তবে এখানে থাক্‌ব না।

কিছু দূর গিয়া উভয়ে ভিন্নপথ ধরিল।

বাড়ীতে পৌছিয়া বেহারী ডাকিল, "হাসি!"

হাসি কাছে আসিল। বেহারী বলিল, "বাপের বাড়ী যাবে ?"

বিস্মিতা হইয়া হাসি জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

বেহারী। দরকার আছে। যাবে কি না বল।

হাসি। যাব না।

বেহারী। কোথায় থাক্‌বে ?

হাসি। কেন, এখানে।

বেহারী। এখানে কার কাছে থাক্‌বে ?

হাসি। তোমার কাছে।

বেহারী। আমি এখানে থাক্‌ব না।

বিস্মিতকণ্ঠে হাসি জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে ?"

বিরক্তির স্বরে বেহারী বলিল, "চুলোয়।"

হাসি মাথা নাড়িয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "আমিও যাব।"

তীব্র শ্লেষের স্বরে বেহারী বলিল, "তা তুমি পার। নতুবা আর আমায় এমন দুর্গতি হবে কেন?"

হাসি বিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, "কেন, আমি কি করেছি?"

পত্নীর দিকে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বেহারী বলিল, "তুমি যা করেছ, তা অতিবড় শত্রুতেও করে না। তুমি যদি স্ত্রীর মত স্ত্রী হ'তে, তা হ'লে আমার এতটা অধঃপতন হ'ত না। তুমিই আমার দুর্গতির মূল। কুক্ষণে রাণীর উপর রাগ ক'রে তোমাকে গ্রহণ করেছিলাম।"

হাসি কোন উত্তর করিতে পারিল না; সে শুধু ছল-ছল চোখে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে জানিত না, মানুষ আপনার অপরাধের দায়িত্বটা অপরের স্কন্ধে চাপাইতে পারিলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়।

হাসির সেই কাতরদৃষ্টি দেখিয়া বেহারীর প্রাণ অনেকটা নরম হইয়া আসিল। সে অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বলিল, "শোন হাসি, আমার অধঃপতন যতদূর হবার, তা হয়েছে। আজ আমি কি ভয়ানক কাজ করতে গিয়াছিলাম, তা বল্‌বার নয়। তুমি রাণীর সই শান্তিকে জান? বোধ হয় জান না। থাক্, সে কথা জেনেও কাজ নাই। আমি সঙ্কল্প করেছি, এ দেশে থাক্‌ব না। থাকলে কিছুতেই আমি চরিত্র সংশোধন করতে পারব না। আমি যত শীঘ্র পারি, এ দেশ ত্যাগ করব।"

হাসি ভয়ে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্। বেহারী বলিল, "রাগ ক'র না হাসি, আমার মাথার ঠিক নাই। যদি তোমাকে কিছু রূঢ় কথা ব'লে থাকি—"

হাসির চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি তাহা আঁচলে মুছিয়া ব্যথিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে?"

বেহারী। তার কিছু ঠিক নাই।

হাসি। কবে ফির্‌বে?

বেহারী। তাও ঠিক নাই। যদি চরিত্রের দুর্ব্বলতা সংশোধন করতে পারি, আবার মানুষ হ'তে পারি, তবেই ফির্‌ব, নচেৎ নয়।

হাসি আর একটু অগ্রসর হইয়া স্বামীর হাতখানা ধরিল, ভীতি-কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "না গো, তুমি যেও না।"

বেহারী বলিল, "না গেলে আমি চরিত্র-সংশোধন করতে পার্‌ব না।"

বাষ্পসজল-কণ্ঠে হাসি বলিল, "না পার নাই পার্‌বে, তুমি যেও না।"

হাতখানা টানিয়া লইয়া বেহারী ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "সাধে কি বলি, তুমিই আমার অধঃপতনের মূল!"

হাসি সেইখানে বসিয়া পড়িল; স্বামীর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তা তুমি বল, আমাকে যা ইচ্ছা তাই বল, কিন্তু তুমি যেও না।"

রোষে দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বেহারী বলিল, "নির্ব্বোধ!" হাসির বাহুবেষ্টন হইতে পা ছাড়াইয়া লইয়া বেহারী সশব্দ-পদক্ষেপে বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল। সম্মুখে প্রদীপটা মিট-মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। হাসি গালে হাত দিয়া সেই নির্ব্বাপিতপ্রায় দীপশিখার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় বেহারী যখন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন সারদাচরণ আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "শান্তিকে পাঠিয়ে দিয়েছ?"

সারদা বলিল, "না, পাঠান হয় নাই।"

বিরক্ত ভাবে বেহারী বলিল, "কেন?"

সারদা। পাঠাবার দরকার নাই।

বেহারী। দরকার নাই?

ঈষৎ হাসিয়া সারদা বলিল, "হাঁ; আমি বিধবা-বিবাহে রাজী।"

ভ্রূকুটী করিয়া বেহারী বলিল, "তুমি নরকে যেতেও রাজী হ'তে পার। কিন্তু শান্তি—"

সারদা বলিল, "শান্তি রাজি না হ'লে আমি কি জোর ক'রে তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি?"

বেহারী বলিল, "অসম্ভব।"

সারদা বলিল, "স্ত্রী-চরিত্রে কোনটা সম্ভব, কোন্‌টা অসম্ভব, তা তোমার আমার মত লোকের বোধগম্য হওয়াই অসম্ভব বেহারীদা।"

বেহারী নীরবে কি ভাবিতে লাগিল। সারদাচরণ উৎফুল্লকণ্ঠে বলিল, "এই অসম্ভব কথাটা নিজের কানে শুনলে বিশ্বাস হবে?"

সারদার হাত চাপিয়া ধরিয়া বেহারী বলিল, "হাঁ, চল।"

সারদা একপদ অগ্রসর হইয়া সহাস্যে বলিল, "আমিও এই জন্যই এসেছিলাম বেহারী। জানি, তুমি রাত্রের ট্রেণেই চ'লে যাবে, কিন্তু তোমার সাক্ষাতেই সব কথা স্থির করা দরকার, এর পর আমায় কোন দোষ পেতে না হয়। শান্তিরও ইচ্ছা—"

তীব্র দৃষ্টিতে সারদার মুখের দিকে চাহিয়া বেহারী বলিল, "কি ইচ্ছা?"

সারদা বলিল, "তার ইচ্ছা যে, তার অন্ত

অভিভাবক এখানে কেহ নাই, তুমিই তাকে শাস্ত্রমতে সম্প্রদান কর।"

"জাহান্নমে যাও" বলিয়া বেহারী সরোষে সারদার হাতখানা ছুঁড়িয়া দিল। সারদা বলিল, "যাবে না ?"

"না" বলিয়া বেহারী একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। সারদা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "কিন্তু গেলে ভাল হ'ত বেহারীদা !"

ক্রোধরুদ্ধ-কণ্ঠে বেহারী বলিল, "তুমি দূর হও।"

সারদাচরণ ম্লানমুখে বাহির হইয়া গেল। বেহারী যদি তাহার অনুসরণ করিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, বাহিরে যাইতেই সারদার মুখে কিরূপ সফলতার হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে বিজয়ীর ন্যায় কিরূপ সগর্ব্বপদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে।

কিন্তু বেহারীর তাহা দেখিবার প্রবৃত্তি আদৌ ছিল না। সে গত রাত্রিতে শান্তিকে দেবীপদে স্থাপন করিয়াছে, তাহাকে কামুকীর আকারে দেখিতে, তাহার নিজমুখে এই পাশববিবাহে সম্মতিজ্ঞাপন করিতে একটুও আগ্রহ হইল না। বরং সারদাচরণের কথা শুনিয়া সে শান্তির উপর, স্ত্রীজাতির উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল। তাহার তখন ইচ্ছা হইতেছিল, যদি সে কোন উপায়ে এই জঘন্য জাতিটাকে সংসার হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে জগতের একটা মহান্ মঙ্গল সাধিত হয়।

বেহারীর যদি তখন কিছুমাত্র বিচারশক্তি থাকিত, তাহা হইলে সারদাচরণের এই কপট ঘৃণ্য উক্তি শান্তির —সেই কল্যকার মহিমময়ী রমণীর চরিত্রে সম্ভব কি না, বুঝিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু নানা কারণে তাহার সে শক্তি তখন একটুও ছিল না, সুতরাং সে সারদাচরণের উক্তিকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল।

বেহারী কিছুক্ষণ দুই হাতের উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া রহিল। তার পর উঠিয়া টেবিলের উপর আলোকটাকে একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, একখানা চিঠির কাগজ লইয়া পত্র লিখিতে বসিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

সারদাচরণ বলিল, "তুমি বিবাহ কর, শান্তি।"

শান্তি বলিল, "আমি বিধবা।"

সারদা। বিধবারও বিয়ে হয়।

শান্তি। হাড়ী-বাগ্দীর ঘরে হয়, বামুন-কায়েতের ঘরে হয় না।

সারদা। বামুন-কায়েতের ঘরেও হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত আছে।

শান্তি। সে মত মাথায় থাক্।

সারদা। শাস্ত্রেও বিধবার বিবাহের বিধান আছে।

শান্তি। আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, শাস্ত্রের কি বুঝি?

সারদা। তোমাকে বুঝিয়ে দেব।

শান্তি। আমি কিন্তু বুঝতে চাই না।

সারদা। বোঝা উচিত। তোমার এই বয়স, এত রূপ।

শান্তি। ম'লে পর এ সকলই পুড়ে ছাই হবে।

সারদা। কিন্তু বেঁচে থেকে এ সব ছাই করা উচিত নয়। বিধাতার দান, এরূপে হেলায় নষ্ট করা মহাপাপ।

শান্তি। আর বিধবার বিবাহই বুঝি মহা পুণ্য ?

সারদা। যাতে দুঃখ, তাই পাপ ; যাতে সুখ, তাহাই পুণ্য ! বিবাহ করলে বিধবা পুনরায় সুখী হ'তে পারে।

শান্তি। আপনার মতে বিবাহেই সুখ ?

সারদা। নিশ্চয়।

শান্তি। তা হ'লে আমার সই কেন এত দুঃখী, বলতে পারেন ?

সারদা। সে তার কর্ম্মফল।

ঈষৎ হাসিয়া শান্তি বলিল, "আর বিধবারা বুঝি কর্ম্মফলের অধীন নয় ?"

আপনার উত্তরে আপনি পরাজিত হইয়া সারদাচরণ লজ্জা ঢাকিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "এ সব বড় বড় দার্শনিক কথা, সহজে বুঝা যায় না। যদি বুঝতে চাও, আর এক দিন বুঝিয়ে দিতে পারি।"

শান্তি বলিল, "তার চেয়ে যদি আমাকে গুপী-দার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন তো আরও ভাল হয়।"

সারদা বলিল, "কে, গোপীনাথ? সে ছোঁড়া পালিয়েছে।"

বিস্ময়ের সহিত শান্তি বলিল, "পালিয়েছে ?"

সারদা। হাঁ, ওয়ারেণ্টের ভয়ে পালিয়েছে।

শান্তি। ওয়ারেণ্ট ! কিসের ওয়ারেণ্ট ?

সারদা। তোমার বাপ তার নামে ওয়ারেণ্ট বা'র করেছে।

শান্তি। তার অপরাধ ?

সারদা। সে তোমার বাপের দুই তিনশত টাকার গহনার সঙ্গে তোমাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে।

শান্তি রাগিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা, আমিই তার সঙ্গে এসেছি।"

ঈষৎ হাসিয়া সারদা বলিল, "কিন্তু লোকে তা বলে না।"

শান্তি বলিল, "লোকে কি বলে ?"

সারদা। বলে, সেই তোমায় কুলত্যাগিনী করেছে।

কুলত্যাগিনী! শান্তির বুকটা কাঁপিয়া উঠিল; সে নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সারদাচরণ মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, ওষুধ ধরেছে।

একটু ভাবিয়া শান্তি বলিল, "আমাকে বেহারীদার বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও।"

সারদা বলিল, "বেহারীদা কাল রাত্রের ট্রেণে পশ্চিমে চ'লে গেছে।"

শান্তি। বাড়ীতে তাঁর স্ত্রী আছে।

সারদা। স্ত্রী তার বাপের বাড়ীতে।

শান্তি দেখিল, তাহার সকল আশ্রমই ভাঙ্গিয়াছে, এখন পথে দাঁড়ান ছাড়া আর উপায় নাই। হায়, কেন সে গোপীনাথকে অবিশ্বাস করিয়াছিল, কেন তাহার স্নেহভরা হৃদয়ে উপেক্ষার নিদারুণ আঘাত করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল! সেই নির্দ্দোষ যুবকের স্নেহের অভিশাপ যে এত শীঘ্র ফলিবে, তাহা কে জানিত!

সারদা বলিল, "কি ভাবছ?"

শান্তি। ভাবছি, আর কোন উপায় আছে কি না?

সারদা। বিবাহ করা ছাড়া তোমার আর কোন উপায়ই নাই।

শান্তি। একটা উপায় আছে।

সারদা বলিল, "কি?"

শান্তি বলিল, "মরণ।"

চমকিত হইয়া সারদা বলিল, "আত্মহত্যা করবে?"

ঈষৎ হাসিয়া শান্তি বলিল, "অগত্যা তাই করতে হবে। আর আমার যে সে সাহস আছে, তাও বোধ হয় শুনেছ।"

একটু ভাবিয়া সারদা বলিল, "সাহস থাকলেও কিন্তু পার্‌বে না।"

শান্তি। কেন পার্‌ব না?

সারদা। এটা তোমাদের নির্জ্জন পল্লীগ্রাম নয়—কল্‌কাতা সহর। এখানে চারিদিকে পাহারা, জলে স্থলে পাহারা। গঙ্গায় ডুবে মর্‌তে যাও, জল-পুলিশে তোমায় বাধা দেবে।

শান্তি। জলে ডোবা ছাড়া কি মর্‌বার আর পথ নাই?

সারদা। আছে। আফিম খাও, বিষ খাও, বড় বড় ডাক্তারেরা পেটের ভিতর থেকে বিষ টেনে বা'র করবে। তার পর তোমাকে পুলিসের হাতে দেবে। আত্মহত্যার চেষ্টার অপরাধে তোমাকে জেলে যেতে হবে।

শান্তি মুহূর্ত্তের জন্য শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "তুমি আমায় ছেলে-মানুষের মত বুঝিয়ে দিলে। যে মর্‌তে চায়, তাকে কে কতক্ষণ ধ'রে রাখ্‌বে?"

উত্তেজিত-কণ্ঠে সারদা বলিল, "আমি ধ'রে রাখব।"

উপহাসের হাসি হাসিয়া শান্তি বলিল, "পার্‌বে? আমি যদি এই আঁচল গলায় জড়িয়ে মরি, যদি না খেয়ে মরি, যদি এই দোতলার ছাদ হ'তে লাফিয়ে পড়ি, তুমি ধ'রে রাখতে পার্‌বে?"

ভয়ে ভয়ে সারদা বলিল, "কেন মর্‌বে শান্তি? মরণটাই কি এত সুন্দর? সুখটা কি কিছুই নয়?"

শান্তি। আমার সুখ এ জন্মের মত ফুরিয়ে গিয়েছে।

সারদা। আমি তোমায় সুখী কর্‌ব।

শান্তি। তোমার মত শত শত দানবের চেষ্টাতেও আমি সুখী হ'তে পার্‌ব না। মরণেই আমার সুখ, আমি মরণ চাই!

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সারদা বলিল, "মৃত্যু-সঙ্কল্প ত্যাগ কর শান্তি। আমি তো জোর ক'রে তোমায় বিবাহ কর্‌তে চাই না। যদি তুমি কোন দিন প্রসন্ন হ'য়ে—"

বাধা দিয়া শান্তি বলিল, "কোন দিনই তা হবে না।"

কম্পিতকণ্ঠে সারদাচরণ বলিল, "নিশ্চয়ই হবে, আমার এ ভালবাসা কখনই নিষ্ফল হবে না। ভক্তের কাতর প্রার্থনায় পাষাণ-দেবতার প্রাণও একদিন গ'লে যাবে, একদিন সে নিশ্চয়ই বরদাত্রীরূপে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াবে। আমি সেই দিনের—সেই সুদিনের জন্য প্রতীক্ষা ক'রে থাকব।" শান্তি দেখিল, সারদার চক্ষে জল। ভাবিল, 'পাষণ্ডেরাও কাঁদে; কাঁদবার ভাণ ক'রেও কাঁদে।'

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

রাণী বেহারীর একখানা পত্র পাইল, বেহারী লিখিয়াছে;—"রাণি! তুমি রাগ করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছ। যদি না করিতে, তবে আজ বোধ হয়, আমাকে তোমায় ত্যাগ করিতে হইত! সেটা তোমার পক্ষে কষ্টকর হইত না কি?"

তুমি রাগ করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়াছ, আমি আজ রাগ করিয়া সংসারটাকে ত্যাগ করিলাম। রাগে কে জিতিল? তবে আমাকে এই জয়ের মূল্য খুব বেশী দিতে হইয়াছে।

তোমাকে দুইটা শুভ সংবাদ দিব। তোমার সই শান্তি আবার বিবাহ করিতেছে। পাত্র কে জান? —সারদা। এ বিবাহের উপযুক্ত পাত্র বটে। তোমার বরণ করিবার নিমন্ত্রণ।

আর একটা সংবাদ, হাসি মৃত্যু-শয্যায়। এই হতভাগীর নাম করিতে রাগও হয়, চোখে জলও আসে। আমার জীবন-নাটকটাকে বিয়োগান্ত করিবার জন্যই সে আসিয়াছিল। তাহার কাজ শেষ হইয়াছে, তুমি পার তো আসিয়া তাহার জীবন-নাট্যের যবনিকাপাত দেখিও।

আমি চলিলাম, কোথায়, তা জানি না। সাক্ষাতের আর সম্ভাবনা নাই। তুমি তোমার অভিমান লইয়া থাক, আমিও আমার সব ফেলিয়া শুধু অভিমানটুকু লইয়া যাত্রা করিলাম। পারি তো কাহারও চরণে সেই শেষ সম্বলটুকু ঢালিয়া দিয়া যাত্রার শেষ করিব। ইতি—

বেহারী।"

পত্র পড়িয়া রাণী অনেকক্ষণ সংজ্ঞাহীনের ন্যায় বসিয়া রহিল। তাহার অভিমানের পরিমাণটা যে এমন ভয়াবহ হইবে, তাহা সে কল্পনাও করে নাই, কিন্তু আজ সেই কল্পনার অতীত বিষয়টা আসিয়া তাহার হৃদয়ে এমন গুরুতর আঘাত করিল যে, সে আঘাতে রাণী আপনাকে কিছুতেই স্থির রাখিতে পারিল না। তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল; ক্রমে সে জলে চোখ ছাপাইয়া উঠিল; চোখের কোণ বহিয়া, গালের উপর দিয়া ফোঁটার পর ফোঁটা গড়াইয়া বেহারীর কঠোর পত্রখানাকে নরম করিতে লাগিল। রাণী বুঝিতে পারিল, বেহারীর কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইয়াছে, এবার তাহার অভিমানের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

তার পর হাসি—হায়! সে মুক্তহৃদয়া বালিকা হাসিতে হাসিতে আসিয়াছিল, কিন্তু এমন কাঁদিয়া গেল কেন?

শান্তি বিবাহ করিতেছে? অসম্ভব! কিন্তু বেহারী তো তাহাকে মিথ্যা লিখে নাই। তবু বিশ্বাস হয় না কেন? হায় অভাগিনী বিধবা! পরদিন রাণী দীনুর মাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিল।

কলিকাতায় গিয়া রাণী দেখিল, বেহারীর কথা যথার্থ; হাসির জীবন-নাট্যের শেষ দৃশ্যের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে, যবনিকা পড়িতে বড় দেরী নাই। আট মাসের গর্ভ, তাহার উপর জ্বর ও কাশি, দেহে কঙ্কালখানি ছাড়া আর কিছুই নাই। হাসিকে দেখিয়া রাণী কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু দিদিকে পাইয়া হাসির শীর্ণ অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

এ হাসি কিন্তু অধিকক্ষণ রহিল না, স্বামীর প্রসঙ্গ উঠিতেই দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, রাণীও না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না।

কাঁদিতে কাঁদিতে হাসি বলিল, "কি হবে দিদি?"

রাণী চোখের জল মুছিয়া, সপত্নীকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "ভয় কি হাসি, রাগ ক'রে গেছে, রাগ প'ড়ে গেলেই ফিরে আসবে।"

ভগ্ন-ব্যথিত কণ্ঠে হাসি বলিল, "কার উপর রাগ দিদি? আমি তো কিছুই বলি নাই।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাণী বলিল, "তোর উপর নয় হাসি, আমার উপর।"

হাসি কিন্তু বুঝিতে পারিল না, দিদির উপর কিসের জন্য স্বামীর রাগ হইতে পারে?

কলিকাতায় বেহারীর নিজের বাড়ী ছিল না, ভাড়াটে বাড়ী। সুতরাং রাণী সেখানে থাকা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিল না। সে হাসিকে তাহার বাপের বাড়ী পাঠাইবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু হাসি তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি দিদি, আমাকে তোমার কাছে থাকতে দাও। তোমার কোলে মাথা রেখে মরতে পারলে—"

রাণী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া সরোষে বলিল, "চুপ কর আবাগী, অমন করলে তোকে গলা টিপে মারব।"

হাসি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঘরের আসবাবপত্র, কতক বেচিয়া কতক বাঁধিয়া লইয়া ঝি-চাকরের মাহিনা শোধ করিয়া দিয়া, রাণী হাসির সঙ্গে দেশে ফিরিল। দেশে আসিবার আগে একবার শান্তির সন্ধান লইতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু তাহার কোন উপায় দেখিতে পাইল না।

রাণী দেশে ফিরিয়া হাসির চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিল। কিন্তু চিকিৎসার কোন ফল দর্শিল না, হাসির অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিল।

চিকিৎসক বলিল, "রোগ মানসিক। দৈহিক রোগের ঔষধ দিতে পারি, কিন্তু মানসিক ব্যাধির ঔষধ কোথায় পাইব?"

রাণীও যে এ কথা বুঝে নাই, তাহা নহে, কিন্তু বুঝিয়াও হাল ছাড়িয়া দিতে পারিল না, আশায় বুক বাঁধিয়া চিকিৎসা চালাইতে লাগিল। হাসি আর ঔষধ খাইতে চাহিত না, রাণী তাহাকে কখন ধমক দিয়া, কখন আদর করিয়া ঔষধ খাওয়াইত। হাসি কেবল মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিত, "সত্যই কি ফিরে আসবে না দিদি?"

রাণী তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিত, আসবে বই কি। লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার, তুই ভাবিস না, নিশ্চয় ফিরে আসবে।"

হাসি বলিত, "কিন্তু দিদি, এবার ফিরে এলে তুমি যেন আর রাগ ক'রে থেক না। আমি তার মনের মত কিছুই করতে পারি না, সেই অভিমানেই চ'লে গেছে। এবারে দিদি, তুমি তাকে সুখী কর।"

রাণী কষ্টে চোখের জল রোধ করিয়া বলিল, "আর তুই!"

শীর্ণ অধরে ম্লান হাসির রেখা ফুটাইয়া হাসি বলিত, "আমি? আমার যে ডাক পড়েছে দিদি! আমি থাকলে সে তো সুখী হবে না। আমি শুধু তোমার সুখের পথে কাঁটা নই, তার সুখের পথেও যে কাঁটা।"

রাণী ভ্রূকুটী করিয়া ধরা গলায় বলিত, "দেখ হাসি, অমন করিস্ তো আমার যে দিকে দু' চোখ যায়, চ'লে যাব।"

হাসি তার শীর্ণ বাহুলতা দ্বারা সপত্নীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিত, "ভেবো না দিদি, তোমায় ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না।" রাণী তাহাকে আপন বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিত।

নবম মাসে হাসি এক পুত্রসন্তান প্রসব করিল। রাণী সানন্দে ক্ষুদ্র শিশুটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া একটা অভূতপূর্ব সুখের আস্বাদ পাইল। কিন্তু তাহার এ সুখ সম্পূর্ণ হইল না। প্রসবের পরই হাসি সেই যে শয্যা লইল, আর উঠিল না, ছেলেকেও একবার কোলে লইল না। রাণী তাহার কোলে ছেলে দিতে গেলে সে বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিত, "আর কেন আমাকে জড়াও দিদি? তোমার ছেলে তুমি লও, আর পার তো"—শীর্ণ হাতখানি তুলিয়া কোটরগত চোখের জল মুছিয়া বলিত, "আর পার তো তাঁর কোলে দিও।"

রাণী মুখে তাহাকে ধমক দিত, কিন্তু অন্তরে অন্তরে কাঁদিয়া উঠিত।

হায় নিষ্ঠুর! এই ফুল্লকুসুমটিকে পদদলিত করিবার জন্যই কি এক দিন তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলে? এই ক্ষুদ্র বালিকাকে হত্যা করিয়া তোমার লাভ কি? রক্তলোলুপ শ্বাপদেরাই তো অকারণে হত্যা করে। অবস্থাবিশেষে শ্বাপদ ও মানুষ কি এক শ্রেণীর জীব?

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

সারদাচরণ বিধবা শান্তির পাণিগ্রহণ করিবে, এ কথাটা যে কিরূপে গ্রামে রাষ্ট্র হইল, তাহা কেহই বলিতে পারে না, অথচ ইহা লইয়া গ্রামের ভিতর একটা তুমুল আন্দোলন চলিল। অনেকে রামসদয়কে এবং তাঁহার পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করিতে লাগিল। দামিনী স্বামীকে ধরিয়া বসিল; বলিল, "যদি এর বিহিত না কর, তবে আমি গলায় দড়ী দেব।"

রামসদয় বলিলেন, "আমি এখন আর কি বিহিত করব? তুমি যদি তখন ঝগড়া-ঝাঁটি না ক'রে—"

দামিনী রাগিয়া বলিল, "আমি ঝগড়া করেছি, তাতে কি হয়েছে? ঘর করতে গেলে অমন তো হয়েই থাকে। তাই ব'লে আমি তো আর তাকে দূর ক'রে দিতে বলি নাই।"

এ কথাটাকে রামসদয় অস্বীকার করিতে পারিলেন না। কিন্তু আপনাকেই সম্পূর্ণ দোষী ভাবিলেন। বলিলেন, "তোমাদের ঝগড়ার জ্বালাতেই আমি দূর ক'রে দিতে চেয়েছিলাম।"

মুখ ঘুরাইয়া দামিনী বলিল, "খুব বাহাদুরীই করেছিলে। আমার না হয় সতীন-ঝি, আমি ঝগড়া করেছি। কিন্তু তুমি তো তার বাপ।"

কথাটা রামসদয়ের মর্ম্মে গিয়া আঘাত করিল। সত্যই তো, সে তাহার বাপ, জন্মদাতা। সে স্নেহ, মমতা সব ভুলিয়া কিরূপে কন্যার প্রতি এমন দুর্ব্যবহার করিয়াছিল? রামসদয় নিরুত্তরে নতবদনে বসিয়া রহিলেন।

দামিনী বলিল, "এখন যা হয় একটা উপায় কর। নয় তো আমি দিব্য ক'রে বলছি, আমার যে দিকে দু'চোখ যায়, চ'লে যাব। লোকের গঞ্জনা আর সহ্য হয় না। আমি ভৈরবীতে গিয়ে ঝাঁপ দেব।"

রামসদয়েরও নদীতে ঝাঁপ দিবার ইচ্ছা হইতেছিল না, এমন নয়। এক দিন তিনি এই পল্লীসমাজের পাঁচ জনের মধ্যে এক জন ছিলেন; এক দিন তাঁহার কথায় কত লোক সমাজচ্যুত হইয়াছে, কত সমাজপতিত পাপী আবার সমাজে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু আজ তাঁহার এ কি দুর্গতি! আজ আর তাঁহার সমাজে মুখ দেখাইবার উপায় নাই। বাড়ীর বাহির হইলে ছেলেরা তাঁহাকে দেখিয়া হাততালি দিতে যায়, যুবকেরা মুখ ফিরাইয়া হাসে, বৃদ্ধেরা সহানুভূতির ছলে শ্লেষের বাণ বিদ্ধ করে। শান্তির গৃহত্যাগ অবধি যজমানেরা বেশ প্রসন্ন ছিল না, এখন তাহারা

খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এবার মানমর্য্যাদার সঙ্গে অন্নবস্ত্রের সংস্থানটুকুও বুঝি লোপ পায়।

অনেক ভাবিয়া রামসদয় শেষে সারদার পিতা ‍স্তরাম ভট্টাচার্য্যের নিকট গিয়া পড়িলেন; সমস্ত পাার প্রকাশ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আমাকে রক্ষা করুন, আমার কুল-মান সব যায়।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আপনি যখন কন্যাকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তখন আর আপনার কুল-মানের ভয় কেন?"

রামসদয় বলিলেন, "আমি তাড়াই নাই, সে নিজে গিয়েছে।"

ক্রুদ্ধস্বরে ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আমি আপনা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, আমার কাছে মিথ্যা বল্‌বেন না।"

রামসদয় মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিলেন, "আমি তাড়াব বলেছিলাম বটে।"

ভট্টা। উত্তম, আপনি তাকে তাড়াতে প্রস্তুত হয়েছিলেন ব'লেই সে চ'লে গেছে। এখন তো তার একটা আশ্রয় চাই। বিবাহ করলে সে একটা আশ্রয় পেতে পারে।

বিস্ময়বিস্ফারিত-লোচনে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রামসদয় বলিলেন, "বলেন কি? তাই ব'লে বিধবা আবার বিবাহ করবে?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সহাস্যে বলিলেন, "ক্ষতি কি? মনে করুন, সে বিবাহ না ক'রে যদি এক জনের রক্ষিতারূপে থাকে, তাতে কি তার এবং আপনার গৌরব বাড়বে?"

রাম। সেটাও নিতান্ত অসঙ্গত।

ভট্টা। বেশ, উভয় পক্ষই যদি অসঙ্গত হয়, তবে সে যায় কোথায়? মানুষমাত্রেরই জীবনধারণের জন্য একটা অবলম্বনের প্রয়োজন। বিধবার, বিশেষতঃ বালবিধবার অবলম্বন স্বামিগৃহ, তদভাবে পিতৃগৃহ; এই উভয় স্থান হ'তে বিতাড়িতা হ'লে সে কোথায় দাড়াবে?

রাম। শাস্ত্রে আছে, বিধবা ব্রহ্মচর্য্য করবে।

ভট্টা। আপনারা শাস্ত্রের দোহাই না দিয়ে নিশ্বাসটি পর্য্যন্ত ফেলেন না, অথচ শাস্ত্রের আদেশ একটিও পালন করেন না, তা জানি। ভাল, বলুন দেখি, ব্রহ্মচর্য্যটা কি এমনই ছেলেখেলার জিনিস যে, একটা বারো বছরের মেয়ে সেটা হাত বাড়িয়ে ধ'রে নেবে?

রাম। না, তাহাকে ক্রমে ক্রমে শিখতে হবে।

ভট্টা। কিন্তু শেখাবে কে? তোমাদের মত প্রবৃত্তির দাস, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, বিলাস-ব্যসনে নিমজ্জিত পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়েরা তো? তোমরা ইন্দ্রিয়ের দাসানুদাস হয়ে বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য করতে আদেশ দাও, আপনারা আসক্তির অবতার হয়ে একটা বালিকাকে ত্যাগের মহামন্ত্র দেখাতে চাও, তাদের সম্মুখে লালসাতৃপ্তির বিকট আদর্শ স্থাপন ক'রে তাদের ইন্দ্রিয়জয় করতে বল। তোমরা শেখাও কি? সংসারে বিধবার দাসীবৃত্তিই ব্রহ্মচর্য্য, তোমাদের কঠোর তাড়না অম্লানবদনে সহ্য করাই ইন্দ্রিয়জয়। এ শিক্ষার, এ ব্যবস্থার পরিণাম এইরূপই হওয়া সম্ভব নয় কি?

ক্রোধে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ওষ্ঠদ্বয় স্ফুরিত হইতে লাগিল। রামসদয় ভীতভাবে বলিলেন, "আপনি রাগ করবেন না, আমরা—আমরা কি জানি?"

ভট্টা। কিছুই জান না, সে কথা সত্য; কিন্তু পদে পদে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করতেও ছাড় না। যাক্, এখন আপনার বক্তব্য কি, বলুন।

রাম। বক্তব্য যা, তা বলেছি। যাতে এ বিবাহটা না হয়—

ভট্টা। আমি চেষ্টা কব্‌ব, যাতে এ বিবাহ না হয়। কিন্তু একটা কথা, যদি বিবাহ না হয়, আপনি আপনার কন্যাকে গৃহে স্থান দিবেন?

রামসদয় ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তা সেটা কি জানেন, লোকে, পাঁচজনে তা হ'লে কি বলবে? বুঝেছেন তো।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি। তবে আমারও এই কথা, যদি আপনার কন্যার এ বিবাহে সম্মতি থাকে, তবে জানবেন, আমি ইহাতে কোন বাধাই দিতে পারব না। আর যদি সে অসম্মত হয়, তবে এ বিবাহ কিছুতেই হবে না।"

অগত্যা রামসদয় ইহাতেই সম্মত হইয়া মুখে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সাধুবাদ এবং অন্তরে অভিসম্পাত দিতে দিতে প্রস্থান করিলেন।

রামসদয় চলিয়া গেলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বসিয়া বসিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন; তার পর কনিষ্ঠ-পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "শিবচরণ, আমার কলিকাতাযাত্রার আয়োজন কর।"

শিবচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কবে যাবেন?"

ভট্টা। আজই।

শিবচরণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "তোমার কি কিছু বক্তব্য আছে?"

শিবচরণ বলিল, "আজ্ঞে, আছে।" ভট্টা। কি, বল।

শিব। শুনেছি দাদা বিধবা-বিবাহ করবেন।

ভট্টা। আমিও তাই শুনেছি।

শিব। সেই জন্যই বোধ হয়—

ভট্টা। হাঁ, সেই জন্যই আমার কলিকাতাযাত্রা।

শিব। আপনি বোধ হয়, এ বিবাহে বাধা দিবেন?

ভট্টা। বাধা দেব কি সম্মতি দেব, তা এখন ঠিক বল্‌তে পারি না। পাত্রপাত্রীর মনোভাব না বুঝলে সে কথা বলা যায় না।

শিবচরণ কিছুক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া ধীর-মৃদু-স্বরে বলিল, "বিধবাবিবাহ কি শাস্ত্রসম্মত?"

ঈষৎ হাসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক বড় বড় পণ্ডিত যথেষ্ট বাদানুবাদ ক'রে গেছেন; সে সকল কি তুমি দেখ নাই?"

শিব। দেখেছি, তবে এ সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় কি, জান্‌তে চাই।

ভট্টা। উত্তম, কি জান্‌তে চাও, বল।

শিব। বিধবা-বিবাহ যথার্থ শাস্ত্রসম্মত কি না?

ভট্টা। বেশ, আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। শাস্ত্র কাহাকে বল?

শিব। বেদ, পুরাণ, সংহিতা, এই সকল শাস্ত্র।

ভট্টা। হাঁ, এই সকলই শাস্ত্র নামে প্রচলিত। আর তোমরা এই সকল শাস্ত্রাদেশ পালন করিয়া থাক?

শিব বলিল, "হাঁ।"

ভট্টা। উত্তম, বেদে যে সকল অনুষ্ঠানের বিধি আছে, সে সকল অনুষ্ঠান কর কি?

শিব। না।

ভট্টা। পুরাণের ও সংহিতার?

শিব। পুরাণের কতক করা হয়, কতক হয় না। সংহিতারও সকল বিধান এখন প্রচলিত নাই।

ভট্টা। কেন, এখন বেদাদির সকল আদেশ পালন করা হয় না?

শিব। সে সকল অদেশ বর্ত্তমানকালোচিত নয়।

ভট্টা। যা শাস্ত্রের আদেশ, তা নিত্য পালনীয়; তার আবার কালাকালের বিচার কি?

শিব বলিল, "আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অক্ষম।"

ঈষৎ হাসিয়া ভটাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "কেবল তুমি কেন, যাঁরা কথায় কথায় শাস্ত্রের দোহাই দেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে অক্ষম। এখন শাস্ত্র কাহাকে বলে, তাহাই বুঝ। প্রাচীন ঋষিপ্রোক্ত অনুস্বার-বিসর্গযুক্ত সংস্কৃত বাক্যমাত্রই যে শাস্ত্র, তা নয়। সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণ সমাজের হিতাহিত বিবেচনা ক'রে যে সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন, তাহাই শাস্ত্র। শাস্ত্র শব্দের অর্থ যে শাসনবাক্য, ইহা ধাত্বর্থ দ্বারাও বুঝা যায়।

শিব। আজ্ঞা!

ভট্টা। তবেই দেখ, সমাজতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ সমাজের অনুকূল ব্যবস্থার নামই শাস্ত্র। আর এই শাস্ত্র কখন চিরদিন একভাবে থাকতে পারে না। কারণ, মানুষের সামাজিক অবস্থা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। ইহা কখনও উন্নত, কখনও অবনত হইতেছে। সেই অতি প্রাচীন বৈদিকযুগে মনুষ্য-সমাজের অবস্থা যেরূপ ছিল, পৌরাণিক যুগে সেরূপ ছিল না; আবার পৌরাণিক যুগে যে অবস্থা ছিল, এখন তা নাই। কাজেই সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রেরও পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে এবং সেরূপ করাই উচিত। এখন বুঝেছ যে, শাস্ত্র শব্দের অর্থ বেদ, স্মৃতি বা পুরাণ নয়, যাহা সমাজের অনুকূল ব্যবস্থা, তাহাই শাস্ত্র।

শিব। আজ্ঞে হাঁ।

ভট্টা। তোমার প্রশ্ন—বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কি না? প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে আগে দেখতে হবে, বিধবা-বিবাহ আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার অনুকূল কি না? এ সম্বন্ধে দুইটা মত আছে, কেহ বলেন অনুকূল, কেহ বা বলেন প্রতিকূল। বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু বিধবা-বিবাহকে সমাজের অনুকূল জ্ঞান ক'রেই বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। অনেকে বলেন, তিনি কেবল বিধবাদের প্রতি করুণার বশবর্ত্তী হয়েই এ কাজ ক'রেছিলেন। আমি কিন্তু ঠিক তা বলি না। বিধবাদের দুঃখ দেখেও তাঁর হৃদয় যেমন বিগলিত হয়েছিল, তেমনি সমাজের দুর্দ্দশা দেখেও তাঁর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন, বালবৈধব্যের ফলে আমাদের সমাজে কত অত্যাচার, ব্যভিচার প্রবেশ করেছে, সমাজের বুকের উপর নিত্য কত পৈশাচিক পাপের অনুষ্ঠান চল্‌ছে, কত ভ্রূণহত্যা, শিশুহত্যা, নারীহত্যা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এই সকল পাপের ফলে সমাজ দিন দিন কিরূপ অবনতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। তাই তিনি সমাজের মঙ্গলাভিপ্রায়েই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা ক'রেছিলেন।

শিবচরণ সবিস্ময়ে পিতার তেজোদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "অপরের কথা যাক্, এখন যে জন্য বর্ত্তমান আন্দোলন, সেই কথাটাই ধর। রামসদয়ের মেয়ে শান্তি বাল-বিধবা; স্বামিগৃহে তার স্থান নাই, পিতৃগৃহ হ'তেও সে বিতাড়িতা। এ অবস্থায় তার বিবাহ সমাজের অনুকূল অথবা প্রতিকূল? যদি সে পুনরায় বিবাহিতা

হয়, স্বামিপুত্র লয়ে সৎপথে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারে, অন্যথায় জীবনধারণের জন্য বা প্রলোভনের বশে অথবা দুষ্ট লোকের নিগ্রহে ব্যভিচারিণী হয়ে সে সমাজের কণ্টকস্বরূপ হবে না কি?

শিবচরণ বলিল, "তা হ'লে আপনি এ বিবাহে নিশ্চয় সম্মতি দিবেন?"

ভট্টা। যদি দেখি, বিবাহে শান্তির সম্মতি আছে, তবে নিশ্চয় আমি সম্মতি দেব, নতুবা নয়।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথাসময়ে কলিকাতা যাত্রা করিলেন, কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া সারদাচরণকে পাইলেন না, শুনিলেন, সে পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছে। তিনি ভগ্নীকে সারদার বিধবা-বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগ্নী সে কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং কথাটা যে সম্পূর্ণ অমূলক জনরব মাত্র, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সন্দেহ সম্পূর্ণ দুরীভূত হইল না। সারদার পশ্চিমযাত্রার সহিত জনরবের যে কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন; বুঝিয়া ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শান্তি চলিয়া গেলে প্রথমটা গোপীনাথের খুব কষ্ট হইল। তার পর কষ্টটা ক্রমে ক্রোধে পরিণত হইল। দ্বিতীয় দিনে সে ভাবিল, "দূর হউক শান্তি। সে আমার কে? কেহই না। ডুবিয়া মরিতেছিল, আশ্রয় দিয়াছিলাম, সুখে রাখিয়াছিলাম। কিন্তু সে এমনই অকৃতজ্ঞ যে, সে কথাগুলি একবারও ভাবিল না; শেষে আমাকেই অবিশ্বাস করিয়া চলিয়া গেল। আর আমি—আমি তাহাকেই ভাবিয়া অস্থির হইয়াছি, সংসার শূন্য দেখিয়াছি। শান্তি কি? কিছুই না, একটা তুচ্ছ রমণী মাত্র। তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই নাই; তার কথা কিছুতেই ভাবিব না।

গোপীনাথের ইচ্ছা হইল, সে শান্তির স্মৃতিটাকে বুকের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলে। শান্তি চলিয়া যাওয়ায় তাহার যে একটুও কষ্ট হয় নাই, ইহাই আপনার মনের নিকট প্রতিপন্ন করিবার জন্য সে দিন সে বাজার হইতে ভাল ভাল মাছ, তরকারী কিনিয়া আনিল, এবং প্রবল উৎসাহের সহিত রন্ধনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন শান্তি তাহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর গোপীনাথ তাহাকে আপনার এই গভীর উপেক্ষা দেখাইয়া বলিতেছেন, "এই দেখ শান্তি, তোমার জন্য আমার একটুও কষ্ট নাই, তুমি চলিয়া গেলেও আমি কেমন আমোদ-প্রমোদ করিতেছি।"

কিন্তু রন্ধন শেষ করিয়া খাইতে বসিলেই তাহার সকল উৎসাহ যেন কোথায় চলিয়া গেল। শান্তির রন্ধনের মধুর আস্বাদ মনে পড়িল, খাওয়াইবার জন্য তাহার আদর, আগ্রহ, অনুরোধ সব মনে পড়িতে লাগিল। গোপীনাথের আর খাওয়া হইল না, সে দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন সব রাস্তায় ঢালিয়া দিয়া আসিল।

চতুর্থ দিনে ভাবিল, "শান্তির দোষ কি? আমি তাহার কে যে, সে আমার নিকট থাকিবে? আমি তাহার একটু উপকার করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি তো সেটা সাধিয়াই করিয়াছি, সে তো আমার কাছে কোন উপকার চায় নাই? আর আমি এমনই বা কি উপকার করিয়াছি? শান্তি কেন, অন্য যে কেহ হইলেও তো এই উপকারটুকু করা যাইত। ছি ছি, এই সামান্য উপকারটুকু করিয়া আমি শান্তির নিকট তাহার প্রতিদানের আশা করিতেছি, তাহার উপর রাগ করিতেছি! আমি কি নির্ব্বোধ।"

আর দুই তিন দিন পরে ভাবিল, "শান্তি কেমন আছে, একবার দেখিয়া আসি। কিন্তু কি বলিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব? যে আমাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আমাকে একটুও বিশ্বাস করিতে পারে নাই, তাহারই সম্মুখে গিয়া বলিতে হইবে, মুখে না বলিলেও ইহাই বুঝাইবে, 'শান্তি, তুমি আমাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছ, কিন্তু আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি, না দেখিয়া থাকিতে পারিলাম না, তাই আসিয়াছি।' ছি ছি, কি লজ্জা, কি অপমান! সে যদি জিজ্ঞাসা করে, কেন আসিয়াছি? যদি দেখা করিতে না চায়? না, সে অপমান, সে উপেক্ষা মাথা পাতিয়া লইতে পারিব না।"

গোপীনাথ কিন্তু এ সঙ্কল্প স্থির রাখিতে পারিল না। দুই দিন পরেই ভাবিল, "তাহাকে এরূপে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। তাহার কি হইল, সে সুখে আছে কি কষ্ট পাইতেছে, একবার জানিয়া আসা কর্ত্তব্য। তাহার সহিত দেখা করিব না, বাহির হইতে শুধু তাহার সংবাদ জানিয়া আসিব। আমি যে তাহার সংবাদ লইতে গিয়াছিলাম, এইটুকুও তাহাকে জানিতে দিব না।"

সে দিন আফিস হইতে সকাল সকাল ছুটী লইয়া গোপীনাথ বেহারীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু সেখানে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে বিস্মিত

স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। দেখিল, বেহারীর বাড়ীর দরজা তালাবদ্ধ; দরজার গায়ে কাগজে লেখা আছে, 'ভাড়া দেওয়া যাইবে'। গোপীনাথ কিছুক্ষণ বাড়ীর আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইল, পাশের বাড়ীর লোকদের জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু কোন সংবাদ পাইল না। অগত্যা সে ক্ষুণ্ণ-মনে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

কিছু দূর আসিতে সহসা সে সারদাচারণকে দেখিতে পাইল। সে পূর্ব্বে সারদাকে বেহারীর নিকট দেখিয়াছিল, এবং তাহার নামও জানিয়াছিল। সুতরাং তাহাকে দেখিয়া গোপীনাথ থমকিয়া দাঁড়াইল; তখন সারদাও তাহাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তখন গোপীনাথ তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, বেহারীবাবু কোথায় গেছেন, বলতে পাবেন?"

সারদা বলিল, "পারি, তিনি পশ্চিমে গেছেন।"

গোপী। সপরিবারে?

সারদা। না, একা।

গোপী। তাঁর পরিবার সব কোথায়?

সারদা। পরিবারমধ্যে তাঁর স্ত্রী; সে তার দেশে চ'লে গেছে।

গোপীনাথ রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল "শান্তি?"

সারদা বলিল, "শান্তি আমার বাড়ীতে আছে।"

গোপী। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

সারদা। তুমি কে?

গোপী। আমি গোপীনাথ।

সারদা। তা জানি, কিন্তু শান্তির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?

গোপীনাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "সম্পর্ক? এমন বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই।"

সারদাচরণ গম্ভীরস্বরে বলিল, "নিঃসম্পর্কীয়ের সঙ্গে এক জন কুলবধূর সাক্ষাৎ হ'তে পারে না।"

গোপীনাথ বিস্মিত দৃষ্টিতে সারদাচরণের মুখের দিকে চাহিল। সারদা বলিল, "তুমি কি শুন নাই?"

গোপী। না, কি?

সারদা। শান্তি—না—থাক্।

গোপীনাথ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া উগ্রস্বরে বলিল, "বল, শান্তির কি হয়েছে?"

সারদা বলিল, "হয় নাই কিছু, তবে শান্তির সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছে।"

গোপীনাথ তাহার হাতটা ছাড়িয়া দিয়া ক্রোধরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "মিথ্যা কথা!"

সারদা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কোন্‌টা মিথ্যা?"

গোপী। বিবাহ।

সারদা। যদি সত্য হয়?

গোপী। তা হ'লে তুমি জোর ক'রে এ কাজ করেছ।

সারদা। আর শান্তি যদি স্বেচ্ছায় ক'রে থাকে?

উত্তেজিত-কণ্ঠে গোপীনাথ বলিল, "অসম্ভব।"

সারদাচরণ তাহার হাত ধরিল, মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমি শান্তির সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলে. চল, দেখা করবে। দেখা ক'রে তার নিজের মুখেই সত্য মিথ্যা সব শুনতে পাবে; আর দেখবে, বিবাহ ক'রে সে এখন কেমন সুখে আছে।"

"চুলোয় যাক্ তার সুখ" বলিয়া গোপীনাথ সজোরে আপনার হাত ছিনাইয়া লইল। সারদা হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেখছি, তুমি তাকে ভালবাস।"

উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া গোপীনাথ বলিল, "একটুও না।"

গোপীনাথ ছুটিয়া চলিয়া গেল। সারদা আপন মনে হাসিয়া বলিল, "যাক্, এ ছোড়ার হাত হ'তে বাঁচা গেল। কিন্তু ভালবাসার রাগকে বিশ্বাস নাই। একটা নূতন পথ দেখতে হবে।"

সারদা ধীরে ধীরে তাহার পিসীমার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া ডাকিল, "পিসীমা!"

পিসীমা বলিলেন, "কেন রে সারু?"

সারদা। তা হ'লে তোমাদের এখন বেড়াতে যাওয়া হবে না?"

পিসী। কি ক'রে আর হবে? উনি যে ছুটী পাবেন না।

সারদা। বেশ, তা হ'লে আমিই দিন কতক ঘুরে আসি।

পিসী। তুই একা যাবি?

সারদা। ক্ষতি কি? আমি তো আর কচি খোকাটি নই।

পিসীমা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "না, তুই একেবারে মস্ত জোয়ান হয়ে পড়েছিস্।"

সারদাও হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা পিসীমা, তোমার কাছে কচি খোকাটি হ'লেও বাইরে আমি সত্যিই একটা জোয়ান পুরুষ হয়ে পড়েছি।"

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন, "ছেলের কথা শোন। হাঁ রে সারু, আর সকলের বেলা তো তুই খুব বড় হয়ে পড়িস্, কিন্তু বিয়ের কথা বল্‌লেই খোকাটির মত কথা কস্ কেন বল্ দেখি?"

সারদা মুখ নামাইয়া একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিল, "কি জান পিসীমা, ও একটা ঝঞ্ঝাট। তা আমি দিনকতক ঘুরে আসি। এসে তোমার কথার একটা উত্তর দেওয়া যাবে।"

উৎসাহিত হইয়া পিসীমা বলিলেন, "উত্তর-টুত্তর বুঝি না, ফিরে এসে বিয়ে করতেই হবে। আমি মেয়ে ঠিক ক'রে রাখব।"

সহাস্যে সারদা বলিল, "এখন ফিরে আসতেই দাও।"

পিসী। তা নয় তো কি আমি বলছি, আজই তোকে বিয়ে করতে হবে? তা হ'লে কবে যাবি?

সারদা। কাল সন্ধ্যার গাড়ীতে।

পিসী। খুব সাবধানে যাস্; একা, রাস্তাঘাটের কথা—

সারদা। ভয় নাই পিসীমা, আমার আরও দু'তিন জন বন্ধু যাবে।

পিসী। তা সাবধানে যাস্। কত টাকা চাই?

সারদা। শ'দুয়েক হলেই হবে। আর কাপড়-চোপড় কিনতে গোটা পঞ্চাশ টাকা চাই।

পিসী। তা হ'লে কাল সকালেই কাপড়-চোপড় যা দরকার, কিনে ফেলিস্। ভাল কথা, দাদা আসবেন লিখেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবি না?

সারদা। আজকালের মধ্যে এসে পড়েন তো দেখা হবে। সঙ্গীদের ছেড়ে দিয়ে তো একা যেতে পারব না।

"তা বটে" বলিয়া পিসীমা বামুন ঠাকরুণকে সারদার খাবার আনিতে আদেশ করিলেন। সারদা খাইতে বসিল, পিসী নিকটে বসিয়া পথে ঘাটে সতর্কতা অবলম্বন সম্বন্ধে তাহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

আসল কথা, সারদা শান্তিকে বশ করিতে চায়; তাহাকে বিবাহ করিতে চায়; কিন্তু শান্তি-বাঘিনীকে বশ করা সহজ নহে। তবে সে ইহাও বুঝিল যে, রমণী যতই শক্তিশালিনী হউক, পুরুষের নিকট সে কতক্ষণ আপনাকে স্থির রাখিতে পারে? পুরুষের আদর, যত্ন, ভালবাসা সে কয়দিন উপেক্ষা করিতে পারে? বিশেষতঃ বালবিধবা, সে আজীবন স্নেহের ভিখারী, ভালবাসার কাঙ্গাল! সুতরাং শান্তি তাহার হইবেই, এক দিন সে তাহার ভালবাসার নিকট ধরা দিবেই, এক দিন নিশ্চয়ই তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া বলিবে, "ওগো, আমি তোমারই!"

এই কল্পনার মনোহর চিত্র সৃজন করিয়া সারদা ভাবিল, শান্তিকে হাতছাড়া করা হইবে না, তাহাকে কাছে কাছে রাখিতে হইবে, আদর-যত্ন দেখাইয়া ভালবাসার ফাঁদ পাতিয়া তাহাকে বশ করিতে হইবে। ভালবাসায় বনের বাঘ বশীভূত হয়, স্ত্রীলোক কোন ছার।

কিন্তু শান্তি এখানে বন্দিনীর ন্যায় থাকিয়া ক্রমেই উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। তাহাকে সঙ্গে লইয়া কিছু দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিলে অনেক ফল ফলিবে, সর্ব্বদা একত্রে বসবাসে নিশ্চয়ই তাহার মনের পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

এইরূপ স্থির করিয়া সারদাচরণ পিসীমাকে তীর্থ-যাত্রার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। পিসীমার মতও হইল, কিন্তু পিসে মহাশয়ের পুলিসের চাকরী, ছুটী পাইলেন না, সুতরাং পিসীমারও যাওয়া হইল না, কেবল সারদা কৌশলে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইল।

সারদাচরণ শান্তিকে বুঝাইয়া দিল যে, রামসদয় গোপীনাথ ও শান্তি উভয়ের নামে নালিশ করিয়াছেন, পুলিস ওয়ারেণ্ট লইয়া গলিতে গলিতে তাহাদের খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সন্ধান পাইলেই টানিয়া লইয়া গিয়া হাজতে পুরিবে, তার পর আদালতের মাঝখানে দাঁড় করাইয়া এমন সকল অশ্লীল প্রশ্ন করিবে, যাহা শুনিলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়।

সারদার কথায় শান্তি যথার্থই ভয় পাইল। সে মরিতে পারে, কিন্তু আদালতের মাঝখানে দাঁড়াইতে পারে না। সুযোগ বুঝিয়া সারদা পশ্চিমযাত্রার প্রস্তাব করিল। ইহাতে ওয়ারেণ্টের ভয় থাকিবে না, তীর্থদর্শনে পুণ্যলাভও হইবে। কিন্তু সারদার সহিত যাইতে হইবে বলিয়া শান্তি প্রথমতঃ এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না; কিন্তু শেষে ভাবিয়া দেখিল, এখানেই বা সে সারদাচরণের সঙ্গ হইতে কিরূপে দূরে থাকিবে? বরং এখান হইতে বাহির হইতে পারিলে তাহার বন্দিত্ব শিথিল হইয়া পড়িবে, হয় তো কোন সুযোগে ভগবান্ তাহার উদ্ধারের উপায় করিয়া দিবেন। এখানেও সহায় ভগবান্, সেখানেও তিনি। এই সকল ভাবিয়া শান্তি সারদাচরণের প্রস্তাবে সম্মতি দিল। সারদা-চরণ হৃষ্টচিত্তে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

হাবড়া ষ্টেশনে পশ্চিমের গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে হই-য়াছে, এমন সময় এক যুবক ছুটিয়া আসিয়া মধ্যম শ্রেণীর একটি কামরায় উঠিতে গেল। কামরায় দুইটি আরোহী ছিল; তাহাদের এক জন পুরুষ, অপরটি স্ত্রীলোক। যুবককে গাড়ীর দরজা খুলিতে দেখিয়া ভিতর হইতে পুরুষ আরোহী বলিয়া উঠিল, "এ গাড়ী নয়, এ গাড়ী [illegible]

যুবক সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল। আরোহী রুক্ষস্বরে বলিল, "তুমি কি রকম লোক হে? দেখ্‌ছ না, এটা মেয়ে-গাড়ী।"

যুবক গাড়ীর ভিতর উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বলিল, "মশায় বোধ হয় স্ত্রীলোক নহেন। এ কি, সারদা বাবু যে?"

আরোহী পুরুষ তখন যুবকের এই ধৃষ্টতার প্রতিফল দিবার জন্য আসন হইতে উত্থিত হইয়া জামার হাতা গুটাইতেছিল; সহসা আগন্তুকের মুখে আপনার নাম শুনিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, চাহিয়াই ধীরে ধীরে স্বীয় আসন অধিকার করিল। যুবক গাড়ীর অপর পার্শ্বে উপবিষ্টা অবগুণ্ঠনবতী রমণীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। সহসা রমণী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া মৃদু কোমল স্বরে ডাকিল, "গুপীদা!"

গোপীনাথ তাহার দিকে একবার রোষকষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল। গাড়ী তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। গোপীনাথ জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতে লাগিল। সারদাচরণ পকেট হইতে একটা চুরুট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল।

গাড়ী শ্রীরামপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে দুই তিন জন লোক গাড়ীতে উঠিতে গেল। গোপীনাথ উঠিয়া সবলে দরজা চাপিয়া রহিল, কাহাকেও উঠিতে দিল না। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে আবার আসিয়া স্বস্থানে বসিল।

রমণী আবার একবার ডাকিল, "গুপীদা!"

গোপীনাথ কোন উত্তর দিল না, ফিরিয়াও চাহিল না; সে দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। গাড়ী ভীমদর্পে লৌহবর্ত্ম কম্পিত করিতে করিতে বিকট গর্জ্জনে গন্তব্যপথে ছুটিয়া চলিল।

বর্দ্ধমান ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিলে গোপীনাথ নামিয়া পড়িল, এবং পাশের একটা গাড়ীতে উঠিল। সারদাচরণ একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বেঞ্চির উপর শুইয়া পড়িল। শান্তি সংজ্ঞাহীনার ন্যায় নীরবে বসিয়া রহিল।

পাশের গাড়ীতে গিয়া গোপীনাথ স্থির থাকিতে পারিল না; গাড়ী থামিলেই সে নামিয়া পড়িতেছিল, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে এক একবার তীব্রদৃষ্টিতে শান্তির কামরার দিকে চাহিতেছিল। একবার দেখিল, সারদাচরণ বেঞ্চির উপর শুইয়া গুন্ গুন্ স্বরে একটা গান ধরিয়াছে, আর শান্তি জানালায় মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। গোপীনাথ দ্রুতপদে গিয়া আপনার কামরায় উঠিল।

আবার একবার দেখিল, সারদাচরণ ঘুমাইতেছে, শান্তি বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। তাহার সর্ব্বশরীর শ্বেতবাসে আচ্ছাদিত, কেবল মুখের কিয়দংশ বাহির হইয়া আছে, গাড়ীর আলোকের উজ্জ্বল রশ্মি-রেখা আসিয়া মুখের উপর পড়িয়াছে। গোপীনাথ স্থির নির্নিমেষনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা হইল, একবার আদর করিয়া ডাকে, "শান্তি!" পরক্ষণেই সারদাচরণের নাসিকাগর্জ্জনের শব্দ তাহার কানে গেল। সে ত্রস্তে মুখ ফিরাইয়া লইয়া পাশের গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।

আর একটা ছোট ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে গোপীনাথ আপনার কামরার ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, যে গাড়ীতে শান্তি আছে, দুই তিন জন লোক সেই গাড়ীতে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। গোপীনাথ তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া গাড়ীর দরজা চাপিয়া ধরিল। লোকগুলাও সহজে ছাড়িল না, তাহারা দরজা খুলিবার জন্য ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল, গোপীনাথকে দুই একটা গুঁতাও দিল, কিন্তু গোপীনাথ অটল পর্ব্বতের ন্যায় দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তিন জন জোয়ান দরজার হাতল হইতে তাহার বজ্রমুষ্টি নড়াইতে পারিল না। এ দিকে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল, লোকগুলা অগত্যা অন্য গাড়ীর সন্ধানে ছুটিল।

এই গোলযোগে শান্তির তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; সে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে গোপীনাথের বীরত্ব দেখিতে লাগিল। তার পর লোকগুলা যখন পরাভূত হইয়া চলিয়া গেল, তখন সে প্রশান্তস্বরে একবার ডাকিল, "গুপীদা!"

তখন গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে। গোপীনাথ চকিত দৃষ্টিতে একবার শান্তির দিকে চাহিয়াই দরজা ছাড়িয়া আপনার কামরায় উঠিতে গেল। এক জন রেল-কর্ম্মচারী আসিয়া তাহার হাত ধরিল। গোপীনাথ তাহাকে ধাক্কা দিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।

কাশীতে নামিয়া শান্তি চঞ্চলদৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু গোপীনাথকে দেখিতে পাইল না।

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

হঠাৎ যখন মনে বৈরাগ্য আসে, তখন ভবিষ্যতের চিন্তাটা মনোমধ্যে আসিতেই পারে না; তখন কোনরূপে বর্ত্তমানের হাত ছাড়াইয়া পলাইতে পারিলেই

যেন জীবনের পথটা নিষ্কণ্টক হয়। কিন্তু শেষে যখন এই ভবিষ্যৎটা বর্ত্তমানের আকার ধারণ করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন তাহার বিষয় না ভাবিলে আর চলিবার উপায় থাকে না। বরং তখন এই চিন্তাটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া অতীতটাকে ফিরাইয়া পাইবার জন্য একটা প্রবল আগ্রহ জন্মাইয়া দেয়।

বেহারীচরণেরও এখন এই দশা। সে হঠাৎ-বৈরাগ্যের বশে যখন গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তখন ভাবে নাই ভবিষ্যতে কি হইবে। জীবনটাই যাহার উদ্দেশ্য-বিহীন, তাহার আবার ভবিষ্যতের চিন্তা কি? জীবনে যখন সুখদুঃখের পার্থক্য নাই, তখন ভিক্ষা করিলেও দিন চলিয়া যাইবে, না খাইলেও দিন আট্‌কাইবে না।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এইরূপ উদাসীন হইয়া বেহারী নানা স্থানে ঘুরিয়া শেষে যখন এক প্রকার রিক্তহস্তে কাশীতে উপস্থিত হইল, তখন সে বেশ বুঝিতে পারিল, না খাইলে একটা দিনও চলে না, এবং ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা তাহার সংস্থান সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্কর। পথে বাহির হইয়া সে যখন দেখিল, ভিখারীর দল একটা পাই পয়সার জন্য কত কাতরতা ও মিনতির সহিত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিতেছে, তখন ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহের কল্পনা করিতেও সে শিহরিয়া উঠিত।

সংসারের উপর রাগটা তখনও যায় নাই, সুতরাং বেহারীর দেশে ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না; এই-খানেই কোনরূপে জীবিকার উপায় করিয়া লইবে স্থির করিল। প্রথমে চাকরীর চেষ্টা করিল, কিন্তু অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোককে কে চাকরী দিবে? ব্যবসায়—তাহাতে মূলধনের আবশ্যক। একজন পাণ্ডা তাহাকে যাত্রী ধরিবার কার্য্যে নিযুক্ত করিল, কিন্তু একদিন গিয়াই বেহারী সে কাজে ইস্তফা দিল। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ডাক্তারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল।

পূর্ব্বে সে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য দুই এক-খানা হোমিওপ্যাথী পুস্তক পড়িয়াছিল। এখন আরও দুই একখানা বহি কিনিল এবং তিন টাকা দিয়া কলিকাতা হইতে একটা ঔষধের বাক্স আনাইয়া লইল। তার পর দুই টাকার একখানি ঘর ভাড়া লইয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

প্রথমে দুই চারিজন দরিদ্র রোগী দেখিয়া বেহারী আপনার পসার করিয়া লইল। তখনও কাশীতে এত অধিকসংখ্যক ডাক্তারের আবির্ভাব হয় নাই, সুতরাং বেহারীর পসার হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। অল্প দিনের মধ্যেই তাহার ক্ষুদ্র ডাক্তারখানাটি আল্‌মারী ও টেবিল-চেয়ারে পূর্ণ হইল, এবং বেহারী সাত টাকায় সমগ্র বাড়ীখানি ভাড়া লইল।

ব্যবসায় চলিল, অর্থাগম হইতে লাগিল, কিন্তু মনের দ্বন্দ্ব ঘুচিল না। কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া যখন সে বিশ্রাম লইতে চাহিত, তখনই একটা অতীতের চিন্তা প্রকাণ্ডকায় দৈত্যের ন্যায় আসিয়া তাহার বুকে চাপিয়া বসিত; বেহারী শত চেষ্টাতেও তাহাকে বুক হইতে সরাইতে পারিত না। হায়, সুখের সংসার তাহার, দৈন্য-বর্জ্জিত কলুষবিহীন পবিত্র সংসার, উৎসাহময় আশাপূর্ণ নিষ্পাপ জীবন; সে জীবন, সে সংসার এখন কোথায়? কোন্ অপরাধে, কাহার ভুলে সে আজ এই সংসার হইতে নির্ব্বাসিত! কোন্ দেবতার অভিশাপে তাহার পবিত্র জীবন মসীমলিন হইয়া আজ দূরে—সংসারের এক নিভৃত-প্রান্তে নিঃসঙ্গভাবে পড়িয়া রহিয়াছে! কোন্ পাপে সে আজ সুখের উচ্চতম কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে!

বেহারী ভাবিত, "দূর হউক, মান অভিমান, দূর হউক গর্ব্ব অহঙ্কার, ফিরিয়া যাই।" কিন্তু কোথায় ফিরিবে? কাহার কাছে যাইবে? ভাবিতে ভাবিতে বেহারীর হৃদয় অবসন্ন অসাড় হইয়া আসিত, সংসারের সুখ-শান্তি সকলই তাহার নিকট উপহাস বলিয়া বোধ হইত।

সে দিন সন্ধ্যার সময় বেহারী রোগী দেখিয়া সবে-মাত্র ডাক্তারখানার দরজায় পা দিয়াছে, এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার হাত ধরিল, এবং তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ডাক্তার?"

একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বেহারী উত্তর করিল, "হাঁ।"

"আসুন, একটি স্ত্রীলোক মরে।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আগন্তুক বেহারীর হাত টানিয়া অগ্রসর হইল। বেহারী বলিল, "কোথায় যেতে হবে?"

আগন্তুক আপনার বাঁ হাতটি বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "বেশী দূরে নয়, ঐ আগেকার গলিতে।"

বেহারী লোকটির সঙ্গে চলিল।

সরু গলির ভিতর একখানি ছোট দোতলা বাড়ী। তাহারই নীচের তলায় একখানি ঘর। ঘরটি যেমন ছোট, তেমনই অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময়। ঘরে আলো ও বাতাস আসিবার জন্য একদিকে একটি ছোট জানালা ছিল, কিন্তু তাহার গায়ে আর এক খানি বাড়ী উঠিয়া জানালার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ

করিয়া দিয়াছে। সেই ক্ষুদ্র অন্ধকারময় গৃহে, আর্দ্র কক্ষতলে একখানি মাদুরের উপর এক স্ত্রীলোকের অচেতনপ্রায় দেহ শায়িত। এক পাশে একটি মাটীর প্রদীপ মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার ক্ষীণ আলোকরশ্মি রমণীর রোগ-পাণ্ডু মুখের উপর নৃত্য করিতেছে।

বেহারী রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। লোকটি প্রদীপটা কাছে সরাইয়া আনিল। সে আলোকে রোগিণীর মুখের দিকে চাহিয়াই বেহারী দুই-পদ পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইল; তাহার বিস্ময়াপ্লুত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "একি, শান্তি!"

লোকটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেহারীর মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠে বলিল, "হাঁ, শান্তি, সেই অভাগীই বটে। কিন্তু আপনি কি বেহারী বাবু?"

বেহারী বলিল, "হাঁ, আমি বেহারী ডাক্তার! তুমি কে?"

লোকটি প্রদীপটাকে একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া বলিল, "আমি গোপীনাথ।" একটু থামিয়া গোপীনাথ উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "দেখুন, বাঁচবে তো?

বেহারী রোগিণীর পাশে বসিয়া তাহার নাড়ী টিপিল, জ্বরের উত্তাপ দেখিল; তারপর গোপীনাথের দিকে ফিরিয়া বলিল, "জ্বরটা বড় বেশী হয়েছে, নাড়ীও দুর্ব্বল। কতদিন জ্বর হয়েছে?"

গোপীনাথ বলিল, "তা জানি না, কাল এমন সময় পাশের বাড়ীর রোয়াকে এই অবস্থায় প'ড়ে থাকতে দেখেছি।"

বেহারী। কতদিন এখানে এসেছে? কার সঙ্গে এসেছে?

গোপীনাথ তীব্রস্বরে বলিল, "তা কি আপনি জানেন না বেহারী বাবু?"

বেহারী। জানলে তোমায় জিজ্ঞাসা করতাম না।

গোপী। ওর স্বামীই সঙ্গে এনেছিল।

বেহারী। স্বামী? স্বামী কে?

কঠোর বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া গোপীনাথ বলিল, "আপনার বন্ধু সারদা বাবু।"

বেহারী নীরবে শান্তির মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। গোপীনাথ বলিল, "হতভাগিনী দুর্ব্বুদ্ধির উপযুক্ত ফল পেয়েছে। এখন যাতে বাঁচে, তাই করুন।"

বেহারী বলিল, "চেষ্টার ত্রুটী হবে না।"

গোপীনাথ উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল, "তবে কি বাঁচবে না?"

বেহারী। বাঁচতে পারে; তবে এ ঘরে থাকলে না বাঁচাই সম্ভব।

গোপী। তবে কি হবে?

বেহারী একখানা পাল্কী ডাক

গোপী। পাল্কী কেন?

বেহারী। আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব

গোপীনাথ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছ?"

গোপীনাথ বলিল, "আপনার ঘরে?"

বেহারী বলিল, "হাঁ, যদি বাঁচাতে চাও, বিলম্ব ক'র না।"

গোপীনাথ দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেল।

রোগিণী একবার পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিল। বেহারী একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "শান্তি!"

শান্তি চক্ষু মেলিয়া চাহিল, ক্ষীণ অস্পষ্টকণ্ঠে বলিল, "জল।"

একপাশে মাটীর কলসীতে জল ছিল। বেহারী একটা পিতলের গ্লাসে জল লইয়া শান্তির মুখে ধরিল। জল খাইয়া তৃপ্তির একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শান্তি আবার চক্ষু মুদিল। বেহারী নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, "সত্যই কি শান্তি বিবাহ করিয়াছে? কিন্তু বিবাহের চিহ্ন—সীঁথায় সিন্দুর কৈ? হাতে লোহা বা চুড়ি কিছুই নাই, পরণে থান কাপড়। না না, সারদা মিথ্যাবাদী। কিন্তু গোপীনাথ? জানি না, ইহার মধ্যে কি রহস্য লুক্কায়িত আছে।"

গোপীনাথ পাল্কী লইয়া আসিল। বেহারী গোপীনাথের সাহায্যে অতি সন্তর্পণে শান্তিকে পাল্কীতে তুলিয়া আপনার বাসায় লইয়া গেল, এবং একজন ভাল ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিল।

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

সারদাচরণ শান্তিকে লইয়া কাশীতে নামিয়াছিল। দিন কয়েক কাশীতে থাকিয়া এলাহাবাদে গেল; তার পর দিল্লী, আগ্রা ঘুরিয়া আবার কাশীতে আসিল। সে ভাবিয়াছিল, এইরূপে একসঙ্গে থাকিতে থাকিতে ভালবাসা এবং আদর-যত্ন ভোগ করিতে করিতে শান্তির মন নিশ্চয়ই ফিরিয়া যাইবে। মেয়েমানুষের মন পুরুষের ভালবাসার বিরুদ্ধে কতক্ষণ সংগ্রাম করিতে পারে? বহ্নির উষ্ণস্পর্শের নিকট ঘৃতকুম্ভ কতক্ষণ আপনার অন্তঃকাঠিন্যরক্ষায় সমর্থ হয়?

কিন্তু কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সারদাচরণ দেখিল, তাহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। কোন্

এক অলৌকিক দৃঢ়তার বলে এই সহায়হীনা বিধবার ক্ষুদ্র মনটি নীতিশাস্ত্রের "ঘৃতকুম্ভসমা নারী" ইত্যাদি মহাজন-বাক্যগুলিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে। হায়, এই শিক্ষাসংস্পর্শশূন্যা শাস্ত্রানভিজ্ঞা রমণী এত দৃঢ়তা, এত সংযম কোথায় পাইল? সারদা-চরণ জানিত না যে, ইহা হিন্দুরমণীর মজ্জাগত সংস্কার, এ সংস্কার শিক্ষালভ্য নহে।

সারদা ভাবিল, এখন সে এই রমণীকে লইয়া কি করিবে? তাহার উপেক্ষা ও অনাদরকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া চিরদিন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিক্ষুকের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইবে, অথবা ইহার সংস্রব ত্যাগ করিয়া ইহাকে আপনার হৃদয়ের শক্তি-সামর্থ্যের প্রমাণ দেখা-ইয়া দিবে? কিন্তু সে শক্তি কোথায়? সে যে অনেক দিন পূর্ব্বে ইহার অলৌলিক সৌন্দর্য্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তবে এক্ষণে কর্ত্তব্য কি?

সারদা দেখিল, এখন বলপূর্ব্বক বিবাহ করা ছাড়া আর উপায় নাই। যেখানে সহজে অধিকার পাইল না, সেখানে সে জোর করিয়া আপনার অধিকার প্রতি-ষ্ঠিত করিবে। কিন্তু এরূপ বিবাহে কি ভালবাসা পাওয়া যাইবে? যদি ভালবাসা না পাইলাম, তবে সে বিবাহে ফল কি? সে ব্যর্থ অধিকারেই বা কি সুখ!

সারদাচরণ শান্তিকে অনেক লোভ দেখাইল, ভয়-প্রদর্শন করিল, কিন্তু শান্তি অচল অটল। তাহার একই উত্তর, "আমি বিধবা। অবশেষে সারদা তাহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "আমায় রক্ষা কর শান্তি, আমার প্রাণ যায়!"

শান্তি বলিল, "আমি অসহায়া বিধবা, আমি কি করিতে পারি।"

সারদা। আমাকে একটু ভালবাসিতে পার।

শান্তি। সবল পুরুষ অনেককে ভালবাস্‌তে পারে, কিন্তু দুর্ব্বল স্ত্রীলোক একজনকে ছাড়া ভাল-বাস্‌তে পারে না।"

সারদা। তোমার ভালবাসার পাত্র কে?

শান্তি। আমার স্বামী।

সারদা। সে তো নাই?

শান্তি। এখানে নাই, স্বর্গে আছেন।

সারদা। স্বর্গ-নরক কল্পনা মাত্র।

শান্তি। তোমার মত লোক তাই মনে করে বটে, নচেৎ স্বেচ্ছাচারের সুবিধা হয় না।

সারদা বলিল, "ভাল, স্বীকার করি স্বর্গ-নরক আছে। কিন্তু তাতে তোমার ক্ষতি কি? তোমার স্বামী স্বর্গে, আর তুমি মর্ত্তে।"

শান্তি বলিল, "মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে আমার মিলন হবে।"

সারদা বলিল, "অসম্ভব।"

দৃঢ়স্বরে শান্তি বলিল, "ইহাই সম্ভব। এ কি এক জন্মের সম্বন্ধ? এ যে জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন।"

সারদা। তার কর্ম্মফলে সে স্বর্গে গেছে, তোমার কর্ম্মফলে তুমি নরকে যেতে পার?

শান্তি। তা হয় না, দু'জনেরই কর্ম্মফল একসূত্রে গাঁথা। তিনি কর্ম্মফলে স্বর্গে যান, আমিও স্বর্গে যাব, নরকে যান, সেখানে গিয়েই তাঁর সঙ্গে মিলিত হব।

বিশ্বাসের আলোকে শান্তির মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সারদা সবিস্ময়ে বলিল, "নরকে যাবে?"

শান্তি সহাস্যে বলিল, "নিশ্চয়। সীতা রাজভোগ ছেড়ে রামের সঙ্গে বনে গিয়েছিল, দময়ন্তী রাজ্যসুখ ত্যাগ ক'রে পতির অনুগমন করেছিল, জান না কি? আমার দেশের মেয়েরা আগে স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় পুড়ে মর্‌ত, শুন নাই?"

সারদাচরণ বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে শান্তির গর্ব্ব ও আনন্দে উদ্ভাসিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিয়ৎ-ক্ষণ এইভাবে থাকিবার পর সারদা কাতরকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু আমার কি হবে শান্তি? আমি যে তোমায় ভালবাসি।"

শান্তি বলিল, "বিধবাকে ভালবাসা পাপ, আর তাকে সে কথা শুনানও মহাপাপ।"

সারদা। আমি পাপ-পুণ্য মানি না, আমি তোমাকে চাই।

শান্তি। চাইলেই সংসারে সব জিনিষ পাওয়া যায় না।

সারদা। কিন্তু আমি তোমায় না পেয়ে ছাড়্‌ব না। আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে শান্তি, আমায় রক্ষা কর, এত পাষাণ হয়ো না।

সারদা হাত বাড়াইয়া শান্তির পা জড়াইয়া ধরিতে গেল; শান্তি পশ্চাতে সরিয়া গিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "আমাকে এইরূপে অপমান কর্‌বার জন্যই এখানে এনেছ?"

সারদা বলিল, "অপমান নয়, আদর ক'রে বুকে রাখ্‌ব ব'লেই এনেছি।"

শান্তি ঘৃণার সহিত উত্তর করিল, "আমি তোমার আদরের মাথায় পদাঘাত করি।"

সারদা উঠিয়াই দাঁড়াইল; বলিল, "অনেক রকম লোক দেখেছি, কিন্তু তোমার মত একগুঁয়ে মেয়ে-মানুষ কখন দেখি নাই।"

শান্তি বলিল, "তোমার মত পাপিষ্ঠ এই প্রথম দেখ্‌লাম।"

সারদা এবার রাগিয়া উঠিল; বলিল, "তুমিই কেবল পুণ্যবতী! মনে করেছিলাম, বিবাহ ক'রে তোমায় সুখী করব, কিন্তু দেখ্‌ছি, সেটা আমার ভুল, তুমি আমার স্ত্রী হবার উপযুক্ত নও।"

শান্তি বলিল, "একশো-বার নয়। যখন বুঝেছ, তখন আমাকে বিদায় দাও।"

সারদা জিজ্ঞাসিল, "কোথায় যাবে?"

শান্তি বলিল, "সে ভাবনায় তোমার দরকার নাই।"

শ্লেষের হাসি হাসিয়া সারদা বলিল, "বুঝেছি, সেই ছোঁড়াটার সঙ্গে বুঝি দেখা হয়েছে। কিন্তু তা হবে না শান্তি, আমি তোমায় সহজে ছাড়্‌ব না। আমি সারদাচরণ, যা ধরি, তা ছাড়ি না। আমি তোমার ধর্ম্মনষ্ট করব, তোমায় অসতী ক'রে, বাজারের বেশ্যা ক'রে রাস্তায় ছেড়ে দেব। তখন তোমার যেখানে ইচ্ছা যেও।"

সারদা দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। শান্তি মনে মনে ডাকিল, "বিশ্বনাথ! রক্ষা কর।"

শান্তি আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। পাশে রাস্তা। সদর রাস্তা নয়, গলির রাস্তা। রাস্তা দিয়া দুই একজন লোক যাতায়াত করিতেছে। শান্তির মনে হইল, উহাদিগকে ডাকিয়া উদ্ধার-প্রার্থনা করে। কিন্তু কে উহারা? তাহার কথা শুনিবে কেন? সহসা শান্তি দেখিল, অদূরে কে এক জন এই বাড়ীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গোপীনাথ না? হাঁ, সেই বটে। কিন্তু উহার চেহারা এত শীর্ণ, এত রুক্ষ কেন?

সহসা শান্তির দৃষ্টির সহিত গোপীনাথের দৃষ্টি মিলিত হইল। গোপীনাথ মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার মুখ যেন ঘৃণায় বিরক্তিতে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তথাপি শান্তির ইচ্ছা হইল, একবার চীৎকার করিয়া ডাকে "গুপীদা।" কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার গাড়ীর ডাকার কথা মনে পড়িল; তাহার উপেক্ষা ও বিরক্তি-পূর্ণ দৃষ্টি মনে পড়িল। শান্তি দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল। জানালা বন্ধ করিতে করিতে দেখিল, গোপীনাথ দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছে।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

পরদিন সারদাচরণ শান্তিকে শুনাইয়া পাচককে আদেশ করিল, "এখানে হবিষ্য, ব্রহ্মচর্য্য, ও-সব চল্‌বে না, সকলকেই এক রকম খেতে হবে।"

এই নিষ্ঠুর আদেশ শ্রবণে শান্তির একটুও দুঃখ হইল না, শুধু মনে মনে হাসিল। সে দিন সে গঙ্গাজল ছাড়া আর কিছু খাইল না।

পরদিনও এইরূপে কাটিল। সে দিন মধ্যাহ্নে সারদাচরণ পাচককে শান্তির ঘরে অন্নব্যঞ্জন রাখিয়া আসিতে আদেশ দিল। পাচক অন্ন রাখিয়া আসিল, কিন্তু শান্তি তাহা স্পর্শ করিল না, তাহা সজ্জিত-ভাবেই ঘরের মেঝেয় পড়িয়া রহিল। শান্তি অভুক্ত অবস্থায় বিছানায় পড়িয়া মানুষ কয়দিন না খাইলে মরে, তাহারই আলোচনা করিতে লাগিল।

সারদাচরণ ভাবিয়াছিল, ক্ষুধার জ্বালায় শান্তিকে নিশ্চয়ই হবিষ্যান্নের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইবে। ক্ষুধার তাড়না অপেক্ষা তাড়না নাই; ইহার জ্বালায় মানুষ হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়, বিশ্বামিত্রের মত ঋষিও চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে।

কিন্তু সারদা সন্ধ্যাকালে আসিয়া যখন দেখিল, অন্ন-ব্যঞ্জন অস্পৃষ্ট অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তখন সে ভাবিল, ক্ষুধার বিষম তাড়না উপেক্ষা করিতে পারে, এমন মানুষও আছে। সে শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাত খাও নি?"

শান্তি বিছানায় শুইয়াই উত্তর করিল, "না।"

সারদা। কেন?

শান্তি। ও ভাত বিধবার খাদ্য নয়।

সারদা। ভাতে আবার বিধবা সধবার ভেদ আছে না কি? দেখ শান্তি, ও-সব ভাওামি ছাড়। ধর্ম্ম মনের জিনিষ, খাওয়ার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই।

শান্তি কোন উত্তর করিল না, শুধু ঈষৎ হাসিল।

সারদা জিজ্ঞাসিল, "না খেয়ে কতদিন থাক্‌বে?"

শান্তি। যতদিন পারা যায়।

সারদা। তারপর?

শান্তি। তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

একটু ভাবিয়া সারদাচরণ বলিল, "দেখ শান্তি, ও-সব দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়। তোমরা যে জিনিষটাকে ধর্ম্ম ধর্ম্ম কর, আসলে ও জিনিষটা কিছুই নয়। আমি অনেক পড়েছি, অনেক শুনেছি, অনেক বড় বড় পণ্ডিতের সহিত তর্ক বিতর্ক করেছি; তাতে কি বুঝেছি জান, যাতে সুখ, তাই ধর্ম্ম, আর যাতে দুঃখ, তাই অধর্ম্ম।"

শান্তি বলিল, "তোমার ধারণা নিয়ে তুমি থাক, আমার ধারণা নিয়ে আমাকে থাক্‌তে দাও।"

সারদা বলিল, "আমি তোমায় ভাল কথাই বল্‌ছি।"

ঈষৎ রুষ্টস্বরে শান্তি বলিল, "তোমার মত লোকে ভাল কথা জানেই না।"

সারদা দেখিল, এখনও সেই গর্ব্ব, তেমনই অহঙ্কার। অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, "ভাল যখন জানি না, তখন এবার হ'তে মন্দই দেখতে পাবে।"

শান্তি বলিল, "যথেষ্ট দেখেছি।"

ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে সারদা বলিল, "কিছুই দেখ নাই; তোমায় ভালবাসি ব'লে এতদিন তা দেখাই নাই। কিন্তু এবার যা দেখাব, তা তোমার কল্পনায় আস্‌তে পারে না।"

সারদা বাহির হইয়া গেল, শান্তি পাশ ফিরিয়া শুইল।

ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল। শান্তি এবার দুই দিন অনাহারের ফল অনুভব করিতে লাগিল। তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল, মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, পেটে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভূত হইল। শান্তি ভাবিতে লাগিল, "মৃত্যু, মৃত্যু! ভগবান্ মৃত্যু দাও।"

কিন্তু মৃত্যু আসিল না, সারদা স্খলিতপদে দরজার নিকট আসিয়া বিকটকণ্ঠে ডাকিল, "শান্তি!"

শান্তি দেখিল, সারদা যথেষ্ট মদ খাইয়া আসিয়াছে; তাহার পা টলিতেছে, কথা জড়াইয়া আসিতেছে, বহু কষ্টেও দেহভার স্থির রাখিতে পারিতেছে না। শান্তি বিছানা ছাড়িয়া ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, "আজ আর রক্ষা নাই, এই নরপশুর হস্তে তাহার নারী-জীবনের সর্ব্বস্ব আজ বিলুণ্ঠিত হইবে।"

"শান্তি, আজ বাবা তোমায় নিয়ে উড়ব।" ব্যাঘ্র যেমন শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ে, তেমনই উন্মত্ত সারদাচরণ উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া শান্তির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। চকিতে শান্তি সরিয়া দাঁড়াইল, সারদাচরণ তাল সামলাইতে পারিল না, তাহার সুরা-কম্পিত দেহ সশব্দে কক্ষতলে পতিত হইল। মুহূর্ত্তে শান্তি পাশ কাটাইয়া কক্ষের বাহিরে আসিল, এবং দ্রুত-কম্পিত-পদে নীচে নামিয়া পড়িল। সারদাচরণ বাড়ীর বাহিরে যাইবার সময় বাহিরের দরজায় চাবি দিয়া যাইত। সে দরজা এখন উন্মুক্ত। শান্তি কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া রাস্তায় দাঁড়াইল।

মাতাল যতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে, ততক্ষণ তাহার লম্ফ, ঝম্প, পড়িলে আর রক্ষা নাই। সারদাচরণ পড়িয়া পড়িয়া দেখিল, শান্তি ঘরের বাহির হইল। সারদা হাত বাড়াইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল, "যেও না বাবা, কুঞ্জ আঁধার ক'রে ভোরের বেলা যেও না, দোহাই বাবা চন্দ্রাবলী!"

সারদা উঠিতে গেল, কিন্তু পারিল না। মাথা একটু তুলিতেই আবার তাহা ঢলিয়া পড়িয়া গেল। তখন সে এই অসভ্য মাথাটার উপর কতকগুলি ভদ্রতাবর্জ্জিত ভাষা প্রয়োগ করিতে করিতে নীরব হইয়া পড়িল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার গুরুগম্ভীর নাসিকাগর্জ্জনে ক্ষুদ্র গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

শান্তি বাহিরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিল। তারপর দাঁড়াইয়া কোথায় যাইবে ভাবিতে লাগিল। সম্মুখে পশ্চাতে অন্ধকারময় নির্জ্জন পথ; উপরে চাহিল, দেখিল, কালো কালো মেঘে আকাশ নক্ষত্র সব ঢাকা। শান্তি ভাবিল, গঙ্গা কোন্ দিকে? কত দূরে? সম্মুখের পথ ধরিয়া শান্তি দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

কয়েক পদ যাইতেই মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল, একটা দমকা হাওয়া ছুটিয়া গেল, ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে শান্তি চলিল।

গলির পর বড় রাস্তা। সেখানে আসিয়া শান্তি ভাবিল, কোন্ দিকে যাইব? বামে না ডাহিনে, শান্তি বামের পথ ধরিয়াই চলিল।

কিছুদূর যাইতেই শান্তি বাধা পাইল। দেখিল, দুই জন মাতাল ভিজিতে ভিজিতে বিপরীত দিক্ হইতে আসিতেছে। শান্তি দাঁড়াইয়া পড়িল। বড় রাস্তায় আলো ছিল। যে আলোকে শান্তিকে দেখিতে পাইয়া মাতালেরা উল্লাসে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। ভয়ে শান্তি পশ্চাতে ফিরিল। মাতালেরা হল্লা করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করিল। শান্তি রুদ্ধশ্বাসে ছুটিল।

কিছুদূর ছুটিয়া শান্তি দেখিল, মাতালেরা তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই। এ দিকে তাহার ছুটিবার শক্তিও ক্রমেই তিরোহিত হইতেছে। শান্তি বুঝিল, আলোকিত পথ তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে। পাশেই একটা অন্ধকার গলি। শান্তি সেই গলির ভিতর ঢুকিয়া ছুটিতে লাগিল। অন্ধকারে ছুটিতে ছুটিতে কতবার পড়িল, উঠিল, উঠিয়া আবার ছুটিল। কিন্তু পা আর চলে না, মাথা ঘুরিয়া পড়িতেছে, সর্ব্বশরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে, আর দাঁড়াইবারও শক্তি নাই। শান্তি কাঁপিতে কাঁপিতে একটা বাড়ীর রোয়াকের উপর বসিয়া পড়িল, বসিয়াই অবসন্নভাবে ঢলিয়া পড়িল, তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে শান্তি চক্ষু মেলিয়া চাহিল। দেখিল, একখানি সুসজ্জিত গৃহে পরিষ্কৃত শয্যার উপর সে শুইয়া আছে। এ কোন্ স্থান, কাহার গৃহ, কিরূপে সে এখানে আসিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। উঠিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। তখন সে অবসন্ন ভাবে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল।

বেহারী ডাকিল, "শান্তি।"

শান্তি চক্ষু মেলিল। বেহারী বলিল, "আমায় চিন্‌তে পার না?"

ক্ষীণকণ্ঠে শান্তি বলিল, "পারি, তুমি বেহারীদা।"

উৎফুল্ল কণ্ঠে বেহারী বলিল, "এখন কেমন আছ?"

শান্তি। ভাল আছি। আমার কি হ'য়েছিল?

বেহারী। খুব কঠিন অসুখ হয়েছিল, টাইফয়েড ফিবার।

শান্তি চক্ষু মুদিয়া একটু ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "এটা কোন্ জায়গা?"

বেহারী। কাশী, আমার বাসাবাড়ী।

শান্তি। এখানে কত দিন আছি?

বেহারী। প্রায় পনর দিন।

শান্তি নীরবে পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, বেহারী তাহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল। শান্তি অনেক ভাবিয়া শুধু এইটুকু মনে করিতে পারিল, এক দিন রাত্রিতে সে সারদাচরণের বাটী হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল। ইহার পর আর কিছু মনে পড়িল না।

সন্ধ্যার সময় বেহারী ঔষধ খাওয়াইতে আসিলে শান্তি বলিল, "আর ওষুধ কেন বেহারীদা?"

বেহারী বলিল, "এখনও তোমার রোগ সম্পূর্ণ সারে নাই।"

শান্তি বলিল, "না সারিলেই ভাল হইত। কেন এত কষ্ট ক'রে আমায় বাচালে?"

বেহারী বলিল, "বাচিয়েছে ভগবান্। আর কষ্ট —আমি বিশেষ কিছু কষ্ট করি নাই, ক'রেছে আর এক জন।"

শান্তি উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে সে?"

বেহারী বলিল, "গোপীনাথ।"

উত্তেজিতকণ্ঠে শান্তি বলিল, "গুপীদা! গুপীদা! আমার জন্য এত কষ্ট করেছেন?"

বেহারী বলিল, "হাঁ, সে-ই তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তা হ'তে তুলে নিয়ে যায়। তারপর এই কয়দিন সে দিনরাত তোমার পাশে ব'সে যমের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। সে এ রকম প্রাণপণ সেবা না করলে বোধ হয়, তোমায় বাঁচাতে পারতাম না।"

মুহূর্ত্তের জন্য শান্তির মুখের উপর আনন্দের বিদ্যুৎ ক্রীড়া করিয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা বিষাদের অন্ধকারে ম্লান হইয়া আসিল। শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "গুপীদা কোথায়?"

বেহারী বলিল, "তুমি ভাল আছ দেখে কাল তার বাসায় গেছে।"

শান্তি। আর বোধ হয় এখানে আসে না?

বেহারী। নিয়তই আসে; তুমি কেমন আছ, জেনে যায়। এই একটু আগেও এসেছিল।

শান্তি। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় না?

বেহারী। কেন চাইবে না?

শান্তি। না, আমার উপর তার ভয়ানক রাগ, আমাকে সে ঘৃণা করে।

বেহারী বলিল, "অসম্ভব। যার উপর রাগ বা ঘৃণা থাকে, তার এমন ভাবে সেবা করতে কেউ পারে না।"

ম্লান হাসি হাসিয়া শান্তি বলিল, "কেবল এক জন পারে, সে গুপীদা।"

বেহারী সবিস্ময়ে শান্তির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শান্তি বলিল, "একবার—শুধু একবার তাকে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে ব'ল, বেহারীদা, আমি তাকে তার ভুলটুকু বুঝিয়ে দেব।"

বেহারী স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল।

শান্তি বালিসে হেলান দিয়া বসিয়াছিল, গোপীনাথ ধীরে ধীরে আসিয়া শয্যার পাশে দাঁড়াইল। শান্তি ডাকিল, "গুপীদা।"

গোপীনাথ হাত দুইটা বুকের উপর নিবদ্ধ করিয়া অবনতমস্তকে ধীরে ধীরে বলিল, "আমায় ডেকেছ?"

শান্তি বলিল, "হাঁ, না ডাক্‌লে আস্‌বে না, তাই ডেকেছি।"

গোপীনাথ বলিল, "কেন ডেকেছ?"

শান্তি। ডাক্‌বার কি আমার অধিকার নাই?

গোপী। কি জানি।

ঈষৎ রুক্ষস্বরে শান্তি বলিল, "যদি তাই জান না, তবে আমাকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করলে কেন?"

গোপীনাথ সে কথার কোন উত্তর করিল না। শান্তি স্নিগ্ধ-কোমল-কণ্ঠে আবার ডাকিল, "গুপীদা!"

গোপীনাথ মুখ তুলিয়া একবার শান্তির মুখের দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল, শান্তি ব'লল, "আমার উপর রাগ করেছ গুপীদা?"

গোপীনাথ বলিল, "আমার রাগে তোমার ক্ষতি কি ?"

শান্তি। আমি লাভ-ক্ষতির কথা বল্‌ছি না, তুমি রাগ করেছ কি না, তাই জিজ্ঞাসা কচ্চি।

গোপী। রাগের কারণ থাক্‌লেই লোকে রাগ করে।

শান্তি। অনেকে অকারণেও রাগ করে। যেমন তুমি।

শান্তির সহাস্য মুখখানার দিকে চাহিয়া গোপীনাথ একটু বিস্ময়ের সহিত বলিল, "অকারণ ?"

মৃদু হাসিয়া শান্তি বলিল, "সম্পূর্ণ অকারণ। মনে কর, যদিই আমি পুনরায় বিবাহ করি, তাতে তোমার এত রাগ কেন ?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গোপীনাথ বলিল, "এই কথাটা শোনাবার জন্যই বোধ হয় আমায় ডেকেছিলে ? আমার কিন্তু কথাটা শুন্‌তে একটুও আগ্রহ ছিল না।"

গোপীনাথ গমনোদ্যত হইল। শান্তি বলিল, "যেও না, দাঁড়াও, আরও কথা আছে।"

গোপীনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আর কি কথা ?"

শান্তি বলিল, "বিশ্বাস হয় ?"

গোপী। কি ?

শান্তি। আমি বিবাহ কর্‌ব ?

মাথা নাড়িয়া উত্তেজিতকণ্ঠে গোপীনাথ বলিল, "একটুও না।"

হাসিতে হাসিতে শান্তি বলিল, "বিশ্বাস কর্‌তে পার না, কিন্তু অকারণে রাগ কর্‌তে পার। সে রাগ আবার এমনই ভয়ানক যে, আমাকে গাড়ীতে বাঘের মুখে ফেলে চ'লে এলে। আমি সাহায্য চাইলাম, কাতরস্বরে ডাক্‌লাম, কিন্তু সে স্বর তোমার কানে গেল না। তার পর দেখ্‌লে, আমি ব্যাধের পিঁজরায় বন্দিনী। দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেলে, একবারও ফিরে চাইলে না, সাহায্যের জন্য আমাকে একটুকুও আশ্বাস দিলে না। আজ যদি আমি নিজের বলে ধর্ম্মরক্ষা কর্‌তে না পার্‌তাম, যদি পলায়নে অক্ষম হতাম—"

গোপীনাথ কক্ষতলে বসিয়া পড়িল; দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলিল, "আমায় ক্ষমা কর শান্তি।"

শান্তি বলিল, "এত কষ্টভোগের পর এত সহজে ক্ষমা পাওয়া যায় না। তোমায় ক্ষমা কর্‌তে পারি—"

গোপীনাথ বলিল, "বল শান্তি, আমায় কি কর্‌তে হবে।"

শান্তি স্থির-গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল, "আমায় আশ্রয় দিতে হবে।"

গোপীনাথ বিস্মিত-সজলনেত্রে শান্তির মুখের দিকে চাহিল। শান্তি বলিল, "আমি আবার ফিরে এসেছি গুপীদা, এক দিন তোমায় কাঁদিয়ে গেছলাম, আজ নিজে কেঁদে ফিরে এসেছি। ভগ্নীর বিশ্বাস নিয়ে, মায়ের স্নেহ নিয়ে আবার তোমার দ্বারস্থ হয়েছি। আমায় আশ্রয় দেবে কি গুপীদা ?"

গোপীনাথ গিয়া শান্তির হাত ধরিল। অশ্রুধারায় তাহার হস্ত সিক্ত করিতে করিতে আবেগকম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "চল বোন, সংসারে আমি বড় একা। ভগ্নীরূপে আমার গৃহে চল, আমার চিরশুষ্ক স্নেহ-ভিখারী হৃদয়কে তোমার স্নেহধারায়—প্রেমধারায় প্লাবিত ক'রে দাও। নির্ব্বোধ মূর্খ গোপীনাথকে তোমার দেবীত্বের আদর্শে মানুষ কর।"

দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বেহারী এতক্ষণ এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতেছিল, এক্ষণে গৃহে প্রবেশ করিয়া ধীরস্বরে বলিল, "শুধু গোপীনাথকেই ক্ষমা কর্‌লে হবে না শান্তি, আমাকেও ক্ষমা কর্‌তে হবে। আমিও তোমায় ভুল বুঝেছিলাম। কেবল বুঝি নাই, একটা মস্ত ভুল করেছিলাম;"

শান্তি বলিল, "মানুষমাত্রেই ভুল করে বেহারীদা; কিন্তু তার সংশোধন অল্প লোকেই করে। তোমারও যে এই সামান্য ভুলটুকু সংশোধন হয়েছে, ইহাই আমার সৌভাগ্য।"

বেহারী বলিল, "সামান্য ভুল নয় শান্তি, আমার এই ভুলের জন্য তোমায় অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে।"

মৃদু হাস্যের সহিত শান্তি বলিল, "আমি কষ্ট পেয়েছি আমার অদৃষ্টের দোষে। কিন্তু বেহারীদা ?—"

বেহারী। কি শান্তি ?

শান্তি। তুমি জীবনে সব চেয়ে যে একটা বড় ভুল করেছ, যার জন্য জীবনটাকেই নষ্ট কর্‌তে বসেছ, তার সংশোধন কি হবে না ?

বেহারী উত্তরে শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। শান্তি বলিল, "কিছু ভেব না বেহারীদা, তুমি যেখানে আপনাকে ক্ষমার অযোগ্য মনে করছ, দেখবে, সেখানে তোমার জন্য ক্ষমার ভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়ে আছে। ফিরে যাও বেহারীদা, একটা তুচ্ছ অভিমানের বশে তিনটা জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট ক'রে দিও না।"

বেহারী নীরবে দাঁড়াইয়া এই মহিমময়ী রমণীর মুখে আশার সমুজ্জ্বল ছায়ার বিকাশ দেখিতে লাগিল।

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

দিন আর চলে না। সংসারে আয় নাই, ব্যয় আছে। দুইটা পেটই চলা দায়, তাঁহার উপর ছেলেটি আছে, রোগীর ঔষধ-পথ্যের খরচ আছে। কবিরাজ প্রথম প্রথম ভাল ভাল ঔষধ দিলেন, ঔষধে ফল দেখা গেল। কিন্তু শেষে যখন ঔষধের দাম বাকী পড়িতে লাগিল, তখন আর তেমন ফল দর্শিল না। রাণী এক-দিন দীনুকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ দীনু, ওষুধে ফল হচ্চে না কেন? কবিরাজ মশায় কি বলেন?"

দীনুই কবিরাজের নিকট হইতে ঔষধ আনিয়া দিত। সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "কি আর বল্‌বেন, মিনি পয়সার ওষুদে কি ফল হয় মাঠাক্‌রুণ?"

রাণীর চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল।

পয়সা চাই, কিন্তু পয়সা কোথায়? ঘরে আর একরত্তি সোনা-রূপা নাই, হাসির কানের মাড়কী দুইখানি পর্য্যন্ত বাঁধা পড়িয়াছে। আছে শুধু খোকার পায়ে দুইগাছি মল। তাহাতে কি হইবে? আর সে মলই বা খোকার পা হইতে কোন প্রাণে খুলিয়া লইবে? রাণী চারিদিকে অকূল পাথার দেখিতে লাগিল।

হাসি বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি দিদি, আমি আর ওষুধ খাব না।"

রাণী রাগিয়া বলিল, "কেন বল্ দেখি?"

মুখ ভার করিয়া হাসি বলিল, "আমার ইচ্ছে নাই।"

রাণী বলিল, "ওষুধ খেতে ইচ্ছে নাই, তবে কি আমার মাথাটা খেতে ইচ্ছে আছে?"

হাসি বলিল, "মোটেই না।

রাণী একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

হাসি বলিল, "তা তুমি, যাই বল দিদি, আমি আর কিছুতেই ওষুধ খাব না।"

রাণী বলিল, "তার পর? রোগ সারবে কিসে।"

হাসি বলিল, "নাই বা সার্‌ল? সত্যি বল্‌চি দিদি, আমার ভাল হ'তে একটুও ইচ্ছে যায় না।"

রাণী। ইচ্ছে যায় না তো আমার কাছে মরতে এলি কেন?

হাসি। তোমার কোলে মাথা রেখে মর্‌ব ব'লে এসেছি। কিন্তু আমার তেমন কপাল কি হবে?

রাগে চোখমুখ লাল করিয়া রাণী বলিল, "তোমার কপালের মুখে মারি ঝাঁটা। আবাগী, আমাকে খেতে এসেছিস্?"

মৃদু হাসি হাসিয়া হাসি বলিল, "রাগ করো না দিদি, সত্যি বল্‌ছি, আমি ম'লে বেশ হয়।"

রাণী। আমার রাজ্য লাভ হয়।

হাসি। তা না হ'লেও তুমি সুখী হও দিদি। আমি দিব্যি ক'রে বল্‌তে পারি, আমি ম'লেই তুমি তাঁকে নিয়ে—

হাসির মুখ চাপিয়া ধরিয়া রাণী উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিল, "দেখ হাসি, মুখ সাম্‌লে কথা কইবি। একে আমি সাত জ্বালায় জ্বলে মর্‌চি, তার উপর তুইও যদি এমনই ক'রে জ্বালাবি, তা হ'লে সত্যি বল্‌চি, আমি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ব।"

রাণীর কণ্ঠস্বরে ক্রোধের তীব্রতা, চক্ষে জলের ধারা।

হাসি বলিল, "ছি দিদি, তুমি কি পাগল হ'লে? মর্‌ব বল্‌লেই কি লোকে মরে যায়?"

আঁচলে চোখের জল মুছিয়া রাণী বলিল, "মরে না ব'লেই বুঝি মর্‌ব মর্‌ব ব'লে আমায় ভয় দেখাতে আসিস্? মর্‌তে হয় মর্‌বি, বাঁচতে হয় বাঁচবি, আমার তাতে কি?"

হাসিতে হাসিতে হাসি বলিল, "কিছু নয় যদি, তবে তুমি কাঁদছ কেন দিদি?"

রাগে চীৎকার করিয়া বলিল, "বোয়ে গেছে আর কাঁদ্‌তে। বেরো আবাগী, আমার সাম্‌নে হ'তে দূর হ। ধন্যি সতীন্ যা হোক্, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে।"

হাসি হাসিতে হাসিতে রাণীর সম্মুখ হইতে ছুটিয়া পলাইল।

রাণী দীনুর মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ দীনুর মা, এ গাঁয়ে কেউ রাঁধুনি রাখে না?"

দীনুর মা সাশ্চর্য্যে বলিল, "ওমা, এ আবার একটা গাঁ, এখানে আবার রাঁধুনী রাখবে?"

রাণী। বলিল, "ঝি চাকরাণী?"

দীনুর মা বলিল, "তা রাখতে পারে, কেন বল দেখি?"

রাণী। তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। একটা চেষ্টা দেখতে পারিস্?

দীনুর-মা। তা পার্‌ব না কেন? কার জন্যে?

রাণী আমার জন্যে।

দীনুর মা অবাক্ হইয়া বিস্ফারিত দৃষ্টিতে রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রাণী বলিল, "আ মর্, হাঁ ক'রে চেয়ে রইলি যে?"

দীনুর মা বলিল, "তুমি অবাক্ করলে দিদিঠাক্রুণ ; তুমি ঝি-গিরি করবে ?"

রাণী। কেন, "ঝি-গিরি কি মন্দ কাজ ?"

দীনুর মা। মন্দ কাজ না হোক্, ছোট কাজ তো বটে।

রাণী। তা হোক্, তুই দেখ্।

দীনুর মা। দেখলাম যেন, কিন্তু তোমাকে রাখবে কে ?

রাণী। যাদের দরকার।

দীনুর মা। যাদের দরকার, তারা আমার মত ঝি রাখবে, তোমার মত ঝি রাখতে সাহস করবে না।

রাণী। কেন বল দেখি ?

দীনুর মা। তোমার যুগ্যি মাইনে যোগাতে পারবে না।

রাণী। আমি বেশী মাইনে চাই না।

দীনুর মা হাসিয়া বলিল, "তোমাকে চাইতে হবে কেন দিদিঠাক্রুণ ?"

রাণীও হাসিতে হাসিতে বলিল, "সেধে দেবে না কি ?"

দীনুর মা। সেধে পায়ে ঢেলে দেবে।

রাণী। পায়ে দিয়ে কাজ নাই, এখন হাতে পেলেই বর্ত্তে যাই। নে, তোর রঙ্গ রাখ, এখন চেষ্টা দেখবি কি না বল।

দীনুর মা। দেখব বই কি দিদি, তুমি বল্ছ, আর দেখব না ?

রাণী গম্ভীরভাবে বলিল, "রহস্য নয় দীনুর মা, আমার দিব্যি, তুই একটা কাজের যোগাড় ক'রে দে।"

দীনুর মা হাত নাড়িয়া বলিল, "দেখবো গো দেখবো, অত দিব্যি-দিলেষা কেন। তা আমি যোগাড় ক'রে দেব, আমাকে কি দেবে ?"

"তোকে আবার কি দিতে হবে ?"

দীনুর মা। দালালী।

রাণী হাসিয়া বলিল, "তা দেখা যাবে।"

দীনুর মা। দেখা যাবে নয়, দালালী চাই।

দীনুর মা চলিয়া গেল। হাসি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের দালালী দিদি ?"

রাণী বলিল, "কিসের আবার ? ও মাগী রহস্য কচ্ছিল।"

হাসি। রহস্য নয় দিদি, আমি শুনেছি, তুমি ঝি-গিরি করবে ?

মুখ ফিরাইয়া লইয়া রাণী বলিল, "করি করব, তোর তাতে কি ?"

হাসি ডাকিল, "দিদি !"

ধরা-গলায় তর্জ্জন করিয়া রাণী বলিল, "দেখ্, হাসি, আমার সাম্‌নে হ'তে যা, আমায় আর জ্বালাস্ নে।"

হাসি জলভরা চোখে একবার দিদির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। রাণী দাঁড়াইয়াছিল, বসিয়া পড়িল। তাহার বুকের ভিতর তখন আগুন জ্বলিতেছিল। হায়, তাহাকে লোকের দ্বারে দাসীবৃত্তি করিতে হইল। কিন্তু তা ছাড়া যে আর উপায় নাই। হাসিকে—খোকাকে বাঁচাইতে হইলে ইহাই যে তাহার একমাত্র অবলম্বন। ওগো, তুমি ফিরে এস, আমার জন্য নয়, হাসির জন্য ফিরে এস, এই ক্ষুদ্র অনাথ শিশুর জন্য ফিরে এস। অভিমানের বশে আমি অনেকবার তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছি, কিন্তু আর ফেরাব না ; আমি রাগ, অভিমান, গর্ব্ব সব ত্যাগ ক'রে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়্ব। তুমি একবার ফিরে এস।

আর হাসি বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া আকুল-প্রাণে ডাকিতে লাগিল, "কোথায় তুমি সর্ব্বসন্তাপবিনাশন, হতাশের আশ্রয়, দুঃখীর সান্ত্বনাস্থল মৃত্যু, তুমি এস, আসিয়া আমার সকল জ্বালা জুড়াইয়া দাও।"

খোকা ঘুম হইতে উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল, হাসি সে দিকে ফিরিয়া চাহিল না। রাণী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কানের মাথা খেয়েছিস্ না কি ? ছেলেটা যে দম আটকে গেল।"

হাসি কোন উত্তর দিল না, উঠিল না, পাশ ফিরিয়া শুইল।

দীনুর মা দীনুকে ডাকিয়া বলিল, "আর শুনেছিস দীনু, বাম্‌নী ঝি-গিরি করবে।"

দীনু একটু বিস্ময়ের সহিত মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ বাম্‌নী গা মা ?"

মা বলিল, আবার কে, ঐ বেহারীর বৌ। মা গো মা, অসাধ্যিসাধন মেয়ে।"

দীনু হাসিয়া বলিল, "দূর্। এও অবার কথার কথা ?"

দীনুর মা বলিল, "কথার কথা নয় রে, সত্যি।"

মাকে ধমক দিয়া দীনু বলিল, "হাঁ সত্যি। তোকে বল্‌তে গেছে সত্যি।"

দীনুর মা। হাঁ রে, সত্যি, আমাকে সে নিজে বলেছে।

দীনু। কি বলেছে ?

দীনুর মা। বল্লে, দীনুর মা, আমাকে একটা ঝি-গিরি যোগাড় ক'রে দিতে পারিস্ ?

দীনু। তুই কি বল্লি ?

দীনুর মা। বল্লুম, কেন পারব না, খুব পারি।

দীনু। তা তুই যোগাড় ক'রে দিবি না কি ?

দীনুর মা। কেন দেব না?

দীনু। কোথায় দিবি?

দীনুর মা। যমের বাড়ীতে।

দীনু বসিয়া মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল, "বামুনের মেয়ের মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।"

দীনুর মা বলিল, "তাও বলি, সাধে কি হয়, এ দিকে যে চলে না।"

দীনু বলিল, "চলে না বোলে কি এমন কাজ কত্তে হবে? লোকে বল্‌বে কি? আমরাই বা মুখ দেখাব কেমন ক'রে?"

দীনুর মা। তা তো বটেই। তবে আমরাই বা ক'র্‌ব কি? নিজেদেরই দিন চলে না।

দীনু। চ'লে না তবু তো চলে যাচ্ছে। যে চালাবার, সেই চালাবে। এক পাটী ধান আছে, ওর আধটা আমাদের থাক্, আধটা মাঠাকৃরুণকে দিয়ে আসি।"

দীনুর মা। তাই যা হয় কর। তবে ওতেই বা ক'দিন চল্‌বে?

দীনু গামছাখানা কোমরে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, "যদ্দিন চলে চলুক, তার পর না হয় দু'কুড়ি 'বাড়ি' ক'রে আনা যাবে।"

দামিনী স্বামীকে বলিল, "শুনেছ গা, ও বাড়ীর রাণী না কি ঝির কাজ কর্‌তে চায়।"

রামসদয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বটে; ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ। ঐ বেটীই তো মন্ত্রণা দিয়ে মেয়েটার মাথা খেলে।"

দামিনী বলিল, "তা যায় যাক্, বামুনের মেয়ে কষ্টে পড়েছে, কিছু দিলে থুলে হয়।"

দুই হাত নাড়িয়া রামসদয় বলিলেন, "আরে রামঃ! একটি কড়াও না। ওর শ্বশুর কি আমাদের কম করেছে, এক ঘ'রে পর্য্যন্ত কর্‌বার চেষ্টায় ছিল। ওর চেয়ে গরীব দুঃখীকে এক মুঠো দেবে, যে পুণ্যি হবে।"

একটু ভাবিয়া দামিনী বলিল, "আমি কি আর অমনি দিতে বল্‌ছি? আমি তো একা পেরে উঠি না, একটা লোক রাখলে ভাল হয়। তা ওকে রাখলে চলে না?"

রামসদয় বলিলেন, "পাগল আর কি? ও সব নষ্ট-দুষ্ট মেয়েকে বাড়ী ঢুকৃতে দিতে আছে? ওদের মুখ দেখলেও পাপ হয়।"

ষট্‌ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

রাণী একখানি পত্র লইয়া হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিলে হাসি উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কার চিঠি দিদি?"

রাণী বলিল, "সইএর চিঠি।"

হাসি ব্যস্ততার সহিত বলিল, "তোমার সই? বেঁচে আছে? কোথায় আছে? কি লিখেছে?"

রাণী বলিল, "একে একে জিজ্ঞাসা কর্। সই এখনো বেঁচে আছে, কাশীতে আছে, শীগ্‌গীর বৃন্দাবনে যাবে। আর লিখেছে—"

রাণী হাসির মুখের উপর একটা মৃদুকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মুখ মুচকাইয়া হাসিল। হাসি তীব্র উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "আর—আর কি লিখেছে?"

মৃদু হাসিয়া, চোখ ঘুরাইয়া রাণী বলিল, "বল্ দেখি, আর কি লিখেছে?"

হাসি দুই হাতে মুখ ঢাকিল। মৃদু হাসিয়া রাণী বলিল, "তবে শোন্।" রাণী চিঠি পড়িতে আরম্ভ করিল, হাসি নিশ্বাস রোধ করিয়া তাহা শুনিতে লাগিল।

শান্তি লিখিয়াছে,—

"সই! আমি এখনো বেঁচে আছি। মরণকে অনেক ডাকাডাকি কর্‌লাম, কিন্তু সে এলো না, কাছাকাছি এসেও ফিরে গেল। কাজেই বেঁচে থাকৃতে হয়েছে। আগে এ জন্য দুঃখ থাকৃলেও এখন আর তা নাই।

তুমি বোধ হয় আমার বিয়ের কথা শুনেছিলে, শুনে নিশ্চয়ই আমাকে অনেক গাল দিয়েছিলে। কিন্তু তোমার গাল দেওয়াই বৃথা হ'লো, আমার বিয়ের ফুল আর ফুটল না। সারদাবাবু অনেক চেষ্টা কর্‌লেন, গাছের গোড়ায় অনেক জল ঢাল্‌লেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না, বিধবার ভাঙ্গা কপাল আর যোড়া লাগল না। শেষে মনের দুঃখে তিনি বিরাগী হ'য়ে লোকালয়ের সংস্রব ত্যাগ ক'রে জেলখানার অতিথি হয়েছেন। শুন্‌তে পাই, এক অভাগিনী বেশ্যাকে সৎপথে আন্‌বার জন্য তাকে মদ খাইয়ে অজ্ঞান ক'রে, তার গহনাপত্রগুলি হাত করেছিলেন। আহা, সারদাবাবুর মত পরোপকারী লোকের কি দুর্গতি!"

পত্র-পাঠ ত্যাগ করিয়া রাণী হাসিতে হাসিতে বলিল, "মুখে আগুন, এততেও রঙ্গ যায় না।"

রাণী পড়িতে লাগিল,—

"তা বিয়েটা না হওয়ায় একটু দুঃখ হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন সে দুঃখ নাই। কেন জান? এখন আমি

একটি ভাই পেয়েছি, পেটে না ধ'রেও একটি ছেলে পেয়েছি। সে কে জান? তার কথা তোমায় বলেছিলাম। সে সেই গাঁজাখোর গোপীনাথ। সই! এত দিনে বুঝেছি, গাঁজাখোরদের ভিতরেও দেবতা থাকে, আর লেখাপড়াজানা ভদ্রলোকদের ভিতরেও পিশাচ থাকে!

এখন কাশীতে আছি। শীগ্‌গীর গুপীদার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাব। বৃন্দাবনবাসিনী হব না, ইচ্ছা আছে, ফিরে এসে গুপীদাকে সংসারী করবার চেষ্টা করব। সে কিন্তু বিয়ে করতে চায় না। তাও কি হয়? আমি জোর ক'রে তার বিয়ে দেব। সে আমার জন্য কি কষ্ট বুক পেতে সয়েছে, তা আমি জানি। আমার কি তাকে সুখী করবার চেষ্টা করা উচিত নয়? আমি জানি, আমি জোর ক'রে ধরলে সে না বলতে পারবে না।

এতক্ষণ নিজের কথাই বললাম, এবার তোমার কথা বলি। বেহারীদার মতি ফিরেছে। গতিও শীগ্‌গীর ফিরবে। আর সে গতিটা যে তোমার দিকেই হবে, তা আমি নির্ভয়ে ব'লে বলতে পারি। কেন না, তুমিই তাঁর অগতির গতি। কিন্তু ভাই অগতির গতি! তুমি যেন অভিমান ক'রে আবার সব নষ্ট ক'র না। মেয়েমানুষের অভিমান, তা সেটা সীমাবদ্ধ হওয়াই উচিত, এটা বোধ হয় এখন হাড়ে হাড়ে বুঝেছ। সুতরাং তোমাকে বেশী উপদেশ দেওয়া বৃথা। আপাততঃ কৃত-পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বেহারী-দা আমাদের সঙ্গী হলেন। তীর্থের মহিমায় যদি মনের ময়লা কাটে!

শাঁখা, শাড়ী, সিঁদুর প'রে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে কেমন সাজিয়েছে, তা আর শুনবার অবকাশ হ'ল না। সেই আগের মত শুধু হাতে রুখু মাথায় থান কাপড় পরেই তোমার কাছে বিদায় চাইছি। আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই বেশেই এক দিন সংসারের কাছে বিদায় নিতে পারি। ইতি—

তোমার সই।"

রাণী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। হাসি চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল।

শান্তির পত্রের কথা রামসদয়ের কানে গেলে তিনি মস্তক-সঞ্চালনে সুদীর্ঘ শিখা কম্পিত করিতে করিতে সগর্ব্বে বলিলেন, "তাই তো বলি, আমার মেয়ে কি কখন অধর্ম্ম করতে পারে? ত্রিসন্ধ্যাপূত ব্রাহ্মণ আমি।"

স্বামীর মুখের কাছে হাত নাড়িতে নাড়িতে দামিনী শ্লেষের স্বরে বলিল, "ভারী বামুন। বিয়ে করলে না বটে, কিন্তু সেই ছোঁড়াটাকে নিয়ে তো ব্রজবাসিনী হ'তে চললো?"

রামসদয় হাসিয়া বলিলেন, "তা যায় যাক্, কুলে তো কালি দিলে না।"

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া দামিনী বলিল, "নাঃ, ব'তি জেলে কুল উজ্জ্বল ক'রে দিয়েছে!"

"নেহাৎ ছেলে মানুষ" বলিয়া রামসদয় হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন এবং নামাবলী স্কন্ধে ফেলিয়া পাড়ায় আপনার ব্রাহ্মণত্বের এই গৌরব প্রচারের জন্য সত্বর বাটীর বাহির হইলেন।

সপ্তত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

"সত্যি দিদি?"

"কি সত্যি হাসি?"

"তিনি ফিরে আসছেন?"

"সই তো তাই লিখেছে।"

"কিন্তু তোমার কি মনে হয়?"

"তোর কি মনে হয় বল্ দেখি?"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হাসি বলিল, "না, তুমিই বল।"

ঈষৎ হাসিয়া রাণী বলিল, "আমার বোধ হয়, নিশ্চয় আসবেন।"

হাসি। এসে যদি আমাকে দেখতে পান?

হাসির মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে রাণী বলিল, "দেখতে পেলে খুসী হবেন, তোকে কত আদর করবেন।"

শঙ্কিত স্বরে হাসি বলিল, "না দিদি, খুসী হবেন না, রাগ করবেন।"

রাণী সহাস্যে বলিল, "দূর ছুঁড়ি!"

হাসি বলিল, "সত্যি দিদি, তিনি খুব রাগ করবেন।"

রাণী। হাঁ, তোকে বলেছে, রাগ করবেন।

হাসি। হাঁ, তিনি নিজের মুখে বলেছেন, আমিই তাঁর সকল কষ্টের মূল। আমি বেঁচে থাকলে তিনি সুখী হবেন না দিদি।

একটু রাগিয়া রাণী বলিল, "আর তুই ম'লেই বুঝি তার চারপো সুখ হবে।"

হাসি বলিল, "ঠিক তাই।"

রাণী। তোর মাথা। যে তোর মত স্ত্রীকে হারায়, সে নিতান্ত অভাগা।

হাসি। না, খুব ভাগ্যিমান্। দিদি, আমাকে বিয়ে ক'রেই তাঁর যত কষ্ট, যত দুর্গতি। তিনি নিজের মুখে এ কথা বলেছেন।

রাণী হাসিয়া বলিল, "ওঃ, তাই বুঝি তোর রাগ হয়েছে?"

রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসি একটু বিস্ময়ের স্বরে বলিল, "রাগ? রাগ কেন হবে দিদি?"

রাণী। রাগ হয় নি তো মরতে চাইছিস্ কেন?

হাসি। আমি বেঁচে থাক্‌তে তিনি তো সুখী হবেন না। আমি যে তাঁর যোগ্য স্ত্রী নই।

রাণী। তুই যদি অযোগ্য, তবে যোগ্য কে হাসি?

হাসি। তুমিই তাঁর যোগ্য। তাঁর কিসে সুখ, কিসে দুঃখ, তা তুমিই বেশ জান, আমি তা জানি না, বুঝতে পারি না, এ কথা তিনি কত দিন বলেছেন। আশীর্ব্বাদ কর দিদি, তিনি ফিরে আসবার আগেই যেন আমার সব শেষ হয়ে যায়।

রাণী মুখ ফিরাইয়া লইল; হাসি জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

একটু পরে রাণী জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁকে দেখতে তোর সাধ যায় না?"

চোখ মেলিয়া মৃদু হাসিয়া হাসি বলিল, "খুব সাধ যায় দিদি, আর সাধ যায় খোকাকে তাঁর কোলে দিতে। কিন্তু আমি সে সাধ পূর্ণ কর্‌তে চাই না, তুমিই খোকাকে তাঁর কোলে দিও, তা হ'লেই আমার জন্ম সার্থক হবে।"

কষ্টে চোখের জল চাপিয়া রাণী বলিল, "ছি হাসি, অমন কথা বল্‌তে আছে? স্বামীকে ফেলে, খোকাকে ফেলে তুই কোথায় যাবি? কোথায় গিয়ে সুখী হবি?"

হাসি আবার হাসিল, ক্ষীণ পাণ্ডুর মেঘের কোলে আবার চপলার ক্ষীণ স্ফুরণ হইল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্ষীণ স্বরে হাসি বলিল, "যেখানেই যাই না কেন, তিনি যদি সুখী হন, সেই যে আমার সুখ! আমার নিজের আর সুখ দুঃখ কি আছে দিদি?"

রাণী স্থির প্রোজ্জ্বল দৃষ্টিতে হাসির শান্ত-প্রফুল্ল মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল। মৃত্যু আসিয়া সে মুখে আপনার বিকট ছায়া বিস্তার করিতেছিল, কিন্তু তথাপি তাহা প্রফুল্ল—প্রশান্ত। রাণীর চোখ দুইটা জলে ভাসিয়া আসিল। সে হাসির বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চকণ্ঠে বলিল, "হাসি, তোর ক্ষুদ্র বুকের ভিতর এত ভক্তি, এত ভালবাসা, এত আত্মত্যাগ! তবে রাক্ষসি, তুই শুধু আমায় কাঁদাতে এসেছিলি কেন?"

হাসি আর উত্তর দিল না; শুধু তাহার পাণ্ডুর অধর-প্রান্তে হাস্যের ক্ষীণ জ্যোতিটুকু নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল।

* * * *

বুকের ভিতর দাবানল চাপিয়া বেহারী আসিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইল; রুদ্ধ-শঙ্কিত-কণ্ঠে ডাকিল, "রাণি!"

উদ্বেলিত-কণ্ঠে রাণী বলিল, "তুমি এসেছ?"

বেহারী বলিল, "হাঁ, এসেছি; তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।"

রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বেহারীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল, উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারায় স্বামীর পদদ্বয় অভিষিক্ত করিতে করিতে বলিল, "ওগো, তুমি আমায় ক্ষমা কর। তুচ্ছ অভিমানের বশে তোমায় আমি চিন্‌তে পারি নাই, কিন্তু হাসি আমায় চিনিয়ে দিয়ে গেছে।"

বেহারী রুদ্ধ বিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হাসি চ'লে গেছে।"

কাঁদিতে কাঁদিতে রাণী বলিল, "হাঁ, সে চ'লে গেছে। আমার রাগ, অভিমান, গর্ব্ব সব নিয়ে, তোমার অবজ্ঞা, অনাদর, ঘৃণা সব তুচ্ছ ক'রে, চির সৌভাগ্যবতীর মত হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে গেছে।"

বেহারী সেইখানে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মাথা টিপিয়া ধরিল।

রাণী উঠিয়া চোখের জল মুছিল; তার পর স্বামীর হাত ধরিয়া শান্ত-স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, "ছি, উঠে এস।"

বেহারী নীরব, নিশ্চল।

রাণী ছুটিয়া ঘরে ঢুকিল, এবং খোকাকে লইয়া গিয়া স্বামীর কোলে তুলিয়া দিল। বেহারী উদাস-দৃষ্টিতে রাণীর মুখের দিকে চাহিল। রাণী বলিল, "হাসির দান।"

বেহারী দুই হাত দিয়া জড়াইয়া সেই ক্ষুদ্র শিশুকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল; তাহার দরপ্রবাহিত অশ্রুধারায় শিশুর মস্তক অভিষিক্ত হইতে লাগিল।

সমাপ্ত

মণির বর

(সামাজিক উপন্যাস)

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত

উৎসর্গ

স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর

শ্রীচরণোদ্দেশ্যে

উৎসৃষ্ট হইল।

গ্রন্থকার

বিজ্ঞাপন

"মণির বর" প্রকাশিত হইল। এখানিও সামাজিক উপন্যাস, সুতরাং সমাজের দোষ গুণ যতটা পারিয়াছি, দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। তবে যাহা দেখাইব মনে করিয়াছিলাম, নানা কারণে তাহা পারিলাম না। যদি কখন ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হয়, তবে সেই সময়ে এ ক্ষোভটুকু দূর করিবার চেষ্টা করিব।

"অভিমান" যাঁহাদের নিকট আদরণীয় হইয়াছে, 'মণির বর'ও তাঁহাদের নিকট আদর পাইবে বলিয়া আশা করি। ইতি—

কলিকাতা,
শ্যামপুকুর,
আষাঢ়, ১৩২৪

শ্রীনারায়ণচন্দ্র শর্ম্মা।

মণির বর

প্রথম পরিচ্ছেদ

"ওলো মণি, ও কালামুখী, হতভাগী, কানের মাথা কি খেয়েছিস্?"

দিদিমার কণ্ঠনিঃসৃত মধুর ও তদপেক্ষা সুমধুর সম্বোধনবাণী শ্রবণে আপ্যায়িত হইয়া মণি ছুটিয়া আসিল এবং ভূলুণ্ঠিত অঞ্চলটা গুটাইয়া কাঁধের উপর ফেলিতে ফেলিতে সহাস্যে বলিল, "না দিদিমা, এখনও তোমার মত একেবারে খেতে পারি নাই।"

দিদিমার ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল; তিনি কণ্ঠস্বর আরও উচ্চে তুলিয়া ডান হাতখানা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "মরণ আর কি, হাস্‌তে একটু লজ্জাও করে না। ষোল বৎসরের ধেড়ে মেয়ে, বর জুটলো না, আবার পোড়ারমুখে হাসি!"

ষোড়শবর্ষীয়া না হইলেও চতুর্দ্দশবর্ষীয়া মণি পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "তা দিদিমা, তুমি যদি বল, তা হ'লে না হয়, একটা বর জুটিয়ে নিই। তখন হাস্‌লে তো আর দোষ হবে না?"

মুখভঙ্গী করিয়া দিদিমা চড়া গলায় বলিলেন, "তাই বর জোটাতেই বুঝি দিনে দুপুরে পাড়ায় নেচে বেড়াস্?"

মণি মুখখানাকে অস্বাভাবিক গম্ভীর করিয়া বলিল, "মাইরি দিদিমা, পাড়ায় একটিও বর নাই; আর তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি ক'রে বল্‌তে পারি, আমি মোটেই নাচ্‌তে পারি না।"

দিদিমা রাগে জ্বলিয়া বলিলেন, "দেখ মণি, কথায় কথায় যদি আমাকে এত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিস্, তা হ'লে ভাল হবে না বল্‌ছি, খেংরা মেরে বিদেয় ক'রে দেব।"

মণির কৃত্রিম গম্ভীর মুখখানা এবার সত্যসত্যই গম্ভীর হইয়া আসিল। চোখ দু'টা ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। দিদিমা তাহা লক্ষ্য করিলেন; তাঁহার সুরটা যেন নরম হইয়া আসিল। তিনি অপেক্ষাকৃত কোমল-স্বরে বলিলেন, "সাধে কি এমন কথা বলি, তোর আক্কেলকে বলি। ঠিক দুপুর বেলা কোথায় গিয়েছিলি?"

মণি মাথা নীচু করিয়া ক্রোধগম্ভীরস্বরে বলিল, "চুলোয়।"

দিদিমা বলিলেন, "মেয়ের কথার শ্রী দেখ। ইচ্ছে কর্‌লেই যদি চুলোয় যাওয়া যেত, তা হ'লে এতদিন এই বুড়ীকে যমযন্ত্রণার উপর তোদের এত বাক্যযন্ত্রণা সইতে হ'ত না।"

দিদিমার গলার স্বরটা গাঢ় হইয়া আসিল। মণি একটু লজ্জা অনুভব করিয়া বলিল, "কোথায় আর যাব? সইদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম।"

দিদিমা। সেখানে কেন? ঘরে কি জায়গা নাই? একে তো ঘরে আইবুড় মেয়ে থাকলে লোকে কত কথা বলে, তার উপর এই রকম পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ালে পাঁচজনে যে মুখে চুণ-কালি দেবে।

মণি। দেয় দেবে, তাই ব'লে আমি দিন-রাত তোমার কাছে মুখটি বুজে ব'সে থাক্‌তে পারব না।

দিদিমার সুপ্ত ক্রোধ আবার জাগিয়া উঠিল; তিনি মণির মুখের কাছে হাত নাড়িতে নাড়িতে তীব্র-স্বরে বলিলেন, "তা পার্‌বে কেন, রাস্তায় রাস্তায় খেমটা নেচে বেড়াবে।"

মণিও রাগিয়া উত্তর করিল, "তাই নেচে বেড়াব।"

দিদিমা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "বটে লা কালামুখী, তোর তেজ যদি ভাঙ্গতে না পারি, আমার নাম ত্রিপুরা বাম্‌নীই নয়।"

"নিশ্চয় নয়।"

এক সৌম্যকান্তি যুবক সম্মুখে আসিয়া সহাস্যে বলিল, "নিশ্চয়ই নয়।"

ক্রোধের উচ্ছ্বাসে দিদিমার অঙ্গবস্ত্র স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল; তিনি তাড়াতাড়ি তাহা সামলাইয়া লইয়া মৃদুহাস্য সহকারে বলিলেন, "বিনোদ যে? এস ভাই এস।"

মণি আর সেখানে দাঁড়াইল না, ধীর সগর্ব্ব পদ-ক্ষেপে বাড়ীর ভিতর ঢুকিল।

দিদিমাও বিনোদকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিলেন, এবং তাহাকে বসিতে আসন দিয়া তাহার ও তাহার মাতার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বিনোদ

তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কার তেজ ভাঙ্‌ছিলে দিদিমা, মণির না কি?"

দিদিমা ঈষৎ লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আর ভাই, কেন বল, রোগে, শোকে তো দেহ জরজর, তার উপর ঐ এক হতভাগা মেয়ে এসে আমার রাস্তা আগলে দাঁড়িয়েছে। ওকে এক জনের হাতে দিতে না পার্‌লে মরণেও আমার সোয়াস্তি নাই। তা যেটের কোলে পা দিয়ো চোদ্দয় পড়েছে, এ পর্য্যন্ত তো বর জুটলো না। একে পয়সা নাই, তায় মা-বাপ-খেকো মেয়ে, সহজে কি কেউ নিতে চায়? তার উপর ও যদি দিনে দুপুরে পাড়ায় পাড়ায় নেচে বেড়ায়, তা হ'লে লোকে কি বল্‌বে বল তো?"

বিনোদ হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই ভাল বল্‌বে না। ঘরের ভিতর না হয় দু' একবার নাচ্‌লে, কিন্তু রাস্তা-ঘাটে নাচাটা কি ভাল?"

বিনোদ ঘরের ভিতর বক্র কটাক্ষপাত করিল। মণি তাহার দিকে রোষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল।

দিদিমা বলিলেন, "এই কথা বল্‌তে গেলেই মেয়ের রাগ, মুখে মুখে সমান উত্তর। আমার ভাই এত জ্বালা সহ্য হয় না। রমা আসুক, আর অত রাজপুত্তুরের খোঁজে কাজ নাই, একটা যেমন তেমন দেখে ওকে বিদেয় ক'রে দিক্‌।"

বিনোদ বলিল, "মন্দ যুক্তি নয়। আমার সন্ধানে একটি পাত্র আছে; দেখতে শুন্‌তে সব ভাল, তবে বয়সটা একটু বেশী, পঞ্চাশের কিছু উপর।"

দিদিমা বলিলেন, "ঐ বা কোন পাঁচ বছরের খুকীটি।"

মৃদু হাসিয়া বিনোদ বলিল, "তা বটে, তবে পঞ্চাশ বছরের বুড়োই দেখা যাক্‌।"

বিনোদ আর একবার বক্রদৃষ্টিতে ঘরের দিকে চাহিল, কিন্তু এবার আর মণিকে পূর্ব্বস্থানে দেখিতে পাইল না, কেবল অন্তরাল হইতে চুড়ির ঠন্ ঠন্ শব্দ শুনিতে পাইল। বিনোদ উৎসাহের সহিত বলিল, "কি বলেন দিদিমা, তা হ'লে চেষ্টা দেখি?"

দিদিমা মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া, ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তা দেখ ভাই, রমাও আসুক, দেখি কি বলে। তার যে আবার রাজপুত্তুর না হ'লে পছন্দ হয় না।"

বিনোদের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল। দিদিমা বলিলেন, "সে এক পাগল। বলে কি জান, এমন সোনার পিত্তিমে জলে ফেলে দেব?"

বিনোদ মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া বলিল, "সেটাও বড় মিছে কথা নয়।"

দিদিমা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "মিছে তো নয়ই। তবে কি কর্‌ব ভাই, আমাদের কি সে কপাল?"

দিদিমা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বিনোদ দিদিমার মৌখিক ও আন্তরিক দুইটা অভি-প্রায়ই অবগত হইয়া মনে মনে হাসিল; প্রকাশ্যে বলিল, "তা হ'লে দিদিমা, যুক্তি ক'রে যা হয় একটা ঠিক ক'রে ফেলুন। যদি বুড়োর দরকার হয়, আমাকে খবর দেবেন।"

দিদিমা হাসিয়া বলিলেন, তুমি বুঝি এখন কেবল বুড়োর সন্ধানেই আছ?"

বিনোদ বলিল, "ঠিক তাই। ছোঁড়া-ছুঁড়ী ছেড়ে এখন বুড়োবুড়ী নিয়েই কারবার আরম্ভ করেছি।"

দিদি। ছোঁড়া ছাড়, কিন্তু ছুঁড়ী ছাড়লে তো চল্‌বে না। তুমি কি মনে করেছ, আর বিয়ে-থা কর্‌বে না?

বিনোদ। এমন বিশ্রী কথা একটুও মনে করি না দিদিমা। বাঙ্গালীর ছেলের দু'চার দিন উপোষ দিলেও বরং চ'লে যায়, কিন্তু বিয়ে না কর্‌লে একটি বেলাও চলে না। একটা কি বল্‌ছেন, আমি পাঁচ সাতটা বিয়ে কর্‌তেও রাজী।

দিদি। আগে একটা ক'রেই তার প্রমাণ দেখাও দেখি।

বিনোদ। নিশ্চয়ই দেখাব। কেবল মনের মত পাত্রী পাওয়ারই যা বিলম্ব।

দিদি। কি রকম পাত্রী চাই? বুড়ী না কি?

বিনোদ। ঠিক আপনার মত বুড়ী নয়, তবে নেহাৎ ছুঁড়ীও না হয়।

দিদিমা হাসিয়া উঠিলেন। তার পর ঘরের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওলো মণি, বিনোদকে দু'টো পান দিয়ে যা না। এটাও কি ব'লে দিতে হবে?"

পরে বিনোদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এত বড় মেয়ে হয়েছে ভাই, কিন্তু একটুও জ্ঞানবুদ্ধি হলো না। তাই ভাবি, এর পর পরের ঘরে গেলে কি হবে?"

বিনোদ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "একটা মস্ত ভাবনার কথা বটে।"

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, কিন্তু পান আসিল না; কেহ যে ঘরের ভিতর পান সাজিবার উদ্যোগ করি-তেছে, এমনও কিছু শোনা গেল না। দিদিমা অসহিষ্ণুভাবে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "পান কোথায় লো? কথাটা কি কানে গেল না?"

ঘরের ভিতর হইতে ক্রোধবিস্ফুরিত চাপা গলায় উত্তর আসিল, "না।"

বিনোদ বলিল, "থাক্, থাক্, ও বেচারী যখন পান সাজ্‌তে জানে না, তখন আর ওকে লজ্জা দিয়ে কাজ কি ?"

বিনোদের কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের ভিতর পানের বাটার ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠিল, এবং অবিলম্বে একখানা ছোট রেকাবীতে চারি খিলি পান রাখিয়া মণি দরজার কাছ হইতে রেকাবীটা সজোরে বিনোদের দিকে ঠেলিয়া দিল। রেকাবীটা আসিয়া বিনোদের হাঁটুতে লাগিল। বিনোদ হাসিতে হাসিতে দুই খিলি পান মুখে পুরিয়া এবং বাকী দুই খিলি হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অতঃপর একবার ঘরের দিকে, তার পর দিদিমার দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ তবে আসি দিদিমা, মণি বেশ অতিথি-সৎকার শিখেছে। প্রহারের সঙ্গে সঙ্গে আহার, এ একরকম মন্দ ব্যবস্থা নয়।"

বিনোদ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। দিদিমা উঠিয়া মণির সম্মুখে গিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "হাঁলা পোড়ারমুখী, তোর রকমখানা কি ?"

মণি ঘাড় উঁচু করিয়া, চোখ নামাইয়া বলিল, "আমার ঐ রকম।"

মুখ ফিরাইয়া দিদিমা বলিলেন, "মুখে আগুন তোমার রকমের।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় যখন ধুমধামের সহিত বেড়-গাঁয়ের শ্রীপতি গাঙ্গুলীর পুত্র দিনেশ গাঙ্গুলীর সহিত কন্যা অপর্ণার বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন তিনি বা তদীয় গৃহিণী স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, এ জন্য পরে তাঁহাদিগকে অনুতাপ করিতে হইবে। আত্মীয়-বন্ধুরা পাত্রের চরিত্রের উল্লেখ করিয়া অনেক নিষেধ করিলেও কুল বা বিদ্যাবত্তা বিষয়ে কোন ত্রুটী না দেখিয়া ব্রজনাথ কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না, গৃহিণীর সহিত একমত হইয়া তিনি শ্রেষ্ঠ কুলীন ও বিদ্বান্ জামাতার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কিন্তু শেষে আত্মীয়গণের কথাই ফলিল; স্বামি-গৃহে অশেষ প্রকারে নির্য্যাতিতা অপর্ণা অচিরাৎ সপত্নীসমাগম সম্ভাবনায় যে দিন কঙ্কালসার দেহে প্রহারের নিদারুণ চিহ্ন এবং ক্রোড়ে এক বৎসরের শিশু কন্যা মণিকে লইয়া পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইল, সে দিন ব্রজনাথ কন্যার অবস্থা ও জামাতার আচরণ দর্শনে মর্ম্মাহত হইলেন; তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। গৃহিণী ত্রিপুরাসুন্দরী চোখের জল মুছিয়া কন্যার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মাতৃহৃদয়ের অসীম স্নেহধারা, পিতৃহৃদয়ের নিদারুণ ব্যাকুলতা, চিকিৎসকের প্রাণপণে যত্ন, কিছুই অপর্ণাকে আরোগ্যের পথে আনিতে পারিল না, তাহার রোগজীর্ণ শরীর দিন দিন জীর্ণতর হইয়া পড়িতে লাগিল। তারপর যে দিন স্বামীর পুনরায় বিবাহের সংবাদ আসিল, সে দিন সে মণিকে মাতার ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া, ও ব্যাকুল দৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া অন্তিম নিশ্বাস গ্রহণ করিল। শোকে অনুতাপে ব্রজনাথের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। অল্প দিনের মধ্যেই তিনিও কন্যার অনুসরণ করিলেন। দুঃসহ শোকভারের সহিত দেড় বৎসরের দৌহিত্রীকে বুকে চাপিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী একা শূন্য সংসারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মাতৃহীনা পিতৃস্নেহ-বঞ্চিতা মণি কতক আদরে কতক অনাদরে মাতামহীর দ্বারা প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

মা-খেকো মেয়ে বলিয়াই হউক বা সংসারের উপর বিরক্তিবশতই হউক, ত্রিপুরাসুন্দরী মণিকে ততটা ভালবাসা দেখাইতে পারিতেন না। সংসারের কঠোর আঘাতে তাঁহার মেজাজটা কড়া হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং স্নেহভিখারিণী বালিকা যখনই মাতামহীর নিকট অবশ্যপ্রাপ্য স্নেহ আদায় করিতে যাইত, তখনই স্নেহের পরিবর্ত্তে গালি খাইয়া হতাশচিত্তে ফিরিয়া আসিত। তখন একমাত্র রমাদা ছাড়া তাহার বিষাদ-মলিন মুখের দিকে চাহিবার আর কেহ থাকিত না।

রমানাথ ত্রিপুরাসুন্দরী বা মণির আপনার কেহই নহে, কিন্তু পর হইলেও সে নিতান্ত আপন হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রজনাথ যখন নপাড়ায় নায়েবী করিতেন, তখন সেখানে শ্যামাচরণ ঘোষাল নামে এক ব্রাহ্মণ-সন্তানের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। শ্যামাচরণের বিষয়-আশয় যথেষ্ট ছিল। যেখানে বিষয়, সেইখানেই মামলা মোকদ্দমা। শ্যামাচরণ একবার জ্ঞাতিবিরোধে মিথ্যা মারপিটের মোকদ্দমায় পড়িয়া ব্রজনাথেরই বুদ্ধি-কৌশলে তাহা হইতে উদ্ধার পান। তদবধি তিনি ব্রজনাথকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন, এবং খুড়ামহাশয় বলিয়া ডাকিতেন। শ্যামাচরণের স্ত্রী ব্রজনাথকে বাবা বলিত, আর পাঁচ বৎসরের পুত্র রমানাথ দাদামহাশয়ের কোলে পিঠে পড়িয়া অপুত্রক ব্রজনাথের হৃদয়ে পুত্রস্নেহের আকুল বাসনা জাগাইয়া দিত।

ব্রজনাথ সহসা এক দিন শুনিলেন, জেলাকোর্টের মোকদ্দমা করিতে গিয়া শ্যামাচরণ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। সংবাদ পাইয়া ব্রজনাথ জেলায় ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সব শেষ হইয়া গিয়াছিল, শ্যামাচরণের চিতাভস্ম পর্য্যন্ত নদীগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছিল। ব্রজনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিলেন।

তার পর শ্যামাচরণের অন্তিমকালে কৃত এক উইল বাহির হইল। সে উইলে শ্যামাচরণ আপনার খুল্লতাত-পুত্র বিমলাচরণকে সম্পত্তির একমাত্র অছি করিয়া গিয়াছেন। উইল আদালতে দাখিল হইল। ব্রজনাথ উইলের প্রতিবাদ করিলেন, মোকদ্দমা চলিল, কিন্তু ব্রজনাথের প্রতিবাদ টিকিল না, শেষে প্রমাণের বলে বিমলাচরণই জয়ী হইলেন। শ্যামাচরণের স্ত্রীর হাতে নগদ যাহা কিছু ছিল, তাহা মোকদ্দমায় খরচ হইয়া গেল।

মোকদ্দমায় জয়ী হইয়া বিমলাচরণ বিষয়সম্পত্তি স্বীয় অধিকারে আনিতে আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানা ঋণের ফর্দ্দও বাহির হইতে লাগিল। প্রজা ও খাতকদের সঙ্গে মোকদ্দমা বাধিল। ব্রজনাথ বুঝিতে পারিলেন, শ্যামাচরণের সমগ্র সম্পত্তি শীঘ্রই ঋণমুক্ত হইয়া বিমলাচরণের পূর্ণ অধিকারভুক্ত হইবে, সাবালক হইয়া রমানাথকে সে সম্পত্তির চিহ্নমাত্র দেখিতে হইবে না।

শ্যামাচরণের বিধবা স্ত্রীকে অধিক দিন বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না, এক বৎসরকালমধ্যেই তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়া গেল। মৃত্যু-কালে তিনি পুত্র রমানাথকে ব্রজনাথের হাতে সঁপিয়া দিয়া গেলেন, এবং বলিয়া গেলেন, "বাবা, বিষয় চুলোয় যাক্, আমার রমাকে বাঁচিও।" ব্রজনাথ চোখের জল মুছিয়া রমানাথের ভারগ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে উইলের অছি বিমলাচরণের লুব্ধদৃষ্টির সম্মুখ হইতে অন্তরিত করিয়া আপনার বাটীতে আনিয়া রাখিয়া দিলেন।

মাতৃহীন রমানাথ পুত্রসন্তানবিহীন ত্রিপুরা-সুন্দরীর পুত্রস্থান অধিকার করিয়া বসিল। ব্রজনাথ তাহার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু একে রমানাথের বুদ্ধিবৃত্তিটা উত্তমরূপে তীক্ষ্ণ ছিল না, তাহার উপর এই অনাথ বালকের প্রতি ত্রিপুরাসুন্দরী যেরূপ অতিরিক্ত স্নেহ-যত্ন দেখাইতে লাগিলেন, তাহাতে রমানাথের শিক্ষাসম্বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা মৎস্যকুলের সংহারেই রমানাথের অধিকতর মনোযোগ দৃষ্ট হইল; পক্ষিশাবকগণের উপরেও তাহার যত্নের ত্রুটি ছিল না। সুতরাং তিন বৎসর যাবৎ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অবস্থান করিবার পর রমানাথ স্কুলের কঠোর কাষ্ঠাসন এবং তদপেক্ষা কঠোর পাঠ্যপুস্তকের বৈচিত্র্যবিহীন নীরসতা ও শিক্ষকের গাম্ভীর্যপূর্ণ বদনমণ্ডল-সান্নিধ্য হইতে আপনাকে দূরে অপসারিত করিল।

দিদিমা আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "হাঁরে রমা, লেখাপড়া ছেড়ে দিলি, খাবি কি?"

রমানাথ বলিল, "তোমার রান্না ভাত।"

দিদিমা বলিলেন, "আমি কি চিরকাল রেঁধে ভাত দেব?"

রমা। যত দিন পার দাও।

দিদিমা। তার পর?

রমা। তার পর মণি আছে। কি বলিস্ মণি?"

মণি আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিল, "রমাদা?"

রমানাথ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "কেন রে মণি?"

ডান হাতের উল্টা পিঠ দিয়া চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে মণি বলিল, "আমার শালিকটা উড়ে গেছে।"

রমানাথ কোঁচার খুঁটে তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "তার আর কি, একটা গেছে, দু'টো এনে দেব।"

ঘাড় হেলাইয়া মণি বলিল, "দাও।"

মুখভঙ্গী করিয়া দিদিমা বলিলেন, "এখনি না কি?"

দিদিমার কাছে ধমক খাইয়া মণি দুই হাতে চোখ ঢাকিল। রমানাথ তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "কাঁদিস না, আয়।

দিদিমা বলিলেন, "ঐ অভাগা মেয়েটাই তোর মাথা খেলে, রমা।"

"তা খাক্" বলিয়া রমানাথ পক্ষিশাবকান্বেষণে চলিল; মণি আহ্লাদের হাসি হাসিয়া নাচিতে নাচিতে তাহার পশ্চাৎ ছুটিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নায়েবী চাকরী করিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিলেও অমিতব্যয়িতানিবন্ধন ব্রজনাথ সামান্য জমী জমা ব্যতীত আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর দিন একটু কষ্টে চলিতে লাগিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রমানাথ এখন সে কষ্ট অনুভব করিতে পারিল, তখন তাহার মৎস্য-শীকার প্রবৃত্তি এবং পক্ষিশাবকের উপর আন্তরিক অনুরাগ

আপনা হইতেই শিথিল হইয়া আসিল। এ দিকে মণিও ক্রমে বড় হইয়া উঠিতেছে, তাহার বিবাহ দিতে হইবে এবং অর্থের অল্পাধিক্যের উপরেই সে বিবাহের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং রমানাথ অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় মনোনিবেশ করিল। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া, অনেকের উপাসনা করিয়া কলিকাতায় সওদাগরী আফিসে একটি কুড়ি টাকা বেতনের চাকরীর জোগাড় করিল এবং একটি ছোট-খাট মেসে বাসা লইল।

রমানাথ প্রথম যখন কলিকাতা যাত্রা করিল, তখন দিদিমার চোখে জল দেখা দিয়াছিল। মণি কিন্তু কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। দিদিমা তাহাকে ধমক দিলেন, রমানাথ কষ্টে চোখের জল চাপিয়া যাত্রা করিল। মণি কাঁদিয়া চোখ ফুলাইল।

রমানাথ প্রতি শনিবারে বাড়ী আসিত। মাস-কাবারে যে দিন মাহিনা পাইত, সে দিন মণির জন্য খেলানা, খাবার প্রভৃতি লইয়া আসিত। দিদিমা ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিলে রমানাথ বলিত, "আহা, ওকে দেবার আর কে আছে দিদিমা ?"

এক বৎসর পরে রমানাথের পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইলে দিদিমা তাহার বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু রমানাথ তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া নিবৃত্তি করিল। বলিল, "আগে মণির একটা গতি ক'রে দিই দিদিমা, তার পর দেখা যাবে।"

দিদিমাও বুঝিলেন, কথাটা ঠিক। মণি বড় হইয়া উঠিয়াছে, এগার ছাড়িয়া বারোয় পা দিয়াছে। সুতরাং রমানাথকে রাখিয়া আগে মণিরই বিবাহের চেষ্টা করা আবশ্যক।

বিবাহের চেষ্টা চলিল, কিন্তু চেষ্টা সফল হইল না। মেয়ে সুন্দরী হইলেও তাদৃশ অর্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকায় কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অর্থরূপ সুগন্ধিবিহীন শিমুল-ফুলের মত মেয়েটিকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল না। রমানাথের প্রতিজ্ঞা, সে এমন সোনার প্রতিমাকে যাহার তাহার হাতে তুলিয়া দিবে না। সুতরাং মণি দ্বাদশ অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশে পদার্পণ করিল, তথাপি পাত্র জুটিল না। ত্রিপুরাসুন্দরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ওরে রমা, মেয়ে যে আর রাখা যায় না।"

রমানাথ হাসিয়া উত্তর করিল, "বল কি দিদিমা, এত বড় বাড়ীতে ঐ একরত্তি মেয়েটাকে রাখা যাবে না ?"

দিদিমা। বাড়ীতে রাখা গেলে কি হবে, লোকে যে ছি ছি করছে ?

রমা। সেটা লোকের স্বভাবদোষ।

দিদিমা। কিন্তু এত বড় আইবুড় মেয়ে ঘরে রাখা কি দোষ নয় ?

রমা। যার তার হাতে এমন সোনার প্রতিমাকে তুলে দেওয়া তার চেয়েও দোষের কথা।

দিদিমা। কিন্তু হাবাতের ঘরের এই সোনার পিতিমাকে কোন রাজপুত্তুরই নিতে আসবে না।

রমানাথ দৃঢ়স্বরে বলিল, "নিশ্চয়ই আসবে। এই আমি ব'লে রাখছি দিদিমা, রাজপুত্রের সঙ্গেই মণির বিয়ে দেব, এ তুমি দেখে নিও কিন্তু।"

"পাগল" বলিয়া দিদিমা হাসিতে লাগিলেন।

মণি ত্রয়োদশ অতিক্রম করিল, কিন্তু কোন রাজপুত্রই তাহাকে গ্রহণ করিতে আসিল না। সম্বন্ধ অনেক আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু কোন সম্বন্ধই স্থায়ী হইল না; কোথাও বরপক্ষ হইতে প্রত্যাখ্যাত হইল, কোথাও বা ছেলে মূর্খ, অসচ্চরিত্র, নির্ধন প্রভৃতি হেতুবাদে রমানাথ প্রত্যাখ্যান করিল। এইরূপে কত সম্বন্ধ আসিল ও ভাঙ্গিল। ক্রমে ত্রিপুরাসুন্দরী অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন; সর্ব্বাপেক্ষা এই ভাঙ্গারাশ মেয়েটার উপরেই তাঁহায় বেশী রাগ হইতে লাগিল। ইহার ফলে মণি দিন-রাত তাঁহার নিকট তিরস্কৃত হইত।

মাতামহীর তিরস্কার মণি প্রায়ই হাসিয়া উড়াইয়া দিত, তবে মাত্রাটা যখন বেশী হইত, তখন না কাঁদিয়া থাকিতে পারিত না। দিদিমা তাহার সে ক্রন্দনে ততটা কর্ণপাত করিত না, করিত শুধু রমানাথ। মণিকে কাঁদিতে দেখিলে রমানাথ অস্থির হইয়া পড়িত; মণির একবিন্দু চোখের জল তাহার নিকট সমগ্র বিশ্বের উচ্ছ্বসিত অশ্রুসাগর বলিয়া বোধ হইত। সুতরাং মণিকে শান্ত করিতে গিয়া রমানাথ দিদিমাকেও পাঁচ কথা শুনাইয়া দিতে ইতস্ততঃ করিত না।

সম্বন্ধের পর সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় দিদিমা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, রমানাথের কিন্তু বিরক্তি বা বিরাম ছিল না। প্রায় প্রতি মাসেই সে কোন না কোন স্থানে ছেলে দেখিতে যাইত, বরপক্ষকে আনিয়া মেয়ে দেখাইত, তার পর এক পক্ষের অমনোনীত হইলে পুনরায় অন্য চেষ্টা দেখিত।

শনিবারে শনিবারে রমানাথ বাড়ী আসিত। বাড়ী আসিলে ত্রিপুরাসুন্দরী তাহাকে তাড়া দিতেন, মণির যে আর বিহাহ হইবে না, এরূপ সম্ভাবনা দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেন। রমানাথ হাসিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া সোমবারে কলিকাতায় চলিয়া যাইত।

রমানাথ মণিকে লিখিতে পড়িতে শিখাইয়াছিল, মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে ভাল বহি আনিয়া দিত। মণি সংসারের কাজকর্ম্মের দিকে বড় একটা মনোযোগ

দিত না, বই পড়িয়া, পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে খেলিয়া, গল্প করিয়া দিন কাটাইত। দিদিমা বকাবকি করিলে কখন কাঁদিত, কখন তাঁহাকে পাঁচ কথা শুনাইয়া দিত। তার পর রমানাথ বাড়ী আসিলে দিদিমা মণির অবাধ্যতাকাহিনী, আর মণি দিদিমার অত্যাচার-কাহিনী তাহার নিকট বিবৃত করিত। বাদী প্রতিবাদী উভয়ের .পরস্পর-বিরুদ্ধ অভিযোগ শুনিয়া বিচারক শুধু হাসিতে থাকিত।

কিন্তু রমানাথের মুখের হাসি ক্রমেই মিলাইয়া আসিতে লাগিল। মণির বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটা দুশ্চিন্তা ও নৈরাশ্যের অন্ধকার ক্রমেই তাহার বুকে জমাট বাঁধিয়া বসিতে আরম্ভ করিল। হায়, সংসারে কি রত্নের আদর নাই?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শনিবার সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিয়া, জামা-কাপড় ছাড়িয়া রমানাথ তামাক সাজিতে সাজিতে ডাকিল, "দিদিমা, ও দিদিমা!"

রন্ধনশালা হইতে দিদিমা উত্তর দিলেন, "কেন রে রমা?"

রমানাথ বলিল, "এ দিকে এস, শুনে যাও।"

দিদিমা বলিলেন, "একটু সবুর কর্, ভাত পুড়ে যায়।"

রমানাথ হুঁকা-কলিকা হস্তে রন্ধনশালার দরজায় গিয়া ঈষৎ রুষ্টস্বরে বলিল, "রেখে দাও তোমার ভাত, আগে কথাটা শোন।"

দিদিমা। শুধু কথায় তো পেট ভরে না, ভাত পুড়ে গেলে খাবি কি?"

"তোমার মাথা" বলিয়া রমানাথ হাতা লইয়া উনানের ভিতর হইতে আগুন টানিতে লাগিল।

দিদিমা ফুটন্ত হাড়া হইতে কয়েকটা ভাত তুলিয়া মাটীতে ফেলিয়া টিপিতে টিপিতে বলিলেন, "কি কথা রে রমা?"

কলিকায় আগুন তুলিতে তুলিতে রমানাথ একটু উদাসভাবে বলিল, "কিছু না, এমন বিশেষ কিছু নয়।"

দিদিমা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তবু বল্ না, শুনি?"

রমানাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কাজের সময় কি কথা শোনে? - রাঁধাবাড়া সেরে, আমাদের খাইয়ে-দাইয়ে বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে ধীরে সুস্থে কথাটা শুন্‌বে।"

ত্রিপুরাসুন্দরী বুঝিলেন, রমা রাগিয়াছে, তাহার রাগের মূল্যও তিনি জানিতেন। সুতরাং তিনি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। রমানাথ কলিকায় ফু দিতে দিতে বাহিরে আসিল এবং হুঁকায় দুই চারিটা টান দিয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া আপন মনে বলিল, "দূর হোক্, আমারই কি এমন মাথাব্যথা! বলে 'যার বিয়ে তার মনে নেই।' যাক্, কেন ছুটাছুটি ক'রে মরি, যেমন তেমন একটা ধ'রে দেওয়া যাক্।"

ত্রিপুরাসুন্দরী মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "হাঁরে রমা, সে সম্বন্ধটা কি হ'ল?"

বিরক্তির স্বরে রমানাথ বলিল. "কোন্ সম্বন্ধ আবার?"

ত্রিপু। সেই যে গেল শনিবারে যেখানকার কথা বলেছিলি।

একটু ভাবিয়া রমানাথ বলিল, "ও; সেই হরিরাম-পুরের কথা তো?"

ত্রিপু। তা হবে। সেই যে বল্‌লি, ঘর-বর সব ভাল।

রমা। ছাই ভাল। আরে রামঃ! ছেলে তো যেন কার্ত্তিক, তার উপর চাল নাই, চুলো নাই। সেখানে আবার মেয়ে দেয়?

সে দিন কিন্তু রমানাথ এই ঘর-বরেরই শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিল। সে কথা মনে থাকিলেও রমার রাগের আশঙ্কায় দিদিমা আর তাহার উত্থাপন করিলেন না; রমানাথের কথাতেই সায় দিয়া বলিলেন, "তা তো বটেই, যে সে ঘরে কি মেয়ে দেওয়া চলে?"

রমানাথ এবার রন্ধনশালার দরজা চাপিয়া বসিল এবং বাম হাতে হুঁকাটা মুখের কাছে ধরিয়া রাখিয়া ডান হাতটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "এই বল তো দিদিমা, যে সে ঘরে যার তার হাতে কি মেয়ে দেওয়া যায়? লোকে বলে, যেমন তেমন দেখে মেয়ে পার ক'রে দাও। আরে, এ কি নদী পার, না খাল পার যে, একবার পার হ'লেই চুকে গেল? এ মেয়ে পার, হুঁঃ, এ মেয়ে পার।"

ত্রিপুরাসুন্দরী সহাস্যে বলিলেন, "বটেই তো, মেয়ে পার করা কি কথার কথা? তা আর কোথাও চেষ্টা দেখ্‌লি?"

রমানাথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "দেখ্‌ব না? তুমি কি মনে কর দিদিমা, আমি শুধু মেসে যাই, আর আপিসে কলম পিষি? তা নয় দিদিমা, আমি ঠিক ওৎ পেতে আছি। দেখি, এবার মা দুর্গা কি করেন?"

ত্রিপুরাসুন্দরী একটু আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় রে, কোথায়?"

হাসিতে হাসিতে রমানাথ বলিল, "এবারে আর যেখানে সেখানে নয়, একেবারে জমীদারের বাড়ী। এইবারে দেখে নিও, রমানাথের কথায় যা, কাজেও তাই।"

ত্রিপুরাসুন্দরী বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "বলিস্ কি রে রমা ?"

রমানাথ হাত নাড়িয়া বলিল, "এর আর বলাবলি কি, সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, শুধু বরের বাপের পছন্দটি বাকী। কাল সকালে উঠেই আমি নসীগঞ্জে যাচ্ছি, হয় তো সঙ্গে ক'রে এনে আশীর্ব্বাদটা সেরে ফেল্‌ব। মস্ত বড় লোক দিদিমা, জমী জমা, পুকুর, বাগিচে, তেজারতী, তালুক, মুলুক ; মস্ত বড় ঘর। তেমনি ছেলে, কার্ত্তিক বল্লেই হয়, তার উপর বি-এ পাশ। একটি পয়সা চায় না, শুধু মেয়েটি পছন্দ হ'লেই হয়।"

ত্রিপু। কিন্তু মেয়ে পছন্দ হ'লে তো ?

রমা। তা আর হবে না ? এমন সাক্ষাৎ দুর্গা-প্রতিমা পছন্দ হবে না ? তাদের চোখ নাই ? তুমি কিছু ভেব না দিদিমা, ও ঠিক হয়ে গেছে।

ত্রিপু। তুই তো এমন তিন শো গণ্ডা ঠিক কর্‌লি ?

ঈষৎ অপ্রসন্নভাবে রমানাথ বলিল, "তিন শো গণ্ডা ঠিক্ কর্‌লাম ব'লে তিন শো গণ্ডাই কি হবে ? দশটা ঢিল ছুড়্‌তে ছুড়্‌তে একটা লেগে যায়। কথায় বলে, 'লাখ কথায় বিয়ে'।"

ত্রিপুরাসুন্দরী সহাস্যে বলিলেন, "তোর কিন্তু রমা, পাঁচ লাখ কথা হয়ে গিয়েছে।"

অগ্নিশূন্য হুঁকায় একটা নিষ্ফল টান দিয়া রমানাথ উঠিয়া দাঁড়াইল ; বিরক্তভাবে বলিল, "তবে তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গিয়েছে ? বিয়ে তো গাছের ফল নয় যে পেড়ে আন্‌ব। এ বিয়ে মেয়ের বিয়ে—হুঁ।"

রমানাথ হুঁকা রাখিয়া, গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া পুকুরঘাটে হাত-পা ধুইতে গেল।

হাত-পা ধুইয়া আহ্নিক সারিয়া রমানাথ আসিলে মণি ডাকিল, "রমাদা, জল খাও।"

উদাসভাবে রমানাথ বলিল, "থাক্, কি আর খাব ?"

ঈষৎ হাসিয়া মণি বলিল, "গরীবের যা আছে, আজ তাই খাও। কাল তখন জমীদারের বাড়ী গিয়ে ক্ষীর-ছানা খাবে।"

মণিকে ধমক্ দিয়া রমানাথ বলিল, "দেখ্, মণি, তুই বড় জেঠা হয়ে পড়েছিস্।"

কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া মণি বলিল, "ও মা গো, তুমি বল কি রমাদা, আমি এই এক রত্তি মেয়ে, আমি হলুম জেঠা ?"

রমানাথ হাসিয়া উঠিল। যখন হাসিল, তখন তাহাকে জল খাইতেও হইল। এক মুঠা মুড়ি আর একটু গুড় দিয়া জলখাওয়া শেষ করিয়া রমানাথ দাবার উপর মাদুর পাতিয়া বসিল, মণি তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল।

তামাক টানিতে টানিতে রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে মণি, তুই কি বলিস, গরীবের ঘরে বিয়ে হওয়া কি ভাল ?"

মণি মাথা নাড়িয়া উত্তর করিল, "মোটেই ভাল না।"

হুঁকাটা মুখ হইতে সরাইয়া, মণির দিকে চাহিয়া রমানাথ সহাস্যে বলিল, "কেন বল দেখি ?"

মণি বলিল, "কেন আবার কি ? গরীবের ঘরে না আছে টাকা-পয়সা, না আছে গয়নাগাঁটি ; কেবল রাত-দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি।"

রমা। খাটুনীটা কি এতই মন্দ ?

মণি। মন্দ নয় তো কি ? চাটুয্যেদের ছোট বৌ ; আহা, বেচারী দিন-রাত খাট্‌ছে, একটু গল্প কর্‌তে পায় না, একটু বই পড়তে পায় না।

রমা। এ সব না পেলেও গরীবের ঘরে আর একটা জিনিস বোধ হয় খুব পায়।

মণি। সে কি ?

রমা। ভালবাসা।

"ছাই" বলিয়া মণি নাসিকা কুঞ্চিত করিল। রমানাথ বিস্মিত দৃষ্টিতে মণির মুখের দিকে চাহিল। মণি বলিল, "গরীবের ঘরে আবার ভালবাসা ! গরীবে না কি ভালবাস্‌তে জানে ?"

মণি চলিয়া গেল ; রমানাথ একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিল। তখন একখানা পাতলা মেঘে নক্ষত্রগুলা ঢাকা পড়িয়াছিল ; রাস্তা দিয়া কে গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল,—

"হায় রে হায় প্রেমিক যে জন সে কেন চায় ভালবাসা।"

পরদিন সকালে উঠিয়াই রমানাথ ছাতা-চাদর লইয়া দুর্গাস্মরণপূর্ব্বক নসীগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করিল।

সন্ধ্যার সময় রমানাথ যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মুখ দেখিয়াই ত্রিপুরাসুন্দরী বুঝিতে পারিলেন, রমানাথ সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইয়াই ফিরিয়াছে। এ সময়ে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। মণিও সন্ধ্যার প্রদীপটা বড় ঘরের ভিতর রাখিয়া শাঁখ বাজাইয়া দিদিমার কাছে আসিয়া বসিল।

রমানাথ জামা-চাদরটা আল্‌নার উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া বিরক্তির সহিত আপন মনে বলিল, "বাপ,

বাড়ীত নয়, যেন নিবন্ধপুরী, কারো মুখে টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত নাই। সকলেই যেন বোবা হাবা কালা। ঝাঁটা মার বাড়ীর মুখে। আস্‌ছে শনিবার আর কোন শা—বাড়ী আসে। দিব্যি মেসে থাকা যাবে।”

রমানাথের এই স্বগত আক্ষেপোক্তি শুনিয়া মণি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। ত্রিপুরাসুন্দরী কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিলেন, “কি হ'ল রে রমা ?”

রমানাথ বিরক্তভাবে বলিল, “হ'ল তোমার মাথা, আর আমার মুণ্ডু। কিসের আবার কি হবে ?”

ত্রিপু। কোথায় গিয়েছিলি ?

রমা। চুলোয় গিয়েছিলাম—যমালয়ে।

রমানাথ কাপড় ছাড়িয়া গাড়ুটা টানিয়া হাত-পা ধুইল। তার পর তামাক সাজিয়া, দাবার উপর আসনপীঁড়ি হইয়া বসিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে আপন মনে বলিতে লাগিল, “চামার চামার, বেটা বড় লোক নয় তো আস্ত চামার। অমন সব উপযুক্ত ছেলে, আর বুড়ো বেটা বলে কি না বিয়ে কর্‌ব। গলায় দড়ি, গলায় দড়ি !”

ত্রিপুরাসুন্দরী সবিস্ময়ে বলিলেন, “বুড়ো !”

হুঁকায় দুই তিন টান দিয়া একটু কাসিয়া রমানাথ বলিল, “বুড়ো ব'লে বুড়ো, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। বেটা আবার বলে কি না, একখানা মহল লেখা-পড়া ক'রে দেব। খেংরা মারি তোর মহলের মুখে ! বেটা আবার ভয় দেখায়, বুঝ্‌লে দিদিমা, ভয় দেখায়। হুঁ, রমানাথ ভয় পাবার ছেলে কি না ?”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

“মা !”

“কেন রে বিনু ?”

“কিছু দান ক'রবে ?”

“কি দান ক'র্‌ব ?”

“এই টাকা—পয়সা।”

“কাকে দিতে হবে ?”

“যার নাই।”

“টাকা-পয়সা অনেকেরই নাই।”

“হাঁ, তবে কি ম'ন কর, টাকার জন্য যাদের মেয়ের বিয়ে আট্‌কায়।”

“আজকাল তো টাকার জন্য অনেকের মেয়ের বিয়ে আট্‌কাচ্চে। আমি ক'জনকে দান ক'র্‌ব ?”

“সকলকে কি আর দিতে বল্‌ছি; তবে যার নেহাৎ আট্‌কেছে।”

মা হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, “পাগল ছেলে ! কার আট্‌কেছে, তাই খুলে বল্ না।”

মাকে হাসিতে দেখিয়া ছেলে একটু অপ্রতিভ হইল; একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “ঐ দক্ষিণ পাড়ায় ব্রজ মুখুয্যের মেয়ে।” মা বলিলেন, “ওঃ, সেই বেজ মুখুয্যে, যে কর্ত্তার কাছে পাশা খেল্‌তে আসতো ?”

ছেলে বলিল, “হাঁ।”

মা। তার আবার মেয়ে কোথায় ? মেয়ে তো অনেক দিন মারা গেছে ?

ছেলে একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, “মেয়ে নয়, নাৎনি।”

মা বলিলেন, “তাই বল্, নাতনী।”

তার পর একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মেয়েটি দেখ্‌তে কেমন রে বিনু ?”

বিনোদ মাথাটা নীচু করিয়া উত্তর করিল, “মন্দ নয়।”

“বয়স কত ?”

“তের চৌদ্দ হবে।”

“এত বড় !”

বিনোদ বলিল, “বড় বৈ কি, তা কি করে বল, পয়সা না হ'লে তো ভাল ছেলে মেলে না। আর অমন মেয়েকে যার তার হাতে দেওয়া, সেটা কি ভাল ?”

মা একটু হাসিলেন, ছেলের মুখখানা লজ্জায় যেন রাঙ্গা হইয়া উঠিল। মা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “তাদের সঙ্গে তোর জানাশুনা আছে ?”

বিনোদ বড় সমস্যায় পড়িল, কিন্তু মায়ের কাছে মিথ্যা বলিতেও পারিল না। দৃষ্টি নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, “এক আধটু জানা-শুনা আছে। ও-পাড়ায় গেলে মাঝে মাঝে ওদের বাড়ীতে যাই। বেজ মুখুয্যের স্ত্রী আমাকে খুব যত্ন-আত্তি করে।”

ছেলের মুখের উপর স্নেহপ্রফুল্ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মা বলিলেন, “কোথাও সম্বন্ধ স্থির হয়েছে ? ছেলে দেখা আছে ?”

বিনোদ। না।

মা। তবে ?

বিনোদ। আগে টাকা, তার পর ছেলে।

মা। কিন্তু টাকার আগে যদি ছেলে পাওয়া যায় ?

বিনোদ সবিস্ময়ে মায়ের মুখের দিকে চাহিল; মৃদু হাসিয়া বলিল, “এ বাজারে তা আর হয় না মা !”

মা-ও হাসিয়া বলিলেন, "তোর মায়ের কাছে সব হয় বিনু। কি রকম ছেলে চাই?"

বিনোদ। একটু লেখাপড়া জানা, খেতে পর্‌তে পায়।

মা। এর চেয়ে শতগুণে ভাল ছেলে আমার সন্ধানে আছে।

বিনোদ। ভাল ছেলের অভাব কি? অভাব পয়সার।

মা। এ পয়সাও দরকার নাই।

বিনোদ বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বল কি মা, সত্যি?"

মা বলিলেন, "তোর মা কি মিথ্যা বলে?"

বিনোদ একটু লজ্জিত হইল। মা বলিলেন, "কিন্তু মেয়েটি একবার দেখা দরকার।"

বিনোদ বলিল, "তাঁদের এখানে আস্‌তে ব'লে দেব?

মা একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তাতে আর কাজ নাই, আমিই যাব।"

"তুমি যাবে মা?"

"দোষ কি? কাল পঞ্চাননতলায় যেতে হবে। ফের্‌বার মুখে ওদের বাড়ী হয়ে আস্‌ব।"

বিনোদ সানন্দে উঠিয়া গেল। মা চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ত্রিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ, জমীজমা এবং তেজারতী কার্‌বার সব ফেলিয়া রত্নেশ্বর রায় মহাশয় যখন পরলোকের পথিক হইলেন, তখন অনেকেই মনে করিল, পুত্র বিনোদ এবার পিতার কষ্টার্জ্জিত টাকাগুলা লইয়া ছিনিমিনি খেলিবে এবং পাঁচ ভূতে তাহা কুড়াইয়া লইয়া আপনাদের শূন্য উদর পূর্ণ করিতে থাকিবে। এই আশায় পাঁচ ভূতও আসিয়া জুটিল; কিন্তু গৃহিণী অন্নপূর্ণার গৃহিণীপণায় এবং বুড়া সরকার রামজয় ঘোষের তীক্ষ্ণদর্শিতার ফলে তাহাদিগকে একে একে সরিয়া পড়িতে হইল। এ দিকে বিনোদও বি-এ পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিল, টাকার ছিনিমিনি খেলার দিকে আদৌ মনোযোগ দিল না।

সে-বারে বিনোদ যখন কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিল, যখন সে ছুটীতে একবার বাড়ী আসিয়াছিল, সেই সময়ে মহেশ চক্রবর্ত্তীর পুত্র গণেশের বিবাহ হয়। গণেশ বিনোদের বাল্যবন্ধু, সুতরাং বন্ধুর অনুরোধে বিনোদকে বিবাহ দিতে যাইতে হইল। বিবাহে কিন্তু বড় গোলযোগ বাধিল। গ্রামে দলাদলি ছিল। সেই সূত্রে বিবাহ-সভায় একটা কথা উঠিল যে, মেয়ের মা'র চরিত্র দূষিত ছিল। মেয়ের বাপ বিপ্রদাস স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতা জানিতে পারিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে এবং পুলিশকে অনেক টাকা ঘুষ দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছে। কথাটা শুনিয়া মহেশ চক্রবর্ত্তী শিহরিয়া উঠিলেন এবং কুলটার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে অসম্মত হইয়া বর উঠাইয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন। বিপ্রদাসের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার দলভুক্ত লোকেরা আসিয়া বরের বাপকে বুঝাইল যে, কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা; বিপ্রদাসের স্ত্রী সতীসাধ্বী ছিলেন, হৃদ্‌-রোগে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। পুলিশ আসিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও ঐ বিপক্ষদলের চক্রান্তের ফল।

মহেশ চক্রবর্ত্তী কিন্তু বুঝিয়াও বুঝিলেন না। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর শেষে তিনি প্রস্তাব করিলেন, আর তিন শত টাকা নগদ পাইলে এই কার্য্যে মত দিতে পারেন।

বিপ্রদাসের তখন আর পাঁচ টাকা দিবার সঙ্গতি ছিল না, সর্ব্বস্ব বেচিয়া, বন্ধক দিয়া পণের আট শত টাকার যোগাড় করিয়াছিলেন। নিরুপায় হইয়া তিনি মহেশ চক্রবর্ত্তীর পায়ে পড়িলেন, বরযাত্রীদের প্রত্যেকের হাতে ধরিয়া অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হইল না, মহেশ চক্রবর্ত্তী বর উঠাইয়া লইলেন। বিপ্রদাস আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

বিনোদ গিয়া বরের হাত ধরিল। বলিল, "গণেশ, বিয়ে কর্।"

গণেশ বলিল, "বাবার মত চাই।"

বিনোদ। তিনি মত দেবেন না।

গণেশ। তাঁর অমতে আমি বিয়ে কর্‌তে পার্‌ব না।

বিনোদ। ব্রাহ্মণের জাতি-ধর্ম্ম যায়।

গণেশ। তিন শো টাকা দিলেই সব রক্ষা পায়।

গণেশের মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিনোদ তীব্রকণ্ঠে বলিল, "তুই না লেখাপড়া শিখেছিস্?"

গণেশ মাথা হেঁট করিল। মহেশ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "লেখাপড়া শিখ্‌লেই বুঝি দাতাকর্ণ হ'তে হয়?"

বিনোদ। দাতাকর্ণ হয় না, মানুষ হয়।

মহেশ। যে মানুষ, সে টাকার কদর বুঝে।

ভ্রূকুটী করিয়া বিনোদ বলিল, "টাকা পেলেই বিয়ে দিবেন?"

মহেশ। নিশ্চয়।

বিনোদ। বেশ, আমি তিন শো টাকা দেব।

মহেশ হাত পাতিয়া বলিলেন, "দাও।"

বিনোদ বলিল, "আমার সঙ্গে টাকা নাই, কাল পাবেন।"

মহেশ হাসিয়া বলিলেন, "এ সব ধাৎের কাজ নয় বাবাজী। এস গণেশ।"

বিনোদ জোরে গণেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমি হ্যাণ্ডনোট লিখে দিচ্ছি।"

মহেশ। হ্যাণ্ডনোট নিয়ে আমি বুঝি তোমার নামে নালিশ করতে যাব?

বিনোদ। তিন শো টাকার জন্ম আপনাকে নালিশ করতে হবে না।

মহেশ। নিশ্চয়ই হবে। টাকা তো তোমার সেই বুড়ো সরকার বেটার হাতে? সে বেটাকে কে না চেনে?

বিনোদ তখন কন্যাপক্ষীয়দের নিকট টাকা ধার চাহিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না, যে সেই রাত্রিকালে তিন শত টাকা আনিয়া দিতে পারে। দুই এক জনের সে সঙ্গতি থাকিলেও দিতে রাজী হইল না; স্বগ্রামবাসী যাহাকে বিশ্বাস করিল না, বিদেশী তাহাকে কিরূপে বিশ্বাস করিয়া টাকা দিতে পারে? মহেশ চক্রবর্ত্তী পুত্রের হাত টানিয়া বলিলেন, "চ'লে এস।"

বিনোদ রুদ্রকণ্ঠে বলিল, "আপনার কি ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান নাই?"

মহেশ রাগিয়া উত্তর করিলেন, "না। তোমার যদি থাকে, তবে এই কুলটার মেয়েকে বিয়ে ক'রে সে পরিচয় দাও।"

"নিশ্চয়ই দেব" বলিয়া বিনোদ গণেশের হাতটা সজোরে ঠেলিয়া দিল এবং ভূপতিত বিপ্রদাসের হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিল, "চলুন, আমি আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করব।"

বিপ্রদাস আনন্দের আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি বিনোদকে আলিঙ্গন করিয়া বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি রাজা হও বাবা।"

স্তম্ভিত মঙ্গল-শঙ্খ আবার বাজিয়া উঠিল। বিপ্রদাস যথারীতি বিনোদের হস্তে কন্যা উমাকে সম্প্রদান করিলেন।

পরদিন সকালে রামজয় সংবাদটা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল এবং ছুটিয়া গিয়া গৃহিণীকে দারুণ দুঃসংবাদের মতই এই অতর্কিত বিবাহের সংবাদটা শুনাইল। গৃহিণী কিন্তু সংবাদটাকে তেমন অশুভভাবে গ্রহণ করিলেন না; তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তা আর কি করবে রামজয়, বিনু যখন এ কাজ করেছে, তখন আমাদেরও তা স্বীকার ক'রে নিতে হবে। এখন আমার বৌমাকে আমার বৌয়ের মতই জাঁকজমকে নিয়ে এস।"

রামজয় আর কোন প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সে লোকজন ও বাদ্যভাণ্ড লইয়া বধূসহিত বিনোদকে ঘরে আনিল। গৃহিণী বধূর মুখ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। রামজয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ রামজয়, আমার ঘরের লক্ষ্মী এসেছে।"

বধূর সুন্দর মুখখানা দেখিয়া রামজয়ও সে কথা অস্বীকার করিতে পারিল না। তবে মথুরাবাটীর জমীদারের মেয়ে, আর সেই নগদ পাঁচ হাজার টাকা হাতছাড়া হওয়ায় সে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া রহিল।

আর এক জনেরও যথেষ্ট মনঃক্ষোভ হইল, তিনি মহেশ চক্রবর্ত্তী। বিনোদের ব্যবহারে চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপনাকে নিতান্ত অপমানিত জ্ঞান করিলেন এবং বিনোদ এতটা বাড়াবাড়ি না করিলে যে আট আর তিনে এগার শত টাকা নিশ্চয়ই তাঁহার হস্তগত হইত, এরূপ সিদ্ধান্তও করিয়া ফেলিলেন। তিনি অন্তরে প্রতিশোধ-স্পৃহা লইয়া সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিনোদ ধনে, মানে, ক্ষমতায় সকল বিষয়েই তাঁহার অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া তাঁহাকে আপাততঃ অপেক্ষা করিতে হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রত্নেশ্বর রায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধে বিনোদ গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র সকলকেই আহ্বান করিত। সে বৎসরেও বিনোদ পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া পূর্ব্ববৎ উদ্যোগ-আয়োজন করিল। কিন্তু মহেশ চক্রবর্ত্তীর ষড়্‌যন্ত্র তখন পাকিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং শ্রাদ্ধদিবসে মধ্যাহ্নকালে গ্রামের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ-কায়স্থই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া পাঠাইল। রামজয় শুনিয়া রাগে আগুন হইয়া উঠিল। বলিল, "রতন রায়ের ছেলেকে একঘ'রে করে কোন্—; বেটাদের ঘাড়ে ধ'রে এনে খাওয়াব।"

রামজয়ের স্পর্দ্ধিত বাক্যশ্রবণে লোকে আরও চটিয়া গেল; যাহারা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা পর্য্যন্ত রাগিয়া উঠিল। তখন সকলে একবাক্য হইয়া বলিল, "রতন রায়ের ছেলে একটা বেশ্যার মেয়েকে ঘরে এনেছে, সে থাকতে আমরা তার বাড়ীতে জলগ্রহণ করব না।"

গৃহিণী অন্নপূর্ণা মাথায় হাত দিয়া বসিলেন বিনোদ আসিয়া ডাকিল, "মা!"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, এত দিনে সব গেল বিনোদ।"

বিনোদ বলিল, "কিছুই যাবে না মা, আমি পাল্কী ঠিক কর্‌তে পাঠিয়েছি।"

গৃহিণী সবিস্ময়ে বলিলেন, "পাল্কী? পাল্কী কি হবে?"

বিনোদ বলিল, "যার জন্য এত গোলযোগ, তাকে অন্যত্রে পাঠিয়ে দেব।"

গৃহিণী বলিলেন, "কাকে? বৌমাকে? বৌমা আমার ঘরের লক্ষ্মী।"

বিনোদ দৃঢ়স্বরে বলিল, "যার জন্য বাবার শ্রাদ্ধ পণ্ড হয়, রায়বংশের মাথা হেঁট হয়, সে লক্ষ্মীই হোক বা সাক্ষাৎ ভগবতীই হোক্, এ বাড়ীতে তার জায়গা নাই।"

বিনোদ দ্রুতপদে আপনার ঘরের দিকে চলিয়া গেল। গৃহিণী ডাকিলেন, "বিনোদ, শোন্।"

বিনোদ ফিরিয়া চাহিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে স্বয়ং উমার হাত ধরিয়া তাহাকে পাল্কীতে উঠাইয়া দিল। রামজয় আসিয়া গৃহিণীর সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "গিন্নীমা গো, বাড়ীর লক্ষ্মী চ'লে গেল।"

গৃহিণী কোন উত্তর করিলেন না, স্থির গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। বিনোদ আসিয়া বলিল, "জয়দাদা, ব্রাহ্মণদের পাতা ক'রে দাও।"

রামজয় তাহার উপর একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল। বিনোদ স্বয়ং পাতা করিতে চলিল।

লোকজনের খাওয়া শেষ হইতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সন্ধ্যার পর গৃহিণী বিনোদের ঘরে ঢুকিয়া ডাকিলেন, "বিনোদ!"

বিনোদ তখন জানালার ধারে দুই হাতে মাথা টিপিয়া একখানা চৌকির উপর বসিয়া ছিল। অন্নপূর্ণা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, পুত্রের মাথায় হাত দিয়া স্নেহকোমল কণ্ঠে ডাকিলেন, "বিনোদ, বাপ!"

বিনোদ শূন্যদৃষ্টিতে মাতার মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা গভীর বেদনাজড়িত কণ্ঠে ডাকিলেন, "কেন এ কষ্ট বুক পেতে নিলি বিনু?"

রুদ্ধকণ্ঠে বিনোদ বলিল, "একটি দিনের জন্য তোমার অবাধ্য হয়েছি মা, আমায় ক্ষমা কর।"

অন্ন। আমার ক্ষমা কর্‌বার কিছুই নাই বাপ, আমি শুধু ভাব্‌ছি—

বিনোদ। তার কথা ভুলে যাও মা, সে নিতান্ত হতভাগিনী।

বিনোদের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল; অন্নপূর্ণা পুত্রের মাথায় হাত দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

একটু থামিয়া বিনোদ বলিল, "কিন্তু মা!"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "কিন্তু কি বিনু?"

বিনোদ বলিল, "কিন্তু নিজের শক্তি না বুঝে একটা বালিকার জীবন কেন নিষ্ফল ক'রে দিলাম মা?" বিনোদের বুক ভাঙ্গিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, নিষ্ফল কেন হবে বাপ?"

বিনোদ সকাতর দৃষ্টিতে মাতার মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "বৌমা আমার সতীলক্ষ্মী, তার জীবন কখনই নিষ্ফল হবে না। তবে সীতা দেবীকেও অনেক কষ্ট সহ্য কর্‌তে হ'য়েছিল।"

আশার মৃদু আলোকপাতে বিনোদের মুখ-মণ্ডল মুহূর্ত্তের জন্য উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা ছেলের হাত ধরিয়া বলিলেন, "এখন কিছু মুখে দিবি আয়।"

বিনোদ মুখ নীচু করিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তুই না খেলে আমি যে কিছু মুখে দিতে পার্‌ব না।"

বিনোদ ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "চল মা।"

মা ছেলের হাত ধরিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে বিনোদ বলিল, "জয়া দাদা খেয়েছে?"

গৃহিণী বলিলেন, "তাকে দেখ্‌তে পাচ্চি না?"

"আমি দেখ্‌ছি" বলিয়া বিনোদ ত্রস্তভাবে বাহিরে চলিয়া গেল।

বিনোদ গিয়া দেখিল, রামজয় তাহার ছোট ঘর-খানিতে রাশীকৃত খাতাপত্র লইয়া খুব মনোযোগের সহিত হিসাবনিকাশ করিতেছে। বিনোদ ডাকিল, "জয়দাদা!"

রামজয়ের হাতের কলম আরও জোরে চলিতে লাগিল। বিনোদ গিয়া কলমটা কাড়িয়া লইল। রামজয় স্ফীত রক্তিম চোখ দুইটা তুলিয়া একবার বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়াই চক্ষু নত করিল। বিনোদ বলিল, "এমন সময়ে খাতাপত্র নিয়ে কি হচ্চে?"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে রামজয় বলিল, "হিসেবনিকেশগুলো সেরে রাখ্‌ছি।"

বিনোদ বলিল, "হিসাব সার্‌বার কি আর সময় পাবে না?"

"যদিই না পাই" বলিয়া রামজয় কলমটা তুলিয়া লইল। বিনোদ বলিল, "হিসেব থাক্, এখন কি খেতে হবে?"

রামজয় সে কথার কোন উত্তর না দিয়া আঙ্গুল গণিয়া পাঁচ আর উনিশের যোগফল ঠিক করিতে লাগিল। বিনোদ তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "উঠে এস।"

মুখ না তুলিয়াই রামজয় বলিল, "একটু পরে যাচ্ছি।"

বিনোদ বলিল, "মা এখনও মুখে জল দেন নি।"

আপন মনে অস্ফুটস্বরে বকিতে বকিতে রামজয় খাতা তুলিয়া বিনোদের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইল।

অতঃপর বিনোদ ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, এবং কলিকাতায় গিয়া ব্যবসায় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু মা বলিলেন, "সেখানে বড় লোকদের দেখ্‌তে অনেক বড় বড় ডাক্তার আছে, কিন্তু এখানে গরীবদের দেখবার কেউ যে নাই বিনু?"

সুতরাং বিনোদের আর কলিকাতায় ডাক্তারী করা হইল না, দেশেই বাড়ীতে ডাক্তারখানা খুলিল, ব্যবসায় বেশ চলিল; সকালে সন্ধ্যায় রোগীর আমদানীর ন্যায় টাকার আমদানী হইল না, বরং রামজয়ের খাতায় খরচের ঘরে অনেকগুলা টাকার অঙ্ক বাড়িয়া উঠিল। মাসান্তে রামজয় খাতা বগলে আসিয়া গৃহিণীকে বলিল, "এ মাসে তিন শো টাকার ওষুধ খরচ হয়েছে গিন্নী মা।"

গৃহিণী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "মোটে তিন শো?"

রামজয় খাতা লইয়া পলাইয়া গেল। ইহার পর তিন অঙ্কের স্থলে পাঁচ অঙ্ক আসিয়া বসিলেও সে আর কখন গৃহিণীর নিকট অভিযোগ করিতে যায় নাই।

ব্যবসায় চলিল, নামডাক যথেষ্ট হইল, অর্থাগমও যে না হইতে লাগিল, এমন নয়, কিন্তু বধূ উমার আর কোন খোঁজখবর লওয়া হইল না। রামজয় খোঁজ লইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বিনোদের সম্পূর্ণ অসম্মতি দেখিয়া সে সাহস করে নাই।

মহেশ চক্রবর্ত্তী ইদানীং বিনোদের এক জন পরম শুভানুধ্যায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। বেশ্যাকন্যাকে ত্যাগ করিয়া বিনোদ যে রত্নেশ্বর রায়ের উপযুক্ত পুত্রের কার্য্য করিয়াছে, এ কথার উল্লেখ করিয়া তিনি প্রায় বিনোদ বাবুর প্রশংসা করিতেন এবং শীঘ্রই যে কোন রাজকন্যার সহিত বিনোদের বিবাহ হইবে, এরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রকাশ করিতেও ছাড়িতেন না। এরূপ শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর বিরলকেশ মস্তকে চপেটাঘাত করিবার জন্য রামজয়ের সময়ে সময়ে হস্তকণ্ডুতি উপস্থিত হইত, কিন্তু সে বিনোদের ভয়ে সে কণ্ডুতি নিবারণ করিতে পারিত না।

এক দিন কথাপ্রসঙ্গে পরিত্যক্তা বধূর কথা উপস্থিত হওয়ায় চক্রবর্ত্তী মহাশয় ধর্ম্মরক্ষার্থ তাহাকে মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শুনিয়া রামজয় বলিয়াছিল, "চক্রবর্ত্তী মশায়, গরু মার্‌লে তার প্রায়শ্চিত্ত কি?"

চক্রবর্ত্তী উত্তর করিয়াছিলেন, "প্রাজাপত্য ব্রত।"

রামজয় হাসিয়া বলিয়াছিল, "কেউ কেউ বলে, জুতো দান।"

কথাটা শুনিয়া অনেকেই হাসিয়া উঠিয়াছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও হাসিয়াছিলেন, কিন্তু সেটা যে তাঁহার অন্তরের হাসি নয়, তাহা কেবল রামজয়ই বুঝিতে পারিয়াছিল।

এইরূপ দুই বৎসর কাটিয়া গেলে বিনোদের পুনরায় বিবাহ-সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। রামজয় যখন দেখিল যে, পরিত্যক্তা বধূকে পুনরায় গ্রহণ করা অসম্ভব, তখন সে অগত্যা গৃহিণীর নিকট প্রস্তাব করিল যে, বৌমাকে ত্যাগ করা হইলেও তাঁহার খাওয়া-পরার সংস্থান করিয়া দেওয়া উচিত; অতএব তাঁহাকে মাসিক কিছু সাহায্য করা হউক।

অন্নপূর্ণা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন রামজয় স্বয়ং এ বিষয়ের বন্দোবস্তের জন্য বিনোদের শ্বশুরালয় বেলপুকুরে যাত্রা করিল। কিন্তু সেখানে গিয়া যাহা শুনিল, তাহাতে হতাশ হইয়া পড়িল। শুনিল, বিপ্রদাস দেশত্যাগ করিয়াছেন। উপযুক্ত পুত্রের অকাল-মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া তিনি শোকে দুঃখে কন্যাকে লইয়া কলিকাতাবাসী হইয়াছেন।

কলিকাতায় যে দুই চারি জন পরিচিত লোক ছিল, তাহাদিগের দ্বারা রামজয় অনুসন্ধান করাইল, কিন্তু বিপ্রদাস বা তদীয় কন্যার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। তখন সকলেই উমার আশা ছাড়িয়া দিল। রামজয় পুনরায় বিনোদকে সংসারী করিবার জন্য তাহার বিবাহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল।

মা কিন্তু ছেলের বিবাহে আদৌ মনোযোগী হইলেন না। বধূকে ত্যাগ করিয়া বিনোদ হৃদয়ে কত গভীর আঘাত পাইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি বিনোদের হৃদয়ের সে আঘাতজনিত ক্ষত শুষ্ক হইবার জন্য সময় দিতেছিলেন; বিবাহের জন্য উৎপীড়ন করিয়া সে ক্ষতে লবণ প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মাতা পুত্রের উপর স্নেহের দাবী করিতেন, কিন্তু উৎপীড়নের দাবী রাখিতেন না।

দুই চারিবার চেষ্টা করিয়া রামজয় যখন পুত্রের বিবাহে মাতার সম্পূর্ণ উপেক্ষা বুঝিতে পারিল, তখন অগত্যা সে নিরস্ত হইল। বিনোদ আপনার ডাক্তারী

ব্যবসায় আর পুস্তকের রাশি লইয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

এইরূপে যখন দিন কাটিতেছিল, তখন অন্নপূর্ণা সহসা ছেলের কথায় বেশ একটু ইঙ্গিত পাইয়া আশায় বুক বাঁধিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন অন্নপূর্ণা দক্ষিণপাড়ায় পঞ্চানন্দের পূজা দিতে গেলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন-পথে ব্রজ মুখুয্যের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ত্রিপুরাসুন্দরী তাঁহাকে আদর-যত্ন করিয়া বসাইলেন। অন্নপূর্ণা অনেকক্ষণ বসিয়া গল্পগুজব করিলেন, নানা কথায় তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা জানিয়া লইলেন; মণিকে দেখিলেন, দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিলেন। শেষে কথায় কথায় এমন একটু আভাস দিলেন, যাহা ত্রিপুরাসুন্দরীর কল্পনার অতীত। অন্নপূর্ণা গেলে তিনি তুলসীতলায় মাথা খুঁড়িয়া আশার সফলতার জন্য ঠাকুরদেবতাকে বিস্তর মানসিক করিলেন।

অন্নপূর্ণা সেই দিন সন্ধ্যার পর বিনোদকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ বেজ মুখয্যের বাড়ী গিয়েছিলাম।"

বিনোদ আগ্রহের সহিত মায়ের মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "মণিকে দেখলাম, দিব্যি মেয়ে।"

বিনোদ চুপ করিয়া রহিল। মৃদু হাসিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "কিন্তু বাপু, টাকা-পয়সা দিয়ে আমি ওদের সাহায্য কর্‌তে পার্‌ব না।"

বিনোদ বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা?"

অন্ন। তাতে ওদের অপমান করা হয়। আর মণির দিদিমা বোধ হয় সে অপমান মাথা পেতে নেবে না।

বিনোদ। সে কথা সত্য।

অন্ন। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক্‌, একটি ভাল ছেলের চেষ্টা দেখ।

বিনোদ মুখ নীচু করিয়া বলিল, "কিন্তু ভাল ছেলে তো অমনি পাওয়া যাবে না, পয়সা চাই।"

অন্নপূর্ণা সহাস্যে বলিলেন, তা হবে না বাপ, বিনা পয়সায় একটি খুব ভাল ছেলে চাই।"

বিনোদ হাসিল; বলিল, "বরং আকাশের চাঁদ পাওয়া যেতে পারে, তবু এমন একটি ছেলে পাওয়া সম্ভব নয়।"

অন্ন। সংসারে অসম্ভব কিছু নাই বিনু।

বিনোদ। দু'একটা আছে বৈ কি মা, যেমন বামনের চাঁদ ধরা।

অন্ন। কিন্তু যে বামন নয়, তার পক্ষে চাঁদ ধরাটা অসম্ভব নাও হ'তে পারে।

মায়ের কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিনোদ চুপ করিয়া রহিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আমি কিন্তু তাদের আশ্বাস দিয়ে এসেছি।"

বিনোদ। কি আশ্বাস দিয়ে এসেছ?

অন্ন। একটি খুব ভাল ছেলে যোগাড় ক'রে দেব ব'লে এসেছি।

বিনোদ। পাবে কোথায়?

অন্ন। সে ভার তোর উপর।

চমকিত হইয়া বিনোদ বলিল, "আমার উপর? আমি কোথায় পাব মা?

ঈষৎ হাসিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "না পাস্‌, তোর মা মিথ্যাবাদী হবে।"

বিনোদ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ভাবছিস্‌ কি?"

বিনোদ বলিল, "বড় কঠিন ভার মা।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আমি কিন্তু যোগ্যপাত্রেই সে ভার দিয়েছি।"

বিনোদ স্থিরদৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "মা!"

মা ছেলের হাতখানা নিজের হাতের উপর রাখিয়া স্নিগ্ধ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "তোর প্রাণে কি ব্যথা, তা আমি জানি বিনোদ. কিন্তু তোর মায়ের বুকে কি ব্যথা, তা কি ভেবে দেখেছিস্‌?"

বিনোদ দুই হাতে মুখ ঢাকিল, অন্নপূর্ণা ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

তার পর সংসারের কথা পড়িল। খাজনা আদায়ের কথা, মাসিক খরচের কথা, হীরু পালের ছেলের ব্যবহারের কথা, ইত্যাদি অনেক কথাই হইল। কথায় কথায় রাত্রি হইয়া গেল। পাচিকা বিনোদের খাবার আনিয়া দিল। মা কাছে বসিয়া ছেলেকে খাওয়াইতে লাগিলেন। বিনোদ কিন্তু সে দিন ভাল খাইতে পারিল না। অন্নপূর্ণা তাহাকে অতঃপর অধিক পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিয়া শুইতে যাইতে বলিলেন।

বিনোদ আপনার ঘরে গিয়া আলোকটা কমাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু চোখে ঘুম আসিল না। খানিক এ-পাশ ও-পাশ করিয়া উঠিয়া পড়িল; উঠিয়া আলোকটা উজ্জ্বল করিয়া দিল। তার পর টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া একখানা খাতা বাহির করিল। খাতার

ভিতর একখানা চিঠি ছিল। বিনোদ চেয়ারে বসিয়া আলোটা কাছে টানিয়া আনিয়া চিঠিখানা পড়িতে লাগিল।

চিঠিখানা অনেক দিনের পুরাতন, প্রায় দুই বৎসর আগেকার লেখা। চিঠিতে লেখা ছিল,—

"শ্রীচরণেষু,

প্রায় এক বৎসর পরে তোমায় পত্র লিখছি। পরিত্যক্তার পত্র লেখায় কোন দোষ আছে কি? দোষ থাক্ আর নাই থাক্, আমি কিন্তু পত্র না লিখে থাক্‌তে পার্‌লাম না। এত দিন লিখি নাই কেন? রাগ ক'রে কি লিখি নাই? না, রাগ নয়, লিখতে সাহস হয় না।

রাগ? কি জন্য রাগ হবে? আমায় ত্যাগ করেছ, কিন্তু সে দোষ তো তোমাদের নয়, দোষ আমার— আমার অদৃষ্টের। আমার অদৃষ্ট যে বড় মন্দ। তিন বছরের বেলায় মা হারিয়েছিলাম, বার বছরে আবার মা পেয়েছিলাম। আর পেয়েছিলাম তোমাকে। তুমি—তুমি যে কি, তা আমি বল্‌তে পারি না। দেবতাদের কথা শুনেছি, কখন চোখে দেখি নাই, সুতরাং বল্‌তে পারি না, তুমি দেবতার চেয়েও বড় কি না। কিন্তু অদৃষ্টের দোষে আমি সব হারালাম। জীবনের সুখস্বপ্ন ক্ষুদ্র ছয়টি মাসের মধ্যেই ভেঙ্গে গেল। আমার অদৃষ্টের দোষ নয় কি?

আমাকে ত্যাগ করায় তুমি হয় তো—হয় তো কেন, নিশ্চয়ই মনে খুব কষ্ট পেয়েছ। কিন্তু আমার অনুরোধ, তুমি আমার জন্য একটুও কষ্ট ভেবো না। আমার তো কোন কষ্টই নাই। আমি তোমার সঙ্গ হারিয়েছি বটে, কিন্তু তোমাকে তো হারাই নাই। তুমি যে আমার ভিতরে বাহিরে, ইহকালে পরকালে। রামচন্দ্র প্রজাদের সন্তোষের জন্য সীতাকে বনে দিয়েছিলেন, তুমি বংশমর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমায় ত্যাগ করেছ। তোমার মত কর্ত্তব্যপরায়ণ মহাপ্রাণ স্বামী কয়টা স্ত্রীলোকের ভাগ্যে ঘটে? আমার ঘটেছিল, কিন্তু অদৃষ্টে সইলো না। তাই আমিও সীতার মতই দিনরাত ঠাকুর-দেবতার কাছে প্রার্থনা কর্‌ছি, যেন জন্মজন্মান্তরে তোমাকেই স্বামী পাই, কিন্তু আর যেন তোমার চরণসেবা হ'তে বঞ্চিত না হই।"

বিনোদ ডান হাতে মাথাটা টিপিয়া চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তার পর আবার পড়িতে লাগিল,—

"আমার যদি কিছু কষ্ট থাকে, তবে সে তোমার জন্য। আমাকে ছেড়ে তুমি কি নিয়ে থাক্‌বে? শুনলাম, তুমি না কি আর বিয়ে কর্‌তে চা'ও না। সত্য কি? কেন? কার জন্য? কথাটা শুনে আমার খুব গর্ব্ব বোধ হচ্চে, আহ্লাদে চোখের জল চাপ্‌তে পাচ্চি না। কিন্তু হায়, এ আনন্দের পাশেই যে তোমার বিষাদ-মলিন মুখখানা দেখ্‌তে পাচ্চি। ছি ছি, তোমার সে দুঃখের কাছে আমার সুখ? লোকে যাই বলুক, আমার সতীসাধ্বী মা স্বর্গে গেছেন, আমি তাঁরই মেয়ে।

"আমি তোমার কাছে আর কিছুই চাই না, কেবল একটা ভিক্ষা আছে। আমার সে অনুরোধ রাখবে? তুমি আবার বিয়ে ক'র, আমার মাথার দিব্যি তুমি বিয়ে কর। মনে ক'র না, তাতে আমার মনে কষ্ট হবে। আমি সত্যি বল্‌ছি, একটুও কষ্ট হবে না। আমরা হিঁদুর মেয়ে, স্বামীই আমাদের সর্ব্বস্ব, স্বামীর সুখেই আমাদের সুখ। যে দিন শুন্‌ব, তুমি আবার বিয়ে করেছ, সে দিন আমার যে সুখ হবে, সত্যি বল্‌ছি, তুমি আমাকে পুনরায় গ্রহণ কর্‌লেও আমার তত সুখ হবে না।

"একটা স্ত্রীলোকের জন্য আপনার জীবনটাকে নষ্ট ক'রো না। আবার বল্‌ছি, যদি আমায় এক দিনের জন্যও পায়ে স্থান দিয়ে থাক, একটুও ভালবেসে থাক, তবে তুমি আবার বিয়ে কর। ইতি

দাসী উমা।"

বিনোদ পত্রখানা একবার, দুইবার তিনবার পড়িয়া তাহাকে আবার খাতার মধ্যে রাখিয়া দিল, তার পর দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। কিন্তু হাতের চাপে চোখের জল থামিল না, তাহা হাতের ফাঁক দিয়া গড়াইয়া টেবিলের উপর টস্ টস্ করিয়া পড়িতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রমানাথ শনিবারে বাড়ী আসিয়া সন্ধ্যার পর যখন জল খাইতে বসিল, তখন জলখাবারের জায়গায় মুড়ির পরিবর্ত্তে ক্ষীরের সন্দেশের আবির্ভাব দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি দিদিমা?"

দিদিমা বলিলেন, "খেয়েই দেখ্ না কি; ক্ষীরের সন্দেশ।"

রমানাথ বলিল, "সন্দেশ, তা তো দেখেই চিনেছি। কিন্তু এলো কোথা হ'তে?"

দিদিমা বলিলেন, "কেন, আস্‌তে কি নাই ?"

হাসিতে হাসিতে রমানাথ বলিল, "আস্‌তে আবার নাই ? হরি করুন, নিত্যি নিত্যি আসুক। তবে আগমনটা কোথা হ'তে হ'ল, সেইটাই জান্‌তে চাই।"

দিদি। তা না, জান্‌লে বুঝি খেতে নাই ?

ঘাড় নাড়িয়া রমানাথ বলিল, "উহুঁ, কি জান দিদিমা, সকল জিনিসেরই উৎপত্তি, গতি, স্থিতি জেনে তবে তার ব্যবহার করতে হয়। বিশেষ উদরের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তার কুলশীলটা ভাল রকমেই জানা দরকার।"

দিদিমা হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, কুল, শীল, গাঁই, গোত্তর সব বল্‌ছি তুই খা।"

দিদিমা দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝুলান মালা-ছড়াটা পাড়িয়া লইয়া রমানাথের সন্মুখে বসিলেন। রমানাথ ততক্ষণ একটা সন্দেশ মুখে ফেলিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহার আস্বাদন অনুভব করিতে করিতে বলিল, "চমৎকার !"

দিদিমা সহাস্যে বলিলেন, "তোকে আজ যে খবর শোনাব, তা এর চেয়েও চমৎকার।"

রমানাথ ব্যস্তভাবে বলিল, "তবে একটু থাম, দিদিমা, আগে এ ক'টাকে গালে ফেলে নিই। ভাল জিনিসের পর আর মন্দ জিনিস মনে ধর্‌বে না।"

রমানাথ ত্বরিত হস্তে সন্দেশ কয়টা গালে ফেলিয়া দিয়া খানিকটা জল খাইল ; তার পর কোঁচার খুঁটে মুখ মুছিয়া বলিল, "এখন তোমার চমৎকার খবরটা বল।"

দিদিমা বলিলেন, "তুই আগে বল্, এ সন্দেশ কোথা হ'তে এসেছে ব'লে তোর মন হয় ?"

রমানাথ একটু ভাবিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "তেমন কিছু মনে হ'ল না।"

হাসিয়া দিদিমা বলিলেন, 'ধন্যি তোর মন ? ঘরে আইবড় মেয়ে থাক্‌তে সন্দেশ আসবার ভাবনা কি ?"

রমানাথ বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দিদিমার মুখের দিকে চাহিল।

দিদিমা বলিলেন, "তুই তো এত ছুটাছুটি ক'রেও কিছু ক'র্‌তে পার্‌লি না। আমি কিন্তু ঘরে ব'সে সব ঠিক ক'রে ফেলেছি।"

রামনাথ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "সব ঠিক ?"

দিদি। হাঁ, সব ঠিক। কাল তুই আশীর্ব্বাদ ক'রে আসবি। ছাব্বিশে বিয়ে।

রমা। একেবারে বিয়ে ?

দিদি। একেবারে নয় তো কি সাতবারে ? এ কি তোর পাত্তর দেখা ?

দিদিমা একটু গর্ব্বের হাসি হাসিলেন ; রমানাথের মুখখানা যেন গম্ভীর হইয়া আসিল। দিদিমা বলিলেন, "যেমন বর, তেমনি ঘর। তুই যেমনটি চাস্, ঠিক তেমনটি। তাই তোর মত না নিয়েই সব ঠিক ক'রে ফেলেছি।"

রমানাথ ললাটে মধ্যমা ও তর্জ্জনী ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিল, "কোথায় ঠিক হ'ল ?"

দিদি। এই গাঁয়েই।

রমা। এ গাঁয়ে তেমন কে আছে ?

দিদি। আছে বৈ কি ; বিনোদ ডাক্তারকে চিনিস না ?

রমা। ওঃ, বিনোদ রায় ? যে স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে ?

দিদি। হাঁ, সেই বটে। তা সে তো স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে নি, পাঁচ জনের ভয়ে ত্যাগ করেছে। বৌটাকে ত্যাগ ক'রে এত দিন পর্য্যন্ত বিয়ে করে নি।

ঈষৎ হাসিয়া রমানাথ বলিল, "এখন যে আবার বিয়ে কর্‌ছে ?"

দিদিমা বলিলেন, "তা আর করবে না ? বড়-লোকের ছেলে, চিরকাল উদাসীন হয়ে থাক্‌বে ? তা ছাড়া ভিতরে আর একটু কথা আছে।"

রমা। আর কি কথা ?

দিদি। বিনোদ মণিকে ভালবাসে।

রমা। কে বল্‌লে ?

দিদি। বল্‌বে আবার কে ? আমি তার ভাব-ভঙ্গী দেখেই বুঝেছি। আর তার মায়ের কথাতেও যেন সেই রকমই আঁচ পেলাম ?

রমা। কি রকম আঁচ পেলে ?

দিদি। এই ধর্ না, অমন বড়লোক, পাশকরা ছেলে, অত বড় ডাক্তার, কিন্তু একটি পয়সা চায় না, শুধু মেয়েটি চায়। গিন্নী নিজে দু দিন এসে দেখে গিয়েছে। আজ আবার এক থালা সন্দেশ নিয়ে এসেছিল। এত করে কেন ? দেশে কি আর সুন্দরী মেয়ে নাই ?

রমানাথ একটু হাসিল ; বলিল, "মেয়ে অনেক আছে, কিন্তু সতীনের উপর কে মেয়ে দিবে ?"

দিদি। সতীন আবার কোথায় ? সে বৌকে তো ত্যাগ করেছে।

রমা। পাঁচ জনের ভয়ে ত্যাগ করেছে, আবার পাঁচ জনের মত পেলেই ঘরে নেবে। তখন ?

দিদিমা শঙ্কিত দৃষ্টিতে রমানাথের মুখের দিকে

চাহিলেন। রমানাথ বলিল, "তখন হয় তো মণিকে ত্যাগ ক'রে আবার তাকে গ্রহণ কর্‌বে।"

দিদিমা বলিলেন, "না, এ তা হবে না, সে মণিকে ভালবাসে।"

রমানাথ বলিল, "ও কথাটা ছেড়ে দাও দিদিমা, 'বড় লোকের ভালবাসা, মুসলমানের মুরগী পোষা।' বিশেষ যে এক স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে আর এক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, তার ভালবাসার মূল্য কত, তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।"

দিদিমা মালাছড়া সমেত হাতটা গণ্ডদেশে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "তুই বলিস্ কি রে রমা?"

রমানাথ বলিল, "যা সত্য, তাই বলি।"

দিদিমা। কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি?

রমা। কথা দিয়েছ, সেটা ফিরিয়ে নিলেই চল্‌বে, কিন্তু বিয়ে হয়ে গেলে তা আর ফিরবে না।

দিদি। আমি কি ব'লে আবার কথা ফেরাব?

রমা। বিয়ে হবে না ব'লে।

দিদি। আমি তা পার্‌ব না।

রমা। তুমি না পার, আমি পার্‌ব।

দিদিমা চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, রমানাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। দিদিমা বলিলেন, "না রমা, তাতে কাজ নাই।"

রমানাথ একটু রাগতভাবে বলিল, "তবে কিসে কাজ আছে?"

দিদিমা। এমন ছেলে হাতছাড়া করিস্ না। তাকে আর নেবে না; আর যদিই নেয়, তাতেই বা দোষ কি? আগে যে লোকে পাঁচ সাত গণ্ডা বিয়ে কর্‌ত।

রমা। খুব বীরপুরুষের কাজ কর্‌ত। কিন্তু সে সত্যযুগ এখন আর নাই দিদিমা।

দিদি। নাই থাক, আমি কিন্তু এ সম্বন্ধ ভাঙ্গতে পার্‌ব না।

রমা। তোমাকে ভাঙ্গতে হবে না, আমিই ভেঙ্গে দিচ্চি।

দিদিমা রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তা হ'লে আমি কিন্তু আর তোদের কোন কথাতেই থাক্‌ব না!"

ঈষৎ হাসিয়া রমানাথ বলিল, "সেটা মণির পক্ষে উপকার বৈ অপকার হবে না।"

রমানাথ ঘরের বাহির হইয়া গেল; দিদিমা স্তম্ভিতভাবে সেইখানে বসিয়া রহিলেন।

মণি আসিয়া ডাকিল, "দিদিমা!"

দিদিমা কথা কহিলেন না। মণি একটু অপেক্ষা করিয়া, আর একটু কাছে আসিয়া ডাকিল, "দিদিমা!"

দিদিমা মুখ তুলিয়া ক্রোধগম্ভীর কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "কেন?"

দিদিমার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখ এবং তদপেক্ষা গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া মণি বিস্মিত হইল; ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে দিদিমা?"

দিদিমা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "আমার শ্রাদ্ধ হয়েছে।"

মণি মুখ টিপিয়া মৃদু হাসিল। দিদিমা ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "স'রে যা মণি, আমি তোদের শত্রু, শত্রুর সাম্‌নে হ'তে চ'লে যা।"

দিদিমা মুখ ফিরাইয়া লইলেন; তাঁহার হাতের মালা জোরে জোরে ঘুরিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

মণি শিবপূজা করিতেছিল। সম্মুখে একটি ছোট মাটীর শিব রাখিয়া তাহাকে ফুল-বিল্বপত্রে ঢাকিয়া দিয়াছিল; তার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মৃদু গদ্‌গদকণ্ঠে ধীরে ধীরে পড়িতেছিল,—

"নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥"

অগ্রভাগে গ্রন্থি দেওয়া ভিজা চুলগুলায় পিঠের কাপড় ঢাকিয়া পড়িয়াছিল; স্নানশুদ্ধ মুখখানা হইতে ভক্তির নির্ম্মল জ্যোতি ফুটিয়া উঠিতেছিল; কপালে চন্দনের ফোঁটা শারদ ঊষার নির্ম্মল বক্ষে প্রভাত-তপনের মতই সুন্দর দেখাইতেছিল। মণি ভক্তি-বিহ্বল কণ্ঠে সুরের সহিত বলিতেছিল,—

"নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥"

সহসা পশ্চাতে চাপা হাসির মৃদু শব্দে চমকিত হইয়া মণি ফিরিয়া চাহিল; দেখিল, দাঁড়াইয়া বিনোদ। মণি তাড়াতাড়ি আঁচলটা মাথায় তুলিতে গেল, কিন্তু পিঠের চুলগুলা চাপিয়া থাকায় সে কার্য্য তত সত্বর সম্পন্ন হইল না। বিনোদ মৃদু হাসিয়া বলিল, "থাক্ থাক্, আমি চ'লে যাচ্ছি, দিদিমা কোথায়?"

মণি ঘাড় হেঁট করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "নাইতে গেছেন।"

মণি একটা বেলপাতা লইয়া নখ দিয়া খুঁটিতে লাগিল। বিনোদ বলিল, "তোমার পূজায় বাধা দিলাম, না?"

লজ্জাজড়িত কণ্ঠে মণি বলিল, "আমার পূজো হয়ে গিয়েছে।"

বিনোদ বলিল, "তুমি সংস্কৃত মন্ত্রগুলা বেশ সুন্দর আবৃত্তি করতে পার।"

মণি লজ্জায় মাথা নীচু করিল। বিনোদ বলিল, "শিবপূজা কর্‌ছ বটে, কিন্তু শিবের মত স্বামী তো জুটলো না।"

বিনোদ হাসিল। মণি সহাস্য কণ্ঠে বলিল, "আমি তো শিবের মত স্বামী চাই না।"

বিনোদ। তবে কি শিবের অনুচরের মত চাও?

মণি। না, আমি চাই মানুষের মত।

বিনোদ। শিব বোধ হয় সে প্রার্থনাটুকুও শুন্‌লেন না।

বিনোদের দিকে একটা মৃদু কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মণি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। বিনোদ বলিল, "তুমি পূজা শেষ কর, আমি এখন যাই।"

মণি বলিল, "বসবেন না?"

বিনোদ বলিল, "বস্‌তেই এসেছিলাম, কিন্তু দেখছি, এখন না বসাটাই ঠিক। তোমার রমাদা কোথায়?"

মণি। বাজারে গেছে বোধ হয়।

"তবে আর এক সময়ে আস্‌ব" বলিয়া বিনোদ প্রস্থানোদ্যত হইল। কয়েক পদ গিয়া সে একবার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল, জানি না, কোন্ আকর্ষণে মণিও তখন সেই দিকে চাহিয়াছিল; মুহূর্ত্তের জন্য চারিচক্ষু সম্মিলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন হইল। কিন্তু সেই সূক্ষ্ম মুহূর্ত্তকালটি উভয়ের হৃদয়ে এমন একটা ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া দিল, যাহাতে আর কেহ কাহারও দিকে চাহিতে সাহস করিল না।

রমানাথ বাড়ীতে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "বিনোদ এসেছিল, না?"

মণি পূজার ফুল-বিল্বপত্র ঘটীর ভিতর তুলিতে তুলিতে বলিল, "হাঁ।"

রমানাথ একটু কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন এসেছিল?"

মণি ঘাড় না তুলিয়াই বলিল, "জানি না।"

রমা। কতক্ষণ এসেছিল?

মণি। এইমাত্র।

রমা। কি ব'লে গেল?

মণি। কিছুই না।

"হুঁ:" বলিয়া রমানাথ জুতা, চাদর ছাড়িয়া হুঁকার অন্বেষণে ব্যস্ত হইল; মণি ফুল, চাল খুঁটিয়া লইয়া স্থান পরিষ্কার করিয়া ঘাটে হাত ধুইতে গেল।

ডান হাতে জলের ঘটী, বাম হাতে ভিজা কাপড়-গামছা, গলায় হরিনামের মালা, ত্রিপুরাসুন্দরী বাড়ীতে ঢুকিয়া ডাকিলেন, "রমানাথ কোথায় রে?"

রমানাথ তখন তামাক সাজা শেষ করিয়া দেশালাই জ্বালিয়া কয়লা ধরাইতেছিল, দিদিমার ডাক শুনিয়া উত্তর দিল, "চুলোয়।"

ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "যাবার মত জায়গা বটে, তবে আমি আগে সেখানে যাই, তার পর যে যেতে হয় যাস্।"

কলিকার উপর ধরান কয়লাটা রাখিয়া কলিকা নাড়িতে নাড়িতে রমানাথ বলিল, "সেখানে যাবার আগু পিছু নাই, যে হয় গেলেই হ'ল।"

ত্রিপুরাসুন্দরী রাগিয়া উত্তর করিলেন, "যেতে হয় যাবি, থাক্‌তে হয় থাক্‌বি, আমার তো তাতে সবটাই ক্ষতি?"

ঈষৎ হাসিয়া রমানাথ বলিল, "ক্ষতি কি লাভ, তা গেলেই বুঝতে পার্‌বে। এখন কেন খুঁজছিলে, তাই বল।"

ত্রিপুরা। খুঁজছিলাম আমার শ্রাদ্ধ করতে! আজ আশীর্ব্বাদ করতে যেতে হবে না?

রমা। কিসের আশীর্ব্বাদ?

ত্রিপুরা। বরের আশীর্ব্বাদ, আবার কিসের? তুই যেমন ন্যাকা।

রমানাথ হাসিয়া বলিল, "ন্যাকা নই দিদিমা, আমি খুব চালাক। সে কাজটা আমি সেরে এসেছি।"

ত্রিপুরাসুন্দরী বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন্ সার্‌লি?"

রমা। এই একটু আগে, বাজারে।

ত্রিপুরা। বাজারে!

রমা। হাঁ, বাজারে ওদের সরকার রামজয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

ত্রিপুরাসুন্দরী হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তা রামজয়কেই আশীর্ব্বাদ ক'রে এলি না কি?"

রমানাথ বলিল, "এক রকম আশীর্ব্বাদ বটে; সাফ জবাব দিয়ে এসেছি।"

ত্রিপুরাসুন্দরী স্তম্ভিতদৃষ্টিতে রমানাথের মুখের দিকে চাহিলেন; তাঁহার ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "জবাব!"

"হাঁ, সাফ জবাব" বলিয়া রমানাথ হুঁকা-কলিকা লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। ত্রিপুরাসুন্দরী বজ্রাহতের ন্যায় উঠানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মণি ঘাট হইতে ফিরিয়া দিদিমাকে তদবস্থ দেখিয়া

কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে দিদিমা?"

তাহার দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "হয়েছে আমার মথা আর মুণ্ডু। যম যখন আমায় ভুলেছে, তখন তোমরা আমায় হাড়ে হাড়ে জ্বালাবে।"

মণি কিছু বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ত্রিপুরাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন, "ও হতভাগা কি ভেবেছে। যত সম্বন্ধ আস্ছে, সব ভেঙ্গে দিচ্ছে। এমন সোনার চাঁদ ছেলে, সেখানেও জবাব দিয়ে এল। ওর নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে।"

মণি বলিল, "ছিঃ দিদিমা।"

ত্রিপুরাসুন্দরী রোষকষায়িত দৃষ্টিতে মণির দিকে চাহিলেন, তার পর জলের ঘটীটা ধপাস্ করিয়া উঠানে বসাইয়া, হাতের কাপড়-গামছা ফেলিয়া দিয়া সেইখানে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিতে লাগিলেন, "হে হরি, হে মধুসূদন, আমাকে নাও ঠাকুর, এ সব জ্বালাযন্ত্রণা হ'তে আমাকে উদ্ধার কর।"

মণি বিস্মিত, ভীত, নির্ব্বাক্।

দশম পরিচ্ছেদ

"বিনু, লক্ষ্মী বাপ আমার, মায়ের কথাটি রাখতে হবে।"

বিনোদ বলিল, "তোমার কোন্ কথাটা না রাখি মা?"

অন্নপূর্ণা প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন, "তা আমি জানি বাপ, জানি বলেই তোর মত না নিয়েই আমি সব ঠিক করেছি।"

বিনোদ বলিল, "বেশ করেছ মা, তোমার মনে যে এই বিশ্বাসটুকু রাখতে পেরেছি, সেইটাই আমার সব চেয়ে সৌভাগ্য।"

অন্নপূর্ণা গর্ব্বস্ফীত কণ্ঠে বলিলেন, "আর তোর মত ছেলে পেটে ধরাও কম সৌভাগ্যের কথা নয়।"

বিনোদ নীরবে মৃদু হাস্য করিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আমি আর কিছু দেখি নাই বিনু, শুধু মেয়েটি দেখেই আমার পছন্দ হয়েছে।"

সহাস্যে বিনোদ বলিল, "আর পছন্দ হয়েছে তাদের কিছুই সঙ্গতি নাই দেখে।"

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন, "তোর ঐ এক কথা। সঙ্গতি না থাক্‌লেও মেয়ে যদি কালো কুৎসিত হ'ত, তা হ'লে কি মত দিতাম?"

মায়ের মুখের দিকে ফুল্ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিনোদ বলিল, "বোধ হয় দিতে মা। তোমার সে বৌ সুন্দরী না হ'লেও তোমার কাছে কম আদর-যত্ন পায় নি!"

সে বোয়ের কথায় অন্নপূর্ণার প্রফুল্ল মুখখানা সহসা গম্ভীর হইয়া আসিল, হঠাৎ যেন অতীত বিষাদস্মৃতির একটা কালো মেঘ আসিয়া বর্ত্তমানের সুখের আলোটা ঢাকিয়া দিল। একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "সকলই অদৃষ্ট! যাক্, আজ আশীর্ব্বাদ করতে আস্‌বে।"

বিনোদ চুপ করিয়া রহিল; তাহারও মুখখানা পূর্ব্বের মত প্রফুল্ল ছিল না। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ছাব্বিশে দিন। বড় তাড়াতাড়ি হয়ে পড়লো। তা হোক, রামজয়ের কাছে কিছু আট্‌কাবে না।"

বিনোদ বলিল, "কিন্তু মা, জাঁকজমকে কাজ নাই।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "সে কথায় তোর কাজ কি?" তুই কি রকম বেহায়া ছেলে! বিয়ের কথায় কোথায় লজ্জা হবে, তা নয়, জাঁকজমক হবে, না চুপে চুপে হবে, এই সব পরামর্শ করতে এসেছিস্।"

অন্নপূর্ণা হাসিয়া উঠিলেন, বিনোদও হাসিল।

রামজয় চীৎকার করিয়া ডাকিল, "গিন্নিমা!"

অন্নপূর্ণা উত্তর দিলেন, "কেন রামজয়?"

রামজয় সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "কেন?" তোমার বাবু কি রকম আক্কেল? একটা হাবাতের ঘরের মেয়ের সঙ্গে বিনোদের বিয়ে দিতে গেছ। ছি ছি, গলায় দড়ী দিতে ইচ্ছা হচ্ছে।"

অন্নপূর্ণা ব্যস্তভাবে কক্ষের বাহিরে আসিয়া বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, হয়েছে কি?"

রামজয় কণ্ঠস্বর আরও উচ্চে তুলিয়া বলিল, "যা হবার তাই হয়েছে। ছি ছি, অপমানের একশেষ!"

অন্নপূর্ণা। অপমান আবার কি?

রাম। অপমানের আর বাকীই কি? বাজারে পাঁচ জনের সাক্ষাতে ছি ছি, এর চেয়ে আর অপমান কি হ'তে পারে?

অন্নপূর্ণা কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের অপমান? কে অপমান করলে?"

রামজয় মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "কে আবার? সেই হাবাতে ছোঁড়াটা—সেই রমাঠাকুর—কি বল্‌বো সে বামুন, নইলে আজ তারই এক দিন কি আমারই এক দিন হ'ত।"

অন্ন। রমানাথ কি বল্‌লে?

রাম। বল্‌লে—কত কথাই বল্‌লে। বল্‌বে

আবার কি, মুখের উপর দশ জনের সাক্ষাতে সাফ জবাব দিয়ে গেল।

অন্নপূর্ণা বিস্ময়জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জবাব দিয়ে গেল?"

রামজয় বলিল, "হাঁ, একেবারে সাফ জবাব। বলে, বিনোদকে তারা কিছুতেই মেয়ে দিতে পারে না। আমরা ছোট লোক, ঘরের বৌকে তাড়িয়ে দিই, এমনি কত কথা। পাশে চক্রবর্ত্তী, আরও দু'পাঁচ জন দাড়িয়ে ছিল, তারা মুচ্‌কে হেসে উঠলে। আমার এমন ইচ্ছা হ'তে লাগল, কি বল্‌ব, বামুনের গলায় পৈতা গাছটা আছে, তা না হ'লে দেখে নিতাম, সে কত বড় বামুনের বেটা বামুন।"

অন্নপূর্ণার বিস্মিত স্তম্ভিত-কণ্ঠ হইতে শুধু উচ্চারিত হইল, "হুঁ।"

রামজয় বলিল, "আচ্ছা, আমিও রামজয় ঘোষ, দেখে নেব, বামুন কেমন ক'রে মেয়েটাব বিয়ে দেয়। বিয়ের জন্যে যদি এসে বিনোদ রায়ের পায়ে ধরতে না হয়, তবে আমি চাষার ছেলেই নই।"

রামজয় বকিতে বকিতে নীচে নামিয়া গেল। অন্নপূর্ণা জলভারগম্ভীর মেঘের মত নিষ্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিনোদ কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল, "মা!"

অন্নপূর্ণার রোষগম্ভীর মুখে মৃদু হাসি ফুটিল, ঘন মেঘের বুকে বিজলী খেলিয়া গেল। বিনোদ বলিল, "আমার জন্য এতটা অপমান সইবে মা?"

ছেলের কাঁধের উপর একখানা হাত রাখিয়া অন্নপূর্ণা শান্তিস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "সইব বৈ কি বাপ, তুই যে আমার ছেলে।"

বিনোদ বলিল, "কিন্তু মা, আমি ছেলে, ছেলের যা কর্ত্তব্য, তা করব।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আর আমি মা, আমিও মায়ের কর্ত্তব্য করতে ছাড়ব না।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর মণি আসিয়া ডাকিল, "রমাদা।"

মণির তীব্র কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া রমানাথ বলিল, "কেন মণি।"

ক্রুদ্ধস্বরে মণি বলিল, "তোমার মতলবখানা কি?"

বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে মণির মুখের দিকে চাহিয়া রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের মতলব মণি?"

মণি বলিল, "যেখান হ'তে সম্বন্ধ আসে, একটা না একটা ছুতো ধ'রে তুমি ভেঙ্গে দাও। কেন বল দেখি?"

ক্ষুব্ধব্যথিত কণ্ঠে রমানাথ বলিল, "আমি ভেঙ্গে দিই।"

মণি জোর গলায় বলিল, "হাঁ, তুমি নয়তো কি আমি ভেঙ্গে দিতে যাই?"

রমানাথ নীরব দৃষ্টিতে মণির দিকে চাহিয়া রহিল। মণি বলিল, "মনে ক'র না রমাদা, আমি নেহাত কচি খুকী, তোমার মনের ভাব কিছু বুঝতে পারি না।"

রমানাথ বলিল, "কি বুঝেছ মণি?"

ক্রোধস্ফুরিত স্বরে মণি বলিল, "আমি যাই বুঝি, কিন্তু একটা আইবড় মেয়ে নিয়ে তুমি এত ঢলাঢলি কচ্চ কেন বল তো?"

মণির রাগ দেখিয়া রমানাথের হাসি আসিল, বলিল, "সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দেওয়ায় তোর রাগ হয়েছে মণি, না?"

মণি ঘাড়টা উঁচু করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ হয়েছে।"

রমানাথ বলিল, "কিন্তু বিনোদের আর এক স্ত্রী আছে তা জানিস্?"

মণি বলিল, "আছে—আছে, তোমার সে জন্য এত মাথাব্যথা কেন?"

রমানাথের মুখে কে যেন সহসা কালি মাড়িয়া দিল, ব্যথাবিজড়িত কণ্ঠে বলিল, "আমার মাথাব্যথা কেন?"

মণি বলিল, "হাঁ, তোমার মাথাব্যথা কেন?"

রমানাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "বুঝেছি মণি, তুই বিনোদকে ভালবাসিস্।"

মণির মুখখানা রাগে লাল হইয়া উঠিল, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। আহতা ভুজঙ্গীর ন্যায় গ্রীবা উন্নত করিয়া কটাক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিতে করিতে মণি বলিল, "আমি কাকে ভালবাসি, না বাসি, সে কথা বলবার তুমি কে?"

রমানাথের মাথা নীচু হইয়া পড়িল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমার অন্যায় হয়েছে মণি, আমি এতটা জানতাম না। যা হবার হয়ে গেছে, এখন আমিই জবাব দিয়ে এসেছি, আবার আমিই গিয়ে তাদের শান্ত ক'রে ঠিক ক'রে আস্‌ব।"

তীব্র শ্লেষের স্বরে মণি বলিল, "ভারি পুরুষত্ব দেখাবে! একবার গিয়ে তাদের অপমান ক'রে এসেছ, আবার নিজে অপমান হ'তে যাবে।"

বিষাদের ম্লান হাসি হাসিয়া রমানাথ বলিল, "তা হোক্ মণি, তোর ভালর জন্য সে অপমান আমি মাথা পেতে নেব।"

দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীটা রমানাথের মুখের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া মণি ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "আমি কিন্তু তা হ'লে গলায় দড়ী দেব, এই ব'লে রাখলাম।"

মণি রাগে জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল। রমানাথ স্তম্ভিতভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার উদাস দৃষ্টির সম্মুখে কৃষ্ণ-যবনিকা টানিয়া দিতে লাগিল।

পরদিন সোমবার। সোমবারে রমানাথকে প্রায় এক ক্রোশ হাঁটিয়া গিয়া আটটার গাড়ী ধরিতে হইত, সুতরাং তাহাকে ৭টার পূর্ব্বে খাইয়া বাহির হইতে হইত। সেটা বৈশাখ মাস; ত্রিপুরাসুন্দরী প্রত্যূষে উঠিয়া নদীতে প্রাতঃস্নান করিতে যাইতেন, মণি আমিষ হাঁড়ী চাপাইয়া ভাতে-ভাত রাঁধিয়া দিত।

সে দিন সকালে উঠিয়া রমানাথ দেখিল, দিদিমা স্নানে গিয়াছেন, আর মণি গোময় দ্বারা গৃহলেপন-কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে; উনান জ্বলে নাই, রান্নাও চড়ে নাই। রমানাথ ডাকিয়া বলিল, "বেলা হ'ল যে মণি।"

মণি কোন উত্তর করিল না। রমানাথ বলিল, "ভাত হবে কখন্?"

মণি ফিরিয়া চাহিল না, সে গভীর মনোযোগের সহিত আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। রমানাথ প্রাতঃকৃত্য সমাধানের জন্য বাহিরে চলিয়া গেল।

প্রাতঃকৃত্য ও স্নান শেষ করিয়া আসিয়া রমানাথ দেখিল, মণি কাজ-কর্ম্ম সারিয়া দাবায় পা ছড়াইয়া বসিয়া বই পড়িতেছে। রন্ধনশালায় উঁকি দিয়া দেখিল, সেখানে রন্ধনের কোনই চিহ্ন নাই। রমানাথ কাপড় ছাড়িল, দুই একবার উচ্চকণ্ঠে বেলা হইয়াছে জানাইল, মণি কিন্তু বইএর পাতা হইতে চোখ তুলিল না। তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। অগত্যা রমানাথ আপিসের কাপড় পরিয়া মণির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং মৃদু হাসিয়া বলিল, "রাগ হয়েছে মণি?"

মণি নিরুত্তর। রমানাথ শান্ত সহাস্য কণ্ঠে বলিল, "ছি মণি, তুই নেহাৎ ছেলেমানুষ। রাগ হয়েছে ব'লে এক মুঠা ভাত রেঁধে দিলি না? তোর রমাদাকে আজ উপবাস দেওয়ালি?"

মণি দাঁতে দাঁতে চাপিয়া ঘাড় নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। রমানাথ তাহার রোষগম্ভীর মুখের উপর একটা প্রফুল্ল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইল।

রমানাথ চলিয়া গেলে মণি মুখ তুলিয়া একবার দরজার দিকে চাহিল। তার পর হাতের বইখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মাথাটা বাঁধা ছিল, টানিয়া ফিতা ছিঁড়িয়া, বিননী খুলিয়া ফেলিল। প্রাচীরের গায়ে পেয়ারা গাছে বসিয়া একটা ছোট পাখী ডাকিতেছিল, "বউ কথা কও", পাখীটা রোজ ডাকিত, তাহার ডাক শুনিয়া মণি হাসিত, তাহাকে ভেঙ্গাইত; কিন্তু আজ আর তাহার ডাক ভাল লাগিল না, ঢিল মারিয়া পাখীটাকে উড়াইয়া দিল। বিড়ালটা বিছানার উপর শুইয়া ঘুমাইতেছিল; মণি গিয়া তাহার গলা টিপিয়া তাহাকে উঠানে ছুড়িয়া ফেলিল। শেষে আর কিছু না পাইয়া একখানা ছেঁড়া কাপড় আনিয়া সেলাই করিতে বসিল।

ত্রিপুরাসুন্দরী স্নানান্তে "ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী" ইত্যাদি পাঠ করিতে করিতে আসিয়া মণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমা চ'লে গেছে?"

মণি ঘাড় না তুলিয়াই উত্তর দিল, "হুঁ।"

ত্রিপুরাসুন্দরী তুলসীতলায় জলের বাটিটা রাখিয়া কাপড় শুকাইতে দিতে গেলেন। রন্ধনশালার দিকে তাঁহার লক্ষ্য হইল; তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, "কৈ, রান্না হয় নি?"

মণি বলিল, "না।"

ত্রিপুরা। তবে সে কি খেয়ে গেল?

মণি। ছাই।

ত্রিপুরা। দিলে কে?

মণি। আমি।

ত্রিপুরা। কেন, এক মুঠা ভাত রেঁধে দিতে পার্‌লে না?

মণি। না।

রাগে চক্ষু কপালে তুলিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "কেন, তোমার গতরে কি পক্ষাঘাত হয়েছে?"

অস্থির চালনায় ছুঁচটা মণির আঙ্গুলে বিঁধিয়া গিয়াছিল; বাম হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা রক্তাক্ত আঙ্গুলটা চাপিয়া ধরিয়া মণি রাগের সহিত উত্তর করিল, "আমি কি সবার দাসী-বাঁদী?"

রাগে চীৎকার করিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "না, তুমি রাজরাণী, ব'সে ব'সে সেবা খাবে। এমনি কপালই তোমার! তাই এমন সোনার চাঁদ সম্বন্ধ হাতে এসেও চ'লে গেল।"

মণি চুপ করিয়া রহিল। ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন,

"আহা, ছেলেটা না খেয়ে চ'লে গেল, সারাটা দিন শুকিয়ে থাকবে। হ্যাঁলা মণি, তুই মেয়েমানুষ না রাক্ষসী ?"

চড়া গলায় মণি উত্তর করিল, "রাক্ষসী।"

"ধন্যি মেয়ে!" বলিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিলেন।

দিদিমার কাছে আপনাকে রাক্ষসী বলিয়া পরিচয় দিলেও মণির মনটা কিন্তু সে দিন মানুষের অপেক্ষা একটুও কঠিন হইতে পারিল না। সে দিনটা তাহার বড়ই অস্বস্তিতে কাটিল, থাকিয়া থাকিয়া কেবলই অভুক্ত রমাদার শুষ্ক মুখখানা মনে পড়িতে লাগিল। কেবলই তাহার কানের কাছে বাজিতে লাগিল, রমানাথের সেই শান্ত স্নিগ্ধ স্বর,—সেই স্বরের মধ্যে একটুও রাগের লেশ ছিল না, একটুও তিরস্কারের গন্ধ ছিল না, শুধু উপেক্ষার বেদনায় ভরা শান্ত স্নিগ্ধ স্বর—"তোর রমাদাকে উপোস দেওয়ালি মণি!"

মণির এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল, সে ছুটিয়া গিয়া রমাদাকে ডাকিয়া আনে; আনিয়া বলে, "আমি এখনই রেঁধে দিচ্চি রমাদা, খেয়ে যাও।" কিন্তু রমাদা তখন কোথায়? কত দূরে?

তার পর দুপুরবেলা খাইতে বসিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী ভাতের গ্রাস হাতে তুলিয়া যখন বলিলেন, "আহা, আমরা দিব্য খেতে বসেছি, আর ছেলেটা সারাদিন শুকিয়ে রইল!" তখন মণির চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। মণি জোর করিয়া চোখের জল চাপিয়া খাইতে বসিল। কিন্তু ভাতগুলা যেন গলা দিয়া নামিতে চাহিল না, মণি জোর করিয়া মুখ টিপিয়া ভাত গিলিতে লাগিল। এত করিয়াও সে অর্দ্ধেকের বেশী ভাত খাইতে পারিল না। ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "ভাত প'ড়ে রইল যে, তোমার আবার হ'ল কি?"

মণি মুখ ভার করিয়া বলিল, "হবে আবার কি? খিদে নাই।"

ত্রিপুরাসুন্দরী গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হুঁঃ।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিনোদ ডাক্তার বেজ মুখুয্যের নাতনীকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু বেজ মুখুয্যের স্ত্রী তাহাতে সম্মত হয় নাই, রমানাথ মুখের উপর জবাব দিয়া গিয়াছে, এ কথাটা সালঙ্কারে গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কথা শুনিয়া গ্রামের অনেকে দুঃখিত হইল, অনেকে আনন্দ প্রকাশ করিল। যাহারা আনন্দিত হইল, তাহাদের মধ্যে মহেশ্বর চক্রবর্ত্তী এক জন। তিনি গোপীনাথ পালের দোকানে দেবদারু কাঠের বাক্সের উপর বসিয়া থেলো হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে রামজয়ের নিকট রমানাথের প্রত্যাখ্যান-কাহিনী যেরূপ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের সহিত বর্ণনা করিলেন, তাহা শুনিয়া অনেকেরই হাস্যসংবরণ করা দুরূহ হইয়া উঠিল। বক্তব্যশেষে তিনি শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বিনোদটা কি মানুষ? লেখ-পড়া শিখলে কি হবে, বুদ্ধি-বিবেচনা এক রত্তিও নাই। বিয়েই যদি কব্‌বি, তা আমাদের বল্। মেয়ের অভাব কি? তা তো নয়, পয়সার অহঙ্কার! আরে বাপু, সমাজে কি পয়সার অহঙ্কার চলে?"

সিধু মণ্ডল মাথা নাড়িয়া বলিল, "অমন কথাটি বল্‌বেন না বাবাঠাকুর, ডাক্তার বাবুর অহঙ্কার একটুও নাই, মাটীর মানুষ, গরীবের মা-বাপ।"

ভ্রূকুটি করিয়া চক্রবর্ত্তী বলিলেন, 'হাঁ, গরীবের মা-বাপ বৈ কি। ওহে সিদ্ধেশ্বর, বোতল বোতল জল ঢেলে বিতরণ ক'রে সকলেই গরীবের মা-বাপ হ'তে পারে, বুঝেছ?"

দীনু বাগ বলিল, "কিন্তু দাদাঠাকুর, উচিত কথা বলি, শুধু জল খেয়ে লোকের রোগ সারে কি ক'রে?"

চক্র। পরমায়ুর জোরে। আমি নিজের চোখে দেখেছি, শিশিতে দু'ফোঁটা ওষুধ দিয়ে হুড় হুড় ক'রে জল ঢেলে ভ'রে দেয়। আমিও প্রথম প্রথম ওকে খুব বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু ঐ জল ঢালা দেখে অবধি আমার ভক্তি চ'টে গেছে। বাড়ীর কেউ ব্যারামে প'ড়ে মারা গেলেও আমি আর ওকে ডাকি না।

সিধু বলিল, "কি জানি বাবাঠাকুর, আমাদের কিন্তু ডাক্তার বাবুকে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি ব'লে মনে হয়।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "তোদের কথা ছেড়ে দে, তোরা চাষাভূষো মানুষ, এ সকলের কি জানিস্?"

গোপী পাল বলিল, "তা হ'লে বিয়েটা হ'লো না?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "তাও কি কখন হয়? ওহে, এ সকল সামাজিক ব্যাপার, এখানে পয়সায় কি আসে যায়, সমাজে মান থাকা চাই। এই যে দেখ্‌ছ তোমাদের টেনাপরা দাদাঠাকুর, এই দাদাঠাকুরের পায়ে কত বেটা লাখপতিকে এসে গড়িয়ে পড়্‌তে হয়। বুঝেছ?"

সকলে কৌতূহলের সহিত চক্রবর্ত্তীর গর্ব্বস্ফীত বদনমণ্ডলের দিকে চাহিল। চক্রবর্ত্তী গর্ব্বের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "দাও হে গোপী, একটু তেল দাও,

একবারে স্নানটা সেরে যাই। আজ আবার ঘোসেদের বাড়ীতে তুলসী দিতে হবে।"

গোপী পালের বিনামূল্যের প্রদত্ত তৈল যথেষ্টরূপে অঙ্গে মর্দ্দন করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুষ্করিণীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। সিধু মণ্ডল চোখ ঠারিয়া গোপী পালকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শুন্‌লে পাল মশায়, বামুনের কথা শুন্‌লে সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে।"

গোপী বলিল, "বামুন বিশ্বনিন্দুক, এখানে আসে কেবল তেল-তামাকের শ্রাদ্ধ করতে।"

দীনু বলিল, "ওনার ছেলের বিয়ের কি হ'ল ?"

সিধু বলিল, "ছেলেব বিয়ে একেবারে হবে। সেবারে দেখলি না, বামুন সুতোবাঁধা মেয়েটাকে ছানলাতলায় জবাব দিয়ে ছেলে নিয়ে চ'লে এল, ডাক্তার বাবু মেয়েটাকে বিয়ে ক'বে বামুনের জাত রাখ্‌লেন। এনার তাও সইল না, পাকচক্র ক'রে মেয়েটাকে ত্যাগ করিয়ে তবে ছাড়্‌লেন। তার পর থেকে শুন্‌তে পাই, ছেলে নাকি আর বিয়ে করবে না বলেছে।"

দীনু বলিল, "যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল। দাও গো পাল মশায়, একটু তামাক দাও, ঢেলে সাজি। এঃ, একেবারে ঠিক্‌রে সার ক'রে গেছে।"

সিধু হাসিয়া বলিল, "বামুন-চোষা কল্‌কে, আর কায়েত-চোষা গাঁ।"

গ্রামে যখন এইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখন অনেকেই আসিয়া রামজয়কে এই বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রামজয় উত্তর দিতে দিতে বিরক্ত হইয়া উঠিল। শেষে সে উত্ত্যক্ত হইয়া গৃহিণীকে বলিল, "গিন্নী-মা, হয় বিনোদের বিয়ে দাও, নয় তো বল, আমি দেশ ছেড়ে যাই।"

গৃহিণী বলিলেন, "তোমাকে দেশ ছাড়তে হবে না রামজয়, আমি শীগ্‌গীর বিনুর বিয়ে দেব।"

রামজয় আশ্বস্ত হইয়া দিন গণিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সোমবার হইতে শনিবার ছয়টা দিন। এই দিন কয়টা মণির বড় কষ্টেই কাটিল। তাহার কিছুই ভাল লাগিত না; খেলায় গল্পে মন বসিত না, আমোদ-প্রমোদ বিষবৎ বোধ হইত; সর্ব্বদাই যেন একটা তীব্র বেদনা আসিয়া বুকের ভিতর চাপিয়া বসিত। কিন্তু কেন যে এই বেদনা, তাহা সে বুঝিতে পারিত না। সে অনেকবার রমাদার উপর রাগ করিয়াছে, রাগের মুখে রমাদাকে অনেক কষ্ট দিয়াছে, কিন্তু সে জন্য নিজে এত কষ্ট কখন তো বোধ করে নাই ? এই কষ্টের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সে নানা কাজে মন দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন কাজেই মন বসিল না, সকল কাজেই মনের ভিতর হইতে একটা অব্যক্ত বেদনাব তরঙ্গ ফুলিয়া উঠিত; মণি শত চেষ্টাতেও সে তরঙ্গটুকু থামাইতে পারিত না।

দিদিমা নাতনীব এই অন্যমনস্কভাব লক্ষ্য করিয়া যদি জিজ্ঞাসা করিতেন, "মণি, তোর হ'ল কি ?" মণি জোর করিয়া হাসিয়া বলিত, "কি আবার হবে ?" কিন্তু তাহার সেই ফাঁকা হাসিটুকুর ভিতরেই অনেকখানি বিষাদের রেখা ফুটিয়া উঠিত, মণি তাহা বুঝিতে পারিত না।

সপ্তাহ-শেষে শনিবাব আসিল। মণি সে দিন সকাল সকাল গৃহকার্য্য শেষ করিয়া সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্ব হইতেই বার বার পথের দিকে চাহিতে লাগিল, সখী দুর্গা আসিয়া ডাকিল, "আয় লো সই, গা ধুতে যাই।"

মণি বলিল, "আমি গা ধুয়ে এসেছি।"

দুর্গা। এত তাড়াতাড়ি ?

মণি। কেন, ধুতে কি নাই ?

দুর্গা। তা থাকবে না কেন, কিন্তু তোর আর দেখা নাই, হয়েছে কি ?

মণি। বিরহ।

দুর্গা হাসিয়া বলিল, "মিলন হ'ল কবে ?"

মণি। বিরহ হয় নি যবে।

দুর্গা। তার পর ?

মণি। মনান্তর।

দুর্গা। তাই তো বলি, আমার সখী কেন হ'ল এমনতর ?

মণি হাসিল, দুর্গাও হাসিল। দুর্গা বলিল, "তবু ভাল, আজ তোর শুক্‌নো মুখে হাসি।"

মণি। আজ বেজেছে যে কালার বাঁশী।

দুর্গা। তাইতে বুঝি মনটা উদাসী ?

মণি। মন উদাসী, প্রাণ উদাসী; জীবনটা খাচ্ছে খাবী।

দুর্গা। আর বাকী কি ?

মণি। দড়ি আর কলসী।

"মরণ আর কি" বলিয়া দুর্গা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। মণি একখানা বই হাতে লইয়া দরজার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মণি দরজায় জলছড়া দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া শাঁখ বাজাইল। ত্রিপুরাসুন্দরী রান্না চাপাইলেন। মণি বড় ঘরের দাবায় চুপ করিয়া

বসিয়া রমাদার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রমানাথ কিন্তু আসিল না। দণ্ডের পর দণ্ড এক এক যুগের পরিমাণ লইয়া বহিয়া যাইতে লাগিল, রমানাথের আসিবার নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেল, তথাপি রমানাথ আসিল না; মণি অন্তরে দারুণ উৎকণ্ঠার ভার লইয়া একা আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া রন্ধনশালায় গিয়া দিদিমার কাছে বসিল।

দিদিমা বলিলেন, "রমা এখনও এলো না। বোধ হয়, ৭টার গাড়ীতে আস্‌বে।"

মণি কোন উত্তর না দিয়া উনানে একখানা কাষ্ঠ গুঁজিয়া দিল।

রন্ধন শেষ হইলে ত্রিপুরাসুন্দরী ভাতের হাঁড়ীতে চাপা দিয়া মালা হাতে বড় ঘরের দাবায় আসিয়া বসিলেন; মণি তাঁহার পাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একখানা কালো মেঘের ছায়ায় কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারটা খুব জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। সেই স্তব্ধ নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে হৃদয়ের একটা তীব্র উৎকণ্ঠা, একটা অজ্ঞাত আশঙ্কার ছায়া লইয়া উভয়েই নীরবে বসিয়া রহিল, কেহই একটি কথাও কহিতে পারিতেছিল না। যেন একটু শব্দ হইলেই এই স্তব্ধ রজনীর গাম্ভীর্য্য ভাঙ্গিয়া যাইবে, এই জমাট অন্ধকারের মধ্য হইতে একটা অজ্ঞাত বিভীষিকা আসিয়া তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইবে।

মণি আর থাকিতে পারিল না; অনেক চেষ্টার পর সাহসে ভর করিয়া মৃদু চাপা গলায় ডাকিল, "দিদিমা!"

সেই চাপা গলার মৃদু আহ্বানেও ত্রিপুরাসুন্দরী যেন শিহরিয়া উঠিলেন; তিনিও সংক্ষেপে মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, "কি?"

মণি বলিল, "৭টার গাড়ী বোধ হয় চ'লে গেছে।"

উদ্বেগপূর্ণ-কণ্ঠে ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "কিন্তু রমা এখনো এল না কেন?"

আবার দুই জনে নীরব। সে নীরবতার মধ্য দিয়া অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। দিদিমা মালা শেষ করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় আস্‌বে না!"

আস্‌বে না। মণির বুকের ভিতর দুম করিয়া যেন একটা ঘা পড়িল। আস্‌বে না? কেন? রাগে? কার উপর রাগ? মণির উপর? মণি তাহাকে সে দিন না খাওয়াইয়া বিদায় দিয়াছে। কিন্তু সে জন্য মণি আজ কয় দিন কি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহা অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কে বুঝিবে? তার উপর রমাদা, তুমিও রাগ করলে? তুমিও কি মণিকে এতই পর ভাব?

ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "তুই খাবি চল্‌।"

মণি বলিল, "না।"

ত্রিপুরাসুন্দরী একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "তবে কি সারারাত এইখানে ব'সে থাক্‌বি?"

মণি। না, শুতে যাই চল।

ত্রিপুরা। খাবি না?

মণি। ক্ষিদে নাই।

ত্রিপুরাসুন্দরীরও মনটা ভাল ছিল না, সুতরাং তিনি মণিকে খাইবার জন্য বেশী অনুরোধ করিলেন না। রান্না ভাত চাপা রহিয়া গেল, মণি গিয়া দিদিমার কাছে শুইয়া পড়িল। দিদিমা কিছুক্ষণ রমানাথের না আসার সম্বন্ধে অনুমানসিদ্ধ নানাপ্রকার মত প্রকাশ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। মণির চোখে কিন্তু ঘুম আসিল না, সে বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এক একবার তন্দ্রা আসিল, কিন্তু ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মণি শিহরিয়া জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ত্রিপুরাসুন্দরী পরদিন স্নান করিতে গিয়া শুনিয়া আসিলেন, কাল চাঁপাতলা ষ্টেশনের কাছে একখানা মালগাড়ীর এঞ্জিনের সহিত সন্ধ্যা ৭টার গাড়ীর ঠোকাঠুকি হইয়া গিয়াছে। তাহাতে অনেক লোক মরিয়াছে, অনেকে মর-মর হইয়াছে, অনেকের হাত-পা মাথা ভাঙ্গিয়াছে। ত্রিপুরাসুন্দরী বাড়ীতে আসিয়া কাঁদাকাটা করিতে লাগিলেন। মণি মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে ঠাকুর, রমাদা আমার উপর রাগ ক'রে কাল যেন না এসে থাকে!"

দিদিমাকে কাঁদাকাটা করিতে দেখিয়া মণি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "কেঁদো না দিদিমা, রমাদা কাল কখনই আসে নি।"

দিদিমা বলিলেন, "তাই হোক্ মণি, তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।"

কিন্তু উভয়েরই হৃদয় উৎকণ্ঠায় দুর্ দুর্ করিতে লাগিল।

বেলা প্রায় একপ্রহরের সময় একখানা পাল্কী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইতেই মণি ছুটিয়া গিয়া পাল্কীর দরজা খুলিয়া ফেলিল। দরজা খুলিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দিদিমা বাড়ীর ভিতর হইতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে লা, মণি?"

মণি কোন উত্তর দিতে পারিল না, সে শঙ্কিত বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার পাল্কীর দিকে এবং একবার দিদিমার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দিদিমা বাহিরে আসিতে আসিতে উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুখে কথা নাই যে, কে?"

সহসা পাল্কীর ভিতর দৃষ্টি পড়িতেই দিদিমা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এঁ্যা, রমা যে? ওরে, কি হ'ল রে?"

ত্রিপুরাসুন্দরীর চীৎকারে দুই চারিজন প্রতিবেশী আসিয়া জুটিল। তাহারা ধরাধরি করিয়া রমানাথকে ঘরে আনিয়া শোয়াইল। ত্রিপুরাসুন্দরী কাঁদিতে লাগিলেন। মণি কাঁদিল না, একটুও কাতরতা বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না; সে ধীরে ধীরে গিয়া অচেতন রমানাথের মাথার কাছে বসিল, এবং ডাক্তার ডাকিবার জন্য জনৈক প্রতিবাসীকে অনুরোধ করিল। ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "কোন্ ডাক্তার?"

মণি বলিল, "বিনোদ বাবু।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "সে আস্‌বে কি?"

মণি বলিল, "আস্‌তে পারে।"

প্রতিবাসী ছুটিয়া বিনোদ ডাক্তারকে ডাকিতে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই বিনোদ ঔষধাদিসহ উপস্থিত হইল। ত্রিপুরাসুন্দরী তাহার হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বিনোদ, ভাই, রমাকে বাঁচা।"

বিনোদ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া রোগীর চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইল। ত্রিপুরাসুন্দরী উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম? বাঁচ্‌বে তো?"

বিনোদ বলিল, "ভয় নাই, মাথায় একটু চোট লেগেছে মাত্র।"

মণি কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, একটুও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিল না। সে নীরবে ডাক্তারের আদেশমত রোগীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। তাহার এই অসাধারণ ধৈর্য্য দর্শনে বিনোদ চমৎকৃত হইল এবং সন্ধ্যার সময় আসিবে বলিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর বিনোদ পুনরায় আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিল, এবং ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ত্রিপুরাসুন্দরীকে ডাকিয়া বলিল, "আজ আর কি উনান জল্‌বে না দিদিমা?"

দিদিমা বলিলেন, "আর কার জন্যে উনান্ জল্‌বে ভাই? রমা যদি বাঁচে, তবেই আবার জল্‌বে।"

বিনোদ বলিল, "সে তো দু'দিন পরে; আপাততঃ আমার জন্যই না হয় উনানটা জ্বেলে ফেল।"

দিদিমা আশ্চর্য্যান্বিতভাবে বিনোদের মুখের দিকে চাহিলেন। বিনোদ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আজ রাত্রে বোধ হয় আমাকে এখানে থাক্‌তে হবে, সুতরাং রাত্রে কিছু খেতেও হবে। ক্ষুধাটা সহ্য করা আমার মোটেই অভ্যাস নাই।"

দিদিমা হাসিয়া রান্না চাপাইতে গেলেন।

বিনোদ মণিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমিও উঠে কিছু খাও দাও। অপর কেউ উপোস্ কর্‌লে রোগীর কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই।"

মণি উঠিল না, কোন উত্তর দিল না। রমানাথের মুখের দিকে চাহিয়া সে নীরবে নতনেত্রে বসিয়া রহিল।

সারারাত্রি রোগীর শুশ্রূষা চলিল। ত্রিপুরাসুন্দরী কতকক্ষণ জাগিয়া থাকিলেন, তার পর আঁচল পাতিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। বিনোদ বা মণি একবারও ঘুমাইল না। বিনোদ মণিকে ঘুমাইবার জন্য অনুরোধ করিলে মণি বলিল, "আমার ঘুম আস্‌ছে না।"

শেষ রাত্রে রমানাথের একটু চৈতন্য হইল। সে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া অস্পষ্টস্বরে ডাকিল, "মণি!"

মণি তাহার মাথার কাছেই বসিয়া ছিল। তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। রমানাথের ডাক শুনিবামাত্র সে চমকিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "কেন রমাদা?"

রমানাথ ক্ষীণ অস্পষ্টস্বরে বলিল, "ভুল—মস্ত ভুল হয়েছে মণি, কিন্তু তুই রাগ করিস্ না।"

তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মণি বলিল, "না রমাদা, আমার একটুও রাগ নাই।"

রমানাথ বলিল, "বিনোদকে তুই—না না, আমি তোর কেউ নয়।"

রমানাথের স্বরটা যেন রুদ্ধ অভিমানের কান্নায় ভরা; রমানাথের বুকের উপর একটা হাত রাখিয়া মণি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "কে বলে রমাদা, তুমি কেউ নও?"

"তুই রাগ করিস্ না মণি, রাগ করিস্ না।"

অস্ফুটকণ্ঠে চীৎকার করিয়া রমানাথ আবার সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মণিও চীৎকার করিয়া উঠিল, "রমাদা, রমাদা!"

বিনোদ তাড়াতাড়ি ঔষধের বাক্স খুলিয়া একটা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রমানাথের মুখে ঢালিয়া দিল। তার পর মণিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমায় এখনি একবার বাড়ীতে যেতে হবে।"

মণি বলিল, "এমন সময়?"

বিনোদ। একটা ওষুধের দরকার পড়েছে।

মণি। সকালে হ'লে চলে না?

বিনোদ। না, তার আগেই খাওয়ান দরকার। আধঘণ্টা পরে ঐ লাল ওষুধটা এক দাগ দিও। পারি তো তার আগেই আমি ফিরে আস্ছি।

একটু উদ্বেগের স্বরে মণি বলিল, "কিন্তু এই রাত্রে আপনি একা—"

বিনোদ মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেল। মণি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পাশে প্রদীপটা মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। অন্ধকার গগনপ্রান্তে শুকতারা সবেমাত্র উঠিয়া জানালার ভিতর দিয়া উঁকি দিতেছিল; ভোরের বাতাস ঝির ঝির করিয়া আসিয়া মণির জাগরণতপ্ত ললাট স্পর্শ করিতেছিল। সম্মুখে রমানাথ চক্ষু মুদিয়া পড়িয়াছিল; তাহার অভিমানখিন্ন মুখখানা যেন নীরবে বলিতেছিল, "তুই রাগ করিস্ না মণি, রাগ করিস্ না।" বাম করতলের উপর মাথাটা রাখিয়া মণি নীরবে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন রমানাথের অবস্থা অনেকটা ভাল হইল। স্বাভাবিক জ্ঞানও ফিরিয়া আসিল। মধ্যাহ্নে ডাক্তার আসিয়া ঔষধের পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। মণি জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখলেন?"

সহাস্যে বিনোদ বলিল, "তুমি কি রকম দেখছ?"

মণি মুখ নীচু করিয়া সলজ্জ কণ্ঠে বলিল, "বোধ হয়, একটু ভাল।"

বিনোদ বলিল, "আমি কিন্তু দেখছি, অনেকটা ভাল, কেমন, নয় কি?"

মণি মৃদু হাসিল। বিনোদ বলিল, "আর ভয় নাই, তোমার রমাদা সেরে উঠেছে।"

মণি বলিল, "আপনার ধার কখন শুধ্তে পার্ব না।"

বিনোদ হাসিয়া বলিল, "এ এক রকম মন্দ মহাজনী নয়, খাতক ধার নিয়েই বলে, শুধ্তে পার্ব না।"

মণি বলিল, "মহাজন না বুঝে এত বেশী ধার দেয় কেন?"

বিনোদ। খাতকেরও ক্ষমতার অতিরিক্ত ধার নওয়া অনুচিত।

মণি। যার অভাব, তার উচিত অনুচিত জ্ঞান থাকে না।

বিনোদ। তা হ'লে দেখছি, এর পর মহাজনকেই সাবধান হ'তে হবে। তবে খাতক শুধতে না পার্লেও সে খাতক।

মণির মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। রমানাথ একবার চোখ মেলিয়াই আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল।

বিনোদ চলিয়া গেল। ত্রিপুরাসুন্দরী আসিয়া ডাকিলেন, "হাঁ লা মণি, তোর কি নাওয়া-খাওয়া সব গেল?"

মণি বলিল, "এই যাই দিদি-মা।"

"আর কবে যাবি? বেলা কি আছে? শীগ্‌গির আয়।"

ত্রিপুরাসুন্দরী চলিয়া গেলেন। মণি উঠিতে যাইতেছিল, এমন সময় রমানাথ চক্ষু মেলিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মণি সরিয়া আসিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রমাদা?"

ক্ষীণস্বরে রমানাথ বলিল, "কিছু না। ডাক্তার—বিনোদ বাবু—"

মণি বলিল, "চ'লে গেছেন।"

রমা। বেলা কত?

মণি। আড়াই প্রহর হবে।

রমা। এখনো তোর নাওয়া-খাওয়া হয় নি?

মণি। এইবার হবে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রমানাথ বলিল, "আমার জন্য তোদের খুব ভাবনা হয়েছিল, না?"

মণি বলিল, "ভাবনা ব'লে ভাবনা। মা গো, যখন তোমাকে পাল্কী হ'তে নামালে, তখন তো তুমি নাই বল্লেই হয়।"

রমা। তার পর?

মণি। তার পর দিদি-মা তো আছড়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগলো, আমি তাড়াতাড়ি ওবাড়ীর হারু মামাকে দিয়ে বিনোদ বাবুকে ডাক্তে পাঠালাম।

রমা। বিনোদ এল?

মণি। কেন আস্বে না? ডাক্তেই তাড়াতাড়ি ছুটে এল, বাড়ী থেকে ওষুধ এনে তোমাকে খাওয়াতে লাগ্‌লো, মাথায় জলপটী বেঁধে দিলে। সন্ধ্যার সময় এসে সারারাত জেগে ব'সে রইল।

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রমানাথ বলিল, "তুই বোধ হয় ঘুমাস্ নি?"

মণি বলিল, "ও মা, তোমার এমন অসুখ, আর আমি ঘুমাব?"

দিদিমা ডাকিলেন, "ওলো মণি!"

রমানাথ বলিল, "যা মণি, বেলা গেল।"

মণি বলিল, "এখন একটু দুধ খাবে?"

রমানাথ বলিল, "একটু পরে। খেয়ে দেয়ে দুধ নিয়ে আসিস্।"

মণি চলিয়া গেল, রমানাথ চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

আহারান্তে দুধের বাটি হাতে লইয়া মণি আসিয়া ডাকিল, "রমাদা!"

রমানাথ চক্ষু মেলিয়া চাহিল। মণি ব'লিল, "দুধ খাও।"

মণি মুখে দুধ ঢালিয়া দিতে লাগিল, রমানাথ খাইতে লাগিল। দুধ খাইয়া রমানাথ বালিসে ভর দিয়া উঠিয়া বসিল; মণি পাশে বসিয়া তাহাকে বাতাস করিতে করিতে বলিল, "এখন কেমন আছ?"

রমানাথ বলিল, "ভাল আছি, শুধু মাথাটা একটু ভারী।"

মণি বলিল, "বিনোদ বাবু বলেছে, ওটা এখন দু'চার দিন থাক্‌বে।"

রমানাথ সহাস্যে বলিল, "আরও দিনকতক বেশী থাক্‌লে ভাল হয়।"

মণি। কেন?

রমা। দিব্যি প'ড়ে প'ড়ে তোর হাতের পাখার বাতাস খাই।

মণি একটু লজ্জার হাসি হাসিল। রমানাথ বলিল, "তুই না আমার উপর রাগ করেছিলি?"

বিছানার উপর পাখার বাঁটটা ঠুকিতে ঠুকিতে মণি মুখ নীচু করিয়া ভারী গলায় বলিল, "হাঁ, রাগ করেছিলাম, তোমায় বলেছে।"

মুগ্ধ দৃষ্টিতে মণির লজ্জারক্ত মুখের দিকে চাহিয়া রমানাথ বলিল, "লুকালে চলবে না মণি, সত্যই তুই সে দিন খুব রেগেছিলি। তবে আমিও তার কম শোধ দিই নাই। কেমন, না?"

মৃদু হাসিয়া মণি বলিল, "বেশ শোধ দিয়েছ!"

রমানাথ বলিল, "কেন শোধ দেব না? পুরুষ-মানুষ ব'লে কি আমাদের রাগ নাই?"

মণি বলিল, "রাগ নাই, এমন কথা অতি বড় শত্রুও বল্‌তে পার্‌বে না; যথেষ্ট রাগ আছে।"

রমানাথ হাসিতে হাসিতে বলিল, "বুঝেছিস তো?"

মণি। বেশ বুঝেছি।

রমা। কিন্তু কি রকমে বুঝ্‌লি?

মণি। রাগ হ'লে পুরুষমানুষ শনিবারে বাড়ী আসে না।

রমানাথ হাসিয়া উঠিল; বলিল, "ঠিক তাই মণি, শনিবারে সত্যই মনে হয়েছিল, দূর হোক্, বাড়ী যাব না। কিন্তু বেলা যতই প'ড়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, মনটা ততই ছটফট কর্‌তে থাক্‌ল। দলে দলে লোক ষ্টেশনের দিকে ছুটছে, আমিও আর থাক্‌তে পারলাম না, ছুটে এসে সাতটার গাড়ী ধর্‌লাম।"

মণি। আমরাও তাই মনে করেছিলাম। তার পর গাড়ী ঠোকাঠুকি হ'ল কেমন ক'রে?

রমা। কেমন ক'রে কি হ'ল, তা ঠিক জানি না। গাড়ী ছুটেছে, আমি ব'সে ব'সে নানান কথা ভাবছি। হঠাৎ কামানের আওয়াজের মত একটা বিকট শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনি। তার পর আর কিছুই মনে নাই।

শিহরিয়া মণি বলিল, "মা গো, ভাগ্যে সামনের গাড়ীতে ছিলে না?"

মৃদু হাসিয়া রমানাথ বলিল, "তা হ'লে তোর রাগের শোধটা আরও ভাল রকমে হ'ত, না মণি?"

"যাও" বলিয়া মণি মুখ ফিরাইয়া লইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর বিনোদ আসিয়া রমানাথকে দেখিয়া গেল। দুই চারিটা প্রশ্ন করিল, রমানাথ মুখ না তুলিয়াই তাহার উত্তর দিল। বিনোদ চলিয়া গেলে রমানাথ মণিকে বলিল, "বিনোদ বাবু বেশ ভদ্রলোক, না মণি?"

মণি মুখ ফিরাইয়া উদাস স্বরে উত্তর করিল, "কি জানি।"

রমানাথ বলিল, "কি জানি কি? খুব ভদ্রলোক। বিনা পয়সায় কোন্ ডাক্তার এতদূর করে? তার উপর—"

মণি জিজ্ঞাসা করিল, "তার উপর কি?"

রমানাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "না, বলি, ওর অভাবই বা কি?"

হাসি চাপিয়া মণি বলিল, "হুঁ।"

রমা। তবে থাক্‌লেই বা পয়সা। হাজার পয়সা থাক্‌লেও ডাক্তার আর উকীল এরা কি নিজের স্বভাব ছাড়ে?

মণি চুপ করিয়া রহিল। রমানাথ আপন মনে বলিতে লাগিল, "হাজার হোক বনেদী বংশ তো। এই জন্যই বলে, বনেদীর আঁস্তাকুড়ও ভাল।" একটু চুপ

করিয়া থাকিয়া রমানাথ আবার বলিল, "দেখি, ভগবান্ কি করেন। কি বলিস্ মণি, সুপাত্র বল্‌তে হবে। তবে আর এক স্ত্রী আছে, ঐ যা একটু দোষ।"

মণি মুখ টিপিয়া মৃদু হাসিল। রামানাথ বলিল, "দোষই বা এমন কি, সে স্ত্রীকে তো ঘরে নিচ্ছে না। তুই কি বলিস্?"

মণি বলিল, "তুমি কি আমাকে স্বয়ংবরা হ'তে বল রমাদা?"

একটু অপ্রস্তুত হইয়া রমানাথ বলিল, "না না, তা নয়। তবে তুইও তো নেহাৎ বিয়ের কনেটি নয়, নিজের ভালমন্দ বুঝতে পারিস্। আমার মত কি জানিস্, নেহাত আট বছরের খুকীটির বিয়ে দেওয়ার চেয়ে মেয়ে একটু বড় ক'রে বিয়ে দেওয়াই ভাল।"

মণি বলিল, "এখন ওষুধ এক দাগ খেলে বোধ হয় তার চেয়েও ভাল হয়।"

রমানাথ হাসিয়া বলিল, "তা তোর যদি ভাল মনে হয়, তবে দিতে পারিস্। তবে আমারও যা ভাল বোধ হয়, তা তো কর্‌তে হবে?"

মণি বলিল, "তা করো এখন, আগে ওষুধটুকু খেয়ে ফেল।"

মণির হাত হইতে ঔষধের গ্লাস লইয়া রমানাথ গলায় ঢালিয়া দিল। তার পর একটু সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "তা তুই যাই বলিস্ মণি, বিনোদ বাবুর মত সুপাত্র পাওয়া দায়। যেমন ঘর, তেমনি বর, টাকারও খাঁকতি নাই, সব দিকেই ভাল।"

মালা হাতে ত্রিপুরাসুন্দরীর ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার সব দিকে ভাল রে রমা?"

রমানাথ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "কে দিদিমা? তোমার কাজ সারা হয়েছে? বাপ! সারা দিনরাতেও তোমার কাজের আর শেষ হয় না।"

ঈষৎ হাসিয়া দিদিমা বলিলেন, "কি কর্‌ব বল্, আমার তো আর দাসী-চাক্‌রাণী নাই যে, সংসারের কাজকর্ম্ম দেখবে।"

রমানাথ গম্ভীর মুখে বলিল, "ইচ্ছা হয় দিদিমা, বুঝলে, এক একবার বড্ডই ইচ্ছা হয় যে, দাসী-চাকরাণী রেখে তোমায় বসিয়ে খাওয়াই। কিন্তু অদৃষ্ট আমার!"

রমানাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। দিদিমা বলিলেন, "আমার আর দাসী-বাঁদীতে কাজ নাই রমা, হরি করুন, এমনি ক'রে খাট্‌তে খাট্‌তে যেন তোদের কোলে মাথা রেখে যেতে পারি।"

মালা সমেত হাত তুলিয়া দিদিমা হরির উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন। রমানাথ বলিল, "যাবার কথা ব'ল না দিদিমা, তুমি গেলে আর থাক্‌বে কে? না দিদিমা, তোমার যাবার কথা শুন্‌লে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে।"

হাসিয়া দিদিমা বলিলেন, "পাগল আর কি! আমি কি আজই যাচ্ছি? আগে তোর বিয়ে দি, মণির একটা কিনারা হোক্। তার পর যাবার কথা।"

কম্বল-আসন-খানা টানিয়া লইয়া চাপিয়া বসিয়া দিদিমা বলিলেন, "এখন কার ভালর কথা বল্‌ছিলি?"

মণি ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রমানাথ বলিল, "এই বিনোদ বাবুর কথা বল্‌ছিলাম। কেমন দিদিমা, সুপাত্র কি না? ঘর বর সব দিকেই ভাল।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দিদিমা বলিলেন, "সে কথা আর কেন রমা?"

রমা। কেন, এটা দোষের কথা না কি?

দিদি। দোষের কথা নয়; কিন্তু—

রমা। কিন্তু কি? একবার জবাব দেওয়া হয়েছে, এই তো? তাতে আর হয়েছে কি? বুঝতে পারি নাই, ভুল হ'য়ে গেছে। ভুল-ভ্রান্তি সকলেরই হয়। "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" বুঝলে দিদিমা, বড় বড় মুনিঋষিদেরও ভুল হয়ে থাকে, আমি তো কোন্ ছার্!"

দিদিমা নীরবে মালা ঘুরাইতে লাগিলেন। রমানাথ বলিল, "তুমি কিছু ভেব না দিদিমা, আমিই ভেঙ্গে দিয়েছি, আমিই আবার জোড়া দিয়ে দেব। তোমার রমানাথ সব পারে দিদিমা, হুঁ হুঁ;"

দিদিমা বলিলেন, "হরি করুন, তাই হোক্।"

রমা। হোক্ কি, হয়ে আছে। ওদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে তো?

দিদি। খুব।

রমা। কিছু চায় না?

দিদি। এক পয়সাও না।

রমানাথ সোজা হইয়া বসিয়া, হাতে হাত চাপড়াইয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, "ব্যোম্ ভোলানাথ, ও তো হয়েই গেছে। বোশেখ মাসের আর ক'দিন আছে?

দিদিমা। দশ দিন।

রমা। বেশ, এই দশ দিনের ভেতর বিনোদ ডাক্তারের সঙ্গে মণির বিয়ে হয়ে গেছে, এ তুমি লিখে রাখ।

ভাবী আনন্দের আশায় দিদিমার মুখখানা হর্ষোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রমানাথ বলিল, "তা তো হ'ল, কিন্তু এ দিকের কি? পণ যেন দিতে হ'ল না,

গয়নাও দুচারখানা আছে, কিন্তু বরাভরণ, খাওয়ান-দাওয়ান, ফুলশয্যা এ সব খরচ আছে তো। খুব কম ক'রে ধরলেও চার শো টাকা।"

দিদিমার প্রফুল্ল মুখখানা একটু ম্লান হইয়া আসিল; বলিলেন, "এত টাকা কোথা হ'তে আসবে ?"

উত্তেজিত কণ্ঠে রমানাথ বলিল, "যেখান হ'তেই হোক, আসতেই হবে। তুমি কি মনে কর দিদিমা, আমি এত দিন চুপ ক'রে আছি ? তবে বেশী জমাতে পারি নাই, দু'শোখানি টাকা সেভিং ব্যাঙ্কে আছে। বাকী দু'শো, তা কেউ কি আর ধার দেবে না ? কেন, আমি কি শুধতে পারব না, না পালিয়ে যাব ? আচ্ছা, সে দেখা যাবে, কিন্তু দিদিমা, বিয়েতে একটা জিনিস চাই।"

দিদি। কি জিনিস ?

রমা। বাজনা; অন্ততঃ এক-দল রোসন-চৌকী। দরজায় সানাই না বাজলে—

"দুধ আনব রমাদা ?"

রমানাথ ফিরিয়া চহিল; চাহিতেই মণির মুখখানা তাহার চোখে পড়িল। কি সুন্দর মুখ ! নিখুঁত নিটোল, হাস্যপ্রদীপ্ত মুখ ! প্রদীপের আলো পড়িয়া সে মুখখানা আরও সুন্দর—আরও সমুজ্জ্বল হইয়াছে। রমানাথ বসিয়া ছিল, শুইয়া পড়িল। মণি জিজ্ঞাসা করিল, "দুধ আনব ?"

একটু ভারী গলায় রমানাথ বলিল, "এখন থাক।"

দিদিমা মণির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুই শুতে যা, আমি দুধ গরম ক'রে এনে দেব।"

মণি চলিয়া গেল, রমানাথ চুপ করিয়া রহিল। দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল রে রমা ?"

রমানাথ বলিল, "কিছু না, মাথাটা একটু টিপ্ টিপ্ করছে।"

দিদিমা বলিলেন, "এতক্ষণ বকেছিস্ কি না। চুপ ক'রে শুয়ে থাক্; আমি দুধটা গরম ক'রে আনি।"

দিদিমা ঘরের বাহির হইয়া গেলেন, রমানাথ নীরব নিস্পন্দভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, "মণি কথাগুলা শুনতে পেয়েছে না কি ? তাই কি ওর মুখখানা হাস হাস ?"

পরদিন বিনোদ আসিলে রমানাথ অন্যান্য কথার পর বলিল, "বিনোদ বাবু, আমি একটা ভুল করেছিলাম।"

বিনোদ বলিল, "মানুষের ভুল হওয়াই স্বাভাবিক।"

রমা। "আমি এখন সেই ভুলের সংশোধন করতে চাই।

বিনোদ। ভুল সংশোধন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

রমানাথ একটু ভাবিয়া বলিল, "আপনি কি আমায় ক্ষমা করতে পারবেন ?"

বিনোদ বলিল, "আমার কাছে আপনি এমন কোন অপরাধ করেন নাই।"

রমানাথ সহসা বিনোদের হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "যথেষ্ট অপরাধ করেছি, আমায় ক্ষমা করুন বিনোদ বাবু, আপনিই মণির উপযুক্ত পাত্র।"

বিনোদের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে আপনার হাত টানিয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার অপেক্ষাও উপযুক্ত অনেক পাত্র আছে।"

ঈষৎ হতাশাব্যঞ্জক স্বরে রমানাথ বলিল, "তা থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা, আপনার হাতেই মণিকে দিই।"

বিনোদ নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল। রমানাথ বলিল, "তাতে মণিও সুখী হবে, আর বোধ হয়, আপনিও সুখী হবেন।"

বিনোদ নীরব। মৌনং সম্মতিলক্ষণং বুঝিয়া রমানাথ উৎসাহের সহিত বলিল, "শুভস্য শীঘ্রম্। আসছে সোমবারে ভাল দিন আছে, এই দিনেই শুভকর্ম্ম শেষ করতে হবে।"

বিনোদের মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা বিষাদের গাঢ় ছায়ায় ঢাকিয়া গেল। রমানাথ কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিতে লাগিল, "যাক্, বাঁচা গেল। মণির অদৃষ্টে যে এমন—"

বিনোদ বলিল, "কিন্তু রমানাথ বাবু!"

রমানাথ হাসিয়া বলিল, "এর আর কিন্তু নাই। আমি অহঙ্কার করছি না, কিন্তু মণির মত স্ত্রী পাওয়া অল্প সৌভাগ্যের কথা নয় বিনোদ বাবু। তা ছাড়া, আমি বেশ জানি, মণি আপনাকে ভালবাসে। আপনার সঙ্গে সম্বন্ধটা ভেঙ্গে যাওয়ায় আমার উপর মণির যে রাগ!"

রমানাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "নেহাত ছেলেমানুষ বিনোদ বাবু, নেহাৎ ছেলেমানুষ। কথায় কথায় রাগ। তা এবার আমি সে রাগ হ'তে অব্যাহতি পেলাম, এখন রাগ-টাগ যা কিছু আপনার ঘাড় দিয়েই—"

সহসা বিনোদের তীব্র দৃষ্টিপাতে চমকিত হইয়া রমানাথ নীরব হইল। বিনোদ বলিল, "ছিঃ রমানাথ বাবু!"

রমানাথ চমকিত, বিস্মিত, ভীত। বিনোদ গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল, "তা হয় না রমানাথ বাবু!"

রমানাথ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন হয় না।

বিনোদ উঠিয়া দাঁড়াইল; নীরস গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "যার জন্য আমার মা অপমানিত হয়েছেন, সে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী হ'লেও, তার ভালবাসা অমূল্য হ'লেও, তাকে আমি গ্রহণ করতে পারি না।"

বিনোদ আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিয়া গেল; রমানাথ হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিল।

"রমাদা!"

মণির তীব্র কণ্ঠস্বরে রমানাথের চমক হইল। সে মুখ তুলিয়া মণির মুখের দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল। মণি গর্জ্জন করিয়া বলিল, "আমি বিনোদ বাবুকে ভালবাসি, এ কথা তোমায় কে বল্লে?"

রমানাথ নীরবে নতবদনে বসিয়া রহিল। মণি বলিল, "তোমার জন্য কি আমায় গলায় দড়ি দিতে হবে?"

রমানাথ মুখ তুলিল; অপরাধীর ন্যায় কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া ভগ্ন দীর্ণ কণ্ঠে বলিল, "আমায় ক্ষমা কর্ মণি, একটা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে আর একটা ভুল ক'রে বসলাম। কিন্তু দোহাই মণি, শুধু তোর সুখের জন্যই—"

রমানাথ আর বলিতে পারিল না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মণি কিন্তু তাহার চোখে জল দেখিয়া একটু নরম হইল না; উগ্র নীরস কণ্ঠে বলিল, "আমি যোড়হাত ক'রে বল্‌ছি রমাদা, আমার সুখের জন্য তুমি একটুও ব্যস্ত হ'য়ো না। তোমাকে আমারই দিব্যি রইল।"

কথা শেষ করিয়াই মণি দ্রুতপদে চলিয়া গেল; রমানাথ হাতে মুখ ঢাকিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রামজয় বলিল, "তা হবে না, গিন্নীমা।"

গৃহিণী বলিলেন, "কেন হবে না, রামজয়?"

রামজয় বলিল, "ওরা লোক ভাল নয়; সেবারে—"

গৃহিণী। সেবারে জবাব দিয়েছিল, কিন্তু এবারে আবার নিজেরাই সেধে এসেছে।

রাম। কে এসেছে?

গৃ। গিন্নী নিজে।

রাম। কিন্তু সেই ছোঁড়াটাকে চেন না।

গৃ। সে একটা পাগল! কিন্তু এবারে তারও মত হয়েছে।

রাম। মত হয়েছে?

গৃ। হাঁ, বিনোদ যে তাকে মরা বাঁচালে।

"বটে" বলিয়া রামজয় একটু ভাবিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "ওরা কি দেবে?"

গৃহিণী বলিলেন, "এক পয়সাও না।"

রাম। বিয়ের খরচপত্র?

গৃ। তাও আমাদের।

রামজয় হাঁ করিয়া কিছুক্ষণ গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তার পর বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, "তুমি কি পাগল হ'লে গিন্নীমা, সিন্দুকের পয়সা বের ক'রে ছেলের বিয়ে দিতে হবে?"

সহাস্যে গৃহিণী বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু উপায় কি? ওদের যে কিছুই নাই।"

রামজয় বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতলের আঘাত করিয়া জোর গলায় বলিল, "ওদের না থাকে, অপরের আছে। গোবিন্দপুরের শিবু চৌধুরীর নাম শুনেছ? মস্ত জমীদার, শালিয়ানা পঞ্চাশ হাজার টাকা নেট আয়। বাড়ী বাগান, পুকুর-পুষ্করিণী, লোকলস্কর হৈ-হৈ কাণ্ড।"

গৃহিণী নীরবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। রাম-জয় সোৎসাহে বলিতে লাগিল, "তারই মেয়ে, মেয়ে তো নয় যেন পরী। তার উপর নগদ পাঁচটি হাজার আর মেয়ের জড়োয়া সুট গহনা এ ছাড়া বরাভরণ, ফুলশয্যা, এ সব তো আছেই।"

গৃহিণী চুপ করিয়া রহিলেন। রামজয় বলিল, "একটু চাপ দিলে চাই কি আরও দু'এক হাজার আস্‌তে পারে। তুমি মনে করো না গিন্নীমা, রামজয় চুপ ক'রে ব'সে আছে। যে দিন ওরা জবাব দিয়ে গেছে, সেই দিনই আমি ঘটক লাগিয়েছি, আমাকে একবার দেখাতে হবে, বিনোদ রায়ের বিয়ে কত বড় ঘরে হ'তে পারে। সব ঠিক্‌ঠাক্, এখন কোন্ তারিখে ছেলের বিয়ে দেবে বল।"

গৃহিণী ঈষৎ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি।"

একটু বিরক্তির সহিত রামজয় বলিল, "কথা দিয়েছ, তাতে কি হয়েছে? কলিতে কেউ তো আর ভীষ্মদেব নয় যে কথার নড়চড় হবে না? আর ওরাও তো একবার কথা দিয়ে তার খেলাপ করেছিল।"

রামজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া গৃহিণী গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "ওরা করেছে ব'লে আমিও করব?"

রামজয়ের মুখখানা একটু ছোট হইয়া গেল। সে

নতমুখে নীরবে বসিয়া হাতে হাত ঘষিতে লাগিল। গৃহিণী বলিলেন, "তা আমি পারব না, রামজয়।"

রামজয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তা হ'লে এতগুলা টাকা—"

গৃহিণী বলিলেন, "সংসারে টাকাটাই কি বড়?"

রামজয় মুখখানা ভার করিয়া অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "তা বটে গিন্নীমা; আমার বাপ-চৌদ্দপুরুষে কখন হাজার টাকা চোখে দেখেনি, কাজেই আমাদের কাছে টাকাটাই বড় ব'লে মনে হয়। কিন্তু যাঁরা বড় মানুষ, তাঁদের কাছে ওটা কিছুই নয়।"

ঈষৎ হাসিয়া গৃহিণী বলিলেন, "রাগ ক'রো না রামজয়, টাকা যে খুব বড় জিনিস, তা আমিও জানি, কিন্তু টাকার চেয়েও মুখের কথাটা বড়; আবার তার চেয়েও বড় আমার ছেলের সুখ।"

"ছেলের সুখ!" রামজয় বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিল। গৃহিণী বলিলেন, "আমি সাধে কথা দিই নাই রামজয়।"

রামজয় বলিল, "তা আমি বুঝেছি, ওদের কাকুতি-মিনতিতে—"

বাধা দিয়া গৃহিণী বলিলেন, "তা নয়, শুধু ওদের কাকুতি-মিনতিতে আমি এত বড় অপমানটা মাথা পেতে নিতে পারি নাই। আমি কেবল ছেলের মুখ চেয়েই কাজ করেছি।"

রামজয় বলিল, "বুঝ্‌তে পার্‌লাম না গিন্নীমা।"

গৃহিণী বলিলেন, "বিনোদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে, ঐখানেই বিয়েটা হয়।"

রামজয় সাশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিল, "বল কি গিন্নীমা, বিনোদের ইচ্ছা?"

গৃহিণী। হাঁ।

রাম। বিনোদ বলেছে না কি?

মৃদু হাসিয়া গৃহিণী বলিলেন, "পাগল। এ কথা কি কেউ মুখ ফুটে বলে?"

রামজয় জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কিসে জান্‌লে?"

গৃহিণী বলিলেন, "কথাবার্ত্তার ভাবভঙ্গীতে বুঝেছি?"

আগ্রহের সহিত রামজয় বলিল, "ঠিক বুঝেছ?"

গৃহিণী বলিলেন, "ছেলের মনের কথা বুঝ্‌তে মায়ের কখন বেঠিক হয় না।"

রামজয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হুঁ, তা হ'লে বিনোদের মত আছে?"

গৃহিণী বলিলেন, "সম্পূর্ণ।"

স্বীয় উরুদেশে একটা চপেটাঘাত করিয়া রামজয় বলিল, "এ কথা আগে বল্‌তে হয়? চুলোয় যাক্ শিবু চৌধুরী, চুলোয় যাক্ তার টাকা। বিয়ের খরচ—তা না হয় তবিল থেকেই হবে। সত্য গিন্নীমা, টাকায় কি আসে যায়? আর এক কথা, টাকা নিয়ে ছেলের বিয়ে দেওয়া, এটাও বেশ ভাল নয়। মেয়ে বেচা যেমন পাপ, ছেলে বেচাও তো তেমনি পাপ? কাজ কি সে পাপের কড়িতে? বিনোদের অভাব কি?"

উভয় পক্ষেই রামজয়ের পোষকতা দেখিয়া গৃহিণী হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। রামজয় তাহা লক্ষ্য না করিয়াই উঠিয়া দাড়াইল; বলিল, "তা হ'লে আর কোন গোল নাই তো?"

গৃহিণী। না।

রাম। বেশ, আমি এ দিককার সব যোগাড় দেখি! তা হ'লে বিনোদের সম্পূর্ণ মত আছে, কি বল গিন্নীমা?

গৃহিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "না বাপু, এত শপথ ক'রে আমি বল্‌তে পার্‌ব না। তুমি নিজে না হয় একবার তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ।"

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে রামজয় বলিল, "তার আর দরকার নাই। যাক্, বিনোদ সুখী হ'লেই হ'ল। তা হ'লে মাঝে আর ছ'টা দিন, তা এরি মধ্যে সব ঠিক ক'রে ফেল্‌ব। আজই ধনা হাড়ীকে ডেকে বাজনার বায়নাটা দিয়ে ফেলি। বাজনাটা চাই-ই, কি বল গিন্নীমা, বাজনা না হ'লে বিয়ে মোটেই মানায় না। দেখি, যদি আগেকার বিয়ের ফর্দ্দখানা পাই।"

আগেকার ফর্দ্দের নামে রামজয়ের উৎসাহ-প্রফুল্ল মুখখানা একটু ম্লান হইয়া আসিল। গৃহিণী একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। রামজয় ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। গৃহিণী ঠাকুরঘরে যাইবার জন্য উঠিলেন।

বিনোদ আসিয়া ডাকিল, "মা!"

"কেন রে বিনু?"

"তীর্থে যাবে মা?"

পশ্চাৎ ফিরিয়া ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন।

বিনোদ বলিল, "তীর্থদর্শন তোমার অনেক দিনের সাধ; যাবে মা?"

"কবে?"

"আজই রাত্রির ট্রেণে।"

মাতা স্তম্ভিত দৃষ্টিতে পুত্রের বিষাদগম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিনোদ আসিয়া মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা ছেলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে বিনু?"

ম্লান হাসি হাসিয়া বিনোদ বলিল, "কিছু না মা, চল, দিনকতক ঘুরে আসি।"

অন্ন। তা যাব, কিন্তু দিনকতক পরে।

বিনোদ। পরে কেন?

অন্ন। আস্‌ছে সোমবারে মণির বিয়ে।

বিনোদ। পাত্রের ঠিক নাই।

অন্ন। আমি ঠিক করেছি।

বিনোদ। আমি জবাব দিয়ে এসেছি।

অন্নপূর্ণা বিস্ময়স্তম্ভিত দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রামজয় কাগজ-পেন্সিল হাতে ব্যস্তভাবে আসিয়া বলিল, "বরণডালার কি কি চাই, বল তো গিন্নীমা।"

গৃহিণী মাথা নীচু করিলেন। বিনোদ তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, "আজ রাত্রে পশ্চিম যাওয়ার সব জোগাড় ক'রে রাখবে জয়া দাদা।"

রামজয় সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কে যাবে?"

বিনোদ। মা আর আমি।

রাম। বিয়ে?

বিনোদ। বিয়ে হবে না।

রামজয়ের হাত হইতে কাগজ-পেন্সিল পড়িয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হবে রে রমা?"

রমানাথ বলিল, "কি আর হবে, দেশে কি আর ছেলে নাই?"

দিদি। এত দিনেও তো একটা জুটলো না।

রমা। সময় হ'লে আপনিই জুটবে।

দিদি। সময় আর কবে হবে? এ দিকে যে পনরয় পড়ে।

রমা। কুলীনের ঘরে আগে বিশ তিরিশ বছরে বিয়ে হ'ত।

দিদি। আগের কথা আগে। এখন যে বারো পার হ'লেই লোকে নিন্দে করে।

বিরক্তির সহিত রমানাথ বলিল, "নিন্দে করে, তার হয়েছে কি?"

দিদি। হবে আর কি, শেষে একঘ'রে করবে।

রমা। করে করবে। তবু আমি ভাল ছেলে না পেলে বিয়ে দেব না।

দিদি। ভাল ছেলে পাবিও না। তিনকুল-খেকো অলক্ষুণে মেয়েকে বিয়ে করতে কোন্ ভাল ছেলে আস্‌বে?

ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া রমানাথ বলিল, "না আসে, আইবড় থাক্‌বে।"

মুখ ফিরাইয়া দিদিমা মালা ঘুরাইতে লাগিলেন, রমানাথ ধূমপানে দৃঢ় মনঃসংযোগ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে দিদিমা বলিলেন, "ওপাড়ার চক্রবর্ত্তীকে জানিস্?"

রমানাথ বলিল, "কে, মহেশ চক্রবর্ত্তী?"

দিদি। হাঁ।

রমা। খুব জানি। তিনিই তো ঘোঁট পাকিয়ে বিনোদের বৌটাকে ত্যাগ করিয়েছেন। তিনি এসেছিলেন না কি?

দিদি। না, কাল তাঁর গিন্নীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

রমা। তার পর?

দিদি। গিন্নী অনেক কথাই কইলে। মণির বয়স হয়েছে ব'লে কত দুঃখ করলে; পাঁচ জনে পাঁচ কথা কয়, কিন্তু কর্ত্তাই সকলের মুখ চেপে রাখে, এ কথাও বল্‌লে।

ঈষৎ হাসিয়া রমানাথ বলিল, "হাঁ, চক্রবর্ত্তী মশায় খুব পরোপকারী।"

দিদিমা বলিলেন, "ওঁর একটি ছেলে আছে না?"

রমা। আছে।

দিদি। এখনও বিয়ে হয় নি।

রমা। আধখানা বিয়ে হয়েছে, হাতে সুতো বেঁধে ফিরে এসেছিল।

দিদি। ছেলেটি কেমন?

রমা। মন্দ নয়। কেন, মণির জন্য ঠিক করেছ না কি?

দিদিমা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "ঠিক কিছু করি নাই, গিন্নীই কথাটা তুলেছিল।"

রমা। তুমি কি বল্‌লে?

দিদি। আমি এমন কিছু বলি নাই, আমি তোর সঙ্গে কথা কইতে বলেছি।

হাতের হুঁকাটা দেওয়ালের পাশে রাখিয়া রমানাথ বলিল, "বেশ করেছ, এবার এলে সাফ জবাব দিও।"

একটু সঙ্কুচিতভাবে দিদিমা বলিলেন, "জবাব দেব?"

রমা। হাঁ, সাফ জবাব।

দিদি। কেন বল্ দেখি? ছেলের কোন দোষ আছে?

মৃদু হাসিয়া রমানাথ বলিল, "অপর কিছু দোষ নাই, এক আধটু চরিত্রদোষ।"

শিহরিয়া উঠিয়া দিদিমা নীরবে চিন্তামগ্ন হইলেন। তাঁহার ভাবিবার একটু কারণও ছিল। রমানাথের নিকট স্বীকার না করিলেও চক্রবর্ত্তী গৃহিণীর বাক্যটায় মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে অনেকটা আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিলেন। আশ্বাস দিয়া এক্ষণে তিনি কি প্রকারে জবাব দিবেন, ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল।

রমানাথ কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া একটা আলস্য ভাঙ্গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার জপ শেষ হ'ল?"

দিদিমা বলিলেন, "হাঁ হ'ল, চল্, ভাত দিই গে। আর জপ, মণিই এখন আমার জপতপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

ঈষৎ হাসিয়া রমানাথ বলিল, "তবু তো মালাটা ছাড় না?"

সন্ত্রস্তভাবে দিদিমা বলিলেন, "বলিস্ কি রে রমা, মালা ছাড়্বো? ইহকালে তো এই হ'ল, এখন পরকালটা তো দেখতে হবে।"

রমানাথ বলিল, "নিশ্চয়। মালা হাতে ক'রে বিয়ের গল্প কর্‌লে বা সংসারের কথা ভাবলে পরকালের কাজ যথেষ্ট হয়।"

"তবু যতটা হয়" বলিয়া দিদিমা মালাছড়া ললাটে স্পর্শ করাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মণিকে ডাক দিয়া রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হইলেন। রমানাথ বলিল, "মণি বুঝি ঘুমিয়েছে।"

যাইতে যাইতে দিদিমা বলিলেন, "ঘুমিয়েছে? কোথায়? ঘরের ভিতর আলো জ্বেলে বই পড়ছে?"

রমানাথ একটু কাত হইয়া মণির ঘরের জানালা দিয়া উঁকি মারিল। দেখিল, ঘরে আলো জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু মণি বই পড়িতেছে না। বইখানা তাহার কোলের উপর পড়িয়া আছে, আর সে বিছানায় বসিয়া গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছে। রমানাথ ভাবিল, "মণির এত ভাবনা কিসের?"

পরদিন রবিবার। রমানাথ বাজারে যাইতেছিল, সহসা মহেশ চক্রবর্ত্তী তাহার সম্মুখস্থ হইয়া সহাস্যে বলিলেন, "এই যে রমানাথ বাবু, বুঝলেন কি না, আমি আপনারই অপেক্ষা কচ্ছিলাম। আপনাদের সকালেই খবর পাঠাবার কথা ছিল, তা কৈ কিছু দিলেন না?"

রমানাথ সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "তা হ'লে আপনারা ছেলে দেখতে, বুঝলেন কি না, আস্‌ছেন কখন্? আর ছেলে মেয়ে সব তো দেখাই আছে, কেবল ব'সে, বুঝলেন কি না, একটা পাকা কথাবার্ত্তা কওয়া।"

তার পর পার্শ্বস্থ রায় মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "খুব ভাল সম্বন্ধই এসেছিল, বুঝলেন কি না, রায় মহাশয়, নগদ বারোশ টাকা। তা আজকালকার ছেলে, বুঝলেন কি না, টাকা দেখতে গেলে ছেলের মন পাওয়া যায় না। কাজেই, বুঝলেন কি না। তা হ'লে রমানাথ বাবু, আস্‌ছেন কখন্? খাওয়া-দাওয়ার পর তো? বলেন যদি আমিই যাই। বুঝলেন কি না, এ তো ঘরের কথা।"

রমানাথ নির্ব্বাক্ নিশ্চল। চক্রবর্ত্তী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা আপনাদের কোন চিন্তা নাই রমানাথ বাবু, বুঝলেন কি না, যা দিতে পারেন। বুঝলেন কি না, ছেলে বেচা আমার ব্যবসা নয়। মেয়েটি ভাল হ'লেই হ'ল।"

রমানাথ গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিল, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়!"

চমকিত হইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় রমানাথের মুখের দিকে চাহিলেন। বজ্রগম্ভীর স্বরে রমানাথ বলিল, "এ গাঁয়ে এখনও অনেক পুকুর আছে; আর পুকুরে বিস্তর জলও আছে।"

পাশ কাটাইয়া রমানাথ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি চক্রবর্ত্তী?"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "পাগল, বুঝলেন কি না, আস্ত পাগল। মেয়েটি পনরয় পা দিয়েছে, দ্বিতীয় সংস্কার যে হয়ে গেছে, তার আর কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করি, কাল মেয়ের দিদিমা এসে, বুঝলেন কি না, কাঁদাকাটা, পায়ে হাতে ধরা। বুড়ীর কাঁদাকাটায় গিন্নীর মন, বুঝলেন কি না, মেয়েমানুষের মন কি না, গ'লে গেল, কাজেই আমাকে, বুঝলেন কি না, মত দিতে হয়েছিল। নইলে এ মেয়েকে কি ঘরে আনে? তা আপদ আপনা হ'তেই, বুঝলেন কি না, চুকে গেল। ধর্ম্মই রক্ষা করেছেন।"

"বটে" বলিয়া রায় মহাশয় মৃদু হাসিলেন। সে হাসিটুকু তাঁহারই পক্ষে শ্লেষের তীব্র বাণস্বরূপ বুঝিলেও চক্রবর্ত্তী মহাশয়কেও একটু হাসিতে হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বারাণসী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা ঘুরিয়া বিনোদ মাতার সহিত হরিদ্বারে আসিল। হরিদ্বারে দুই তিন

দিন থাকিয়া পুষ্করে যাইবার মনস্থ করিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আর কেন, ফিরে চল্!"

বিনোদ বলিল, "কেন মা, এমন সব তীর্থস্থান, তোমার কি ভাল লাগে না?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "হোক্ বাপু, আমার আর ভাল লাগে না। ঘরে ফির্বার জন্য মন কেমন কর্‌ছে।"

বিনোদ হাসিয়া বলিল, "তোমার কখন মুক্তি হবে না মা!"

সহাস্যে অন্নপূর্ণা বলিলেন, "মা কি কখনও মুক্তি চায় রে পাগল?"

বিনোদ। তবে কি চায়?

অন্ন। মা চায় শুধু ছেলেকে। ছেলেই মায়ের মুক্তি, ছেলেই মায়ের স্বর্গ।

বিনোদ বিস্ময়-বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে জননীর মাতৃ-স্নেহে মহিমময় মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "শুনিস নাই, যশোদা কৃষ্ণকে ভগবান্ জেনেও তাঁর কাছে মুক্তি চায় নাই, শুধু পুত্ররূপী কৃষ্ণকেই চেয়েছিল।"

ভক্তিবিহ্বল দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বিনোদ নীরবে রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "এখন ফিরে যাবি কি না বল্। বিনোদ বলিল, "তাই চল মা, কিন্তু ফের্‌বার মুখে একবার শ্রীক্ষেত্র হয়ে গেলে ভাল হয়।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তাই চল্, কিন্তু শ্রীক্ষেত্র হ'তে বরাবর দেশে ফিরব, তা আমি ব'লে রাখছি বাপু।"

কয়েক দিন পরে বিনোদ মাতার সহিত শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইল।

স্নানযাত্রা উপলক্ষে শ্রীক্ষেত্রে তখন লোকারণ্য। অনেক কষ্টে একটি ভাল বাসা ঠিক করিয়া বিনোদ মাতাকে ঠাকুর দেখাইয়া আনিল। অপরাহ্ণে বিনোদ সমুদ্রদর্শনে গমন করিল।

বিশালকায় সমুদ্র। কি বিরাট্, কি মহান্ দৃশ্য! অগাধ অনন্ত অপরিমেয় জলরাশি। নীল, গম্ভীর, প্রশান্ত জলরাশি দৃষ্টিপথ রোধ করিয়া রহিয়াছে, শেষে দিগন্তে নীল গগনপ্রান্তকে আলিঙ্গন করিয়া অনন্তের অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া দিয়াছে, নীলিমায় নীলিমায় এক অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছে। সৈকতসমীপে জল অস্থির, তরঙ্গচঞ্চল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া সৈকতপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইতেছে, যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল শিশু খেলিতে খেলিতে জননী বসুন্ধরার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, আবার হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে জননীর ক্রোড় ছাড়িয়া দূরে সরিয়া যাইতেছে। তরঙ্গশিরে ফেনপুঞ্জের শ্বেত শতদলমালা দুলিতেছে।

বিনোদ গভীর বিস্ময়ে ও আনন্দে এই বিরাট্ দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

সহসা কলহাস্যের অস্ফুট ধ্বনিতে চমকিত হইয়া বিনোদ ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, কতকগুলি বাঙ্গালী স্ত্রীলোক সৈকতভূমির উপর ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কেহ ঝিনুক কুড়াইতেছে, কেহ কর্কটশিশুর পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে, কেহ বা সাগরতরঙ্গের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। তরঙ্গ ফেনপুঞ্জ মস্তকে লইয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসিতেছে, রমণী তাহার আগে আগে ছুটিয়া পলাইতেছে, কিন্তু সীমা অতিক্রমের পূর্ব্বেই উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ আসিয়া তাহার পরিধেয় সিক্ত করিয়া দিয়া সরিয়া যাইতেছে, তরঙ্গের প্রত্যাবর্ত্তনবেগে সে পড়িয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গিনীদের কলহাস্যে সৈকতভূমি মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। সেই ক্রীড়ারত রমণীদলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই বিনোদ সহসা একখানা পরিচিত মুখ দেখিতে পাইল। এ কি, এ মুখ এখানে কোথা হইতে আসিল? বিনোদ আর সে দিকে চাহিতে পারিল না, দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

কিছুক্ষণ পরে বিনোদ হাত সরাইয়া যখন পুনরায় মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন রমণীরা বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। বিনোদ উঠিয়া ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়া আসিল।

পরদিন স্নানান্তে ঠাকুর দেখিবার জন্য বিনোদ মাতার সহিত মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিল। মন্দিরের ভিতর অসম্ভব জনতা। সে জনতা ভেদ করিয়া অন্নপূর্ণা রত্নবেদীর নিকট উপস্থিত হইতে পারিলেন না। বিনোদ পাণ্ডার চেলার সাহায্যে ভিড় ঠেলিয়া মাতাকে ভিতরে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইল। কিন্তু অন্নপূর্ণা সম্মত হইলেন না; ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আর ঠেলাঠেলিতে কাজ নাই। ঠাকুর-দর্শনে যদি মুক্তি হয়, তবে এখান হ'তে দেখ্‌লেও হবে।"

ঘন-সন্নিবিষ্ট মনুষ্যমস্তকের অন্তরালে দৃষ্টি-সঞ্চালন করিয়া অন্নপূর্ণা ঠাকুর দেখিতে লাগিলেন। বিনোদ কিন্তু ঠাকুর দেখিল না, তাহার চঞ্চল-দৃষ্টি জনসংঘের মধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল।

আবার সেই মুখ। ঐ যে কে অদূরে দাঁড়াইয়া ভক্তিবিহ্বলদৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে; দৃষ্টিতে চাঞ্চল্য নাই, পলক নাই, চোখের কোণ বহিয়া বুঝি এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতেছে, সমগ্র মুখমণ্ডল ভক্তির মহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। বিনোদ পলকহীন দৃষ্টিতে সেই মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিল

এ বার কেবল বিনোদ একা দেখিল না, সেই মুখের অধিকারিণীও বিনোদকে দেখিতে পাইল। পিছনে ভিড়ের ধাক্কা খাইয়া সে ফিরিয়া চাহিল, মুহূর্তে চারি-চক্ষু সম্মিলিত হইল। মুহূর্ত্ত পরেই রমণী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া দলের ভিতর মিশিয়া গেল।

বাসায় ফিরিয়া অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কি কোন অসুখ হয়েছে বিনোদ?"

বিনোদ সংক্ষেপে উত্তর দিল, "না।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তবে তোর মুখের চেহারা এমন কেন?"

বিনোদ নতমুখে নীরব রহিল। অন্নপূর্ণা ছেলের হাত দুইটা নিজের হাতের উপর রাখিয়া স্নেহকোমল কণ্ঠে ডাকিলেন, "বিনোদ।"

বিনোদ মুখ তুলিয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে বিনু?"

কাতরকণ্ঠে বিনোদ বলিল, "সে এসেছে মা।"

অন্ন। কে এসেছে বাপ?

বিনোদ নিরুত্তর। অন্নপূর্ণা উৎসুকভাবে বলি-লেন "কার কথা বল্‌ছিস্? কে এসেছে—বৌমা?"

বিনোদ রুদ্ধস্বরে বলিল, "হাঁ।"

অন্নপূর্ণা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়? কখন দেখলি?"

বিনোদ বলিল "দু'বার দেখেছি, কাল সমুদ্রের ধারে, আজ মন্দিরের ভিতর।"

অন্ন। দেখলি তো আমায় বল্‌লি না কেন?

বিনোদ। বল্‌লে কি হ'ত মা?

অন্নপূর্ণা ঈষৎ তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "বল্‌লে কি হ'ত? তুই কি মনে করিস বিনোদ, বৌমাকে দেখবার জন্য আমার একটু আগ্রহ নাই? তুই এত স্বার্থপর?"

লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া বিনোদ বলিল, "আমার দোষ হয়েছে মা।"

অন্ন। কোথায় আছে জানিস্?

বিনোদ। না।

অন্ন। খুঁজে বের কর্‌তে পার্‌বি?

বিনোদ। এই লোকারণ্যের ভিতর হ'তে খুঁজে বের করা কি সহজ মা?

একটু ভাবিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু বের কর্‌তে পার্‌লে ভাল হ'ত।"

বিনোদ বলিল, "ভাল আর কি হ'ত মা?"

কৃত্রিম রোষপূর্ণ কটাক্ষে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "কি হ'ত না হ'ত, তা তুই কি বুঝ্‌বি? আর সকল কথারই কৈফিয়ৎ তোকে দিয়ে আমাকে কি কাজ কর্‌তে হবে?"

মৃদু হাসিয়া বিনোদ বলিল, "না মা, আমি খুঁজে বের কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বো।"

বিনোদ অনেক চেষ্টা করিল, প্রত্যেক বাসা অনু-সন্ধান করিল, দুই বেলা মন্দিরে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, সমুদ্রের ধারে খুঁজিয়া বেড়াইল, কিন্তু যাহাকে খুঁজিতেছিল, তাহাকে পাইল না; সে যেন ক্ষণিকের দেখা দিয়া চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

এ দিকে উৎসব-শেষে যাত্রীর দল ফিরিতে আরম্ভ করিল, লোকারণ্যময় পুরীধাম লোক-বিরল হইয়া আসিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "লোক ক'মে গেছে। এই সময় একবার দেখ।"

কিন্তু খুঁজিবার আর সময় হইল না। রামজয়ের পত্র আসিল। রামজয় অন্নপূর্ণাকে লিখিয়াছে, "আপনারা শীঘ্র ফিরিয়া আসবেন। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র বিমলা-বাবুর আসন্ন অবস্থা। তাঁহার অবর্ত্তমানে বিষয় আপ-নাদের। শত্রুপক্ষ ষড়যন্ত্র করিতেছে। ফিরিতে দেরী করিবেন না।"

অন্নপূর্ণা পরদিন সকালের গাড়ীতে পুরী ত্যাগ করিলেন।

প্রত্যাবর্ত্তনপথে অন্নপূর্ণা ভুবনেশ্বরে নামিলেন না। সেখানে আসিয়া শুনিলেন, কাল এক দল বাঙ্গালীযাত্রী আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে এক সধবা যুবতী স্ত্রীলোকের কলেরা হয়। রাত্রে সে মারা যায়। কিন্তু তাহার আগেই তাহার দলের যাত্রীরা সরিয়া পড়িয়াছিল, আজ সকালে মুদ্দাফরাস দিয়া তাহার গতি করা হইয়াছে।

বিনোদ অনুসন্ধানে জানিতে পারিল, সে যাত্রীর দল কলিকাতা হইতে আসিয়াছিল। পাণ্ডা খাতা দেখিয়া বলিল, "মৃতার নাম উমাসুন্দরী। তবে দেবী বা দাসী তাহা লিখিয়া লয় নাই, সুতরাং বলিতে পারিল না। তবে চেহারা দেখিয়া ভদ্রঘরের মেয়ে বলিয়াই বোধ হয়।

মৃতার আকৃতিসম্বন্ধে অনেককে জিজ্ঞাসা করি-য়াও বিনোদ সঠিক কিছু জানিতে পারিল না। কেহ বা বলিল, বয়স বিশ, কেহ বলিল, না, ত্রিশ হবে; কেহ বা বলিল, ষোল সতেরর বেশী নয়; কেহ বলিল, চেহারা লম্বা রং খুব ফর্‌সা, কেহ বা বলিল, একটু বেঁটে একটু কালো। আকৃতিসম্বন্ধে বিনোদ দুইজনের এক মত পাইল না।

বিনোদ কিছু বুঝিতে পারিল না। না বুঝিলেও

তাহার বুকের ভিতর একটা শোকের তরঙ্গ যেন ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। অন্নপূর্ণা ছেলেকে লইয়া সন্ধ্যার গাড়ীতেই দেশে যাত্রা করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

দিদিমা বলিলেন, "আমার কথা শোন্ রমা।"

রমানাথ বলিল, "তোমাব ভীমরথী হয়েছে!"

দিদি। আমার ভীমরথী হয় নি, হয়েছে তোদেব।

রমানাথ বিস্মিত দৃষ্টিতে দিদিমাব মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাদের।"

দিদিমা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বুড়ো হ'লেও তোরা কি মনে করিস্, আমার চোখ নাই, আমি কারো মনের ভাব বুঝ্তে পারি না?"

রমা। কার মনের ভাব বুঝেছ?"

দিদি। তোরও মনের ভাব বুঝেছি, তারও বুঝেছি।

রমানাথ মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিল, দিদিমা বলিলেন, "আমার কথা রাখ্, রমা, এতে তুইও সুখী হবি, মেয়েটাও সুখী হবে। আর আমি—শেষ-কালটায় আমাকেও দু'টো দিন হেসে খেলে যেতে দে।"

রমানাথ নীরব। দিদিমা বলিলেন, "সেই ভাল, কি বলিস্?"

রমানাথ মুখ তুলিয়া চাহিল; স্থির-গম্ভীর স্বরে বলিল, "তা হয় না, দিদিমা।"

দিদি। খুব হবে। দোষ কি?

রমা। দোষ অনেক। তুমি মাণকে চেন না।

দিদিমা হাসিয়া বলিলেন, "না, আমি ষাট বছরের বুড়ী, তাকে এতটুকু বেলা হ'তে মানুষ ক'রে এলাম, আমি তাকে চিনি না, আর তুই সে-দিনকার ছোঁড়া, তুই চিনেছিস্।"

রমানাথ কোন উত্তর দিল না; সে কলিকায় তামাক ভরিয়া, দেশালাই জ্বালিয়া কয়লা ধরাইতে লাগিল। কিন্তু কয়লা সহজে ধরিল না, দেশালায়ের কাঠি এক-টার পর একটা জ্বলিতেছিল, আর নিবিতেছিল। দিদিমা বলিলেন, "তুই ভাবিস্ না রমা, আমি দিব্য ক'রে বল্তে পারি, মাণ তোকে খুবই—"

ভ্রূকুটিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রমানাথ তিরস্কারের স্বরে বলিল, "ছিঃ দিদিমা।

দিদিমা অগত্যা চুপ করিলেন, রমানাথ বাতাস আড়াল করিয়া বসিয়া কয়লা ধরাইল, এবং তাহা কলি-কার উপর রাখিয়া ফুঁ দিতে থাকিল।

দিদিমা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠে বলিলেন, "তা হ'লে তোর মতলবটা কি, বল্ দেখি?"

রমা। কিসের মতলব?

দিদি। মেয়েটা কি আইবুড়ই থাক্বে?

রমা। তাতেই বা দোষ কি? তোমার ঠাকুর-মার কে না সেই আইবুড় ছিল?

দিদিমা রাগিয়া উঠিলেন, "তুই কি তাই মনে ক'রে নিশ্চিন্ত আছিস্ বুঝি? তা হবে না রমা, আমি গলায় দড়ি দেব।"

রমানাথ কলিকাটা হুঁকার মাথায় বসাইয়া বাঁ হাত দিয়া হুঁকার ছিদ্র-মুখটা মুছিতে মুছিতে সহাস্যে বলিল, "না দিদিমা, তোমাকে এতটা কষ্ট করতে হবে না, আর আমিও ঠিক সেই আশায় নিশ্চিন্ত নই।"

ক্রুদ্ধস্বরে দিদিমা বলিলেন, "নিশ্চিন্ত তো ন'স, কিন্তু কচ্ছিস্ কি? এই তো ছেলে খুঁজবার তরে পনের দিনের ছুটী নিলি, তার তো আজ আট দিন কেটে গেল।"

রমানাথ হুঁকায় একটা টান দিয়া বলিল, "এ আটটা দিন বাজে কাটে নি দিদিমা, কাজ অনেকটা এগিয়ে দিয়েছি।"

দিদিমা রাগত ভাবে বলিলেন, "আমার মাথা আর মুণ্ড করেছিস্।"

রমা। তোমার মাথামুণ্ড না কর্লেও মণির উপায় অনেকটা করেছি। এখন আটকেছে একটি জায়গায়, টাকা চাই। হাঁ, দিদিমা, আমাকে বাঁধা রেখে কেউ হাজার তিনেক টাকা দেয় না? তোমার আছে? দেবে?"

দিদিমা বলিলেন, "হাঁ, আছে বৈ কি। তুই টাকার জন্যে কেঁদে বেড়াচ্ছিস্, আর আমি সিন্দুকে টাকার তোড়া তুলে রেখেছি। কথার ভঙ্গী দেখ।"

দিদিমা অপ্রসন্নভাবে চলিয়া গেলেন, রমানাথ বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে টাকার চিন্তায় ব্যাপৃত হইল।

টাকা—তিনটি হাজার টাকা, ভগবান্, এই টাকাটি পাইয়ে দাও, আর কখন তোমার কাছে একটি পয়সাও চাইব না। কত লোক কত রকমে টাকা পায়, পথে টাকা দিয়ে যায়, মাটীর ভিতর হ'তে টাকার কলসী বের হয়। রমানাথ উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে পায়ের নীচে মেঝেটা টিপিয়া টিপিয়া দেখিতে লাগিল, পিছনের দেওয়ালে গোটাকতক টোকা মারিল; কিন্তু টাকার কলসীর অস্তিত্বের সম্ভাবনা কোথাও দেখা গেল না। রমানাথ হতাশচিত্তে তামাক টানিতে লাগিল।

বাহির হইতে কে ডাকিল, "বাড়ীতে কে আছেন?"

রমানাথ হুঁকা-হাতে উঠিয়া বাহিরে গেল; দেখিল, এক অপরিচিত প্রৌঢ় ব্যক্তি। লোকটির কাঁধে চাদর, বগলে ছাতা, কোমরে গামছায় জড়ান একটা ছোট পুঁটুলী, হাতে জুতা, পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলায় ভরা। তাহার আকার নাতিদীর্ঘ, গায়ের রং ময়লা, গলায় কাঠের সরু দোহার মালা। অপরিচিত আগন্তুককে দেখিয়া রমানাথ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। আগন্তুক দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া মাথাটা একটু নীচু করিয়া বলিল, "প্রণাম, এই কি ব্রজ মুখুয্যে মশায়ের বাড়ী?"

রমানাথ বলিল, "হাঁ।"

"আঃ, বাঁচলাম" বলিয়া আগন্তুক বৈঠকখানায় উঠিল, এবং ছাতা-জুতাটা মাটীতে ফেলিয়া কোমরের গামছা খুলিতে খুলিতে বলিল, "মুখুয্যে মশায় বাড়ী আছেন?"

রমানাথ একটু বিস্মিতভাবে আগন্তুকের দিকে চাহিয়া বলিল, "তিনি তো মারা গেছেন?"

"এঁ্যা, মারা গেছেন?"

আগন্তুক এমনই অপ্রসন্ন মুখভঙ্গী করিল যে, তাহাতে বোধ হইল, যেন এই কথাটায় তাহার কত উদ্যম, কত প্রয়োজনীয় কার্য্য একেবারে পণ্ড হইয়া গেল।

রমানাথ একখানা আসন আনিয়া দিল, আগন্তুক তাহাতে বসিয়া কাঁধের চাদরখানা নাড়িয়া বাতাস খাইতে খাইতে বলিল, "মারা গেছেন? কত দিন?"

রমা। অনেক দিন, দশ এগার বছর হবে।

আগ। এত দিন? তাঁর আছে কে?

রমা। স্ত্রী আর এক নাতনী।

আগ। মহাশয়ের নাম কি?

রমা। আমার নাম রমানাথ ঘোষা'ল।

আগন্তুকের হাতের চাদর নাড়া বন্ধ হইয়া গেল; সে হাঁ করিয়া রমানাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তার পর দীর্ঘ উচ্চারণে একটু বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিতে করিতে বলিল, "র-মা-না-থ ঘো-ষা-ল? ন পাড়ায় বাড়ী, শ্যাম ঘোষালের ছেলে না?"

রমানাথ বিস্মিতভাবে বলিল, "হাঁ।"

আগন্তুক হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বাস, ঠিকই হয়েছে। পেসাদীটা একবার দিন। হরি হে মধুসূদন!"

আগন্তুকের হাতে কলিকাটা দিয়া রমানাথ বলিল, "আপনি—"

আগন্তুক উভয় হস্তসংযোগে ধূমপানের উদ্যোগ করিয়া বলিল, "সব বল্‌ছি বাবাজী, সব বল্‌ছি, তামাকটা খেয়ে নি। (কলিকায় একটা টান দিয়া কাসিয়া) সোজা পথ কি, কোন্ ভোরে বেরিয়েছি। (ধূমপান ও কাসি) যা হ'ক, এখন যে ঠিক এসে ধরেছি, এই আমার—"

শেষের কথাগুলা কাসির সহিত সংযুক্ত হইয়া এমন অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইল যে, রমানাথ তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না।

ধূমপান শেষ করিয়া কলিকাটা রমানাথের হাতে ফিরাইয়া দিয়া আগন্তুক বলিল, "আমার নাম নবীনচন্দ্র ঘোষ, পিতার নাম স্বরূপচাঁদ ঘোষ। জাতিতে সদ্‌গোপ; বাড়ী ন পাড়া। সাতপুরুষের ওপর বাস। আপনার ঠাকুর আমাকে ভাল রকমই চিন্‌তেন।"

অতঃপর নবীন রমানাথের পিতার গুণকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার জন্য যথেষ্ট দুঃখপ্রকাশ করিল, এবং বিমলবাবু যে ফাঁকি দিয়া, সমগ্র সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, রমানাথ এক্ষণে একটু চেষ্টা করিলেই স্বীয় পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধারসাধন করিতে পারেন, এরূপ অভিমতও ব্যক্ত করিল। রমানাথ চুপ করিয়া তাহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিল।

বাজে কথা শেষ করিয়া নবীন কাজের কথা পাড়িল। রমানাথকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাবাজী, এখন তুমি একেবার গিয়ে দাঁড়ালেই বাস্। চুল চিরে বিষয় ভাগ ক'রে দেওয়াব।"

রমানাথ কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি ক'রে হবে?"

নবীন আঙ্গুলে তুড়ি দিয়া বলিল, "আইনে। বাবাজী, ইংরেজের আইন তো জান না, একেবারে চুলচেরা বিচার, এক তিল এদিক্ ওদিক্ হবার যো নাই। আমি পনর বছর থেকে মোকদ্দমা ক'রে আস্‌ছি, আজ আমার বয়স পঞ্চান্ন। আইন-কানুন জান্‌তে তো আমার বাকী নাই।"

রমানাথ বলিল, "মোকদ্দমা কর্‌তে হবে তো?"

নবীন। তা হবে বৈ কি। মোকদ্দমা ছাড়া আজকাল ভদ্রলোকের কি উপায় আছে? এই যে আমার কিই বা বিষয়, বলে 'বাঁদরের সম্পত্তি গালে।' তা বাবাজী, একটা না একটা মোকদ্দমা লেগেই আছে। আজ তিরিশ বছরে—(একটু ভাবিয়া) হাঁ, তিরিশ বছর হবে বৈ কি, পিতাঠাকুরের গঙ্গালাভের পর হ'তেই মোকদ্দমা ক'রে আস্‌ছি। আর তোমার এতটা বিষয় বিনা মোকদ্দমায় কি হাতে আসে?"

রমানাথ চিন্তিতভাবে বলিল, "কিন্তু মামলামোকদ্দমা করা—"

নবীন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; "তা কি আর আমি বুঝি না। আর মামলা চালান কি তোমাদের মত ছেলেমানুষের কাজ? সে সব তোমাকে কিছু করতে হবে না, যা করবার, আমিই করব, তুমি শুধু সই দিবে।"

রমানাথ বসিয়া ভাবিতে লাগিল। নবীন বলিল, "কিছু ভাবনা নেই বাবাজী, কিছু ভাবনা নেই। তুমি তো নবীন ঘোষকে চেন না; উকীল, মোক্তার, কেরাণী, মুহুরী সব হাতের মুটোয়। তুমি শুধু দাঁড়িয়ে থেকে দশ বিশ হাজার টাকার সম্পত্তি হাতে পাবে। কিন্তু একটি কথা—"

রমানাথ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?"

নবীন। জমী-জায়গাগুলো বিক্রীই কর আর প্রজা-বিলীই কর, আমার হাতে দিয়ে করতে হবে! আমি অবশ্য লেহ্য যা, তাই দেব।

রমা। বিক্রী করলে কত টাকা পাওয়া যেতে পারে?

নবীন। হাজার দশেকের তো কম নয়।

রমানাথের মুখখানা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; বলিল, "আমি অতশত বুঝি না, আমাকে হাজার তিন চার টাকা দেবেন, বিষয় সব আপনার। টাকা কিন্তু আমার মাসখানেকের ভিতর চাই।"

নবীন হাঁ করিয়া রমানাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রমানাথ উঠিয়া তৈল আনিয়া দিল। তৈল মর্দ্দন করিতে করিতে নবীন ভাবিতে লাগিল, "যাত্রাটা মন্দ নয়। কথাতেই আছে, 'বাঁয়ে শেয়াল ডাইনে না।' কিন্তু ছোঁড়াটা পাগল না কি?"

রমানাথ দিদিমাকে সব কথা খুলিয়া বলিল, দিদিমা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তাঁর মুখে আমি শুনেছি, তোর বাবার বিষয়ের দাম বিশ হাজারের বেশী। বিষয়টা বেচিস্ না রমা, আর খুব সাবধানে থাকবি। তারা নাকি ভয়ানক লোক, তোকে মেরে ফেলতেও পারে।"

পরদিন প্রত্যূষে রমানাথ নবীনের সহিত ন-পাড়া অভিমুখে যাত্রা করিল। যাত্রার পূর্ব্বে মণি হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে রমাদা, তুমি এবার বড়লোক হবে।"

রমানাথ বলিল, "একবার বড়লোক হ'তে সাধ যায় মণি।"

মণি বলিল, "কেন বল দেখি?"

রমানাথ হাসিয়া বলিল, "বড়লোক হ'লে না কি লোকের ভালবাসা পাওয়া যায়।"

মণি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

"হাঁ ভাই, মনের মত!"

"কেন ভাই মনের মত?"

"তোর না কি বিয়ে?"

"হাঁ, আবার টোপর মাথায় দিয়ে।"

"আর বৌ আসছে দোলায় চ'ড়ে রূপের বাজার নিয়ে।"

"আমি কাঁদ তবে চোখে আঁচল দিয়ে।"

উমা হাসিতে হাসিতে আঁচল লইয়া চোখে চাপা দিল। বিরাজ আঁচলটা টানিয়া বলিল, "রক্ষা কর ভাই, তামাসা করতে কর্‌ত আবার সত্যিই কেঁদে ফেলবি। ঐ যে, চোখে জল এসেছে।"

উমা আঁচলটা টানিয়া লইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "তোর মাথা! হাসতে গেলে চোখে জল আসে না?"

বিরাজ বলিল, "কে জানে ভাই, তোর ও হাসির জল, কি কান্নার জল। তা কান্নারই বা দোষ কি? এতেও যদি না কান্না আসবে—"

উমা বলিল, "কিসে?"

মুখভঙ্গী করিয়া বিরাজ বলিল, "তোর শ্রাদ্ধে।"

উমা। আমার শ্রাদ্ধে তোরা কাঁদবি, আমি কাঁদব কেন?

উমা হাসিয়া উঠিল। বিরাজ বলিল, "দেখ ভাই মনের মত, তুই যতই হাসিস, ও হাসি তোর দেঁতো হাসি ছাড়া আর কিছুই নয়।"

মৃদু কটাক্ষনিক্ষেপ করিয়া উমা বলিল, "ইস, আমাকে এমনই পেলি না কি?"

বিরাজ বলিল, "যেমনই পাই, তুই মেয়েমানুষ।"

উমা। আর তুই বুঝি পুরুষমানুষ?

বিরাজ। পুরুষ হ'লে তোর ঐ দেঁতো হাসিতেই ভুলে যেতাম। কিন্তু আমিও মেয়েমানুষ, তোর বুকে কি বেদনা, তা আমি বুঝতে পারি। আচ্ছা ভাই, সত্যি বল্ দেখি।

উমা। কি বলব?

বিরাজ। তোর মনে একটুও কষ্ট হয় নি?

উমার মুখখানা ভার হইয়া আসিল। সে মাথা নীচু করিয়া মাটীতে দাগ টানিতে লাগিল। মৃদু হাসিয়া বিরাজ বলিল, "তবে যে এতক্ষণ হাসছিলি না?"

মুখ না তুলিয়াই উমা বলিল, "আর এখনই কি কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছি না কি?"

বিরাজ। নিশ্চয়। তবে সেটা বাইরে নয়, ভিতরে। কৈ দেখি।

বিরাজ উমার চিবুকে হাত দিয়া তাহার মুখখানা তুলিতে গেল; উমা আরও জোরে মুখ নীচু করিয়া আপনার বেদনাচিহ্ন লুকাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু চক্ষু বিশ্বাসঘাতকতা করিল; টস্ টস্ করিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া বিরাজের হাতে পড়িল। বিরাজ তাড়াতাড়ি জোর করিয়া তাহার মুখখানাকে তুলিয়া ধরিল; সহানুভূতির কোমলকণ্ঠে বলিল, "ও কি ভাই, সত্যি যে কেঁদে ফেল্‌লি? ছিঃ!"

বিরাজ তাহাকে টানিয়া আনিয়া আপনার বুকের কাছে ধরিল। আর রক্ষা রহিল না, বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তখন অনেক দিনের সঞ্চিত সাতসমুদ্রের জল দুই চোখ দিয়া ছুটিয়া বিরাজের বুক ভাসাইতে লাগিল।

বিরাজ এই বাড়ীর অধিকারিণীর মেয়ে। এই মেয়ে ছাড়া তাঁহার আর কেহ নাই। কিন্তু অদৃষ্টদোষে সে মেয়ে বিধবা—যৌবনে যোগিনী। সম্পত্তির মধ্যে ছিল কলিকাতার এই বাড়ীটুকু। উপরতলায় আপনারা থাকিয়া নীচের তলাটা ভাড়া দিয়াছিল। এই ভাড়ার আয়েই মা ও মেয়ের দিন চলিত। বিপ্রদাস নীচের তলার দুইটি ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিলেন। বাকি দুইটি ঘরে আর এক ঘর ভাড়াটিয়া ছিল।

বিরাজ প্রায় উমার সমবয়স্ক, দুই এক বৎসরের মাত্র বড়। বিরাজ বিধবা, উমা পতি-পরিত্যক্তা। উভয়েরই বয়স ও অবস্থার সাম্য অনেকটা ছিল; আর এই সাম্যনিবন্ধনই উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মিয়াছিল। সে ভালবাসা যেমন প্রগাঢ়, তেমনই অনাবিল। যেখানে দুইটি হৃদয়ই দুঃখে ভরা, সেইখানেই এমন ভালবাসা জন্মে; সুখের ঘরে এমন ভালবাসা সম্ভবে না।

অনেকক্ষণ পরে কান্না থামিল, উমা চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল। বিরাজ বলিল, "এত জল চোখে চেপে রেখে তুই হাস্‌তে পারিস্। ধন্যি ভাই তোকে।"

উমা হাসিল; বর্ষণক্লান্ত মেঘের বুকে ক্ষীণ বিদ্যুৎবিকাশের ন্যায় ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "তুই-ই বা কোন্ কম?"

বিরাজ বলিল, "আমার কথা ছেড়ে দে; আমার ভগবানের মার।"

উমা বলিল, "আর আমারই কোন্ মানুষের মার?"

বিরাজ। তোর মানুষের মার বৈ কি।

উমা। তাই না হয় হ'ল। কিন্তু ফলে তো এক।

বিরাজ। ঠিক এক নয়; তোর আছে, আমার নাই।

উমা। তোমার নাই মেনেও যদি তুমি বুক ধর্‌তে পার, আমার আছে জেনে আমি বুক ধ'রে থাক্‌তে পারি না?

বিরাজ। তা পার্‌বি, কিন্তু অপরের হাতে দিয়ে বুক ধর্‌তে পার্‌বি না।

মাথা নাড়িয়া উমা জোর গলায় বলিল, "আচ্ছা, পারি কি না দেখ্।"

হাসিতে হাসিতে বিরাজ বলিল, "এই তো দেখ্‌লাম।"

লজ্জার হাসি হাসিয়া উমা বলিল, "ওটা কিছুই নয়।"

বিরাজ। এর চেয়েও বেশী কিছু দেখতে হবে না কি?

উমা। তুই কি আমাকে এতটা দুর্ব্বল মনে করিস্?

বিরাজ। ঠাকুর-দর্শনে তোর রকম দেখে তা মনে করতাম না বটে, কিন্তু আজ আমার সে ভুল ভেঙ্গেছে। আজ বুঝেছি, তুইও মেয়েমানুষ।

উমা চুপ করিয়া রহিল। বিরাজ বলিল, "আচ্ছা ভাই, পুরুষগুলা কি স্বার্থপর?"

সহাস্যে উমা বলিল, "আর মেয়েরাই বা কোন্ নিঃস্বার্থের অবতার?"

বিরাজ। তবু পুরুষদের মত নয়। তাদের জীবনে-মরণে, আদরে-অনাদরে সেই একই সর্ব্বস্ব। কিন্তু পুরুষগুলা একটা ধরছে, একটা ছাড়ছে। মেয়েরা কি তাই করে?

উমা। তারা যে মেয়েমানুষ।

বিরাজ। মেয়েমানুষ কি মানুষ নয়? তাদের কি প্রাণ নাই? ত্যাগে কি তাদের ব্যথা লাগে না? অনাদরে অপমানে প্রাণে কষ্ট বোধ হয় না?

উমা। কষ্ট হ'লেও সহ্য কর্‌তে হবে। এ যে বিধির বিধান।

বিরাজ রাগতভাবে বলিল, "আমার বোধ হয়, বিধির বিধান নয়, পুরুষের তৈরী বিধান। কি বলব, আমার হাতে যদি এর বিধান কর্‌বার অধিকার থাক্‌তো—"

উমা হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে তুই মেয়েগুলাকে পুরুষ, আর পুরুষগুলাকে মেয়ে ক'রে দিতিস্। কেমন, না?"

বিরাজ। ঠিক তাই।

উমা। কিন্তু তারা পুরুষের গুণ পাবে কোথা হ'তে? পুরুষের যে অশেষ গুণ?

বিরাজ। ছাই গুণ! গুণের মধ্যে তো এই—তোর মত স্ত্রী থাক্‌তে আবার বিয়ে করতে যায়?

উমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি আর আছি কৈ?"

বিরাজ। এই তো দিব্যি আমার সামনে ব'সে আছিস্?

উমা। এ যে থেকেও নাই ভাই।

উমার স্বরটা গাঢ় হইয়া আসিল। বিরাজ বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "একখানা চিঠি লিখবি?"

উমা। কাকে?

বিরাজ রাগিয়া বলিল, "যে তোমার ঘাড় ভাঙ্গবে, তাকে।"

উমা হাসিয়া বলিল, "তাকে চিঠি লিখ্‌তে হবে না; সময় হ'লে সে আপনি খোঁজ নেবে।"

উমাকে ঠেলিয়া দিয়া বিরাজ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "দূর হয়ে যা।"

উমা বলিল, "রাগ করিস্ না ভাই, চিঠি আমি লিখ্‌ব।"

বিরাজ। কবে? বিয়ে হয়ে গেলে?

উমা। ঠিক তাই।

"মুখে আগুন তোমার!" বলিয়া বিরাজ মুখ ফিরাইয়া লইল। নীচে হইতে বিপ্রদাস ডাকিলেন, "উমা!"

উমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "বাবা এসেছেন, যাই ভাই।"

বিরাজ। আমি একটু পরে জ্যেঠা মশায়ের কাছে যাচ্ছি। দেখি, কোন উপায় হয় কি না।

হাত যোড় করিয়া উমা বলিল, "তোর পায়ে পড়ি ভাই, দিনকতক সবুর কর্।"

ক্রোধভরা দৃষ্টিতে উমার দিকে চাহিয়া বিরাজ বলিল, "দেখ্, ঠাকুরবাড়ীতে মন্দিরে তার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল, কিন্তু তুই আমাকে দেখাস্ নি, গাড়ীতে উঠে যখন এ কথা শুনালি, তখন হ'তে আমি তোর উপর হাড়ে হাড়ে রেগে আছি, এর উপর আর আমাকে রাগাস্ নি, তা বল্‌ছি।"

উমা তাহার হাত দুইটি ধরিয়া কাতর স্বরে বলিল, "আমাকে মাপ কর্ ভাই, আমার মাথা খাস্, এখন কোন কথা—"

তাহার হাত ঠেলিয়া দিয়া বিরাজ বলিল, হ্যাঁলা, তুই মেয়েমানুষ না কি?"

"কিছুই না, তোর মনের মত।"

ফিক্ করিয়া হাসিয়া উমা দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিল।

উমা নীচে আসিয়া দেখিল, পিতা আফিসের জামা-কাপড় পরিয়াই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন। উমা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল; ধীরে ধীরে ডাকিল, "বাবা!"

বিপ্রদাস মুখ তুলিয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। উমা দেখিল, পিতার দৃষ্টিটা বিষাদের ব্যথায় ভরা। জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে বাবা?"

বিপ্রদাস একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিষাদগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "কিছু না। তুই যাবি?"

উমা। কোথায় যাব বাবা?

বিপ্র। মেয়েছেলেরা কোথায় যাবে?

উমা। শ্বশুরবাড়ী।

বিপ্র। তুই যাবি?

উমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "উত্তর দিস্ না যে? যাবি?"

নতমুখে উমা ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা—"

বিপ্র। আমি শুন্‌লাম, তোর শাশুড়ী তোর অনুসন্ধান কর্‌ছে।

উমা। কেন?

বিপ্র। কেন আবার? তোকে ঘরে নেবে ব'লে।

উমা। লোকে কি বল্‌বে?

বিপ্র। কিছু না, টাকার জোরে লোকের মুখ বন্ধ হবে।

উমা নীরব নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান। বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাবি?"

উমা মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, "না।"

বিস্ময়বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বিপ্রদাস বলিলেন, "যাবি না?"

উমা ব'লল, "না।"

বিপ্র। না গেলে তোর শাশুড়ী আবার ছেলের বিয়ে দেবে।

উমা। তা দিক্।

বিপ্র। তবু যাবি না?

উমা। না।

বিপ্র। কেন বল্ দেখি? রাগ হয়েছে?

উমা। না।

বিপ্রদাস কন্যার হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনিলেন, স্নিগ্ধদৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পাগ্‌লী মেয়ে! না গিয়ে কর্‌বি কি?"

উমা। তোমার কাছে থাক্‌ব।

বিপ্র। আমি কি চিরস্থায়ী?

জলভরা চোখে একবার পিতার মুখের দিকে চাহিয়াই উমা মুখ ফিরাইয়া লইল। বিপ্রদাস চিন্তিতমনে উঠিয়া গেলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিপ্রদাস কলিকাতায় আসিয়া সওদাগরী আফিসে একটি চাকরীর যোগাড় করিয়া লইয়াছিলেন। রমানাথও এই আফিসে কাজ করিত। বিপ্রদাসের সহিত রমানাথের আলাপ-পরিচয় ছিল। বিপ্রদাস খুঁটিয়া খুঁটিয়া রমানাথের সকল পরিচয়ই লইয়াছিলেন, কিন্তু নিজের সম্পূর্ণ পরিচয় দেন নাই ; রমানাথও তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। তিনিই যে বিনোদের শ্বশুর, তাহা রমানাথ জানিত না। বিপ্রদাস কিন্তু কৌশলে বিনোদের সকল সংবাদই লইতেন।

বেতন ছিল পঁচিশটি টাকা। আটটাকা ঘর ভাড়া দিতে হইত, বাকী টাকায় সংসার কষ্টে চলিত। সংসারেও বাপ আর মেয়ে। বিপ্রদাস মাহিনার টাকা আনিয়া উমার হাতে ফেলিয়া দিতেন ; উমা খুব হিসাব করিয়া তাহাতেই মাস চালাইত। কোন মাসে দুই এক টাকা ধার হইত, কোন মাসে বা কিছু বাঁচিত। উমা বিরাজের নিকট উলের কাজ শিখিয়াছিল। কার্য্যের অবসরে উলের কাজ করিয়াও উমা মাসে কিছু কিছু পাইত। মোটের উপর সংসার একরকমে চলিয়া যাইত, বিশেষ কোন অভাব হইত না।

বিপ্রদাস দুই একবার রমানাথকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। রমানাথ উমাকে দেখিয়া, তাহার হাতের রান্না খাইয়া প্রশংসার স্রোত বহাইয়া দিয়াছিল। উমা যে পতি-পরিত্যক্তা, রমানাথ তাহা জানিত না। এক দিন সে বিপ্রদাসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনার মেয়ে আপনার কাছেই থাকে, শ্বশুরবাড়ী যায় না ?"

বিপ্রদাস উত্তরে বলিয়াছিলেন, "যায় বৈ কি, তবে বেশী দিন থাকে না। ঐ মেয়ে ছাড়া আমাকে দেখ্বার তো আর কেউ নাই !"

রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "জামাই কি করেন ?"

বিপ্রদাস বলিলেন, "বড় ডাক্তার।"

রমানাথ বলিল, "মেয়ে এখানে থাকে, জামাই রাগ করে না ?"

বিপ্রদাস বলিলেন, "যখন রাগ করে, তখন পাঠিয়ে দিই।"

আর এক দিন রমানাথ আসিয়া আহারান্তে তামাক খাইতে খাইতে মণির বিবাহের কথা পাড়িল। সেই সঙ্গে বিনোদের কথা উঠিল। তাহার পত্নীত্যাগের কথা, তাহার বাড়ীতে যাতায়াতের কথা, যাতায়াতে মণিকে ভালবাসা, বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রভৃতি সকল কথাই বলিল। উমা তখন ভাত খাইতে বসিয়াছিল। তাহার হাতের ভাত হাতে রহিয়া গেল, কান খাড়া করিয়া নিদারুণ উৎকণ্ঠার সহিত সে কথাগুলা শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে তাহার হাত হইতে ভাতের গ্রাস পড়িয়া গেল, বিড়ালে পাতের মাছ তুলিয়া খাইল, প্রদীপটা তৈলাভাবে মিট্ মিট্ করিতে লাগিল। উমা সকল ইন্দ্রিয়কে কর্ণপথে যোজনা করিয়া নীরব নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল।

তার পর রমানাথ চলিয়া গেলে বিপ্রদাস যখন ডাকিলেন, "উমা !" তখন উমার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি পাতের ভাতগুলা চাপা দিয়া, উঠিয়া আসিয়া হাত-মুখ ধুইল।"

সে রাত্রে উমা ঘুমাইতে পারিল না, ভাবিয়া, কাঁদিয়া, চোখের জলে বালিস ভিজাইয়া রাত্রি কাটাইল।

কিছু দিন পূর্ব্বে উমা স্বহস্তে লিখিয়াছিল, "তুমি আবার বিয়ে কর, তাতে আমার একটুকুও কষ্ট হবে না।" তবে আজ আবার কষ্ট হয় কেন ? চোখে জল আসে কেন ? স্বামী মণিকে ভালবাসে শুনিয়া তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া আসে কেন ? তবে উমা যে স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, সেটা কি কেবল মৌখিক,—ভাণ মাত্র ? না, উমা সত্যই উহা অন্তরের সহিত বলিয়াছিল। কিন্তু এমন অনেক কঠিন সত্য আছে, যাহা মুখে বলা যায়, কিন্তু বাস্তবে পরিণত হইতে দেখা যায় না, দেখিলে সহ্য হয় না। বুক ফাটিয়া যায়, প্রাণ ছিঁড়িয়া পড়ে, হৃদয় যেন শতধা চূর্ণিত হইয়া আছাড়ি-পিছাড়ি করিয়া কাঁদিয়া বলে "ওগো সত্য ! তুমি মিথ্যা। আমি সত্য চাই না, মিথ্যাই আমার সর্ব্বস্ব হউক।"

উমা জানিত, স্বামীকে হারাইলেও সে স্বামীর ভালবাসা হারায় নাই ; দূরে থাকিলেও স্বামী তাহার পর নহে, আপনার। বাহিরে পরিত্যক্তা হইলেও সে স্বামীর হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত হয় নাই ; সেখানে তাহার আসন সুদৃঢ়, সুপ্রতিষ্ঠিত। জগতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা তাহাকে সে আসন হইতে বিচ্যুত করিতে পারে।

আজ কিন্তু তাহার সে আসন টলিয়াছে ; প্রকৃতির অমোঘ শক্তির নিকট তাহার বিশ্বাসের দৃঢ়তা, নিষ্ঠার গভীরতা পরাভূত—পর্য্যুদস্ত হইয়াছে, সত্যের কঠোর আঘাতে তাহার কল্পনার দুর্গ ধূলিসাৎ হইয়া পড়িয়াছে। আর তাহার রহিল কি ?

ওগো, তুমি আমাকে ত্যাগ কর, ত্যাগ করিয়া যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ কর। কিন্তু তাহাকে ভালবাসিলে কেন ? আমার আসনে তাহাকে আনিয়া

বসাইলে কেন? আমি তোমার কাছে আর কিছুই চাই না, তোমার সঙ্গ চাই না, স্নেহ চাই না; অধিকার চাই না, আধিপত্য চাই না; শুধু তুমি আমায় ভালবাস, এইটুকু জেনে, এই বিশ্বাসটুকু বুকে ধ'রে আমায় মর্‌তে দাও, এইটুকু ছাড়া আমি তোমার কাছে আর কিছুই প্রার্থনা করি না।

উমা আকুলহৃদয়ে বিছানায় পড়িয়া ছটফট্ করিতে লাগিল। তখন তাহার স্বামিপ্রেমের সহিত মনের একটা ঝগড়া বাধিয়া গেল। প্রেম বলিল, "মর্ ছুঁড়ী, সে বিয়ে কর্‌তে চায়, তা তুই কেঁদে মরিস্ কেন?"

মন বলিল, "বাহবা! কাঁদ্‌বে না? সে যে ওর স্বামী, সর্ব্বস্ব।"

প্রেম। তবে তাকে বিয়ে কর্‌তে বলা হয়েছিল কেন? বাহাদুরী নেবার জন্যে কি?

মন। বাহাদুরী নেবার জন্য নয়, তারই ভালোর জন্য।

প্রেম। তবে এখন আবার কান্না কেন?

মন। কান্না তো বিয়ের জন্য নয়, ভালবাসার জন্য।

প্রেম। সে বিয়ে কর্‌বে, অথচ স্ত্রীকে ভালবাসবে না, এ কি রকম বিয়ে?

মন। যে রকমই হোক্। সে ত্যাগ কর্‌লে, আবার বিয়ে কর্‌লে, তাকে ভালোও বাস্‌লে! তা হ'লে এ অভাগী যায় কোথায়?

প্রেম। চুলোয়।

মন। সেখানে যেতে পার্‌লে তো সব গোলই চুকে যায়। কিন্তু ইচ্ছা কর্‌লেই তো সেখানে যাওয়া যায় না।

প্রেম। কেন যাওয়া যাবে না? যাবার অনেক উপায় আছে!

মন। আত্মহত্যা?

প্রেম। আত্মপ্রতারণার চেয়ে আত্মহত্যা ভাল।

মন। প্রতারণাটা তুমি আবার কি দেখ্‌লে?

প্রেম। সবটাই প্রতারণা। মুখে বল্‌ছেন—ওগো, আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি সুখী হও, আর মনে মনে বল্‌ছেন, ওগো, তোমার সুখে কাজ নাই, তুমি সুখী হ'লে আমার দুঃখের সীমা থাক্‌বে না। কেমন, এই তো?

মন রাগিয়া বলিল, "তোমার সবই আজগুবি কথা। স্বামী আর এক জনকে ভালবাসে শুনে হাস্‌বে না কি?"

প্রেম হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়। যদি যথার্থ ভালবাসা থাকে, তা হ'লে হাসি আপনি আস্‌বে। তা যদি না আসে, তবে বুঝ্‌তে হবে, এ ভালবাসা, ভক্তি, স্বামীকে সুখী কর্‌বার ইচ্ছা সকলই ভাণমাত্র।"

মন। কিন্তু হাসি যে আসে না।

প্রেম। আগে আমিত্বটুকু ভুলে যাও, তখন হাসি আপনি আস্‌বে।

মন। আমিত্বটুকু যদি গেল, তবে রইল কি?

প্রেম। সুখ, শান্তি, আনন্দ সকলই রইল।

মন বলিল, "বোঝাপড়া ক'রে দেখি, যদি পারে, ভালই।"

সকালে উমা যখন শয্যাত্যাগ করিল, তখন তাহার মুখে গভীর শান্তি বিরাজিত; তথায় বিষাদের ছায়াটুকু পর্য্যন্ত নাই।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

সম্পত্তি হাতে আসা এক, আর তাহা রক্ষা করা স্বতন্ত্র। বিমলাচরণের হাতে যথেষ্ট সম্পত্তি আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। যে বুদ্ধি দ্বারা সম্পত্তি রক্ষা করা যায়, বিমলাচরণের তাহার অভাব সম্পূর্ণই ছিল। এত বিষয়ও তাঁহার নিজের বুদ্ধিতে আসে নাই, গ্রামের বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন দুই চারি জন পাকা লোক তাঁহাকে বুদ্ধি ধার দিয়াছিল। পরের বুদ্ধি ধার করিয়া বিমলাচরণ খুড়া শ্যামাচরণের বিষয়টা হাত করিয়াছিল।

বিষয় হাতে আসিবার পর বিমলা ঘোষাল ছোট বাবু হইয়া পড়িলেন, এবং গ্রামের লোক তাঁহাকে বাবুর মতই সম্মান দেখাইতে লাগিল। ছোট বাবুও আপনার বাবু নাম বজায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। পুরাতন বাড়ী ভাঙ্গিয়া নূতন ধরণে নূতন বাড়ীর পত্তন হইল; বাড়ী লোকজনে সরগরম হইয়া উঠিল। দোল, দুর্গোৎসব, দান-ধ্যান, বারমাসে তের পার্ব্বণ চলিতে লাগিল। ছোট বাবুর নবীন যশোরশ্মিতে জমীদার চৌধুরী বাবুদের সাত পুরুষের যশ বিদ্যুতালোকের সম্মুখে প্রদীপের আলোর মত ম্লান হইয়া আসিল।

এ দিকে যাহারা বুদ্ধি ধার দিয়াছিল, তাহারা সুদসমেত আসল আদায় করিয়া লইতে উদ্যত হইল। ইহার ফলে মামলা-মোকদ্দমা বাধিল। বুদ্ধির মহাজনদের মধ্যেই আবার কেহ কেহ আসিয়া ছোট বাবুর পক্ষে যোগ দিল, এবং মোকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ ও আশ্বাস দিয়া আপনাদের পরোপকার-প্রবৃত্তির পরিচয়

দিতে লাগিল। ইহার ফলে দশ বৎসরেও মোকদ্দমার অবসান হইল না, একটার পর একটা মোকদ্দমা লাগিয়াই রহিল।

এ দিকে ছোট বাবু বাবুগিরির মর্য্যাদা রক্ষার অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে সুরাদেবীর উপাসনাতেও প্রবৃত্ত হইলেন। উপাসনার যে সকল আনুষঙ্গিক উপকরণ আছে, তাহাও আসিল। লোকে বলিতে লাগিল, "হাঁ, বাবু বলি তো ছোট বাবুকে। নৈলে ঐ যে কুঁচলে পাড়ার চৌধুরীরা, জমীদার হ'লে কি হয়, বেটাদের হাত দিয়ে জল গলে না, সকালে নাম কর্‌লে অন্ন জোটে না।"

ছোট বাবু হাসিয়া গর্ব্বস্ফীতকণ্ঠে বলিতেন, "আরে, বিষয় কি জন্য? দাও, থোও, আমোদ-আহ্লাদ কর, মজা উড়াও। বিষয় সঙ্গে আসে নাই, সঙ্গে যাবেও না!"

রামধন চূড়ামণি দন্তহীন মুখে হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া বলিতেন, "বিজ্ঞের কথাই তো এই। শাস্ত্রেই আছে—'কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদরঃ।' বুঝলেন কি না?"

পারিষদ্‌বর্গ সমস্বরে প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিল, "ঠিক, ঠিক, সংসারে কে কার, চোখ বুজ্‌লেই অন্ধকার।"

এইরূপে সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিমলাবাবু যখন পূর্ণবেগে বাবুগিরির স্রোত চালাইতেছিলেন, তখন সহসা এক দিন তাঁহার স্ত্রী কালের স্রোতে ভাসিয়া গেল। স্ত্রীর সহিত ইদানীং তত্টা সাক্ষাৎসম্বন্ধ না থাকিলেও তাহার মৃত্যুতে বিমলাবাবু শোকাকুল হইলেন। সন্তানসন্ত'ত কিছুই ছিল না, সুতরাং লোকে বলিল, "ছোট বাবুর আবার বিয়ে করা উচিত। ছোট বাবুও তাহা অনুচিত ভাবেন নাই। কিন্তু রঙ্গিলা ইহাতে আপত্তি তুলিয়া বলিল, "আবার বিয়ে কেন? আমাতে কি তোমার মন উঠে না? তুমি বিয়ে কর্‌লে আমি যদি গলায় দড়ি না দিই, তবে তোমারই দিব্যি।"

রঙ্গিলা বাবুর গৃহিণী নহেন, বাগানবাড়ীর অধিকারিণী। রঙ্গিলা বারো টাকা মাহিনায় কলিকাতায় থিয়েটারে কাজ করিত। তখন তাহার নাম ছিল ভূতী। আগে তাহার মাহিনা ষোল টাকা ছিল, কিন্তু তিন বৎসরেও একটা দাসীর ভূমিকা অভিনয় করিতে না পারায়, ম্যানেজার রাগিয়া তাহার চারি টাকা বেতন কমাইয়া দিয়াছিলেন। বিমলা বাবু একবার থিয়েটার দেখিতে গিয়া নৃত্যপরায়ণা সখীদের দলের ভিতর ভূতীকে দেখিলেন। ভূতী নাচে বা গানে ততটা পটু না হইলেও দর্শকদলের উপর চটুল কটাক্ষ-নিক্ষেপে সুনিপুণা ছিল। এই কটাক্ষের গুণে ভূতী বিমলা বাবুর সুনজরে পড়িল। তাহার ভাগ্যচক্র সহসা প্রবলবেগে ঘূর্ণিত হইয়া গেল। বিমলা বাবু তাহাকে থিয়েটার হইতে ছাড়াইয়া মাসিক এক শত টাকা বেতনে আপনার বাগানবাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন। ভূতী রাত জাগার এবং ম্যানেজারের তিরস্কারের দায় হইতে বাঁচিয়া গেল। তাহার ভূতী নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া রঙ্গিলা নাম হইল। তাহার অঙ্গে অলঙ্কার উঠিল, সেবায় দাসী নিযুক্ত হইল, পান্তাভাতের পরিবর্ত্তে পোলাও-কালিয়া খাইয়া রঙ্গিলা অল্পদিনের মধ্যেই আপনার শুষ্ক কাষ্ঠপ্রায় দেহখানিকে বাবুজন-মনোহর করিয়া তুলিল।

ছোট বাবুর এই অসামাজিক আচরণে সমাজপতিরা প্রথমে নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন, গোপনে দুই এক কথা বলাবলিও করিতে লাগিলেন, কিন্তু শেষে আপনাদিগকেই একঘ'রে হইবার উপক্রম দেখিয়া, এই অপ্রয়োজনীয় আন্দোলন পরিত্যাগ করিলেন। চূড়ামণি মহাশয় শাস্ত্রবাক্যের আবৃত্তি করিয়া ব্যবস্থা দিলেন, "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।"

রঙ্গিলা যখন বিবাহ করিতে নিষেধ করিল, তখন বিমলা বাবু আর বিবাহ করিতে পারিলেন না। রঙ্গিলা যদি সত্যই গলায় দড়ি দেয়।

অতঃপর বিমলা বাবুর যে কেবল সম্পত্তির ক্ষয় হইতে লাগিল, এমন নহে, দেহের ক্ষয়ও রীতিমত আরম্ভ হইল। আগে স্ত্রী ছিল; সে এ ক্ষয়ের পূরণ করিত। হিঁদুর ঘরের মেয়ে, স্বামী অতি বড় পাষণ্ড হইলেও তাহাকে দেবতার মত ভক্তি করিতে পারে, লাথি-ঝাঁটা খাইয়াও স্বামীর সেবা করিতে ছাড়ে না। সুতরাং স্ত্রী বর্ত্তমানে বিমলা বাবুর দৈহিক বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে তাঁহার দেহের দিকে ফিরিয়া চাহিবার আর কেহ রহিল না; মুখে সহানুভূতি দেখাইবার লোক অনেক ছিল, কিন্তু প্রাণ দিয়া সেবা করিবার কেহই ছিল না। সুতরাং বিমলা বাবুর দেহ অত্যাচারে অনাচারে দিন দিন জীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। বিমলা বাবু নিজে সে দিকে বড় একটা লক্ষ্য করিলেন না।

যখন লক্ষ্য হইল, তখন আর প্রতীকারের উপায় ছিল না। তখন বাত আসিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে, লিভার বিকৃত হইয়া গিয়াছে, দেহ শীর্ণ কঙ্কালসার হইয়াছে। আহারে রুচি নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই, জাগরণেও শান্তি নাই। ডাক্তার বলিল, "মদ ছাড়ুন।" বিমলা বাবু কিন্তু মদ ছাড়িতে পারিলেন না; মদ ভিন্ন

তখন আর মানসিক শান্তির উপায় ছিল না। অবশেষে যে দিন অবশ হস্ত মুখের নিকট মদের গ্রাস তুলিবার ক্ষমতা হারাইল, সেই দিন মদ ছাড়িলেন। কিন্তু মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি তখন একেবারে শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, তপ্তা নদী বৈতরণীর কূলে উপস্থিত হইয়া বিমলাচরণ বুঝিতে পারিলেন, কেবল আমোদ আহ্লাদে মাতিয়া মজা উড়াইয়া বেড়াইলে চলে না, সংসারে ইহা ছাড়া আরও অনেক কাজ আছে। কিন্তু হায়, তাঁহার সকল কাজই যে অসম্পন্ন রহিয়া গেল। আর কি কখন তাহা সম্পন্ন করিবার অবসর হইবে? কে জানে।

বিষয় তখন প্রায় অর্দ্ধেক উড়িয়া গিয়াছে। অর্দ্ধেক যাহা আছে, তাহাও গ্রাস করিবার জন্য চারিদিকে ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলের ন্যায় শত্রুরা হাঁ হাঁ করিতেছে। বিমলাচরণ ভাবিলেন, একখানা উইল করিবেন। কিন্তু উইল করিয়া কাহাকে বিষয় দিবেন? কে তাঁহার আছে? বিমলাচরণ ব্যাকুল নেত্রে সংসারময় নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, কেহই নাই; আত্মীয় বলিতে, বন্ধু বলিতে, উত্তরাধিকারী বলিতে তাঁহার কেহই নাই। তাঁহার ব্যাধিজীর্ণ প্রাণ হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

এই সম্পত্তির উপর যাহাদের শ্যেনদৃষ্টি পতিত হইয়াছিল, নবীন ঘোষ তাহাদের অন্যতম। সে অনেক দিন হইতেই সম্পত্তিটা হস্তগত করিবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। এক্ষণে বিমলাচরণের অবস্থা দেখিয়া, কি উপায়ে সম্পত্তিটা হস্তগত করা যায়, তাহারই উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু উপায় সহজে খুঁজিয়া পাইল না। ভাবিতে ভাবিতে সহসা শ্যামাচরণের নাবালক পুত্র রমানাথের কথা মনে পড়িল। নিরাশার গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সহসা যেন আশার উজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া উঠিল; বিমলাচরণ শ্যামাচরণের সম্পত্তির অছি মাত্র ছিলেন, সম্পত্তি শ্যামাচরণের পুত্র রমানাথের। এখন যদি সেই রমানাথকে খুঁজিয়া বাহির করা যায়, তাহা হইলে এ সম্পত্তি তো মুঠার মধ্যে। যাহা আছে, তাহা তো আছেই, যাহা গিয়াছে,—অর্থাৎ বিমলাচরণ বিক্রয় করিয়াছেন, অপরে ফাঁকি দিয়া বা কাড়িয়া লইয়াছে, তাহাও হাতে আসিবে। কেন না, অছির তো দান-বিক্রয়ের অধিকার নাই। তখন নবীনচন্দ্র অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনটি সঙ্কল্প স্থির করিল, প্রথম—রমানাথকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; দ্বিতীয়—তাহার কাছ হইতে সমগ্র সম্পত্তিটা লিখাইয়া লইতে হইবে; তৃতীয়—সে যদি বাঁকিয়া বসে, তাহা হইলে মামলা-মোকদ্দমা করিয়া যে উপায়ে হউক, তাহাকে হাতে আনিতে হইবে।

এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিয়া নবীনচন্দ্র এক দিন অতি প্রত্যূষে জয়দুর্গা বলিয়া রমানাথের উদ্দেশে যাত্রা করিল। নবীন জানিত, রমানাথ নায়েব ব্রজ মুখুয্যের বাড়ীতেই প্রতিপালিত হইতেছিল। যদি তাহার সন্ধান পাওয়া যায়, তবে ব্রজ মুখুয্যের বাড়ীতেই পাওয়া যাইবে। নবীনের প্রথম উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

নবীন গ্রামের লোকদের কাছে রমানাথের পরিচয় দিল। তাহার কথায় কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না, ভাবিল, এটা নবীনের কারসাজি, মানুষটা জাল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

নবীনচন্দ্র রামানাথকে পাইয়া বড় আনন্দেই তাহাকে লইয়া আসিয়াছিল। রমানাথ নিজমুখে তিন হাজার চাহিয়াছিল। নবীন ভাবিয়াছিল, দরদস্তুর ক'রে কোন্ না দু' হাজারে দাঁড় করান যাবে। দু' হাজার টাকায় বিশ হাজার টাকার সম্পত্তি; শালিয়ানা আয়ই তো নেট পাঁচটি হাজার টাকা। পাতাচাপা কপাল; পাতাটা বোধ হয় উড়লো। নবীন রমানাথকে আনিয়া চর্ব্ব্যচোষ্যরূপে খাওয়াইতে লাগিল। পুকুরে মাছ ধরাইল, পাঁঠা কাটিল, ঘি, দুধ, দৈ আনিয়া রমানাথের পরিতৃপ্তিসাধন করিতে লাগিল।

কিন্তু নবীনের এত উদ্যোগ-আয়োজন সব ব্যর্থ হইল, তাহার হর্ষে বিষাদ আসিল; সে শুনিল যে, বিমলাবাবুর পিতামহের এক দৌহিত্র আছে; সেই দৌহিত্র বিলাসপুর-নিবাসী বিনোদ রায়ই এক্ষণে এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। বিনোদ রায় সম্পত্তি অধিকারের চেষ্টা করিতেছে। নবীন জানিত, বিমলাবাবুর আত্মীয়-স্বজন কেহই তাই, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে বিষয়টা নির্ব্বিবাদে রমানাথকে অর্শাইবে, আর দুই হাজার টাকায় বিক্রয় কোবালা লেখাইয়া লইয়া সে এই বিষয়ের মালিক হইয়া বসিবে। মামলার 'ম'ও করিতে হইবে না, আদালতের দরজায় পা দিবারও প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু কোথা হইতে আবার এই উপসর্গ আসিয়া জুটিল। বিমলাবাবুর কেহ নাই, তাঁহার পিতার কেহ নাই; রহিল কি না তাঁহার পিতামহের একটা মেয়ে, আর সে মেয়েরই একটা ছেলে। তাহাদের নামও কেহ জানিত না, কিন্তু এত দিন পরে কোথা হইতে সে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল, বিষয়ের উত্তরাধিকারী লইয়া ঝগড়া বাধাইতে আসিল? বিষয়ের প্রকৃত উত্তরাধিকারী রমানাথ;

কিন্তু সে আজ বিশ বছর বে-দখল; সাবালক হইবার পরও বিষয় অধিকারের চেষ্টা করে নাই। এখন তাহার অধিকার প্রমাণ করা সহজ নয়।

ঝগড়ায় নবীনচন্দ্রও পশ্চাৎপদ নহে, কিন্তু ঝগড়াটা সমকক্ষের সহিত হইলেই ভাল হয়। যে বছরে ত্রিশ হাজার টাকা মালের কোম্পানীর কাগজের সুদ ভোগ করে, ডাক্তারী করিয়া মুঠো মুঠো টাকা আনে, মামলা উঠিলে হাইকোর্ট হইতে বড় বড় উকীল-ব্যারিষ্টার আনিয়া দাঁড় করাইতে পারে, তাহার সহিত ঝগড়া করিয়া নবীনের মত লোকের বিজয়লক্ষ্মীকে ঘরে আনা কতটা সম্ভবপর, নবীন তাহা মুহূর্ত্তে ভাবিয়া লইল। দেখিল, তাহার কপালের পাতাটা উড়িতে উড়িতেও উড়িল না, পাতাটা ঠিক পাথরের মত হইয়া আবার চাপিয়া বসিল। নবীনের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

কেবল যে নবীনের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল, এমন নয়, রমানাথেরও সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে স্থির করিয়াছিল, তিন হাজার টাকা হস্তগত করিয়াই ফিরিবার পথে আগে গোপালপুরে যাইবে এবং শ্রীরাম গাঙ্গুলীর এম-এ পাশ করা ছেলেটির সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা করিয়া একবারে দিন, ক্ষণ, লগ্ন সব ঠিক করিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইবে। দিদিমাকে সে দেখাইবে, রমানাথের মুখেও যা, কাজেও তাই। আর মণিকে—মণিকে আর কি দেখাইবে? মণির জন্যই তো তাহার এত উদ্যোগ, এত চেষ্টা; ভগবান্ মণিকে সুখী করুন। তাহাই তাহার গর্ব্ব, তাহাই তাহার আনন্দ, তাহাতেই তাহার সুখ।

কিন্তু দুই চারি দিন পরে নবীন যখন তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, ব্যাপারটা আগে যত সহজ ছিল, এখন ততই জটিল হইয়া পড়িয়াছে, উইলের নকল বাহির করিয়া দুই এক নম্বর মামলায় জয়লাভ করিতে না পারিলে একটা পয়সারও আশা নাই, তখন নবীনের কথাগুলা রমানাথের কানে ঠিক বাজের মতই ঠেকিল, তাহার সুখস্বপ্ন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এ দিকে গ্রামের কোন কোন লোক রমানাথকে উপদেশ দিল, "এত বড় সম্পত্তিটা দশ হাজার টাকার কমে বেচা যায় না।" কেহ বা বলিল, "চৌদ্দ পনেরো হাজার দিলে কত লোক লুফে নেয়।"

রমানাথ কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল, কথাই সার, পনেরো হাজারে কাজ নাই, পাঁচ হাজার দিয়াও লুফিয়া লইবার জন্য কাহারও আগ্রহ দেখা যায় না। নবীন বলিল, "লোকের কথা শুনো না বাবাজী, গাছে তুলতে অনেকে আছে, নামাতে কেউ নাই। দশ হাজার বিশ হাজার সব ফাঁকা আওয়াজ। উইলের নকলটা বার ক'রে নম্বর রুজু ক'রে দিই, তার পর টাকার কথা। দিন কতক সবুর কর, মা কালী যদি করেন, তখন পাঁচ-হাজারই পাবে।"

রমানাথ অগত্যা তাহাতেই সম্মতি দিয়া এবং উইল বাহির করিবার কাগজপত্রে সই দিয়া বিষণ্ণচিত্তে বাড়ী ফিরিল। নবীন বলিয়া দিল, মোকদ্দমার দিন পড়িলে তাহাকে সংবাদ দেওয়া হইবে। রমানাথ নিশ্চিত আশা লইয়া গিয়াছিল, অনিশ্চিত আশা লইয়া ফিরিয়া আসিল।

বাড়ীতে আসিলে মণি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ রমাদা, তুমি তো একটুও বড় হওনি? যেমনটি ছিলে, ঠিক তেমনটিই আছ।"

রমানাথ তাহার কথার কোন উত্তর দিল না। মণি তাহার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইল।

ত্রিপুরাসুন্দরী সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন, "থাক্ গে বাবু বিষয়-আশয়, মামলা-মোকদ্দমায় কাজ নাই। যেমন আনচিস্, নিচ্ছিস্, খাচ্ছিস্, তেমনই দুঃখের ভাত খেয়ে বেঁচে-বর্ত্তে থাক্।"

রমানাথ কিন্তু শুধু দুঃখের ভাত খাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। সে যখন শুনিল, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পাত্রটির অন্যত্র বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন তাহার আক্ষেপের সীমা রহিল না। তাহার বরের বাপদের উপর রাগ হইল, সমাজের উপর রাগ হইল, আপনাকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বোধে নিজের উপর রাগ হইল। শেষে সব রাগটা গিয়া বিনোদের উপর পড়িল। বিনোদ যদি সে দিন প্রত্যাখ্যান না করিত, তবে এত দিনে তো বিবাহ হইয়া যাইত। তার পর সে যদিও আপনারই সমগ্র সম্পত্তি বেচিয়া টাকার যোগাড় করিল, সেখানেও এই বিনোদই গিয়া বাদ সাধিল; তাহার এত সম্পত্তিতেও কুলাইল না, অপরের সম্পত্তি লইয়া বড়লোক হইবার আশায় সেই দুরন্ত ন-পাড়াতেও গিয়া উপস্থিত হইল। এমন সুপাত্রটা হাতছাড়া হইয়া গেল। কি ভয়ানক শত্রু এই বিনোদ রায়! রমানাথ তাহার এমন কি অপকার করিয়াছে যে, সে এমন শত্রুতা সাধিল? এখনও সে যদি বিষয়ের দাবী পরিত্যাগ করে, তাহা হইলেও হয় তো পাত্রটি হাতছাড়া হয় না।

রমানাথের ইচ্ছা হইল, সে গিয়া বিনোদকে অনুরোধ করে, "তুমি সব বিষয় লও, বিষয়ে আমার কিছুমাত্র দরকার নাই। সব লইয়া তুমি শুধু তিনটি হাজার টাকা দাও, আমি মণিকে সুপাত্রে দান করি।" ইচ্ছা হইলেও রমানাথ ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিল

না। যে বিনোদ মণিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, মুখের উপর জবাব দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গিয়াছে, সেই বিনোদের নিকট মণিরই বিবাহের জন্য ভিক্ষা করিতে যাইবে? কখনই না। সে যদি শুধু রমানাথকে অপমান করিয়া যাইত, তাহা হইলেও হয় তো রমানাথ তাহার নিকট যাইতে পারিত; কিন্তু যে মণিকে অপমান করিয়াছে, মণির ভালবাসাকে এক কড়া কাণা কড়ির মত জ্ঞান করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহার কাছে রমানাথ কিছুতেই যাইতে পারে না। মণি শুনিলে কি বলিবে? হয় তো ঘৃণায় লজ্জায় গলায় দড়ী দিবে। মণিকে সে বুড়া বরের হাতে তুলিয়া দিবে, নিজে বিবাহ করিবে, আজীবন কুমারী রাখিবে, তথাপি বিনোদের কাছে যাইবে না।

রমানাথ স্থির করিল, "আর বড় ঘরে কাজ নাই, গরীব গৃহস্থ ঘরে ভাল ছেলেব চেষ্টা দেখা যাক্।"

কিন্তু গরীব গৃহস্থের ভাল ছেলেও সহজে মিলিল না। এ দিকে আষাঢ় ফুরাইয়া শ্রাবণ মাস আসিল। ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "ওরে রমা, সামনে ভাদ্দর মাস; এখন তিন মাস আর বিয়ে নাই। এই মাসেই যা হয় ক'রে ফেল্।"

রমানাথ আর পনেরো দিনের ছুটী লইয়া পাত্র খুঁজিতে বাহির হইল। রমানাথ অনেক দেখিল, অনেক খুঁজিল, কিন্তু যেমনটি খুঁজিতেছিল, তেমনটি পাইল না। শেষে সে বিরক্ত হইয়া, মণির অদৃষ্টের দোহাই দিয়া একটি দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র স্থির করিল। পাত্রের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি; একটি ছেলে, একটি মেয়ে আছে। বিষয়-আশয় মন্দ নয়, খাওয়া-পরার কষ্ট নাই, এক পয়সাও দিতে হইবে না। এই পাত্রই সে স্থির করিয়া আসিল।

পাত্র নিজে আসিয়া মেয়ে দেখিয়া গেল, মেয়ে দেখিয়া পছন্দ হইল। আশীর্ব্বাদ ও বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "হ্যাঁ রে রমা, এ যে বুড়ো।"

রমানাথ রাগিয়া বলিল, "মেয়েই বা কোন্ কচি খুকী?"

ত্রিপুরা। এত খোঁজাখুঁজির পর শেষে এই জুটলো?

রমা। ওর অদৃষ্ট! তোমাদের পছন্দ না হয়, অন্য চেষ্টা দেখ।

অন্য চেষ্টা দেখিবার ক্ষমতা না থাকায় ত্রিপুরাসুন্দরী নিরস্ত হইলেন।

পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইবার সময় মণি রমানাথের ভাল জামা-কাপড় বাহির করিয়া দিল, রুমালে এসেন্স মাখাইয়া দিল। আরসি-চিরুণী আনিয়া ধরিল। রমানাথ রুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কি হবে?"

মণি বলিল, "কোথায় যাবে যে?"

মুখভঙ্গী করিয়া রমানাথ বলিল, "হাঁ, চুলোয় যাব।"

মণি। বালাই? তুমি চুলোয় যেতে যাবে কেন?

রমা। আমি যাব না তো কে যাবে, তুই?

মণি। তা রমাদা, তুমি যদি পাঠাও, তা হ'লে যাব না?

মণি ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। রমানাথ দাঁতে দাঁত চপিয়া ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে মণির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর সে কাপড়জামা ছাড়িয়া ফেলিয়া ময়লা কাপড়-জামা পরিয়াই বাহির হইল। চালের বাতার ভিতর হইতে একটা টিক্‌টিকি ডাকিল —টিক্ টিক্ টিক্। ভ্রূকুটী করিয়া রমানাথ উঠানে নামিল। ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "একটু ব'সে যা।"

রমানাথ পশ্চাৎ ফিরিয়া তাঁহার দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। মণি দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। ত্রিপুরাসুন্দরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন মনে বলিলেন, "দুর্গা! দুর্গা!"

ঘণ্টাখানেক পরে রমানাথ যখন ফিরিয়া আসিয়া বাড়ী ঢুকিল, তখন ত্রিপুরাসুন্দরী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, ফিরে এলি যে, গেলি না?"

রমানাথ জামা খুলিতে খুলিতে রাগতস্বরে বলিল, "চুলোয় যাব। যাবার কি যো আছে? এ দিকে টিক্‌টিকি, ও দিকে তুমি পেছু ডাক্‌লে, রাস্তায় বেরুল সাপ। এমন অযাত্রায় গিয়ে শেষে কি প্রাণটা খোয়াব?"

ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "তা ফিরে এসেছিস, বেশ করেছিস্। এত অকল্যাণ দেখে মানুষ কি পা বাড়ায়?"

রমানাথ রাগিয়া বলিল, "মানুষ তো পা বাড়ায় না, কিন্তু তারা বলবে কি?"

ত্রিপুরা। বল্‌লে তো বোয়েই গেল। ভারী তো সুপাত্তর।

রমানাথ ততক্ষণে জামা-কাপড় ছাড়িয়া হুঁকা-কলিকা লইয়া বসিয়াছিল; দিদিমার কথা শুনিয়া সে হুঁকা-কলিকা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; উত্তেজিত-ভাবে চীৎকার করিয়া বলিল, "হাঁ, খুব কুপাত্র। আমার অন্যায় হয়েছে, ঝক্‌মারি করেছি। এখন তোমরা একটি সুপাত্র এনে বিয়ে দাও।"

ত্রিপুরাসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন, "তাই না হয় দেব।"

রমানাথ উচ্চকণ্ঠে বলিল, "দেব নয়, দাও। আমি আর তোমাদের কোন কথাতেই নাই। এই নাকে কানে খত দিলাম।"

রমানাথ সত্য সত্যই ঘাড় নীচু করিয়া মাটীতে নাক ঘষিতে গেল। মণি খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। রমানাথের আর নাকে খত দেওয়া হইল না, সে তাড়াতাড়ি ঘাড় সোজা করিয়া ক্রোধরক্ত দৃষ্টিতে মণির মুখের দিকে চাহিয়াই বাহিরে চলিয়া গেল। ত্রিপুরাসুন্দরী সহাস্যে বলিলেন, "ভালা পাগলের পাল্লায় পড়েছি যা হোক্।"

সারারাত্রি ধরিয়া ভাবিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী স্থির করিলেন, "বিনোদের মাকে গিয়া আর একবার ধরা যাক্। আমাদের এখন কন্যাদায়, রাগ করলে কি চলে? যার হাতে ধর্‌তে হয় না, তার এখন পায়ে ধর্‌তে হবে।"

আপনার সঙ্কল্পের কথা আপনার অন্তরে গোপন রাখিয়া পরদিন ত্রিপুরাসুন্দরী আহারান্তে বিনোদদের বাটীতে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় তিনি বার বার হরিকে হরির লুট এবং সত্যনারায়ণকে সিন্নী মানসিক করিয়া গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে আর কথা তুলিতে পারিলেন না। দেখিলেন, বিনোদ শয্যাগত; দুই জন ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া অবধি বিনোদ যেন কেমন উন্মনা হইল, আর কাজকর্ম্মে তেমন আস্থা রহিল না। যে কাজটা নিতান্ত না করিলে নয়, তাহাই কোনরূপে করিত, বাকী সময়টা আপনার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া কাটাইত। ডাক্তারখানায় তাহাকে আর বড় একটা দেখা যাইত না; ডাক আসিয়া ফিরিয়া যাইত। আগে বিনোদ দিনে তিনবার রোগীর বাড়ী যাতায়াত করিত, এখন রোগী সাত বার ডাকিয়াও ডাক্তারের দেখা পায় না। অনেক ডাকাডাকিতে যদি দেখা পায়, তবে বিনোদ রোগী দেখিয়াই বলে, "ভিজিট দাও।"

গরীব গৃহস্থ সানুনয়ে বলে, "বাবু, আমি বড় গরীব।"

বিনোদ রাগিয়া বলে, "গরীব তো আমাকে ডাকতে যাও কেন?"

গরীবের মা-বাপ ডাক্তার বাবুর এই অর্থপ্রিয়তা দেখিয়া লোকে বিস্মিত হয়। তাহার রাগ দেখিয়া গৃহস্থ ভয়ে বলে, "তবে একটু অপেক্ষা করুন, ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়ে টাকার যোগাড় করি।"

বিনোদ কিন্তু অপেক্ষা করে না; আপনার ব্যবহারে যেন আপনিই লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি পলাইয়া আইসে। আসিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে থাকে।

তার পর গৃহস্থ বহু কষ্টে টাকার যোগাড় করিয়া বাড়ী বহিয়া যখন ডাক্তার বাবুকে টাকা দেয়, তখন বিনোদ তাহা ফিরাইয়া দিয়া বলে, "যা বাঁধা দিয়েছ, সব ছাড়িয়ে আন।" তার পর আপনার পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলে, "দুধ, মিছরি, সাগু কিনে দাও গে।"

গৃহস্থ অবাক্ হইয়া ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। কিন্তু পরদিন ডাকিতে আসিলে হয় তো বিনোদ আর যাইতে চাহে না। কাঁদাকাটা করিলে বলে, "ভিজিটের টাকা, ওষুধের দাম না পেলে যাব না।"

বাড়ীতে আসিয়া যাহারা বিনামূল্যে ঔষধ লইত, তাহারা এখন আর সব দিন ঔষধ পায় না। কোন দিন বিনোদ ডাক্তারখানায় আসিয়া বসে, কোন দিন বা আসে না। রোগীরা মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া যায়। রোগীরা চলিয়া গেলে বিনোদ হয় তো ডাক্তারখানায় আসে; আসিয়া চাকরকে ধমক দেয়। কিন্তু পরদিন চাকর রোগীদের আগমনবার্ত্তা জানাইতে গেলে বলে, "আমার শরীর খারাপ, ফিরে যেতে বল্।"

রামজয় আসিয়া গৃহিণীকে ধরিল; বলিল, "বিনোদের এ কি হ'লো গিন্নী-মা?"

অন্নপূর্ণাও পুত্রের ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহার কারণও বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতীকারের উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে রামজয়ের নিকট সকল কথা বলিলেন। রামজয় শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল; বলিল, "হায়, হায়, সত্য-লক্ষ্মীর শেষে এই হ'লো? কলিতে কি ধর্ম্ম নাই?"

রামজয় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "এখন কি করি রামজয়?"

রামজয় বলিল, "বিয়ে দাও; বিয়ে হ'লে মন অনেকটা স্থির হবে।"

অন্ন। কিন্তু ও কি বিয়ে করবে?

রাম। তুমি বল্‌লেই করবে।

অন্ন। তা করতে পারে, কিন্তু ধ'রে বেঁধে বিয়ে দেওয়া কি ভাল?

রামজয় একটু রাগিয়া বলিল, "ভাল-মন্দ বুঝি না, যদি ছেলেকে বাঁচাতে চাও, তবে বিয়ে দাও।"

অন্নপূর্ণা "দেখি" বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি সহজে বিনোদের নিকট এ প্রস্তাব করিতে পারিলেন না।

এ দিকে বিনোদের আহারে রুচি গেল, রাত্রে নিদ্রা হইত না, শরীর ক্রমে শীর্ণ হইয়া আসিল, চক্ষু কোটরে ঢুকিল, চোখের কোলে কালি পড়িল। অন্নপূর্ণা ভীত হইলেন। এক দিন তিনি ছেলের কাছে বসিয়া এ কথা সে কথার পর বলিলেন, "বিনু, আমার একটা কথা রাখ্।"

বিনোদ বলিল, "তোমার কোন্ কথা না রাখি মা?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "সকল কথাই রাখিস্ কিন্তু—"

বিনোদ। এতে কিন্তু হবে কেন মা, তোমার কোন্ কথা রাখতে হবে বল?

অন্নপূর্ণা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আমারও ইচ্ছা, রামজয়েরও ইচ্ছা, তুই সংসারী হ'।"

মৃদু হাসিয়া বিনোদ বলিল, "এখন কি আমি সন্ন্যাসী?"

অন্ন। সন্ন্যাসীর মনেও বরং শান্তি আছে, তোর তাও নাই।

বিনোদ নীরবে বসিয়া রহিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তুই বিয়ে কর্।"

বিনোদ শূন্যদৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "কর্‌বি কি না বল্।"

ম্লান হাসি হাসিয়া বিনোদ বলিল, "তুমি বল্‌লে কি না কর্‌তে পারি, মা?"

মুখ নীচু করিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আমি বল্‌ছি, বিয়ে কর্।"

বিনোদ বলিল, "তা কর্‌ব, কিন্তু দিন কতক গেলে ভাল হয় না?"

অন্নপূর্ণা মুখ তুলিয়া জোর গলায় বলিলেন, "অনেক দিন গেছে, আর নয়। তোর শরীরটা কি হয়েছে দেখেছিস্?"

বিনোদ হাসিল; বলিল, "তোমার কোলে থেকেও যদি শরীর না সারে, তবে বিয়ে কর্‌লেই কি তা সার্‌বে মা?"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া অন্নপূর্ণা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "হাঁ, সার্‌বে, আমি বল্‌ছি সার্‌বে।"

শূন্যে উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিনোদ বলিল, "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্ মা।"

অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি ছেলের কাছ হইতে উঠিয়া গেলেন।

হায় অন্ধ মানুষ! জীবনের বিকাশ হইতে লয় পর্য্যন্ত তুমি কেবল সুখ সুখ করিয়া ব্যস্ত হও, নিদারুণ আগ্রহ, প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়া, মরু-মরীচিকার পশ্চাৎ ছুটিয়া বেড়াও; কিন্তু সুখ পাও কি? যাহার জন্য তোমার এত ব্যগ্রতা, এত ছুটাছুটি, সে মায়া-মন্ত্রে তোমার সম্মুখে কুহক-নগরীর মোহন চিত্রখানি ধরিয়া ধরিয়া তোমার আগে ছুটিতে থাকে। আর অন্ধ তুমি, সেই মরীচিকাকে আয়ত্ত করিবার আশায় উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটিয়া যাও। শেষে ছুটিতে ছুটিতে এক দিন অবসন্ন-পদে ক্লান্তদেহে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়া আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কর।

মৃত্যু? সে কি ভীষণ দৃশ্য! জীবিতের নিকট মৃত্যু কি বীভৎস ব্যাপার! সব আছে অথচ কিছু নাই। সংসার আছে, আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে; স্নেহ, মমতা, ভালবাসা সব আছে; অথচ মুহূর্ত্তে সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কোথায় কোন্ অজ্ঞাত অপরিচিত দেশে যাইতে হইবে। না জানিলেও—যাইতে ইচ্ছা না থাকিলেও যাইতে হইবে। তার পর এই দেহের ধ্বংস; হয় আত্মীয়স্বজনে যত্ন করিয়া ইহার ধ্বংস-কার্য্য সম্পন্ন করিবে, নয় মুদ্দাফরসে টানিয়া ফেলিয়া দিবে। এই দেহ—এই যত্নপালিত দেহ শৃগাল-শকুনির ভক্ষ্য হইবে। হইবে কেন, হইয়াছে। বিদেশে যেখানে আপনার বলিতে কেহ নাই, মুখে শেষ জলবিন্দু দিতে কেহ নাই, শেষ নিশ্বাসের শব্দটুকু শুনিবার কেহ নাই, সেইখানে কি মর্ম্মন্তুদ যাতনা ভোগ করিতে করিতে সে মরিয়াছে। কি অতৃপ্তি, কি নিষ্ফলতা, কি উপেক্ষা বুকে ধরিয়া ধরণীর নিকট বিদায় লইয়াছে। এক দিন —এক দিনের ব্যবধানে তাহার দেহটি পর্য্যন্ত শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য হইয়াছে। হায় অভাগিনি!

বিনোদ উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল।

বিনোদের দেহ ক্রমে শীর্ণ হইতে লাগিল। তাহার লাবণ্য গেল, শ্রী গেল, সবলতা গেল, অটুট স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা ডাক্তার আনাইলেন। চিকিৎসা চলিল, কিন্তু আরোগ্য-লক্ষণ কিছু দেখা গেল না। ক্রমে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া আসিল। রামজয় মেয়ে খুঁজিতেছিল। এখন মেয়ে খোঁজা ছাড়িয়া ভাল ডাক্তারের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইল।

ত্রিপুরাসুন্দরী বড় আশা লইয়া আসিয়াছিলেন; বড় নিরাশা লইয়া ফিরিয়া গেলেন।

অন্নপূর্ণা সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যখন একাগ্রচিত্তে পুত্রের সেবাশুশ্রূষা করিতেছিলেন, তখন রামজয় আসিয়া জানাইল, "ন-পাড়ার বিষয় লইয়া মোকদ্দমা

বাধিয়াছে; রমা ঠাকুরকে খাড়া করিয়া নবীন ঘোষ বিষয়টা হাত করিবার চেষ্টায় আছে।" শুনিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "মোকদ্দমা ক'রে তার তদ্বির কর। তবে বিষয় যদি রমানাথের প্রকৃত হয়, তবে ছেড়ে দাও।"

রামজয় বলিল, "যে দিন তা হবে, সে দিন নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব, কিন্তু ফাঁকি দিয়া যে কেউ বিনোদ রায়ের একটি কড়া নেবে, রামজয় থাক্‌তে তা হচ্চে না।"

রামজয় মোকদ্দমার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এ দিকে ডাক্তারেরা বলিল, "রোগের মূল কারণ মানসিক অশান্তি, সে অশান্তি দূর করা দরকার। মাঝে-মাঝে মণির নাম শুনিতে পাই। মণি কে?"

অন্নপূর্ণা মণির পরিচয়, তাহার সহিত বিনোদের বিবাহ-সম্বন্ধ প্রভৃতি সকল কথাই বলিলেন। শুনিয়া বিজ্ঞ ডাক্তার বলিলেন, "যদি মণিকে কাছে রাখ্‌তে পারেন, তা হ'লে খুব ভাল হয়।"

অন্নপূর্ণা রমানাথকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "মণিকে আমায় দাও।"

চমকিত হইয়া রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আমি তাকে ছেলের বৌ কর্‌ব।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রমানাথ বলিল, "আর তা হয় না; তার সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে।"

অন্ন। সম্বন্ধ ভেঙ্গে দাও; তোমার সব বিষয় ছেড়ে দেব।

ভ্রূকুটী করিয়া রমানাথ বলিল, "আমরা মেয়ে বেচি না।"

অন্ন। বেশ, আমি ভিক্ষা চাইছি।

রমা। এক দিন আমি পায়ে ধ'রে দিতে গিয়েছিলাম।

অন্ন। সে কথা যেতে দাও, এখন দেবে কি না বল।

রমা। বলেছি তো, তার সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছে।

অন্ন। কোথায় হ'ল?

রমা। এইখানেই।

অন্ন। পাত্র কে?

রমা। আমি।

অন্নপূর্ণা তীব্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি মণির দিদিমার সঙ্গেই কথা কইব। তোমার মত হাবাতে হতভাগা মণির যোগ্য নয়।"

গর্জ্জন করিয়া রমানাথ বলিল, "আমি হাবাতে নই, আমার বাপের যথেষ্ট বিষয় আছে।"

অন্ন। বিষয় তোমার বাপের নয়, আমার বাবার।

রমা। আদালতেই তার মীমাংসা হবে।

রমানাথ ক্ষিপ্রপদবিক্ষেপে চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণা রামজয়কে ডাকাইয়া বলিল, "বিষয়ের এক কড়া রমানাথকে ছেড় না, সত্যি ওর বাপের বিষয় হলেও নয়। ছাড়তে হয়, আদালতে শেষ পর্য্যন্ত দেখে তবে ছাড়্‌বে।"

রামজয় বিস্ময়স্তম্ভিত দৃষ্টিতে অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

রমানাথ ডাকিল, "দিদিমা!"

দিদিমা বলিলেন, "কেন?"

"মণির বিয়ের কি কর্‌লে?"

"আমি আর কি কর্‌বো?"

"তুমি কর্‌বে না তো কে কর্‌বে?"

"তুই।"

রমানাথ বলিল, "আমি? আমি আর তোমাদের কোন কথাতেই নাই।"

দিদিমা বলিলেন, "নাই তো আবার জিজ্ঞাসা কচ্চিস্ কেন?"

বিরক্তভাবে রমানাথ বলিল, "সেটা আমার ঝকমারি হয়েছে।"

দিদিমা বলিলেন, "একশোবার।"

রমানাথ আপন মনে অস্পষ্টস্বরে বকিতে লাগিল। দিদিমা বলিলেন, "হাঁ রে রমা?"

গম্ভীরভাবে রমানাথ উত্তর করিল, "কি বল।"

দিদি। তুই কি পাগল হ'লি?

রমা। তোমরা পাগল কচ্চো, আর পাগল হব না?

দিদি। আমরা তোকে পাগল কচ্ছি, না তুই আমাদের পাগল কচ্ছিস্?

রমা। আমি তোমাদের কিসে পাগল কর্‌লাম?

দিদি। কিসেই বা না কর্‌লি? তুই থাক্‌তে আমি বর খুঁজতে যাব, না মণি যাবে?"

উদাসস্বরে রমানাথ বলিল, "যে হয় যাবে।"

গালে হাত দিয়া দিদিমা বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন "তুই বলিস্ কি রে রমা?

ঝঙ্কার দিয়া রমানাথ বলিল, "সাধে কি বলি, আমি খুঁজে আন্‌লে তো তোমাদের পছন্দ হবে না।"

দিদি। পছন্দর মত হ'লেই পছন্দ হয়।

রমা। তোমাদের ইংরেজ পছন্দ। তেমনটা কোথায় পাই বল।

দিদি। তাই ব'লে কি একটা বুড়ো ধ'রে আন্‌বি?

রমা। চল্লিশ বছরে মানুষ বুঝি বুড়ো হয়?

দিদিমা সহাস্যে বলিলেন, "না, কচি খোকা থাকে।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া রমানাথ বলিল, "এই জন্যই তো বলি, তোমরা নিজেদের পছন্দমত দেখ।"

দিদিমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাই না হয় দেখ্‌ব। কিন্তু তুই সত্যি বল্ দেখি।"

দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া রমানাথ বলিল, "কি বল্‌বো?"

দিদিমা বলিলেন, "তোরই কি পছন্দ হয়েছিল?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া রমানাথ বলিল, "তা—পছন্দ—তা হয়েছিল বৈ কি। পছন্দ না হ'লেই বা আন্‌ব কেন?"

দিদি। এনেছিলি দায়ে প'ড়ে।

"ভারী তো দায়" বলিয়া রমানাথ উঠিয়া তামাক সাজিতে গেল দিদিমা রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। রমানাথ তামাক সাজিতে সাজিতে ডাকিল, "দিদিমা!"

দিদিমা রন্ধনশালা হইতে উত্তর দিলেন, কি?"

রমানাথ বলিল, "আজ বিনোদ বাবুর মা আমাকে ডাকিয়েছিলেন।"

দিদি। কেন?

রমা। তিনি মণিকে চান, অর্থাৎ মণির সঙ্গে বিনোদের বিয়ে দেবেন।"

দিদিমা তাড়াতাড়ি রন্ধনশালা হইতে বাহিরে আসিলেন, সকৃড় হাতটা উঁচু করিয়া রাখিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "তার পর?"

রমানাথ বলিল, "তার পর তিনি আমার বিষয়ের দাবী ছেড়ে দেবেন।"

দিদি। তুই কি বল্‌লি?

রমা। কি বলা উচিত, বল দেখি?

দিদি। আমি অত উচিত অনুচিত জানি না, তুই কি বল্‌লি, তাই বল।

রমা। সাফ জবাব দিলাম।

দিদি। জবাব দিলি?

রমা। হাঁ, জবাব দিলাম। বল্‌লাম, মেয়ে বেচা আমাদের ব্যবসা নয়।

দিদিমার মুখখানা ভারী হইয়া আসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তার পর?"

রমা। তার পর তিনি ভিক্ষা চাইলেন।

সবিস্ময়ে দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, "ভিক্ষা?"

সহাস্যে রমানাথ বলিল, "হাঁ, ভিক্ষা। ওটা ভিক্ষা নয়, উপহাস। অর্থাৎ আমরা বড় লোক, তোমরা গরীব; আমরা যে ভিক্ষা বলছি, এটা আমাদের বলা নয়, তোমাদের। আমরা যখন চাইছি, তখন তোমরা কৃতার্থ হয়ে আমাদের পায়ে এনে ফেলে দাও। বুঝ্‌লে দিদিমা, কথার ভাবটা এই। রমানাথ কি সে ছেলে? এ ভবী ভোলবার নয়। সে দিনকার অপমানটা কি আমি ভুলে গিয়েছি?"

শঙ্কা-কম্পিতকণ্ঠে দিদিমা বলিলেন, "তুই কি তার শোধ নিয়ে এলি না কি?"

মাথা নাড়িয়া জোর গলায় রমানাথ বলিল, "নিশ্চয়।"

দিদিমার মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর হইয়া আসিল। তিনি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন রমানাথ তামাক সাজা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দিদিমা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "তুই কর্‌লি কি রে রমা?"

রমা। কি কর্‌লাম?

দিদি। হাতের লক্ষ্মী আবার পায়ে ঠেলে এলি?

রমানাথ তীব্রদৃষ্টিতে দিদিমার মুখের দিকে চাহিল; গম্ভীরস্বরে বলিল, "দেখ দিদিমা, তোমরা মনে কর, বড় লোক লাথি ঝাঁটা মেরেও যদি একবার হেসে কথা কয়, তা হ'লেই আমরা কৃতার্থ। তা তোমরা কৃতার্থ হ'তে পার, কিন্তু রমানাথ শর্ম্মা হবে না। সে ইট খেয়ে ইটটি হজম কর্‌তে পার্‌বে না, ফিরিয়ে পাটকেলটি মার্‌বে। কেন, বিনোদ ডাক্তার ছাড়া পাত্র কি আর নাই?"

দিদিমা বলিলেন, "খুঁজে তো পেলি না!"

স্থির-গম্ভীরস্বরে রামনাথ বলিল, "এত দিন পাই নাই, আজ পেয়েছি।"

দিদি। কোথায়?

রমা। এই তোমার সাম্‌নে। আমিই মণির বর, আমিই তাকে বিয়ে কর্‌বো।

দিদিমার বিস্ময়স্তম্ভিত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "সত্যি?"

রমানাথ স্থিরকণ্ঠে বলিল, "হাঁ, সত্যি। শোন দিদিমা, আমি এত দিন শুধু বিদ্বান্ ধনবান্ পাত্র খুজে বেড়াই নাই, আমি খুঁজছিলাম, যে মণিকে সুখে রাখ্‌বে, তাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাস্‌বে। তা সে মূর্খই হোক্ বা গরীবই হোক্। কিন্তু সারা দেশটা খুঁজে আমার মনের মত পাত্র পেলাম না; দেখ্‌লাম, আমি ছাড়া আমার মত মণিকে সুখী কর্‌তে কেউ পার্‌বে না। তাই ঠিক করেছি, আমিই বিয়ে কর্‌ব; তুমি বিয়ের উদ্যোগ কর।"

রমানাথ হুঁকা হাতে বাহিরে চলিয়া গেল। দিদিমা

নিশ্চল নিস্পন্দভাবে উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া দুই ফোঁটা আনন্দের অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥"

"আচ্ছা ভাই, মহাভারত পড়্‌লেই কি পুণ্য হয়?"

"তা আর হয় না? না হ'লে লেখা থাকবে কেন?"

ঘাড় নাড়িয়া বিরাজ বলিল, "লেখা অমন থাকে। এই যে কত গল্পের বই আছে, তাতে নায়ক-নায়িকা, ভালবাসাবাসি, ছোরাছুরী, মিলন, বিচ্ছেদ, কত কি থাকে। নায়ককে কেউ ছুরী মাচ্চে, নায়িকা অমনি ভুঁইফোড় হয়ে মাঝখানে এসে বুক পেতে দাঁড়াল, ছুরীটা তার বুকেই পড়লো। তাই ব'লে সত্যি সত্যি কি এমন হয়?"

উমা বলিল, "কেন হবে না? ভালবাসার জন্য লোক কি না করতে পারে?"

ঈষৎ হাসিয়া বিরাজ বলিল, "আর যা পারুক, কিন্তু ছুরীর সামনে বুক পেতে দেওয়া—মা গো. মনে কর্‌লেও গা শিউরে উঠে।"

উমা বলিল, "তা হ'লে তুই ভালবাসার কিছুই জানিস্ না।"

বিরাজ। তা খুব জানি। আমি তোমার, তুমি আমার বলতে জানি, মিলনে হাস্‌তে, বিরহে কাঁদতে জানি, শুধু ঐ ছোরাছুরীর ব্যাপারটা কেমন যেন ঠেকে।

উমা। কিছুই ঠেকে না। আচ্ছা, মনে কর্, তুই এক জনকে ভালবাসিস্।

বাধা দিয়া বিরাজ বলিল, "মর্ পোড়ামুখী, এক-জনকে ভালবাসব কি, আমি যে বিধবা?"

উমা হাসিয়া বলিল, "আমি কি আর তোকে সত্যিই ভালবাস্‌তে বল্‌ছি?"

বিরাজ গম্ভীরমুখে বলিল, "সত্যিই হোক্ আর মিথ্যাই হোক্, বিধবাকে ও কথা বলতে নাই।"

উমা বলিল, "আচ্ছা, অপরের কথা যাক্, ধর্ তোর স্বামী, তাকে তো তুই খুব ভালবাস্‌তিস্?"

বিরাজ। একটুও না।

উমা। মাইরি না কি?

বিরাজ। আমি কি মিথ্যা বল্‌ছি? তার দেখাই পেতাম না, তা ভালবাসব কা'কে। সে থাকতো কোথায় কোন্ রঙ্গিণীকে নিয়ে, আর আমি খেতাম শাশুড়ীর ঝাঁটা-লাথি। তিন বছরে তিন দিনও দেখা পেয়েছি কি না সন্দেহ।

মৃদু হাসিয়া উমা বলিল, "দেখা পাওয়ায় সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু ভালবাস্‌তিস্ যে, তাতে কোন সন্দেহ নাই।"

উমার মুখের উপর মৃদু কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বিরাজ বলিল, "আ লো, ভালবাস্‌লেই হ'লো আর কি। বলে—চোরে-কামারে দেখা নাই, সিঁদ-কাঠীতে চুরী।"

উমা বলিল, "বেশী দেখা-সাক্ষাতে কাজ নাই, সাত পাকের সময় সেই যে চোরে-কামারে দেখা হয়, তাতেই সিঁদকাঠী তৈরী হয়ে যায়।"

বিরাজ। যার হয়, তার হয়, আমার তো ভাই হয় নি।

উমা। তোর পোড়া কপাল।

বিরাজ হাসিয়া বলিল, "ভাগ্যিস্ ব'লে দিলি ভাই।"

কিছুক্ষণ দুই জনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। অতি বড় দুঃখের ভার আসিয়া যেন দুই জনেরই বুকে চাপিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ পরে বিরাজ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কথা ক' ভাই, এমন চুপ ক'রে ব'সে থাকা যায় না, হাঁপিয়ে উঠতে হয়।"

উমা বলিল, "কি কথা কইব?"

বিরাজ। যা হয়।

উমা। এক ছিল রাজা, তার ছিল দুই রাণী।

বিরাজ। একটি সুয়ো আর একটি দুয়ো।

উমা। হাঁ, সুয়োর নামটি ছিল বেশ।

বিরাজ। উমা।

উমা হাসিয়া বলিল, "না, বিরাজমোহিনী।"

বিরাজও হাসিতে হাসিতে বলিল, "উঁহু, সে ছিল আর এক রাজার দুয়ো। মুখে আগুন তোমার গল্পের। অন্য কথা বল্।"

উমা। দুঃখের গান শুনে শুনে অরুচি জন্মে গেছে। দু'টো সুখের কথা—তোর বিয়ের কথা বল্।

উমা। মনে নাই।

বিরাজ। তবে যা মনে আছে, তাই বল্। আচ্ছা ভাই, বিনোদ বাবু তোকে কেমন ভালবাস্‌তো?

উমা। খুব। হাস্‌লে হাস্‌তো, কাঁদলে অন্ধকার দেখতো, হাই তুল্‌লে হাত পাততো—

বিরাজ। ঘাম দিলে বাতাস করতো, শুলে পা টিপে দিত।

উমা। হাঁচলে জীব বল্‌তো, চল্‌লে ব্যথা পেতো, ঘুমুলে জাগিয়ে দিত, জাগলে ঘুম পাড়াত।

বিরাজ। ক্ষিদে পেলে খাইয়ে দিত, মান কর্‌লে পায়ে ধর্‌তো।

উমা। সামনে এলে আদর কর্‌তো, পিছন ফিরলে গাল দিত। মুখে বল্‌তো বেঁচে থাক, মনে বল্‌তো নিপাত যাও।

দুই জনেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। দুঃখের ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে সে হাসিটুকু শান্তির প্রসন্নতা আনিয়া দিল।

নীচে হইতে কে ডাকিল, "বিপ্রদাস বাবু বাড়ী আছেন?"

উমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বারান্দার রেলিং ধরিয়া নীচের দিকে চাহিল। বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

উমা বলিল, "সেই বিলাসপুরের রমানাথ বাবু।"

উমা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। বিরাজ কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মহাভারতখানি মুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে; বর্ষণক্লান্ত পাণ্ডুর মেঘমালা ভেদ করিয়া অস্তমান সূর্য্যের লাল আভা বর্ষার সন্ধ্যাকে এক অপূর্ব্ব শ্রীতে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। বিরাজ রেলিং ধরিয়া সেই রক্তরাগমণ্ডিত সান্ধ্য-শ্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতর জমাট-বাঁধা অন্ধকারটা যেন ঠেলিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল।

নীচে হইতে রমানাথের হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছিল, "তোমাকে যেতে হবে উমা, তোমার বাবাকেও যেতে হবে, আমার বিয়ে।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

মণি জিজ্ঞাসা করিল, "বিনোদ বাবু কেমন আছেন দিদিমা?"

দিদিমা বলিলেন, "একটু ভাল আছে।"

মণি বলিল, "আজ গিয়েছিলে?"

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দিদিমা বিষণ্ণমুখে বলিলেন, "গিয়েছিলাম বৈ কি। যাবার মুখ নাই, তবু না যাওয়া ভাল দেখায় না ব'লেই যেতে হয়।"

একটু চুপ করিয়া নতমুখে মণি বলিল, "রমাদার অসুখের সময় বিনোদ বাবু অনেক করেছিলেন।"

দিদিমা বলিলেন, "সে কথা আমার দু'বার বল্‌তে? মরা বাঁচিয়েছিল। বিনোদের ধার কি কখনও শোধ হবে?"

মণি। অসুখটা খুবই হয়েছিল, না দিদিমা?

দিদি। খুব ব'লে খুব, যমে মানুষে টানাটানি। দু' দু'জন ডাক্তার দিন-রাত বাড়ীতে ব'সে। বড়লোক, তাই রক্ষা, আমাদের মত লোক হ'লে কি বাঁচতো?

মণি। এই তো সে দিন তীর্থি ক'রে ফিরে এলো?

দিদি। সেই এসে অবধি পড়েছে। বিদেশ বিভুঁয়ে তো নাওয়া-খাওয়ার ঠিক থাকে না; ওরা বড়লোক, ওদের কি ও সব সহ্য হয়? তার উপর—"

মণি। তার উপর কি?

দিদিমা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিলেন, "শুনিস্ নাই?"

উৎসুকভাবে মণি বলিল, "না, কি?"

দিদি। সে বৌটা যে মারা গেছে।

বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে মণি বলিল, "বল কি দিদিমা?"

মণি তরকারী কুটিতেছিল; বেগুনটা অর্দ্ধকর্ত্তিত অবস্থায় বঁটিতে লাগিয়া রহিল। মণি তাহার দুই পাশে দুই হাত রাখিয়া দিদিমার মুখের দিকে ব্যগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। দিদিমা বলিলেন, "ক্ষেত্রে গিয়েছিল, সেইখানেই—ওরাও তখন সেখানে, বিনোদের সঙ্গে দেখাও হয়েছিল, ও কিন্তু সে কথা বলে নি।"

ব্যগ্রকণ্ঠে মণি জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর?"

দিদি। তার পর তার ওদিককার ব্যারাম হয়, তাতেই মারা যায়। দাহ পর্য্যন্ত হয় নি।

মণি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যথিতস্বরে বলিয়া উঠিল, "আহা!"

দিদিমা বলিলেন, "সেই শোকেই তো ছোঁড়ার অসুখটা হয়ে পড়লো। আহা, হবে না? হাজার হোক্ স্ত্রী তো বটে।"

একটু থামিয়া দিদিমা বলিতে লাগিলেন, "আর সেই জন্যেই তো গিন্নী ছেলের বিয়ের জন্য রমাকে এত ক'রে ধরেছিল। তা রমা কি মানুষ?"

দিদিমা একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মণি ব্যস্ত হস্তে অর্দ্ধকর্ত্তিত বেগুনটাকে তৎপরতার সহিত কুটিতে লাগিল।

দিদিমা বলিলেন, "বিনোদ বিকারের ঘোরে নাকি শুধু তোরই নাম—"

বেগুন কুটিতে কুটিতে মণির আঙ্গুল কাটিয়া গেল; সে তাড়াতাড়ি বাঁ হাত দিয়া কাটা আঙ্গুলটা টিপিয়া ধরিল। দিদিমা তাহা দেখিতে পাইয়া

ব্যস্তভাবে বলিলেন, "আঙুল কাট্‌লি না কি? কতটা কাট্‌লো?"

মণি বলিল, "না, তেমন কাটে নি, বঁটির ধারটা লেগে গেছে। পোড়া বঁটিটায় যে ধার হয়েছে!"

ঈষৎ হাসিয়া দিদিমা বলিলেন, "হাঁ, দোষটা বঁটির বৈ কি। একটু দেখে শুনে কাজ কর্‌তে হয়। রক্ত পড়্‌ছে?"

"না।" বলিয়া মণি পুনরায় বার্ত্তাকুকর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল। ভাত উথলিয়া উঠিল। দিদিমা ভাতের হাঁড়ির মুখের সরাটা তুলিয়া লইয়া হাত ধুইলেন।

মণি বলিল, "হাঁ দিদিমা, রমাদা ফির্‌বে কবে?"

দিদিমা বলিলেন, "মঙ্গলবার বুধবার নাগাদ ফির্‌তে পারে, সোমবারে তো বিয়ের দিন।"

মণি মুখ নীচু করিয়া আলু ছাড়াইতে লাগিল। মৃদু হাসিয়া দিদিমা বলিলেন, "কেন, মন কেমন কর্‌ছে না কি?"

মণিও একটু হাসিয়া বলিল, "বড্ড।"

দিদি। মন তো কেমন কর্‌ছে, কিন্তু এখনো তুই তার নাম ধ'রে ডাক্‌বি?

মণি। তবে কি ব'লে ডাক্‌ব?

দিদি। তোর মাথা ব'লে। ডাকবার আর কিছুই নাই কি?

মণি। ওগো হাঁগো বল্‌বো?

সহাস্যে দিদিমা বলিলেন, "তাই বল্‌বি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মণি বলিল, "তা হ'লে ওগোর ফির্‌তে এখনো তিন চার দিন দেরী।"

দিদিমা হাসিয়া উঠিলেন। মণিও মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে আলু কাটিতে লাগিল; কিছুক্ষণ পরে মণি ডাকিল, "দিদিমা!"

দিদি। কি?

মণি। কালও তুমি যাবে?

দিদি। কোথায়?

মণি। ওদের বাড়ী।

দিদি। তা এখন ঠিক বলি কি ক'রে। কেন?

মণি বলিল, "না, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি।"

মনে মনে একটু হাসিয়া দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই যাবি?"

মণি একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, "আমি—না, রমাদা শুন্‌লে রাগ কর্‌বে।"

দিদি। শুন্‌লে তো? কে তাকে বল্‌তে যাবে?

মণি চুপ করিয়া রহিল। দিদিমা বলিলেন, "তা হ'লে কাল যাবার সময় তোকে নিয়ে যাব।"

বিনোদের অসুখ শুনিয়া অবধি মণির তাহাকে দেখিতে যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। ইচ্ছা হইলেও কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না, বলিলেও পাছে কেহ কিছু মনে করে। অবশ্য মনে করিবার কিছু ছিল না, সে ভালবাসার খাতিরে যাইতে চাহে নাই, শুধু কৃতজ্ঞতার খাতিরে যাইতে চাহিতেছে। রমানাথের অসুখের সময় বিনোদবাবু কি খাটুনিই খাটিয়াছে! ঘরের ঔষধ দিয়া, দিন-রাত কাছে থাকিয়া, আপনার ক্ষতি করিয়া চিকিৎসা করিয়াছে, সেবা করিয়াছে। এ জন্য মণি যে তাহার নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। সেই কৃতজ্ঞতার খাতিরেও বিনোদের অসুখের সময় তাহাকে একবার দেখিতে যাওয়া উচিত। কিন্তু লোকে কি তাহা বুঝিবে? তাহারা ভাবিবে, এটা কৃতজ্ঞতার খাতির নয়, ভালবাসার খাতির। দিদিমা তামাসা করিবে, রমাদা রাগ করিবে, হায়, লোকে যদি লোকের মনের কথা বুঝিতে পারিত? মনের ভিতর যথেষ্ট ঔৎসুক্য থাকিলেও মণি লোকলজ্জায় খাতিরে যাইবার কথা বলিতে পারিল না, মনের কথা মনে চাপিয়া উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইতে লাগিল।

সুতরাং দিদিমা যখন তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে বলিল, তখন সে সম্মতিসূচক কোন কথা বলিল না, অসম্মতিও প্রকাশ করিল না। চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু তাহার এই মৌনভাবটুকুই যে তাহার মনের ভিতর লুকান আগ্রহ সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়া দিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না, দিদিমা কিন্তু সেটুকু বেশ বুঝিয়া লইলেন।

সেই দিনই আহারান্তে দিদিমা মণিকে সঙ্গে লইয়া বিনোদকে দেখিতে গেলেন। যাইবার সময় তিনি একখানা ভাল কাপড় এবং দুই একখানা গহনা যাহা ছিল, তাহা বাহির করিয়া দিয়া মণিকে পরিতে বলিলেন। মণি হাসিয়া বলিল, 'এ সব কেন দিদিমা, ক'নে দেখা দিতে হবে না কি?"

দিদিমা একটু রাগিয়া বলিলেন, "ক'নে দেখা দিতে হলেই বুঝি ভাল কাপড় পরে? লোকের বাড়ী যেতে হ'লে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যেতে হয়।

মণি। সে যারা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন, তাদে দরকার।"

দিদি। আর তুই বুঝি স্বর্গের বিদ্যাধরী?

মণি। তা না হলেও নেহাৎ খাওড়াতলার পেত্নী নই।

মণির মুখের উপর ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দিদিমা বলিলেন, "যা হোক্ মেয়ে তুই মণি, আর কো গুণ না থাক্, কথা খুব শিখেছিস্।"

দিদিমার রাগ দেখিয়া অগত্যা মণি কাপড় গহনা পরিল।

ঊনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

বিনোদ একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। উঠিতে বসিতে পারিত, চলাফেরা করিতে পারিত না। ডাক্তারেও চলাফেরা করিতে নিষেধ করিয়াছিল। বিনোদ প্রায় শুইয়া থাকিত। যখন নিতান্ত বিরক্তি-বোধ হইত, তখন হয় বালিস ঠেশান দিয়া বসিত, নয় ধীরে ধীরে গিয়া টেবিলের পাশে চেয়ারের উপর বসিয়া থাকিত। কিন্তু বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিত না; কিছুক্ষণ থাকিয়াই আবার আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িত।

পুত্রের আরোগ্যলাভে অন্নপূর্ণার যে আনন্দের সীমা ছিল না, ইহা বলাই বাহুল্য। বিনোদের অসুখ যখন বাড়াবাড়ি, তখন যত দেবতা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল, সকলকেই কিছু না কিছু মানত করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সকল মানত শোধের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। যে দিন বিনোদ পথ্য পাইবে, সেই দিন তিনি গৃহদেবতা কালীর কাছে বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া আসিবেন, সত্য-নারায়ণের সিন্নী দিবেন। রামজয় মুড়াগাছার বিশালাক্ষীকে পাঁঠা দিয়া পূজা দিয়া আসিবে। পাঁঠাটা রামজয়ই মানত করিয়াছিল। অন্নপূর্ণা ছাগশিশু হত্যায় রাজি ছিলেন না। পূজার অন্যান্য খরচ অন্নপূর্ণা দিবেন, পাঁঠাটা রামজয় নিজের টাকায় কিনিয়া দিবে। রামজয়ও গোস্বামীর শিষ্য, কিন্তু প্রাণের দায়ে অনেক সময় বৈষ্ণবকে শাক্ত এবং শাক্তকে বৈষ্ণব হইতে হয়। "আতুরে নিয়মো নাস্তি।"

ত্রিপুরাসুন্দরী ও মণি বাড়ীতে উপস্থিত হইলে অন্নপূর্ণা সাদরে তাঁহাদিগকে বসাইলেন। মণি সেখানে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া উঠিল এবং এ-ঘর সে-ঘর দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। মণি এ বাড়ীতে নূতন আসিয়াছিল।

একটা ঘরের দরজায় পা দিয়াই মণি চমকিয়া উঠিল। দেখিল, ঘরের ভিতর বিনোদ শয্যার উপর বালিসে হেলান দিয়া বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া মণি সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল; সেখান হইতে পলাইবে কি দাঁড়াইয়া থাকিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পলাইবার জন্য সে একটা পা পিছন দিকে বাড়াইল, কিন্তু বিনোদকে সে দিকে চাহিতে দেখিয়া আর পা বাড়াইতে পারিল না। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনোদ ধীরে ধীরে বলিল, "কে, মণি?"

মণির মুখখানা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, "কখন্ এলে?"

মুখ না তুলিয়াই মণি উত্তর দিল, "এই একটু আগে।"

বিনোদ। দিদিমা এসেছেন বুঝি?

মণি। হাঁ।

বিনোদ। মা'র সঙ্গে দেখা হয়েছে?

মণি। হয়েছে।

একটু থামিয়া বিনোদ বলিল, "তা ওখানে-দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে এস।"

মণি ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইল। বিনোদ চুপ করিয়া রহিল, মণির মুখেও কথা নাই। গৃহ নীরব নিস্তব্ধ; কেবল দেওয়ালে ঝুলান ঘড়িটা টিক্ টিক্ শব্দে গৃহের এই অস্বাভাবিক নীরবতা ভঙ্গ করিতে লাগিল।

কিন্তু এমন চুপ করিয়া বেশীক্ষণ থাকা যায় না। মণি টেবিলের গায়ে বাঁ হাতটা বুলাইতে বুলাইতে ধীরে ধীরে বলিল, "আপনার খুব অসুখ হয়েছিল, না?"

বিনোদ বলিল, "হাঁ, খুব বেশী অসুখই হয়েছিল, যাবারই কথা। তা মা যেতে দিলেন না।"

মণি বলিল, "আপনার এরি মধ্যে যাবার এত সাধ কেন?"

রোগশীর্ণ অধরে ম্লান হাসি হাসিয়া বিনোদ বলিল, "যাবার আর সাধ অসাধ কি? সাধ থাকলেও যেতে হবে, না থাকলেও যেতে হবে। যখন যেতেই হবে, তখন সকাল সকাল যাওয়াই ভাল।"

কথা কহিতে কহিতে মণির ক্রমে সাহস হইতে-ছিল। সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনার দেখ্‌ছি বৈরাগ্য হয়েছে।"

বিনোদও হাসিয়া বলিল, "কিন্তু সেটা স্থায়ী নয় এই যা দুঃখ।"

মণি। আপনার এত কি দুঃখ যে, তার জন্য এরি মধ্যে স্থায়ী বৈরাগ্য চান?

বিনোদ। মানুষের দুঃখটাই সব, সুখ খুব অল্প। মানুষ যদি একবার নিজের অবস্থা ভেবে দেখে, তা হ'লে সে বৈরাগ্য ছাড়া আর কিসেও সুখ দেখ্‌তে পায় না। "বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।"

মণি। যত সুখ বুঝি ঐ ঝুলি-কাস্থার ভিতর?

বিনোদ। ঝুলি-কাস্থা বাইরের বৈরাগ্য, মনের বৈরাগ্যে ও-সকল থাকে না।

বিনোদ আর বসিতে পারিল না, শুইয়া পড়িয়া অবসন্নভাবে চক্ষু মুদিত করিল। মণি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর ঘরের ভিতর ঘুরিয়া ছবি দেখিতে লাগিল।

দেওয়ালে কয়েকখানা ছবি ছিল। ছবিগুলা

সবই বিলাতী। কোনটা জঙ্গলে বাঘ শীকারের ছবি; কোনটা সাগরতীরে সূর্য্যাস্তের মনোরম চিত্র; কোনখানা বা শ্যামবনানী-বেষ্টিত শান্ত পল্লীর মনোমুগ্ধকর প্রতিকৃতি। সম্মুখের দেওয়ালে মানবকঙ্কালের একখানা বৃহৎ চিত্র। সে চিত্র দেখিয়া মণি শিহরিয়া উঠিল। তাহারই পাশে একখানি ছোট ফটো। ফটোখানা একটি লজ্জা-নম্রা কিশোরীর। মণি দাঁড়াইয়া একমনে ফটোখানা দেখিতে লাগিল।

পশ্চাতে মৃদু হাসির শব্দ শুনিয়া মণি ফিরিয়া চাহিল। বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, "ধ্যানস্থ হয়ে কি দেখছ?"

মণি। দৃষ্টি ফিরাইয়া ছবিখানার দিকে চাহিয়া বলিল, "এখানা বোধ হয় আপনার—"

তাহার কথা শেষ না হইতেই বিনোদ বলিল, "আমার স্ত্রীর ফটো।"

মণি। আপনার স্ত্রী সুন্দরী ছিলেন।

বিনোদ। শুধু সুন্দরী নয়, গুণবতীও ছিলেন।

ঈষৎ হাসিয়া মণি বলিল, "আপনি এখনও আপনার স্ত্রীকে ভালবাসেন?"

বিনোদ। ভালবাসার এখন তখন নাই, চিরকাল থাকে।

মণি। শুনতে পাই, আপনার (একটু থামিয়া) আপনার বিয়ের চেষ্টা চল্‌ছে।

বিনোদ। তুমি মিথ্যা শোন নাই।

শ্লেষপূর্ণস্বরে মণি বলিল, "বিয়ের পরেও বোধ হয় আপনার এই ভালবাসা ঠিক এম্‌নি থাকবে?"

দৃঢ়স্বরে বিনোদ বলিল, "মরণের পরও যদি ভালবাসার অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তবে বোধ হয়, তখনও থাকবে।"

মণি বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে বিনোদের মুখের দিকে চাহিল; বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, "তবু আপনি আবার বিয়ে করবেন?"

প্রশান্তস্বরে বিনোদ বলিল, "হাঁ।"

মৃদু হাসিয়া মণি বলিল, "আপনার ভালবাসাটা কিছু নূতন রকমের বটে!"

বিনোদ। কি রকম?

মণি। শুনেছি, যে যাকে ভালবাসে, তাকে সুখী করবার চেষ্টা করে।

বিনোদ। সেটা ঠিক।

মণি। আপনি কিন্তু এই স্ত্রীর জীবিত অবস্থায়—

চমকিত হইয়া মণি দেখিল, বিনোদের মুখমণ্ডল সহসা বিষাদের গাঢ় ছায়ায় আবৃত হইয়াছে। মণি কিন্তু থামিল না; সে পূর্ব্বাপেক্ষা বরং একটু কঠিন স্বরে বলিতে লাগিল, "এই স্ত্রীর জীবিত অবস্থায় আবার আপনি বিয়ে কর্‌তে উদ্যত হয়েছিলেন?"

বিনোদ। হাঁ।

মণি। আপনি আবার বিয়ে কর্‌লে ইনি বোধ হয়, ঠিক সুখী হতেন না?

ধীর-গম্ভীরস্বরে বিনোদ বলিল, "তুমি আমার স্ত্রীকে চিন্‌লে এ কথা বল্‌তে না।"

মণি একটু শ্লেষের হাসি হাসিল। বিনোদ বালিসের নীচে হইতে চাবী বাহির করিয়া মণির দিকে ছুড়িয়া দিল। বলিল, "ড্রয়ারটা খোল।"

মণি ড্রয়ার খুলিল। বিনোদ বলিল, "সাম্‌নের ঐ বাঁধান খাতাখানা দাও।"

মণি খাতাখানা আনিয়া বিনোদের কাছে রাখিল। বিনোদ উঠিয়া বসিল; এবং খাতার পাতা উল্‌টাইয়া একখানা চিঠি বাহির করিল। চিঠিখানায় নিজে একবার চোখ বুলাইয়া মণির হাতে দিয়া বলিল, "পড়।"

বিনোদ আবার শুইয়া পড়িল; মণি চিঠিখানা দুই হাতে ধরিয়া মনে মনে পড়িতে লাগিল। বিনোদ বলিল, "হেঁকে পড়।"

মণি একটু ইতস্ততঃ করিয়া ধীরে ধীরে পড়িতে লাগিল,—

"শ্রীচরণেষু,

পোড়া মেয়েমানুষের মন, যাতে বারণ, সেই কাজই কর্‌তে চায়। মনকে এত বোঝালাম, শুন্‌লে না, তোমাকে চিঠি না লিখে থাক্‌তে পার্‌লেম না। রাগ কোরো না, তুমি পুরুষমানুষ, আর আমি অবুঝ মেয়েমানুষ।

কিন্তু তুমি বুদ্ধিমান্ পুরুষ হয়েও এমন অবুঝের কাজ কচ্চো কেন? আমি এত কি অপরাধ করেছি যে, এমন শাস্তি দিচ্চ? আমাকে ত্যাগ করাতেও কি সে শাস্তি পূর্ণ হয় নি? তাই আরো দুঃখ—আরো শাস্তি দেবার সঙ্কল্প করেছ? মনে করেছিলাম, আমার তো আর অন্য কোন সুখ নাই, তুমি সুখে আছ শুন্‌লে তবু একটু সুখী হব। সে সুখটুকুতেও আমাকে বঞ্চিত ক'রে রাখ্‌বে?

বল, আমাকে কোন্ কঠিন দিব্য ক'রে বল্‌তে হবে যে, তুমি বিয়ে কর্‌লে আমি সত্যই সুখী হব? কি প্রমাণ দেখালে বুঝবে যে, তোমার বিয়ে হয়েছে শুন্‌লে আমার সুখের সীমা থাকবে না? আমি ম'লে বিয়ে করবে? বল, আমি মরি। আত্মহত্যা পাপ, কিন্তু তোমার সুখের জন্য আমি কোন্ পাপের ভয় করি?

দাদা মায়ের কাছে চ'লে গেছেন। বাবা যেন পাগলের মত। তিনি শীঘ্রই দেশ ত্যাগ কর্‌বেন। আমিও যাব। কোথায় যাব, ঠিক নাই। তুমি জেনো, আমি মরেছি। আমার নাম পর্য্যন্ত ভুলে যেও। তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা-সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই। কথাটা মনে কর্‌তে এখনো চোখে জল আসে। কত দিনে এ দুর্ব্বলতাটুকু যাবে? যাবে কি না, জানি না। যদি কখনো যায়, তখন পারি তো তোমার সঙ্গে আবার দেখা করার চেষ্টা কর্‌বো। তার আগে নয়।

মাকে আমার প্রণাম জানিও। তোমাকেও আমার এই শেষ প্রণাম।

দাসী উমা।"

পত্র পড়িতে পড়িতে মণি চোখের জল রাখিতে পারিল না। পত্র শেষ করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, "আপনার স্ত্রী দেবী।"

বিনোদ কোন উত্তর করিতে পারিল না; উত্তর করিবার শক্তি তখন তাহার ছিল না। সে শুধু জল-ভরা দৃষ্টিতে সম্মুখবর্ত্তী ফটোখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

মণি বলিল, "কিন্তু এমন স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে, এমন ভালবাসার অবমাননা ক'রে আবার আপনি বিয়ে কর্‌বেন?"

স্থিরকণ্ঠে বিনোদ উত্তর করিল, "হাঁ।"

মণি জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে বিনোদের মুখের দিকে চাহিল। বিনোদ বলিল, "এই স্ত্রীর চেয়েও, এই ভালবাসার চেয়েও আর একটা উঁচু জিনিস আছে মণি।"

মণি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি?"

গাঢ়স্বরে বিনোদ বলিল, "মা।"

মণি দেখিল, ভক্তির মহিমায় বিনোদের রোগ-মলিন মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মণি শ্রদ্ধা-পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার সেই মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

মণিকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা যে রমানাথের ছিল না, এমন নয়, কিন্তু সে ইচ্ছাটাকে সে জোর করিয়াই চাপিয়া রাখিয়াছিল, বাহিরে একটুও প্রকাশ পাইতে দেয় নাই। কেবল বাহিরে কেন, মনের ভিতরেও যদি কখন সে ইচ্ছাটা জাগিয়া উঠিত, তবে রমানাথ মনকে ধমক দিয়া তাড়াতাড়ি তাহা চাপিয়া যাইত। ছি ছি, মনটা কি উন্মাদ! কি চঞ্চল। রমানাথের ইচ্ছা হইত, এই চঞ্চল মনটাকে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া উপযুক্ত শাস্তি দেয়। ছি ছি, মণি শুনিলে কি মনে করিবে? মণির কাছে সে এতটা স্বার্থপর বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে? রমানাথের মন কখন টলিত, কিন্তু সঙ্কল্প টলিত না। মনের অনুরোধে তো টলিতই না, দিদিমার অনুরোধেও তাহা টলিল না। সে সমান উপেক্ষার সহিত জানাইয়া দিল যে, মণিকে বিবাহ করিবার জন্য সে আদৌ উৎসুক নহে।

কিন্তু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে উত্ত্যক্ত হইয়া রমানাথ যে দিন হঠাৎ আপনার মনের কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিল, সে দিন যেন রমানাথের আজীবন সযত্নে রক্ষিত ধৈর্য্যের বাঁধন মুহূর্ত্তে সমূলে ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সে এমনই ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল যে, সে যেন মণিকে বিবাহ করিবার জন্য সারাজীবন উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, মণিকে পাইবার আশায় যুগযুগান্তর ধরিয়া কঠোর সাধনা করিয়া আসিতেছে। দিদিমা তাহার ঔৎসুক্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, মণির বিস্ময়ের সীমা রহিল না। পাড়াপ্রতিবাসীরা শুনিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "ঘরেই যখন বর আছে, তখন মেয়েকে এত বড় করিয়া রাখিবার কি দরকার ছিল?"

দরকার যে কি ছিল, তাহা রমানাথ ছাড়া আর কেহ জানিত না, সুতরাং কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না।

মহেশ চক্রবর্ত্তী রায় মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বুঝ্‌লেন কি না রায় মশায়, এই জন্যেই ছোঁড়ার আমার গণেশকে পছন্দ হ'লো না। ও ছোঁড়া আমার গণেশের চেয়ে সুপাত্র কি না! গণেশ একটা, বুঝলেন কি না, তবু পাশ করেছে, আর ও, বুঝলেন কি না; আকাট মুর্খ। ছি ছি! বেজ মুখুয্যের নাতনী শেষে, বুঝ্‌লেন কি না, এমন একটা আকাটের হাতে পড়্‌লো! বুড়ীটারই বা কি আক্কেল?"

রমানাথ এ দিকে বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলিল। শ্রাবণের সতরই বিবাহের দিন স্থির হইল; তাহার এ দিকে পাঁচই ছাড়া আর দিন ছিল না। কিন্তু পাঁচই তো কাল। ইহার মধ্যে কি বিবাহের আয়োজন হইতে পারে? কিন্তু ইহার বারোটা দিনের মধ্যে কি আর একটাও দিন ছিল না? রমানাথ পঞ্জিকাকারের উদ্দেশ্যে একটা কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া মনের রাগ মিটাইল। তার পর দিদিমার সহিত যুক্তি করিয়া খরচের একটা ফর্দ্দ করিয়া ফেলিল। কলিকাতায় সেভিংব্যাঙ্কে টাকা জমা ছিল। দিদিমাকে অন্যান্য উদ্যোগ করিতে পরামর্শ দিয়া রমানাথ টাকা

আনিবার ও বাজার করিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিল।

কলিকাতায় পৌছিয়া রমানাথ প্রথমে মেসে গেল। মেসের বন্ধুবান্ধবেরা রমানাথের বিবাহ শুনিয়া উল্লাস প্রকাশ করিল এবং এই উৎসব উপলক্ষে রমানাথ কিরূপ ভোজ দিবে, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

রমানাথ কিন্তু কেবল মেসের এই কয়েকটি বন্ধুকে আপনার বিবাহ-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া সম্পূর্ণ তৃপ্তি পাইল না, আরও পাঁচ জনের নিকট প্রাণের এই অধীর আনন্দোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতায় তাহার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা বেশী ছিল না। মেসের বন্ধুবর্গ ছাড়া আফিসের দুই এক জন কেরাণী ছিল; আর ছিল উমার পিতা বিপ্রদাস। রমানাথ বিপ্রদাসের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

বিপ্রদাস তখনও আফিস হইতে ফেরেন নাই। উমা তাহাকে যত্ন করিয়া বসাইল, জল খাওয়াইল, পান-তামাক দিল। রমানাথ তাহাকে আপনার আসন্ন বিবাহের সংবাদ দিল, এবং বিবাহের সময় তাহাকে বাড়ীতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। উমা কোন উত্তর দিল না, শুধু নতমুখে একটু হাসিল। তখন রমানাথ সন্ধ্যার পর আসিয়া তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া উঠিল। উমা রাত্রিতে তাহাকে এখানে আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিলে রমানাথ সোৎসাহে তাহাতে সম্মতি দিয়া প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যার পর রমানাথ আসিয়া বিপ্রদাস বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে বিপ্রদাস বাবু বলিলেন, "কি হে, এত লম্বা লম্বা ছুটী নিচ্ছ যে? সাহেব যে রেগে আগুন।"

রমানাথ অবজ্ঞার সহিত উত্তর করিল, চুলোয় যাক্ সাহেব। সাহেব রাগবে ব'লে বিয়ে করব না? কাল আবার যাচ্ছি, সাত দিনের ছুটী চাই।"

বিপ্রদাস বলিলেন, "তা হ'লেই চাকরীর দফা গয়া।"

রমানাথ জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "গয়াই হোক্, আর কাশীই হোক্, আমার ছুটী চাই।"

বিপ্র। এবার হয় তো একেবারে ছুটী দিয়ে দেবে।

রমা। একেবারেই হোক্ আর দু'বারেই হোক্, ছুটী যোদ্দা চাই। বিয়েটা তো করতে হবে।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিলেন, "তুমি এত বিয়েপাগলা হ'লে কত দিন?"

রমানাথ বলিল, "আমি পাগল চিরকালই। দিদিমা কথায় কথায় আমাকে পাগল বলে। তবে এ পাগলামীটা দিনকতক হয়েছে।"

বিপ্র। সেই ঘরাঘরিই যখন বিয়ে করবে, তখন এত দেরী করলে কেন?

রমানাথ একটু রাগতভাবে বলিল, "আমি কি বিয়ে করবার জন্য ধন্না দিয়ে পড়েছিলাম! পাত্র যখন জুটলো না, তখন কি করি? আর সেই ধর, আমাকেও তো একটা বিয়ে করতে হবে।"

অতঃপর রমানাথ বসিয়া বসিয়া মণির বিবাহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টার কথা, আপনার সম্পত্তি ও মোকদ্দমার কথা, দ্বিতীয় পক্ষের পাত্রের কথা, বিনোদের মাতার বিবাহ-প্রস্তাবের কথা, তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করার কথা, সকল কথাই একে একে বলিল। শুনিয়া বিপ্রদাস বলিলেন, "এই তুমি সেবারে বিনোদের সঙ্গে বিয়ে দিবার জন্য ঝুঁকেছিলে, আবার জবাব দিলে কেন?"

বিপ্রদাসের হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া তাহাতে একটা টান দিয়া রমানাথ বলিল, "কি জান দাদা, ছেলেটি ভাল দেখেই রাজি হয়েছিলাম, কিন্তু শেষে দেখলাম, ওরা লোক বেশ ভাল নয়। এক তো আগেকার বৌটাকে তাড়িয়ে দিলে, তার একটা খোঁজখবরও নিলে না। তার উপরে সেবারে মুখের উপর এমন জবাব দিয়ে গেল যে—"

বিপ্রদাস একটা দুর্গন্ধ অনুভব করিয়া উমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "উমা কি উপরে? তরকারীটা বোধ হয় ধ'রে গেল।"

উমা উপরে ছিল না, রান্নাঘরে উনানের সম্মুখেই বসিয়া ছিল। পিতার আহ্বানে চমকিত হইয়া সে তাড়াতাড়ি হাঁড়িতে জল ঢালিয়া দিল। রমানাথ হুঁকায় শেষ টান দিয়া তাহা বিপ্রদাসের হাতে দিতে দিতে বলিল, "বিনোদের যে খুব অসুখ।"

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অসুখ?"

রমানাথ বলিল, "তা ঠিক জানি না, তবে দু'জন ডাক্তার না কি দেখছে। শুনলাম—"

বিপ্রদাস উৎকণ্ঠাপূর্ণ দৃষ্টিতে রমানাথের মুখের দিকে চাহিলেন। রমানাথ বলিল, "শুনলাম, ব্যারামটা খুব শক্ত, এ যাত্রা রক্ষা পায় কি না—"

রান্নাঘরের ভিতর একটা বিকট ঝন্-ঝন্ শব্দ হইল। রমানাথ বলিল, "কি পড়লো?"

বিপ্রদাস কোন উত্তর দিলেন না, গম্ভীরভাবে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

আহারান্তে রমানাথ চলিয়া গেলে উমা আসিয়া পিতার পায়ের কাছে বসিল। বিপ্রদাস চক্ষু মুদ্রিত

করিয়া শয্যার উপর পড়িয়া ছিলেন, ঘুমান নাই। উমা আসিয়া বসিলে, তিনি চোখ মেলিয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন; ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাওয়া হয়েছে ?"

উমা নতমুখে মৃদুস্বরে বলিল, "ক্ষিদে নাই।"

বিপ্রদাস চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। উমা পিতার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। হাত বুলাইতে বুলাইতে উমা মৃদুকম্পিতস্বরে ডাকিল, "বাবা!"

চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বিপ্রদাস স্নেহকোমলকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "কেন মা ?"

উমা কোন কথা বলিল না, কিন্তু বিপ্রদাস যেন পায়ে দুই ফোঁটা তপ্ত জলের স্পর্শ অনুভব করিলেন। বিপ্রদাস ধীরে ধীরে বলিলেন, "অসুখ হয়েছে, সেরে যাবে, তার জন্য ভয় কি ?"

উমা নীরব। বিপ্রদাস একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাবি ?"

উমা নীরবে পিতার পায়ে ঘন ঘন হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিল। বিপ্রদাস বলিলেন, "কিন্তু এখন হঠাৎ যাওয়াটা কি ভাল দেখায় ?"

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে উমা বলিল, "এখন কি ভাল মন্দ বিবেচনার সময় আছে বাবা ?"

একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিপ্রদাস বলিলেন, "কিন্তু এত কাল পরে কি তোর যাবার সময় হ'লো ?"

উমা নীরবে বসিয়া আঁচলে চোখ মুছিল। বিপ্রদাস স্নিগ্ধসান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, "কাঁদিস্ না মা, কাল আফিসে ছুটী নিয়ে পরশু যাব।"

উমা বলিল, "ছুটী কি না নিলেই নয় বাবা ?"

বিপ্রদাস বলিলেন, "ছুটী না নিলেই কি চাকরী থাকবে মা ? বিশেষ কাল পেমেণ্টের দিন। যেতে হ'লে টাকা-কড়ি চাই তো।"

উমা ধীরে ধীরে উঠিয়া শুইতে গেল।

পরদিন বিরাজ শুনিয়া বলিল, "কি লো, বরণ করতে যাবি না কি ?"

চোখের জলের সঙ্গে ঠোঁটে হাসি আনিয়া উমা বলিল, "তাই আশীর্ব্বাদ কর্ ভাই, যেন বিয়ে দিয়েই হাস্‌তে হাস্‌তে ফিরে আস্‌তে পারি।"

ভ্রূকুটী করিয়া বিরাজ বলিল, "বরণ আর কি, ফিরে আস্‌বি কেন ? ভগবান্ করুন, যেন সেই ঘরেই জন্ম জন্ম থাকিস্।"

উমা বলিল, "আমি তো এত সুখ চাই না ভাই ?"

বিরাজ বলিল, "চাস্ কি না চাস্, দেখা যাবে। তবে এই অভাগীটাকে যেন ভুলে যাস্ না।"

বিরাজের চোখ দিয়া টস্-টস্ করিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। উমার চোখ তো জলে ভরাট ছিল।

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

বিনোদকে দেখিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী মণির সহিত বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, বাহিরে বৈঠকখানায় একটি অপরিচিত লোক বসিয়া আছে। ত্রিপুরাসুন্দরী মাথার কাপড়টা কপাল পর্য্যন্ত টানিয়া দিলেন, মণি বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে চাহিল। তাহাদিগকে দেখিয়াই আগন্তুক তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ত্রিপুরাসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছেন না মা, আমি দীনেশ।"

দীনেশ আসিয়া ত্রিপুরাসুন্দরীর পায়ের কাছে মাথা নোয়াইল। ত্রিপুরাসুন্দরী মুঠা-করা ডান হাতটা কপালের কাছ পর্য্যন্ত তুলিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। জামাতাকে দেখিয়া তাঁহার বিস্মৃতপ্রায় কন্যাশোক যেন উথলিয়া উঠিল; কষ্টে তাহা রোধ করিয়া, মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া অশ্রুসজলকণ্ঠে বলিলেন, "সব ভাল তো বাবা ?"

দীনেশ বলিল, "হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে এক রকম মন্দ নয়। তবে ছেলেপিলের অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। আজ কত দিন ধ'রে আসি আসি কর্‌ছি, কিন্তু আসা আর ঘ'টে উঠে না। নানান্ ঝঞ্ঝাট।"

কথা শেষ করিয়া দীনেশ জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে মণির দিকে চাহিল। ত্রিপুরাসুন্দরী মণির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "গড় কর্ মণি, তোর বাবা।"

মণি বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার পিতার মুখের দিকে, আরবার দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে গিয়া পিতৃপদে প্রণত হইল। দীনেশ তাহার মাথায় হাত দিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে বলিল, "এস মা এস, রাজরাণী হও।"

ত্রিপুরাসুন্দরী জামাতাকে লইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। মণি আসন পাতিয়া পা ধুইবার জল আনিয়া দিল। দীনেশ পা ধুইয়া আসনে বসিলেন, এবং মণিকে তাহার কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, এত কাল কন্যাকে দেখিতে না আসার কারণ সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যা-মিশ্রিত নানারূপ কৈফিয়ৎ দিয়া আপনার পিতৃস্নেহের পরিচয় দিতে লাগিলেন। মণি কিন্তু হুঁ হাঁ ছাড়া বেশী কথা বলিতে পারিল না। যাহাকে জীবনে

কখন দেখে নাই, পিতা হইলেও তাহার সহিত কথা কহিতে কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। কথা কহিবার ইচ্ছা থাকিলেও কহিতে পারিল না। সে পিতাকে পান-তামাক দিয়া রন্ধনশালায় দিদিমা'র কাছে গিয়া বসিল।

ত্রিপুরাসুন্দরী তখন জামাতার আহারের জন্য রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিলেন। মণিকে আসিয়া বসিতে দেখিয়া বলিলেন, "চলে এলি যে, বাপের কাছে একটু বোস্ না।"

মণি বলিল, "লজ্জা করে।"

ত্রিপুরাসুন্দরী সহাস্যে বলিলেন, "দূর ছুঁড়ী, বাপের কাছে আবার লজ্জা?"

মণি সে কথার কোন উত্তর না দিয়া উনানে জ্বাল দিতে বসিল।—কিছুক্ষণ পরে বলিল, "কেন এলো দিদিমা?"

দিদিমা বলিলেন, "কথা শোন, বাপ মেয়েকে দেখ্‌তে আস্‌বে না?"

মণি বলিল, "কৈ, এত দিন তো আসে নি।"

দিদি। এত দিন আসে নি ব'লে আজ কি আস্‌তে নাই? সংসারী লোক, কাজের গোলযোগে আস্‌তে পারে নি।"

মণি আর কোন কথা বলিল না, উনানের পাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বাস্তবিক যে দীনেশচন্দ্র এত দিন কাজকর্ম্মের গোলযোগেই আসিতে পারেন নাই, আর আজ সব গোলযোগ মিটিয়া যাওয়ায় আসিয়াছেন, তাহা নহে। আগেই বলা হইয়াছে, প্রথমা স্ত্রী অপর্ণাকে ত্যাগ করিয়া তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। সে বিবাহের পূর্ব্বেই অপর্ণা স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। তার পর অল্পদিনের মধ্যেই সে মারা গেল। দীনেশও প্রথম পক্ষের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ লইয়া সংসার পাতিয়া বসিলেন। প্রথম পক্ষের যে একটা মেয়ে আছে, এ কথা তাঁহার মনেই রহিল না। কচিৎ মনে হইলেও তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাতের আবশ্যকতা অনুভব করিতেন না। দ্বিতীয় পক্ষের অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি তখন তাঁহার স্বভাবতঃ উৎসারিত পিতৃস্নেহের চারিপাশ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এইরূপে যখন দিন চলিতেছিল, তখন সহসা এক দিন মহেশ চক্রবর্ত্তী গিয়া তাঁহার পিতৃস্নেহের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিলেন। দীনেশ যখন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রথম পক্ষের কন্যা অরক্ষণীয়া হইয়া পিতৃপুরুষগণের নরকের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে এবং পরিশেষে কুলমর্য্যাদাবিহীন একটা হতভাগ্য সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার কুলমর্য্যাদার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, তখন তাঁহার চিরসুপ্ত পিতৃস্নেহ সহসা উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিল। কন্যার ভাবী মঙ্গলের ইচ্ছায় এবং কৌলীন্যমর্য্যাদা রক্ষার জন্য তিনি সকল কাজ ফেলিয়া সত্বর কন্যাকে দেখিতে ছুটিলেন।

মহেশ চক্রবর্ত্তীর এই অযাচিত পরোপকার-প্রবৃত্তির একটু কারণও ছিল। তিনি যখন দেখিলেন, তাঁহার মত লোকের পুত্রকে উপেক্ষা করিয়া পাঁচ জনের কাছে তাঁহাকে নিতান্ত হেয় করিয়া দিয়া, রমানাথ নিজেই ব্রজ মুখুয্যের নাতনীকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন সহসা তাঁহার পরোপকার-প্রবৃত্তিটা প্রবল হইয়া উঠিল। মেয়েটার এবং মেয়ের বাপের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বেড়গাঁয়ে দীনেশ গাঙ্গুলীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় দীনেশকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যদিও দীনেশ এ যাবৎ কন্যার সহিত কোন সম্বন্ধই রাখেন নাই, তথাপি কন্যার বিবাহে তাঁহার উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে চলিবে না। কেন না, কন্যা অপাত্রে পতিত হইলে তজ্জন্য পিতাকে ধর্ম্মতঃ দোষের ভাগী হইতে হইবে। শাস্ত্রে আছে—"পিতৃদত্তা কন্যা, রাজদত্তা ভূমি।" বিশেষতঃ কন্যার বিবাহের উপরেই পিতার কুলমান সম্পূর্ণ নির্ভর করে। রমানাথের পিতামহ গাঁইহাটীর রায়েদের ঘরে বিবাহ করিয়া স্বকৃতভঙ্গ হইয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্রের সহিত কন্যার বিবাহ হইলে দীনেশের আর স্বভাবত্ব থাকিবে না। অধিকন্তু তাঁহার চতুর্দ্দশ পুরুষ তাঁহাকে নিদারুণ অভিশাপ প্রদান করিতে করিতে নিরয়গামী হইবেন। সুতরাং কন্যাকে সৎপাত্রগতা করা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরোপকার-চেষ্টা নিষ্ফল হইল না। দীনেশের দ্বিতীয় পক্ষের সহিত তাঁহার একটু আত্মীয়তার গন্ধ ছিল। সুতরাং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথায় দীনেশ "আচ্ছা, দেখি, চেষ্টা করুবো" ইত্যাদি ফাঁকা মত প্রকাশ করিলেও দ্বিতীয় পক্ষের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। প্রথম পক্ষের কন্যাকে সৎপাত্রস্থা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া তিনি বিলাসপুরে উপস্থিত হইলেন।

সংসারে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ন্যায় পরোপকারী লোকের অভাব নাই। তাঁহাদের পরোপকার-প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মবুদ্ধি দর্শনে অনেক সময় ধর্ম্মকেও হতবুদ্ধি হইতে হয়।

আহারে বসিয়া দীনেশ শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, "মা, মেয়েটি তো দেখ্‌ছি বড় হয়ে উঠেছে।"

ত্রিপুরাসুন্দরী রন্ধনশালার দ্বারপ্রান্তে বসিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "তা হয়েছে বৈ কি বাবা, শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে গেল চোতে পনরয় পা দিয়েছে।"

দীনেশ মুখের নিকট আনীত ভাতের গ্রাসটা হাতে রাখিয়াই যেন অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "বলেন কি, পনরো! তা হবে বৈ কি, সে কি আজকার কথা; বোধ হয়, তের-শো সাল, আর আজ তের-শো পনেরো।"

ত্রিপুরাসুন্দরী জামাতার অলক্ষিতে আঁচলে চোখ মুছিলেন। দীনেশ ভাতের গ্রাসটা মুখে দিয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে বলিলেন, "তা হ'লে আর তো রাখা যায় না।"

ত্রিপুরাসুন্দরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আর কি রাখা যায়, না, রাখা উচিত। কেবল পয়সার অভাব আর ছেলের অভাবেই এত দিন হয়ে ওঠে নি।"

ঈষৎ গর্ব্বস্ফীতকণ্ঠে দীনেশ বলিলেন, "ছেলের অভাব? স্বভাব দীনেশ গাঙ্গুলীর মেয়ে, কত কুলীনের বেটা কুলীন এসে পায়ে ধ'রে মেয়ে নিয়ে যাবে।"

ত্রিপুরাসুন্দরী নীরবে বসিয়া আঙুল দিয়া মাটীতে দাগ কাটিতে লাগিলেন। দীনেশ বলিলেন, "যাক্, কালই আমি মৃত্যুঞ্জয় ঘটককে ব'লে দিচ্চি। কোন চিন্তা নাই মা, এক হপ্তার মধ্যে যদি না বিয়ে দিতে পারি, তবে আমি শ্রীপতি গাঙ্গুলীর ছেলে নই।"

ত্রিপুরাসুন্দরী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "ঘটকের আর দরকার নাই বাবা, বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে।"

দীনেশ যেন হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক হয়ে গেছে?"

ত্রিপুরা। হাঁ, আসছে সতরই বিয়ে।

দীনেশ। কোথায় হ'লো?

ত্রিপুরা। রমানাথের সঙ্গে।

দীনেশ। রমানাথ?

ত্রিপুরাসুন্দরী তখন রমানাথের সম্পূর্ণ পরিচয় দিলেন। দীনেশ চুপ করিয়া বসিয়া সব শুনিলেন, তার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "উহুঁ।"

ত্রিপুরাসুন্দরী শঙ্কিতভাবে জামাতার দিকে চাহিলেন। দীনেশ মৃদু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "তাও কি হয় মা, ওরা যে ভঙ্গ। ভঙ্গের ঘরে কি স্বভাবের মেয়ে দেওয়া যায়? ভাগ্যে আমি এসে পড়লাম, তা নইলে তো বিয়ে হয়ে যেত, আমার কুল মান সব নষ্ট হ'তো। সর্ব্বনাশ হয়েছিল আর কি, ধর্ম্মই রক্ষা করেছেন।"

ত্রিপুরাসুন্দরী স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন। তখন দীনেশ মণির বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতে উপদেশ দিয়া আহার শেষ করিয়া উঠিলেন। ত্রিপুরাসুন্দরী নিশ্চল নিস্পন্দভাবে দরজায় মাথা দিয়া বসিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মণি আসিয়া ডাকিল, "দিদিমা, ও দিদিমা!"

ত্রিপুরাসুন্দরী চমকিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। মণি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ঘুম ধরেছে দিদিমা?"

ত্রিপুরাসুন্দরী একবার তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইলেন। মণি বলিল, "ভাত দেবে না?"

ত্রিপুরা। নিয়ে খা।

মণি। না, তুমি দাও।

ত্রিপুরাসুন্দরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কঠোর স্বরে "আমি পারব না" বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। মণি অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

বিবাহের বাজার করিয়া রমানাথ একটা বৃহৎ মোট ঘাড়ে লইয়া যখন বাড়ীতে উপস্থিত হইল, তখন অপরাহ্ণ। শ্রাবণের অপরাহ্ণ, আকাশ থম্‌থমে মেঘে ভরা। বৃষ্টি নাই, বিদ্যুৎ নাই, বাতাস নাই, শুধু থম্‌থমে পাণ্ডুর মেঘমালা আকাশের গায়ে জমাট বাঁধিয়া পৃথিবীর মুখখানাকে বিষাদগম্ভীর ছায়ায় ঢাকিয়া দিয়াছে। এমনই সময় রমানাথ মোট-ঘাড়ে বাড়ীতে ঢুকিল এবং মোটটা ধড়াস্ করিয়া দাবার উপর ফেলিয়া ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আপন মনে বলিল, "বাপ, কি ভারী! এ সব মোট বওয়া কি ভদ্রলোকের কাজ? কি করা যায়, বেটা মুটে বলে কি না, এক টাকা নেব। ইস, একটা টাকা মুখের কথা আর কি। কিন্তু ঘাড়টা যেন বেঁকে গেছে। বাপ!"

তার পর ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া ডাকিল, "দিদিমা, ও দিদিমা, ও বাবা, সন্ধ্যে না হ'তেই সব ঘুমিয়ে পড়লো না কি?"

ত্রিপুরাসুন্দরী ঘর হইতে বাহির হইয়া রাগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "কে রে, রমা এলি?"

রমানাথ বলিল, "এলাম বৈ কি। তবু ভাল, তোমরা এই যে ঘুমাও নি।"

দাবার উপর বসিয়া পড়িয়া রমানাথ জামার বোতাম খুলিতে লাগিল। ত্রিপুরাসুন্দরী কোন উত্তর না দিয়া ঘরের ভিতর হইতে একখানা মাদুর আনিয়া পাতিয়া দিলেন। রমানাথ জামাটা খুলিয়া ফেলিয়া মোটের বাঁধন খুলিতে লাগিল। ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "ও সব এখন থাক্; আগে মুখে হাতে জল দে।"

"এই যে দিচ্ছি" বলিয়া রমানাথ মোট খুলিতে লাগিল। মোটের ভিতর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের কিছুই বাদ ছিল না, কাপড়-চোপড় হইতে রন্ধনের ঝাল-মশলা পর্য্যন্ত ছিল। রমানাথ সে সকল একে একে বাহির করিতে করিতে কোন্ জিনিসটা কোথায় কত সস্তায় কিনিয়াছে, দিদিমার কাছে তাহার বিস্তৃত পরিচয় দিতে লাগিল। দিদিমা গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, "বেশ, ভাল" এইরূপ সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রমানাথ কিন্তু তাঁহার এই গাম্ভীর্য্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমে মোটের ভিতর হইতে নান্দীমুখের কাপড়, গামছা বাহির হইল; লঙ্কামরিচ ধ'নে, সুপারি বাহির হইল, টাকায় আটটা হিসাবে দুই টাকার ফজলী আম বাহির হইল; বালাখানার চারি আনা সেরের তামাক বাহির হইল; পানে খাইবার পাথুরিয়া চুণ বাহির হইল; সাবান, এসেন্স, আরসি, চিরুণী, সিন্দুরকৌটা সব একে একে বাহির করিল। এই সকল খুচরা জিনিস বাহির করিয়া রমানাথ একটা কাগজের লম্বা-চওড়া বাক্স বাহির করিল এবং দিদিমার দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিল, "বল দেখি, এতে কি আছে?"

ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "কি জানি, কাপড় বুঝি।"

"হাঁ, বেনারসী শাড়ী" বলিয়া রমানাথ বাক্স খুলিয়া একখানা বেগুণে রঙের শাড়ী বাহির করিল। শাড়ীর বাহার দেখিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমানাথ কাপড়খানা তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "কাপড়খানা একবার দেখ, যেমন জমি, তেমনি কাজ। পঁয়ত্রিশ টাকা নিয়েছে। তবু আলাপী দোকানদার, কেনা দরে দিয়েছে। তা নইলে এর দাম পঁয়তাল্লিশ টাকার একটি পয়সা কম নয়।"

ত্রিপুরাসুন্দরী কাপড়খানা দেখিয়া রমানাথের হাতে ফেরত দিলেন। রমানাথ তাহা বাক্সে তুলিয়া কাগজে মোড়া সেমিজ-বডি বাহির করিল। ত্রিপুরাসুন্দরী একটা মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ও সব এখন রাখ, একটু জল মুখে দে।"

ত্রিপুরাসুন্দরী এক গ্লাস জল এবং কয়েকখানা বাতাসা আনিয়া দিলেন। রমানাথ বলিল, "শুধু জল-বাতাসা দিলে হবে না ক্ষিদেয় নাড়ী চুঁয়ে যাচ্ছে।"

ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "খাওয়া হয় নি না কি?"

ঈষৎ হাসিয়া রমানাথ বলিল, "সকালে তিন পয়সার কচুরী খাওয়া হয়েছিল। বিপ্রদাস বাবুর বাড়ী খেতে যাবার কথা ছিল, তা বাজারে ঘুরতেই সময় গেল, যাবার আর সময় পেলাম কোথায়? খেতে গেলে আজ আর আসা ঘট্‌তো না।"

ত্রিপুরাসুন্দরী ব্যস্তভাবে বলিলেন, "ও বেলার ভাত আছে, দেব? না ভাত চড়াব?"

রমানাথ বলিল, "ভাত চড়িও এর পর, এখন যা আছে, তাই দাও। প্রাণটা বাঁচুক। মণি কোথায়?"

ত্রিপু। ঘরেই আছে।

রমা। তাই হোক, আমি বলি বা শ্বশুরবাড়ী গেছে।

সম্মুখের ঘরখানার দিকে চাহিয়া রমানাথ ডাকিল, "মণি, ও মনোমোহিনি, একবার বেরুতে পারবে কি? একটু তামাক-টামাক পাব?"

মণি ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইল এবং হুঁকা-কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে চলিল। রমানাথ বলিল, "ও তামাক নয়, এই তামাকটা একটু সাজ।"

শালপাতার মোড়কের পাশ দিয়া আঙ্গুল গলাইয়া রমানাথ একটু তামাক বাহির করিয়া মণির হাতে দিল। মণি মাথা নীচু করিয়া গম্ভীর-মুখে হাত পাতিয়া তামাক লইল। রমানাথ বলিল, "ও বাবা, এরি মধ্যে মণির যে লজ্জা, এর পর বোধ হয়, ওর মুখ দেখা ভার হবে।"

রমানাথ হাসিয়া উঠিল। কিন্তু মণি বা দিদিমা কেহই সে হাসিতে যোগ দিল না। বরং দিদিমার মুখখানা আরও একটু গম্ভীর, আরও একটু বিষাদ-মলিন হইল। বিস্মিতভাবে রমানাথ বলিল, "তোমাদের এ কি হ'লো দিদিমা? কারো মুখে কথা নাই, একটু হাসি নাই, ব্যাপার কি?"

মুখ ফিরাইয়া ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "কি আবার? যাই, ভাত বাড়ি।"

তিনি দ্রুতপদে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন, মণি পিছন ফিরিয়া তামাক সাজিতে বসিল। রমানাথ পা ধুইয়া জল খাইল। তার পর মণির দিকে চাহিয়া বলিল, "কাপড় দেখেছিস্ মণি, অনেক বেছে বেছে

পছন্দ করেছি। ফর্সা রঙে বেগুনে রং মানায় ভাল, না?"

মণি কোন উত্তর করিল না, ফিরিয়াও চাহিল না। রমানাথ যেন বিরক্তভাবে বলিল, "তা মানাক আর নাই মানাক, আমি তো এনেছি। তোদের পছন্দ না হ'লো তো বোয়েই গেল। মেয়েমানুষের আবার পছন্দ। হুঁ।"

ত্রিপুরাসুন্দরী ডাকিলেন, "উঠে আয় রমা।"

রমানাথ বলিল, "তামাকটা খাব না?"

ত্রিপু। খেয়ে উঠে তামাক খাস।

রমা। সেই ভাল। বাপ, কি ক্ষিদেটাই পেয়েছে।

রমানাথ উঠিয়া রন্ধনশালার সম্মুখে গেল এবং ভাতের থালার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "উঃ, করেছ কি দিদিমা, আমি আজ আস্‌বো ব'লে কি তোমরা জান্‌তে?"

ত্রিপু। না।

রমা। তবে এত তরকারির ঘটা? রমানাথ ঘরে না থাক্‌লে তোমরা বুঝি এই রকম রাজসই ক'রে খাও?

রাগতভাবে ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "হাঁ, খাই। তুই এখন খেতে বস্‌বি, না দাঁড়িয়ে—"

হাসিতে হাসিতে রমানাথ বলিল, "বস্‌বো কি দিদিমা, আমি তো দেখেই অবাক্ হয়ে গেছি। এ যে বর খাওয়ানর যোগাড়। তা আর দু'টো দিন পরে তো খাওয়াতেই হবে।"

রমানাথ হাসিতে হাসিতে রান্নাঘরের দাবায় উঠিল।

দীনেশ বাবু বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া ডাকিলেন, "মা কোথায় গো?"

রমানাথ বিস্ময়ের সহিত তাঁহার দিকে চাহিল। দীনেশ তাহার দিকে একবার চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন, একটু জোর-গলায় বলিলেন, "সব ঠিক ক'রে এলাম মা। চক্রবর্ত্তী মশায় লোক অতি সজ্জন, টাকার খাঁই নাই। শুধু খরচ-খরচার জন্য দুশো টাকা দিতে হবে। আর মেয়েকে মল, বালা, মাকৃড়ী, চিরুণী। ছেলেও দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ নয়, একটা পাশ করেছে। সর্ব্বাংশেই মণির উপযুক্ত পাত্র।"

মাথা ঘুরিয়া রমানাথ পড়িয়া যাইতেছিল, খুঁটীটা জড়াইয়া ধরিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। দীনেশ বলিতে লাগিলেন, "এই সোমবারেই দিন ঠিক ক'রে এলাম। কাল আশীর্ব্বাদ, পরশু গায়ে হলুদ। আমি একবার ওপাড়া দিয়ে ঘুরে আসি। একটা পান দে মণি।"

মণি হাত ধুইয়া পান আনিয়া দিল। পান হাতে লইয়া দীনেশ আর একবার রমানাথের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। রমানাথ খুঁটী ধরিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ত্রিপুরাসুন্দরী কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "ও মণির বাপ।"

রমানাথ কোন উত্তর দিল না, দিদিমার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

ত্রিপুরাসুন্দরী ডাকিলেন, "রমা!"

রমানাথ নীরব, নিশ্চল, যেন প্রাণহীন চিত্রপুত্তলিকা! ত্রিপুরাসুন্দরী গিয়া তাহার হাত ধরিলেন, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "খাবি আয় রমা, তোর বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।"

ত্রিপুরাসুন্দরীর চোখ দিয়া টস্-টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। রমানাথ ধীরে ধীরে দিদিমার হাত হইতে আপনার হাত ছাড়াইয়া লইয়া রান্নাঘরের দাবা হইতে নামিল এবং মাতালের মত টলিতে টলিতে আসিয়া যেখানে জিনিসপত্রগুলা বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ান ছিল, সেইখানে বসিয়া পড়িল।

মণি তামাক সাজিয়া আনিয়া হুঁকাটা আগাইয়া দিয়া বলিল, "তামাক খাও রমাদা!"

রমানাথ উদাস দৃষ্টিতে একবার মণির মুখের দিকে চাহিল; তার পর তাহার হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া এক পাশে রাখিয়া দিল। মণি মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "রমাদা।"

রমানাথ নিরুত্তর। মণি বলিল, "তাই না রমাদা, তোমার কোন মৎলব ছিল না?"

রমানাথ একবার মণির মুখের দিকে চাহিয়াই মাথা নীচু করিল। মণি বলিল, "কিন্তু বড় দেরী ক'রে ফেল্‌লে। তোমার কপালটা নেহাৎ মন্দ।"

রমানাথ কোন উত্তর দিল না। সে দেয়ালে মাথাটা রাখিয়া হাত দুইটা বুকের উপর জড় করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিল। মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার স্তব্ধ অন্ধকার তাহার দৃষ্টির চারিপাশে জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালে উঠিয়া রমানাথ গৃহমধ্যে শয়ান দীনেশ বাবুকে শুনাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "তা হবে না দিদিমা, এত কাল পরে পিতৃত্বের অধিকার দেখিয়ে মণিকে জলে ফেলে দেবে, তা আমি দেখ্‌তে পারব না। বিনোদের চেয়ে গণেশ চক্রবর্ত্তী সুপাত্র নয়। বিনোদই

মণির উপযুক্ত পাত্র। আমি বিনোদের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক কর্‌তে চল্‌লাম।"

রমানাথ দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

দীনেশ বাবু উঠিয়া বাহিরে আসিলেন; ত্রিপুরা-সুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পাগলটা কি ব'লে গেল?"

বিষাদগম্ভীর স্বরে ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "পাগল নয় দীনেশ, ও রমা।"

একটু হাসিয়া দীনেশ বাবু বলিলেন, "যেই হোক্‌, আমার চেয়ে যে ওর দরদ বেশী দেখ্‌ছি।"

ত্রিপুরাসুন্দরী তীব্র দৃষ্টিতে জামাতার মুখের দিকে চাহিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। দীনেশ বাবু গাড়ু হাতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

মণি কাছে আসিয়া বলিল, "কি দিদিমা, গালে হাত দিয়ে ব'সে যে?"

দিদিমা কোন উত্তর দিলেন না; মণি সহাস্যে বলিল, "কাল তো রমাদার ভাব লেগেছিল, আজ যে তোমার ভাব লাগ্‌ল দেখ্‌ছি।"

দিদিমা মুখ ফিরাইয়া বিরক্তির সহিত বলিলেন, "স'রে যা মণি, আমার আর হাসি-তামাসা ভাল লাগে না।"

ঈষৎ হাসিয়া মণি বলিল, "তবে কি ভাল লাগ্‌বে দিদিমা? একটা গান? একটু নাচ?"

দিদিমা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মণির মুখের দিকে চাহিলেন। মণি বলিল, "তা আর দুটো দিন সবুর কর দিদিমা, দু'দিন পরে খুব নাচ-গান হবে।"

দিদি। দু'দিন পরে আমার শ্রাদ্ধ হবে।

মণি। শুধু তোমার?

দিদি। শুধু আমার হ'লে তো বেঁচে যেতাম। সেই সঙ্গে রমারও যে—

দিদিমা আর বলিতে পারিলেন না, অশ্রুভারে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। মণি বলিল, "তুমি তো বেশ লোক দিদিমা, আমার বিয়ে, কোথায় আমোদ আহ্লাদ কর্‌বে, তা নয়, রমার কি হবে, তাই ভেবে কাঁদ্‌তে বসেছ।"

একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দিদিমা বলিলেন, "আমাকে আর জ্বালাস্‌ না মণি, ছোঁড়া কাল হ'তে কিছু খায় নি, মুখের গ্রাস ফেলে চ'লে এসেছে।"

দিদিমা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মণি কঠোর স্বরে বলিল, "কেন এলো? কে আস্‌তে বল্‌লে? তার কপাল।"

চোখ মুছিয়া, হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া গভীর বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে দিদিমা বলিলেন, "সত্যি মণি, হতভাগা কি কপাল নিয়ে জন্মেছিল!"

দুই ফোঁটা চোখের জল টস্‌ টস্‌ করিয়া মাটীতে পড়িল। হাসিতে হাসিতে মণি বলিল, "অমন কপাল নিয়েও মানুষ জন্মায়? জন্মাতে হয় তো আমার মত কপাল নিয়ে।"

দিদিমা মুখ তুলিয়া বিস্ময়পূর্ণদৃষ্টিতে মণির হাসি-ভরা মুখের দিকে চাহিলেন। এ কি, এ হাসির রেখা, না অন্তররুদ্ধ অশ্রুরাশির উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ! দিদিমা ডাকিলেন, "মণি!"

মণি। কি?

দিদি। তুই হাস্‌ছিস্‌?

মণি। তা নয় তো কি কাঁদছি?

দিদি। হাঁ, তুই কাঁদ্‌ছিস্‌।

মণি দিদিমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল এবং তাঁহার হাঁটুতে মুখটা গুঁজিয়া দিয়া জোর করিয়া বলিল, "না।"

দিদিমা দুই হাত দিয়া জড়াইয়া তাহার মাথাটাকে আপনার বুকের উপর টানিয়া আনিলেন। তখন মণির চোখের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল; দিদিমাও মণির মাথার উপর মুখ রাখিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

রমানাথ বাড়ী ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, "দিদিমা, ও দিদিমা!"

দিদিমা চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন, মণিও ত্রস্তভাবে দিদিমা'র বুক হইতে মুখ তুলিয়া লইল, কিন্তু চক্ষুর জল থামাইতে পারিল না।

রমানাথ কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করিল না; সে বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতলের আঘাত করিয়া হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "কেল্লা মাৎ দিয়া দিদিমা, সব ঠিক। মানুষ বলি তো বিনোদের বাকে। এক-বার দু'ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌তেই একেবারে জল। উঠে পড় দিদিমা, সোমবারেই বিয়ের দিন। কাল সকালেই আশীর্ব্বাদ, বেলা এগারটার মধ্যে গায়ে হলুদ। সব ঠিক-ঠাক। আমি তো বলেছি, রমানাথ শর্ম্মার যে কথা, সেই কাজ।"

দিদিমা স্তম্ভিত দৃষ্টিতে রমানাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমানাথ বলিল, "নাও, উঠে পড়। ঘরে কিছু থাকে তো দাও, ক্ষিদেয় শরীর যেন ঝিম্‌-ঝিম্‌ করুচে। ও কি, হাঁ ক'রে চেয়ে রইলে যে?"

দিদিমা আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তুই কি রমা?"

রমানাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি কি? আমি মানুষ, আমি

হাতী, ঘোড়া, রাক্ষস, খোক্কস, ভূত, প্রেত, পশু, জানোয়ার। বাস্, এখন উঠে পড়। কিছু খেয়ে প্রাণটা বাঁচান যাক। আগে নিজের প্রাণ, তার পর সব। শাস্ত্রেই বলে—"আত্ম রেখে ধর্ম্ম, তবে পিতৃ-কর্ম্ম।"

এত দুঃখের উপরেও দিদিমা না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন রমানাথ মণির দিকে চাহিয়া বলিল, "মণি, একটু তামাক দে। সেই কাল সকালে কলকাতায় তামাক খেয়েছি। তার পর সারা দিন-রাত হুঁকো- কল্কের মুখ দেখি নি।"

মণি ফিক্ করিয়া একটু হাসিল। চোখে জল, ঠোঁটে হাসি; সে হাসিতে যেন রৌদ্রবৃষ্টির অপূর্ব্ব সম্মিলন হইল। আর সে সম্মিলনে রমানাথের মুখে সপ্তবর্ণে চিত্রিত রামধনু ফুটিয়া উঠিল।

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

সকালবেলা হঠাৎ রমানাথ গিয়া যখন অন্নপূর্ণার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল, তখন অন্নপূর্ণা তাহাকে ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি হাত ধরিয়া রমানাথকে তুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি ঘরের দু'টো পাগল নিয়েই অস্থির, আবার এই একটা পাগল পায়ে ধর্‌তে এসেছ। ছি বাবা, এত পায়ে হাতে ধর্‌তে হবে কেন? আমি তো মণিকে পেলে বর্ত্তে যাই।"

আনন্দের আবেগে রমানাথ চোখের জল থামাইতে পারিল না। সে বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে বলিল," তুমি বর্ত্তে যাও না মা, আমরাই বর্ত্তে যাই; আমাদের কন্যাদায়।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "দায় অদায় আবার কি? মেয়ের বিয়েও যেমন দায়, ছেলের বিয়েও তেমনি দায়। মেয়ের জন্য যেমন ভাল পাত্র খুঁজ্‌তে হয়, ছেলের জন্যও তেমনি ভাল বৌ খুঁজে বেড়াতে হয়। শুধু বৌ হ'লেই কি হ'লো? ভাল ঘরের মনের মত বৌ পাওয়া—সে-ও কি কম ভাগ্যের কথা?"

রমানাথ মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়া ভাবিল, "হায়, এই দেবীকে সে দিন প্রত্যাখ্যান করিয়া দিয়াছিলাম।"

তার পর কথাবার্ত্তা সব ঠিক হইল। অন্নপূর্ণা রামজয়কে ডাকাইলেন। রামজয় পাঁজি আনিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া নিজেই দিন-ক্ষণ সব দেখিল, পুরোহিত ডাকিবার বিলম্ব আর সহিল না। দিন-ক্ষণ সব ঠিক করিয়া রমানাথ চলিয়া গেল। রামজয় হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই দেখ গিন্নীমা, আমি বলেছিলাম, কত বেটা পায়ে ধ'রে বিনোদ রায়কে মেয়ে দেবে। দেখ, আমার কথা ঠিক অক্ষরে অক্ষরে ফল্‌লো কি না?"

অন্নপূর্ণা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বাপ বুঝি খুব গণৎকার ছিল?"

রামজয় বলিল, "আমার বাবা রতন রায় গণনার ধার ধার্‌তো না, এটুকু আমার মায়ের কাছে শেখা।"

গিন্নীমার উপর একটা হাস্যপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া রামজয় হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণা উঠিয়া বিনোদের কাছে গেলেন।

বিনোদ সকল কথা শুনিয়া মাকে বলিল, "এ আবার কি কর্‌লে মা?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ছেলের জন্য মায়ের যা করা উচিত, তাই করেছি।"

বিনোদ। ছেলের জন্য বার বার এত অপমান সহ্য করবে?

অন্ন। ছেলের সুখের জন্য মা প্রাণ দিতে পারে।

বিনোদ. কিন্তু যেখানে তোমার এত অপমান, সেখানে আমি কি সুখী হ'তে পারি মা?

অন্নপূর্ণা মৃদু হাসিলেন; বলিলেন, "পাগল! আমার আবার অপমান কোথায় দেখলি?"

বিনোদ। ঐ লোকটাই না তোমার মুখের উপর জবাব দিয়েছিল?

অন্ন। কে বল্‌লে?

বিনোদ। জয়া দাদা।

সহাস্যে অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ঐ একটা পাগল। আমার হয়েছে সাত পাগল নিয়ে ঘরকন্না।"

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু কথাটা সত্য কি না?"

অন্ন। সত্য।

বিনোদ। তবে?

অন্ন। আজ কেউ তোর সর্ব্বনাশ ক'রে কাল যদি এসে পায়ে ধ'রে, তাকে কি তুই ক্ষমা করবি না?

বিনোদ আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ও সব মান অপমানের কথা যেতে দে। আসল কথা, মণিকে আমি বৌ করব।"

বিনোদ বলিল, "কেন মা, দেশে কি আর মেয়ে নাই?"

অন্ন। মেয়ে অনেক আছে, কিন্তু সকলেই আমার ছেলের মনের মত নয়।

লজ্জায় বিনোদের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

নীচে হইতে রামজয় ব্যগ্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া-ডাকিল, "গিন্নীমা, গিন্নীমা!"

অন্নপূর্ণা ব্যস্তভাবে পশ্চাতে ফিরিলেন। ফিরিবা-মাত্র সবিস্ময়ে দেখিলেন, দরজার উপর এক অবগুণ্ঠিতা রমণী!..

অবগুণ্ঠিতা ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইল। অন্নপূর্ণা দুই হাত দিয়া তাহার অবগুণ্ঠন তুলিয়া ধরিলেন; তাঁহার বিস্ময়াপ্লুত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "এ কি, বৌমা!"

বিনোদ বসিয়াছিল, শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িয়া দুই হাতে চক্ষু আবৃত করিল।

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

সকালে বিনোদকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইবার জন্য রমানাথ যখন কাপড়-জামা পরিতেছিল, তখন দীনেশ বাবু ত্রিপুরাসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা, আপনারাই মণিকে মানুষ করেছেন, তার উপর আমার চেয়ে আপনাদেরই দাবী বেশী। আমিও আপনাদের সে দাবী নষ্ট করতে চাই না। কিন্তু মেয়েটার সুখ-দুঃখের দিকে তো চাইতে হয়?"

রমানাথ জামা গায়ে দিবার উদ্যোগ করিতেছিল; সে জামাটা দুই হাতে ধরিয়াই ত্রিপুরাসুন্দরীকে লক্ষ্য করিয়া রুক্ষস্বরে বলিল, "দীনেশ বাবুকে বল দিদিমা, মণির সুখ-দুঃখটা ওঁর চেয়ে আমরা খুব ভাল রকমেই বুঝে থাকি। তা নইলে রমানাথ শর্ম্মা কাল গিয়ে বিনোদের মায়ের পায়ে ধর্‌তো না।"

দীনেশ বাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব সংবরণ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "রাগ ক'রো না রমানাথ, মণির সুখ-দুঃখ আমার চেয়ে তোমরা যে বেশী বুঝে থাক, তা আমি জানি। তবে সতীনের উপর মেয়ে দিলে মেয়ে যে কিরূপে সুখী হয়, শুধু এইটুকুই বুঝতে পাচ্ছি না।"

উত্তেজিত স্বরে রমানাথ বলিল, "এটুকুও বেশ বুঝ্‌তে পার্‌তেন, যদি জান্‌তেন, সে সতীনের ভয় একটুও নাই, বিনোদ তাকে ত্যাগ করেছে।"

দীনেশ। বিবাহিতা স্ত্রীকে ত্যাগ করা বড় সহজ কথা নয় রমানাথ, ত্যাগ করেছে বটে, কিন্তু গ্রহণ কর্‌তেই বা কতক্ষণ?

রমা। গ্রহণ কর্‌লে কত দিন কর্‌তো। সে স্ত্রী নিরুদ্দেশ।

ত্রিপুরাসুন্দরী মৃদুস্বরে, বলিলেন, "নিরুদ্দেশ না, সে বৌ ম'রে গেছে।"

রমানাথ বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে দীনেশের দিকে শ্লেষপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "এখন বোধ হয়, বুঝ্‌তে পাচ্ছেন দীনেশ বাবু, বিনোদের মত সুপাত্রের হাতে দিলে মণি সুখী বৈ অসুখী হবে না।" রমানাথ ক্ষিপ্রহস্তে জামাটা গায়ে দিয়া বোতাম আঁটিতে লাগিল।

দীনেশ বাবু মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, "তাই হ'তো, যদি সে বৌটা যথার্থই ম'রে যেত।"

রমানাথ বিস্মিত দৃষ্টিতে দীনেশের মুখের দিকে চাহিল। দীনেশ বাবু বলিলেন, "সে মরে নাই, বেঁচে আছে।"

বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে রমানাথ বলিল, "বেঁচে আছে? আপনি দেখে এসেছেন না কি?"

দীনেশ। ইচ্ছা হয়, তুমিও দেখে আস্‌তে পার।

রমা। কোথায়? যমালয়ে গিয়ে?

দীনেশ। অত দূরে যেতে হবে না, বিনোদ বাবুদের বাড়ীতে গেলেই দেখ্‌তে পাবে। কাল সে এসেছে।

রমানাথের বোতাম আঁটা বন্ধ হইয়া গেল। উত্তেজনার সহিত বলিল, "আসে আসুক, তাকে ওরা গ্রহণ কর্‌বে না। গ্রহণ কর্‌লে—"

দীনেশ বাবু বলিলেন, "গ্রহণ কর্‌লে কোন দোষই হবে না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেছেন—"

রাগে চীৎকার করিয়া রমানাথ বলিল, "মহেশ চক্রবর্ত্তী? ঐ চক্রবর্ত্তীই যত নষ্টের মূল। ঐ তো চক্রান্ত ক'রে বৌটাকে তাড়িয়েছে।"

মহেশ চক্রবর্ত্তী হাসিতে হাসিতে বাড়ী ঢুকিয়া বলিলেন, "বুঝলেন কি না রমানাথ বাবু, আমি কোন দোষেরই দোষী নই। পাঁচ জনে কথাটা তুলেছিল, তাইতেই, বুঝলে কি না, ওরা ত্যাগ ক'রেছিল। তা এত দিন পরে মেয়েটা যখন ফিরে এসেছে, তখন, বুঝলে কি না, তাকে আবার ত্যাগ করা কি ভাল দেখায়? লোকে বল্‌বে কি? আর ধর্ম্মেই বা, বুঝলে কি না, সইবে কেন?"

রমানাথ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। চক্রবর্ত্তী বলিতে লাগিলেন, "খবরটা শুনেই কাল সন্ধ্যার পর —মুষলধারে বৃষ্টি, সেই বৃষ্টি মাথায় ক'রেই, বুঝলে কি না, ওদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। বিনোদের সঙ্গে দেখা ক'রে বুঝিয়ে ব'লে এলাম, মেয়েটাকে, বুঝলে কি না, আর ত্যাগ ক'রে কাজ নাই। এক দিন গাঁয়ের

সকলকে, বুঝলে কি না, লুচি-সন্দেশ ক'রে খাইয়ে দিলেই হবে। তাতে ওরাও, বুঝলে কি না, স্বীকার পেয়েছে।"

চীৎকার করিয়া রমানাথ বলিল, "সব ষড়যন্ত্র! সব মিথ্যা!"

চক্রবর্ত্তী ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন, "সত্য কি মিথ্যা, তা রমানাথ বাবু, তুমি নিজে গিয়েই, বুঝলে কি না, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন ক'রে আসতে পার।"

রমানাথ জ্বলন্তদৃষ্টিতে একবার চক্রবর্ত্তীর দিকে, আরবার দীনেশের দিকে চাহিয়া ছুটিয়া বাড়ীর বাহির হইল; জুতাটা পায়ে দিবারও সময় হইল না, খালি পায়েই বিনোদের বাড়ীর দিকে ছুটিল।

চক্রবর্ত্তী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পাগল! বুঝলেন কি না, দীনেশ বাবু, ছোক্‌রার মাথাটা একটু খারাপ আছে।"

দীনেশ সে কথায় কান না দিয়া ত্রিপুরাসুন্দরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তা হ'লে মা, আর তো সময় নাই, দিনও নাই। এখন চক্রবর্ত্তী মশায়ের ছেলেকে আশীর্ব্বাদ ক'রে আসি।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী বলিলেন, "আমি আর কি বল্‌বো, যা ভাল হয়, তাই কর।"

দীনেশ বলিলেন, "খুব ভাল হবে মা, খুব ভাল হবে। হাজার হোক, আমি তো বাপ, আমি কি আর মেয়েটাকে জলে ফেলে দেব? তা হ'লে চক্রবর্ত্তী মহাশয়, শুভস্য শীঘ্রই চলুন।

চক্রবর্ত্তী একটু আহ্লাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, চলুন। কি জানেন দীনেশ বাবু, আমি ভদ্রলোকের কথা, বুঝলে কি না, এড়াতে পারি না। যখন কথা দিয়েছি, তখন, বুঝলে কি না. তার আর নড়চড় হবে না। এখন তারা ব্রহ্মময়ীর ইচ্ছা।"

দীনেশ বাবু দুর্গা দুর্গা বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত যাত্রা করিলেন। ত্রিপুরাসুন্দরী স্তব্ধভাবে দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মণি ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছো দিদিমা?"

ত্রিপুরাসুন্দরী বিষাদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ভাবছি আমার মাথা আর মুণ্ড। তোদের দু'টোকে প্রতিপালন করেছিলাম, কিন্তু দু'টোরই কপাল কি সমান?"

মণি সহাস্যে বলিল, "তা কি করবে দিদিমা, তোমার আদর-যত্নে কপালের লেখা তো মুছে যাবে না?"

ত্রিপুরাসুন্দরী ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সজল কণ্ঠে বলিলেন, "ভগবান্, তুমিও কি তা মুছতে পার না?"

বৃদ্ধার জীর্ণ বক্ষঃপঞ্জরগুলা যেন ভাঙ্গিয়া মুচড়াইয়া দিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

ষট্‌ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

রমানাথ প্রায় ছুটিয়া বিনোদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল, এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে উপরে চলিল, রামজয় তাহার ভাবগতিক দেখিয়া বিস্মিতভাবে তাহার অনুসরণ করিল।

অন্নপূর্ণা বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন; রমানাথ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "সত্য—সত্য কি?"

অন্নপূর্ণা আশ্চর্য্যান্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে রমানাথ? কি সত্য?"

রমানাথ জোরে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল, "আপনার বৌ—আগেকার বৌ—"

অন্নপূর্ণা সহাস্যে বলিলেন, "হাঁ রমানাথ, আমার বৌমা এসেছে, আমার ঘরের লক্ষ্মীকে আবার ফিরিয়ে পেয়েছি।"

রমানাথ নিরুত্তর। পাশের ঘর হইতে অবগুণ্ঠনবতী উমা বাহির হইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া রমানাথকে প্রণাম করিল। প্রণামান্তে উঠিবার সময় সে ইচ্ছা করিয়াই অবগুণ্ঠনটা একটু সরাইয়া দিয়া সস্মিত-দৃষ্টিতে রমানাথের দিকে চাহিল। রমানাথ চমকিয়া উঠিল; বলিয়া উঠিল, "এ কি, উমা?"

মৃদুস্বরে উমা বলিল, "হাঁ কাকা, আমি।"

রমানাথ স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল; উমা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে রমানাথ মুখ তুলিয়া অন্নপূর্ণার দিকে চাহিয়া বলিল, "উমা আপনার বৌ?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "হাঁ, ঐ আমার ঘরের লক্ষ্মী।"

রমানাথ স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল; তার পর যেন একটা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া "ভগবান্ রক্ষা করেছেন" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান্ কাকে রক্ষা করলেন, রমানাথ?"

রমানাথ বলিল, "উমাকে। কেবল উমাকে কেন, মণিকেও রক্ষা করেছেন।"

রমানাথ প্রস্থানোদ্যত হইল। অন্নপূর্ণা ডাকিলেন, "রমানাথ!"

রমানাথ ফিরিয়া দাঁড়াইল। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে তোমার সঙ্গেই তো মণির বিয়ে হবে?"

গম্ভীরস্বরে রমানাথ উত্তর দিল, "না।"

অন্নপূর্ণা একটু বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "হবে না কেন?"

ম্লান হাসি হাসিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে রমানাথ বলিল, "আমি তো তার উপযুক্ত নই মা।"

অন্ন। অনুপযুক্ত কিসে?

রমা। সর্ব্বাংশে। আমি মূর্খ, আমি গরীব, আমি পরান্নে পালিত, আমার মাথা রাখবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত নাই।

অন্ন। কিন্তু দিন কয়েক আগে তো তুমি বিয়ে করবে বলেছিলে?

রমানাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া দীর্ঘশ্বাসের সহিত উত্তর করিল, "বলেছিলাম। কিন্তু কেন বলেছিলাম, তা জানি না। বোধ হয়, তখন আমার ঘাড়ে ভূত চেপেছিল।"

রমানাথ ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া সে স্থিরদৃষ্টিতে উর্দ্ধে চাহিয়া শান্ত সজলকণ্ঠে বলিল, "ভগবান্, সত্যই তুমি মঙ্গলময়। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হোক নাথ।"

রামজয় বারান্দার একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। রমানাথ চলিয়া গেলে, সে অন্নপূর্ণার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "বামুনের বোধ হয় একটু পাগলামীর ছিট আছে গিন্নীমা।"

অন্নপূর্ণা গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "আমি ওকে চিন্‌তে পার্‌লম না রামজয়।"

রামজয় ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমি কিন্তু বেশ চিনেছি, ও একটা আস্ত পাগল। ওর মতলবের একটুও ঠিক নাই।"

অন্নপূর্ণা চুপ করিয়া রহিলেন। রামজয় ট্যাঁক হইতে একখানা চিঠি বাহির করিল। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার চিঠি?"

উৎফুল্লকণ্ঠে রামজয় বলিল, "উকীলের। এই মাত্র এসেছে। সত্যি গিন্নীমা, বৌমা যথার্থই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী। মা কাল এসেছেন, আর কালই আমরা মোকদ্দমায় ডিক্রী পেয়েছি।"

অন্ন। কোন্ মোকদ্দমা?

রাম। ঐ ন-পাড়ার বিষয়ের গো। যাক্, এখন গিয়ে জমী জায়গাগুলোর বন্দোবস্ত করতে হবে। বিনোদ একেবার গেলেই ভাল হয়, না যেতে পারে, আমিই সব ঠিক ক'রে ফেল্‌ব। এবার নবীনচন্দ্র ঘোষকে একবার দেখে নিতে হবে।

অন্নপূর্ণার মুখখানা আরও একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। বিনোদ ঘর হইতে বাহির হইয়া দরজা ধরিয়া দাঁড়াইল, এবং রামজয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বিষয়ের বন্দোবস্ত করবার আগে দানপত্রের একখানা কাগজ আন্‌তে হবে। আজই নিয়ে এসো।"

রামজয় একটু বিস্মিতভাবে বলিল, "দানপত্র! কার নামে দানপত্র হবে?"

বিনোদ বলিল, "রমানাথের নামে।"

রামজয় বিস্ময়বিস্ফারিতদৃষ্টিতে একবার বিনোদের মুখের দিকে, একবার অন্নপূর্ণার দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা সহাস্যে বলিলেন, "আমি কি কর্‌বো রামজয়, যার বিষয়, তার ইচ্ছা।"

রামজয় ক্ষুণ্নস্বরে বলিল, "তাই ব'লে এত বড় সম্পত্তিটা ঐ পাগলা ঠাকুরকে দিতে হবে?"

ঈষৎ হাসিয়া বিনোদ বলিল, 'হাঁ, দিতে হবে। ভাবনা কি জয়াদাদা, যখন স্বয়ং লক্ষ্মী তোমাদের ঘরে বাঁধা, তখন তোমাদের সম্পত্তির অভাব কি?"

রামজয় দাঁড়াইয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, "ভাবছ কি?"

রামজয় বলিল, "দিতেই হবে?"

বিনোদ বলিল, "হাঁ, আমাকে দিতেই হবে। তবে একটু সন্দেহ আছে, তোমার পাগলা ঠাকুর বিষয়টা নেবে কি না।"

রামজয় বিমর্ষচিত্তে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল। যাইতে যাইতে রমানাথ যাহাতে বিষয়টা লইতে অস্বীকৃত হয়, তজ্জন্য যত ঠাকুরের নাম মনে পড়িল, সকলকেই কিছু না কিছু মানসিক করিল। কিন্তু ঠাকুরদের উপর ভার দিয়াও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। কেন না, বিষয় দিলে লইতে চায় না, এমন লোক কি জগতে আছে? যে যতই পাগল হউক, টাকা-পয়সার বেলায় সকলেই সতর্ক—"পাগল বুচ্‌কি আগল।"

বিনোদ মাতার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "কাজটা কি অন্যায় হ'লো মা?"

অন্নপূর্ণা পুত্রের মুখের উপর হর্ষসমুজ্জ্বল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া স্ফীতকণ্ঠে বলিলেন, "একটু অন্যায় হয়েছে বিনোদ, আমাকে এই কাজটা করবার সুযোগ দিলি না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোর মত মহাপ্রাণ ছেলে যেন জন্মে জন্মে পাই।"

বিনোদ মস্তক নত করিয়া মাতার পদধূলি গ্রহণ করিল।

সপ্তত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

রমানাথ বাড়ী ফিরিয়া দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দীনেশ বাবু কোথায় গেলেন, দিদিমা ?"

দিদিমা গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "চক্রবর্ত্তীর বাড়ী।"

রমানাথ ব্যস্তভাবে বলিল, "কেন, ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করতে না কি ?"

দিদিমা বলিলেন, "হুঁ।"

রমানাথ তাড়াতাড়ি আন্‌লা হইতে চাদরখানা লইয়া, চটী জুতাটা পায়ে দিয়া উঠানে নামিল। দিদিমা ছুটিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "কোথায় যাস্ ?"

সহাস্যে রমানাথ বলিল, "কোথায় বল দেখি ?"

দিদি। চক্রবর্ত্তীর বাড়ী।

রমা। ঠিক ধরেছ।

দিদিমা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "না, তোর গিয়ে কাজ নাই।"

দিদিমার মুখের উপর বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রমানাথ বলিল, "যাব না ? কেন ?"

দিদিমা জোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না।"

রমানাথ দাঁড়াইয়া একটু ভাবিল, ভাবিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "ভয় নাই দিদিমা, আমি গোলযোগ বাধাতে সেখানে যাচ্চি না, আমি যাচ্চি বরকে আশীর্ব্বাদ করতে।"

দিদিমা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "তুই আশীর্ব্বাদ করবি ?"

রমানাথ বলিল, "আমি করব না তো কে করবে ? মণির বিয়েতে আমার চেয়ে আনন্দ কার হবে ? আমি তার বরকে আশীর্ব্বাদ করব না ?"

উত্তেজিত কণ্ঠে দিদিমা বলিলেন, "না। কে আমার মণির বর ? মণির বর তো তুই।"

ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া রমানাথ বলিল, "ছি ছি ! তুমি কি পাগল হ'লে দিদিমা ? অমন কথা কি বলতে আছে ?"

উচ্চকণ্ঠে দিদিমা বলিলেন, "খুব বলতে আছে। তবে শোন্ রমা, আমি জোর ক'রে তোর সঙ্গে মণির বিয়ে দেব। দেখি, কে বাধা দিতে পারে।"

রমানাথ স্থিরদৃষ্টিতে দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আমি বাধা দেব।"

দিদি। তা হ'লে এই আমি বলচি রমা, আমি গলায় দড়ি দেব, বিষ খাব, মণিকে বিষ খাইয়ে মারব।

রমানাথের মুখখানা রাগে লাল হইয়া উঠিল। সে রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমিও তবে শোন দিদিমা, তা যদি কর, তবে এই মুহূর্ত্তে আমি বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাব। যদি না যাই, তবে আমি বামুনের ছেলে নই।"

দিদিমা হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া রমানাথ বলিল, "ছিঃ, তুমি আমাকে এতটা অপদার্থ মনে কর দিদিমা ?"

দিদিমার মুখের উপর একটা তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রমানাথ সগর্ব্ব-পদক্ষেপে চলিয়া গেল।

* * * *

সানায়ে ভৈরবীর কোমল রাগিণীতে মিলন-সঙ্গীতের মধুর তান প্রভাতবায়ুস্তর কম্পিত করিয়া যখন দিগন্তে বিলীন হইল, তখন রমানাথ বধূবেশে সজ্জিতা মণির নিকট গিয়া ডাকিল, "মণি !"

মণি নত-দৃষ্টিতে করুণকণ্ঠে উত্তর করিল, "রমাদা !"

রমানাথ বলিল, "দুঃখ করিস্ না মণি, ঈশ্বর মঙ্গল-ময়, তিনি যা করেন, সবই আমাদের মঙ্গলের জন্য।"

মণি কোন উত্তর করিল না, নীরবে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। রমানাথ আপনার দক্ষিণ হস্তখানি তাহার মাথার উপর রাখিয়া ধীর-প্রশান্তস্বরে বলিল, "স্ত্রীলোকের স্বামীই দেবতা, ইহকাল পরকালের সর্ব্বস্ব; মূর্খ হোক্, দরিদ্র হোক্, পাষণ্ড হোক্, সকল অবস্থাতেই স্বামী স্ত্রীর পূজ্য, স্বামীর সুখেই স্ত্রীর সুখ। আশীর্ব্বাদ করি মণি, তুই সুখী হ'।"

মণি অবনতমস্তকে রমানাথের পদধূলি গ্রহণ করিল।

বরকন্যা বিদায় হইল, বাড়ীতে বিজয়া-দশমীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। রমানাথ স্তব্ধভাবে বৈঠকখানায় বসিয়া রহিল।

বিনোদ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার পশ্চাতে রামজয়। বিনোদ ডাকিল, "রমানাথ বাবু !"

রমানাথ মুখ তুলিয়া অর্থহীন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। বিনোদ পকেট হইতে একখানা রেজেষ্টারী দলিল বাহির করিয়া রমানাথের হাতে দিল। রমানাথ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি এ ?"

বিনোদ বলিল, "দানপত্র। বিমলাবাবুর যে সম্পত্তি আমার নামে ডিক্রী হয়েছিল, আমি সেই সম্পত্তি আপনাকে দানপত্র ক'রে দিলাম।"

রমানাথ মৃদু হাসিল; বলিল, "কেন দিলেন ?"

বিনোদ। বিষয় প্রকৃতপক্ষে আপনার।

রমা। আমার হ'লে আপনার নামে ডিক্রী হ'তো না।

বিনোদ। আদালতে সব সময়ে ন্যায়-বিচার হয় না।

রমানাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "কিন্তু আর আমার বিষয় নিয়ে কি হবে বিনোদ বাবু ?"

বিনোদ বলিল, "সংসারে থাকৃতে হ'লে বিষয়সম্পত্তিতে সকলেরই দরকার থাকে।"

রমানাথ বলিল, "আমার কিন্তু কিছুমাত্র দরকার নাই।"

রামজয় হাঁ করিয়া রমানাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিনোদ বলিল, "দরকার না থাকলেও আপনাকে নিতে হবে। অন্ততঃ আমার অনুরোধে, উমার অনুরোধে নিতে হবে।"

রম। নিয়ে কি করব ?

বিনোদ। বিষয়ে কর্‌বার কাজ অনেক আছে। আপনার নিজের কিছু না থাকে, পরের কাজেও লাগাতে পারেন।

রমানাথ বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বিনোদ ও রামজয় স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে রমানাথ বলিল, "তা হ'লে এক কাজ করুন, অর্দ্ধেক বিষয় মণির নামে লেখাপড়া ক'রে দিন।"

রমানাথ দানপত্রখানা ফিরাইয়া বিনোদের হাতে দিল। বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, "বাকী অর্দ্ধেক ?"

রমা। আপনাকে দিলাম।

বিনোদ। আমার যা আছে, তাই যথেষ্ট।

একটু ভাবিয়া রমানাথ বলিল, "তা হ'লে আর একটা কাজ করুন। দেখছি, কন্যাদায়ের মত দায় আর নাই। বাকী অর্দ্ধেক বিষয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত লোকের সাহায্যের ব্যবস্থা কর্‌বেন।"

রামজয় আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া রমানাথকে প্রণাম করিতে করিতে গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "ঠাকুর, তুমি সত্যিকার একটা মানুষ।"

রমানাথের পায়ের ধূলা লইয়া রামজয় মাথায় দিল।

সম্পূর্ণ

জেল-ফেরৎ

১

দুইবারের জেল-ফেরৎ চরণ মালিক লোক-সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যখন গ্রামের নিত্যানন্দ বাবাজীর আখড়ায় যাতায়াত করিতেছিল এবং হবিনামের উপর নির্ভর করিয়া কলঙ্কিত জীবনটাকে সফল করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন সহসা গরবী আসিয়া গোল বাধাইয়া দিল।

চারি বৎসর আগে এই গরবীর জন্যই চরণ জেলে যাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তিন বৎসর অজন্মা, দেশে হাহাকার উঠিয়াছিল। দুই দিন চরণের ঘরে হাঁড়ী চড়ে নাই, স্ত্রী গরবী ক্ষুধায় অবসন্ন হইয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছিল, এক বৎসরের ছেলে সোনা এক ফোঁটা ফেনের জন্য কাঁদিয়া লুটোপুটি খাইতেছিল, আর চরণ ক্ষুৎপিপাসাক্লান্ত অবসন্ন দেহকে কোনক্রমে টানিয়া লইয়া আধসের চাউলের জন্য মহাজনের দ্বারে মাথা কুটিতেছিল। মহাজনের কিন্তু দয়া হইল না; তিনি তিন বৎসরের হিসাব টানিয়া চরণকে বুঝাইয়া দিলেন, এই তিন বৎসরে সে যে সাড়ে পাঁচ গণ্ডা টাকা দেনা করিয়াছে, তাহা সুদে আসলে পৌনে আট গণ্ডা টাকায় দাঁড়াইয়াছে। চরণের ভিটাটার দাম জোর কুড়ি টাকা হইতে পারে; বাকী পৌনে তিন গণ্ডা টাকা মহাজনের লোকসান। এরূপ স্থলে মহাজন লোকসানের উপর আর লোকসান করিতে পারে না।

একটা গভীর নিরাশা ও মর্ম্মদাহ লইয়া চরণ রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিল। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের ভিতর একটা ব্যর্থ ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। সে আগুনে তাহার পাপ-পুণ্য-বোধ, হিতাহিতজ্ঞান পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। তার পর গভীর নিশীথে পল্লী যখন নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবিয়া গেল, তখন শুধু চরণের ভগ্ন কুটীরমধ্য হইতে সোনার আকুল চীৎকার উত্থিত হইয়া রজনীর সে গভীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল। গরবী আকুলদৃষ্টিতে ক্ষুধার তীব্র তাড়না নীরবে স্বামীকে জানাইয়া দিতে লাগিল। চরণ আর পারিল না; সে পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইল।

তার পর চরণ কিরূপে যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া নকুড় দত্তের বাড়ীতে ঢুকিয়া, কি উপায়ে ভাঁড়ার ঘরের চাবী ভাঙ্গিয়া চাউলের হাঁড়ী খুঁজিয়া বাহির করিল এবং এক হাঁড়ী চাউল ও কয়েকটা ঘটীবাটি লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। যেন কোথা হইতে একটা অজ্ঞাত শক্তি আসিয়া তাহার ইন্দ্রিয়সমূহকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া, এই নিতান্ত অনভ্যস্ত কার্য্যটা খুব সহজভাবেই সম্পন্ন করাইয়া দিল। কিন্তু যেমন নিঃশব্দে গিয়াছিল, তেমন নিঃশব্দে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিল না, প্রাচীরে উঠিবার সময় অপহৃত ঘটীবাটিগুলা হইতে শব্দ উত্থিত হইল, সে শব্দে বাড়ীর লোক জাগিয়া উঠিল এবং চীৎকার করিতে করিতে চোরের পশ্চাৎ ধাবমান হইল।

চোর ধরা দিল না, কিন্তু তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত লোকে ধাওয়া করিল। চরণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ঘরে আসিল এবং অপহৃত জিনিসগুলা ঘরের ভিতর ফেলিয়া পাকা বাঁশের লাঠী লইয়া বাহির হইল। লাঠীর বহর দেখিয়া অনুসরণকারীরা পলায়ন করিল।

চরণ স্ত্রীকে তুলিয়া ভাত রাঁধাইল এবং ছেলেকে ভাতের মাড় খাওয়াইয়া দুই দিনের পর স্ত্রীপুরুষে পেট ভরিয়া ভাত খাইল। খাওয়া যখন শেষ হইল, পূর্ব্বদিক্ ফর্সা হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন পুলিস আসিয়া চরণকে গ্রেপ্তার করিল, তখন কৃত কার্য্যের পরিণামচিন্তায় চরণ কাতর হইয়া পড়িল। তার পর তাহাকে চালান দিবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস যখন অপহৃত চাউল ও ঘটীবাটিগুলা পর্য্যন্ত লইয়া চলিল, তখন চরণ পাগলের মত চীৎকার করিয়া দারোগাকে বলিল, 'দোহাই হুজুর, যেগুলোর তরে আমি জেলে যাচ্ছি, সে-গুলো রেখে যাও, ও অভাগী তবু খেয়ে দশটা দিনও বাঁচবে।"

উত্তরে দারোগাবাবু এমন একটা অশ্রাব্য উত্তর দিলেন যে, তাহা শুনিয়া চরণের ইচ্ছা হইল, হাতের হাতকড়ার আঘাতে দারোগার মাথাটা ফাটাইয়া দেয়, কি নিজের মাথায় মারিয়া নিজে মরে। কিন্তু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই কনষ্টেবল রুলের গুঁতা মারিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। যাইবার সময় সে গরবীকে একটুও আশ্বাস দিয়া যাইতে পারিল না।

মাস দুই পরে সংবাদ আসিল, চুরি অপরাধে চরণের দেড় বৎসর জেলের হুকুম হইয়াছে। শুনিয়া গরবী কাঁদিয়া উঠানের ধূলায় লুলোপুটি খাইতে লাগিল।

দেড় বৎসর পরে চরণ ঘরে ফিরিল। কিন্তু গরবী বা সোনা কাহাকেও দেখিতে পাইল না, শুধু ভগ্নপ্রায় কুটীরখানা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। অনুসন্ধানে চরণ জানিতে পারিল, তাহার জেলে যাইবার মাস কয়েক পরে গরবী কেশেপুকুরের ছিদাম মাঝীকে সাঙ্গা করিয়া তাহার ঘর-ঘরকান্না করিতেছে। শুনিয়া চরণ অবসন্নভাবে উঠানের উপর বসিয়া পড়িল। সে জানিত না যে, তাহার জেলের সংবাদ-শ্রবণে গরবী এক দিন ঠিক এই জায়গাই ধূলার উপর লুটাইয়া পড়িয়া আর্ত্ত চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিয়াছিল।

পরদিন চরণ কেশেপুকুর অভিমুখে যাত্রা করিল, এবং ছিদাম মাঝীর বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল, বাহিরে একটি বছর তিনেকের ছেলে খেলা করিতেছে। সোনাকে চিনিতে চরণের বিলম্ব হইল না; সে পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া সোনাকে বুকের উপর তুলিয়া লইল। সোনা কিন্তু তাহাকে চিনিল না, সহসা এক জন অপরিচিত কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া সে ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। ছেলের কান্না শুনিয়া গরবী বাহিরে আসিল; কিন্তু চরণকে দেখিয়া, লোকে সহসা সম্মুখে সাপ বা বাঘ দেখিলে যেমন আতঙ্কে শিহরিয়া ছুটিয়া পলায়, তেমনই ভাবে ছুটিয়া পলাইল। চরণ ধীরগম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল, "গরবী—গরবী।"

গরবী কিন্তু উত্তর দিল না, ফিরিয়াও চাহিল না। চরণ কিয়ৎক্ষণ অচল প্রস্তরের মত দাঁড়াইয়া রহিল, তার পরে আস্তে আস্তে সোনাকে বুক হইতে নামাইয়া দিয়া, যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিয়া চলিল।

ফিরিয়া আসিয়া চরণ কিন্তু আগে যে ভাবে জীবন কাটাইতেছিল, ঠিক সে ভাবে জীবন কাটাইতে পারিল না। একে তো তাহার নিকট সংসারটা উলট-পালট হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর আবার অপবাদগ্রস্ত জেল-ফেরৎ! চরণকে কেহই আর প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিল না। সকলেরই দৃষ্টি হইতে যেন ঘৃণা ও তিরস্কারের তীব্রতা আসিয়া শেলের মত তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। চরণ মাথা নীচু করিয়া কোনরূপে দিন কাটাইতে লাগিল। একবার ক্ষুধার তাড়নায় যে কাজ করিয়াছে, স্ত্রী-পুত্রকে অনশনের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে কলঙ্কের কালি গায়ে মাখিয়াছে, সে কালিমা এ জীবনে ধৌত হইবে না। কিন্তু হে অন্তর্য্যামী দেবতা, তুমি জান, স্নেহ-মমতার শাসন কি ভয়ঙ্কর! যাহাদের জন্য জীবন দিতে পারা যায়, তাহাদের জন্য কলঙ্কের ভার মাথায় লওয়া, সে কত সহজ। কিন্তু দেড় বৎসরের কঠোর প্রায়শ্চিত্তেও কি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল না?

জীবনে একটা ভুল করিলেই যে সমগ্র জীবনটা ব্যর্থ হইয়া যাইবে, এমন কোন কথা নাই। চরণ অতীত জীবন বিস্মৃত হইয়া নূতন জীবন-গঠনে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সমাজ তাহা হইতে দিল না, প্রতিপদে খোঁচা দিয়া তাহার বর্ত্তমানটাকে অতীতের ভিতর ঠেলিয়া দিতে লাগিল। চৌকীদার আসিয়া রাত্রিতে জাগাইত, থানার এলাকার মধ্যে চুরী হইলেই পুলিশ আসিয়া চরণের ভাঙ্গা কুঁড়ের ভিতর চোরাই মালের সন্ধান করিত। এমনই সন্ধান করিতে করিতে পুলিশ আবার এক দিন তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। হরিশচন্দ্রের বলাই নন্দীর বাড়ীতে চুরীর অপরাধে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে এক বৎসরের জন্য জেলে পাঠাইয়া দিলেন।

এবার জেল হইতে ফিরিয়া চরণ আর গ্রামের ভিতর বাস করিতে পারিল না; গ্রামপ্রান্তে মাঠের ধারে যেখানে বিস্তৃত প্রান্তরটা আপনার বিশাল শূন্যতা লইয়া গ্রামখানাকে জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল, সেইখানে ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিল।

কিন্তু মানুষ সমাজের বাহিরে একা থাকিতে পারে না। লোকসমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া চরণ বন্ধনবিহীন বৈষ্ণব-সমাজের দ্বারস্থ হইল এবং নিত্যানন্দ বাবাজীর আখড়ায় যাতায়াত করিয়া বাবাজীর নিকট কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। তাহার অভিপ্রায় শুনিয়া বাবাজী রাগিয়া বলিলেন, "মর্ বেটা, একে জাতে চাঁড়াল, তার উপর জেল-ফের্‌তা, আমি তোকে মন্ত্র দেব?

চরণ কাঁদিয়া বলিল, "মন্তর না দাও, আমার উদ্ধারের উপায় ব'লে দাও বাবাজী!"

বাবাজী বলিলেন, "উপায় আর কি, নিরুপায়ের উপায় হরি, হরিকে ডাক্।"

বাবাজীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চরণ হরিনাম-জপে প্রবৃত্ত হইল এবং আপনার হৃদয়ের সকল জ্বালা-যন্ত্রণা হরির চরণে অর্পণ করিয়া মনটাকে স্থির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই গরবী এক দিন ছেলের হাত ধরিয়া তাহার কুটীরদ্বারে আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিল।

"আমার কি হবে সোনার বাপ ?"

চরণ অধোমুখে নিরুত্তর। গরবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আমার যে আর দাঁড়াবার ঠাঁই নাই ?"

মুখ তুলিয়া চরণ বলিল, "আমার ঘরে থাক্‌বি ?"

গরবী বলিল, "যদি তুমি রাখ।"

চরণ বসিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার মুখের উপর সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গরবী বলিল, "মনে কর, তোমার ছেলেও তো আছে। আমাকে যদি নেহাৎ—"

বাধা দিয়া চরণ বলিল, "তুই আর ছেলে আলাদা কি গরবী ?"

মুখ নাচু করিয়া গরবী বলিল, "তা হ'লেও দোষ-ঘাট যা কিছু আমিই করেছি, ছেলেটার কোন দোষ নাই।"

বিষাদগম্ভীরস্বরে চরণ বলিল, "দোষ তোরও কিছু নাই গরবী, দোষ যদি কিছু থাকে, সে আমার কপালের।"

গরবী নীরবে বসিয়া মাটীতে আঙ্গুল ঘষিতে লাগিল। চরণ বলিল, "তোর কিন্তু ছিদামের ঘর ছেড়ে আসা ঠিক হয় নি।"

মুখ তুলিয়া ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে গরবী বলিল, "প'ড়ে প'ড়ে তার মার খাব ?"

"ঘর কত্তে গেলে অমন হয়ে থাকে।"

"কিন্তু সেখানে আমার কিসের ঘর ?"

"তবে গিয়েছিলি কেন ?"

"পেটের জ্বালায়।"

"পেটের জ্বালা কি এত বড় ?"

"যার জ্বালায় চুরী পর্য্যন্ত করা যায়, সেটা খুব ছোট কি ?"

এই কঠোর সত্য উত্তর শুনিয়া চরণ ভ্রূকুটী করিল। ঈষৎ রাগতভাবে গরবী বলিল, "তা আমি যা করেছি, করেছি, কিন্তু ছেলে তো তোমার।"

মৃদু হাসিয়া চরণ বলিল, "সংসারে কে কার গরবী ? একমাত্র হরিনামই সার।"

পরিহাসের স্বরে গরবী বলিল, "জেলে গেলে দেখছি মানুষ বৈরিগী হয়।"

চরণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। গরবী ছেলের হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাস্ ?"

অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে গরবী বলিল, "চুলোয়।"

গরবী চলিল, চরণ ডাকিল, "ফিরে আয় গরবী !"

গরবী ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং চরণের মুখের উপর তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কেন ?"

চরণ বলিল, "এইখানেই থাক্।"

তীব্রস্বরে গরবী বলিল, "তাতে যদি তোর জপ-তপের ব্যাঘাত হয় ?"

চরণ চুপ করিয়া রহিল। গরবী ফিরিয়া চলিল। যখন সে কুটীরের সীমানা ছাড়াইয়া মাঠে নামিবার উপক্রম করিতেছে, তখন সহসা চরণ ছুটিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল এবং উৎসুককণ্ঠে বলিল, "যা হয় হবে গরবী, তুই ফিরে আয়।"

গরবী কিন্তু ফিরিয়া চাহিল না ; সে চরণের মুখের উপর ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। চরণ হতবুদ্ধির ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অদূরে ক্ষেতে কাজ করিতে করিতে জনৈক কৃষক গাহিতেছিল।—

"মোন তোমারে বারে বারে কত বুঝাব।
বুঝেও তো বুঝো না তুমি এ কি অসম্ভবো।"

চরণ একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিল।

ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু চরণ সে দিন কিছুতেই মন দিতে পারিল না। নামগান করিতে গেল, কিন্তু মুখ দিয়া নাম বাহির হইল না। সন্ধ্যা হইল, কুটীরে আলো জ্বালিল না। অন্ধকার কুটীরদ্বারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্রমে গ্রাম, প্রান্তর সব স্তব্ধ হইয়া আসিল, অন্ধকার মাঠের উপর দিয়া নৈশবায়ু শন্-শন্ শব্দে বহিয়া যাইতে লাগিল। চরণ বসিয়া বসিয়া শুধু শুনিতে লাগিল, যেন প্রান্তরের অপর পার হইতে গরবী আকুলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "আমার যে আর দাঁড়াবার ঠাঁই নাই।" খানিক পরে চরণ কুটীরে ঢুকিয়া শুইয়া পড়িল। সে দিন আর তাহার খাওয়া হইল না।

পরদিন সকালে উঠিয়াই চরণ কেশেপুকুরে উপস্থিত হইল। কিন্তু সেখানে গরবী নাই, সোনাও নাই। চরণ বিষণ্ণচিত্তে ফিরিয়া আসিল।

তিন দিন এ গ্রাম সে গ্রাম অনুসন্ধান করিয়া চরণ যখন গরবীর কোন উদ্দেশ পাইল না, তখন সে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় নিত্যানন্দ বাবাজীর আখড়ায় যাতায়াত করিতে লাগিল।

৩

কালে সবই সহিয়া যায়। চরণেরও সহিয়া গেল। বছরখানেকের চেষ্টায় সে গরবীকে ভুলিল, সোনাকে ভুলিল ; শুধু প্রাণের ভিতর হরিনামটি জাগাইয়া

রাখিল। আর একটা কথা জাগিয়া রহিল, সেটা জেলের কথা। চরণ ভুলিতে চেষ্টা করিলেও পুলিস তাহাকে সেটা ভুলিতে দিল না। মাঝে মাঝে খানা-তল্লাসী করিতে আসিয়া, তাহাকে মারিয়া, ঘরের জিনিসপত্র তছনচ করিয়া, তাহাকে শুধু উত্ত্যক্ত করিল না, সে যে জেলফেরৎ, এ কথাটা স্পষ্টভাবে তাহার মনের ভিতর জাগাইয়া রাখিল। সে স্মৃতির দংশনে চরণ যখন আকুল হইয়া পড়িত, তখন সে নির্জ্জন কুটীরদ্বারে বসিয়া আপন মনে গাহিত—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে,
তোমা বিনে কে দয়ালু জগৎসংসারে।
পতিতপাবন হেতু তব অবতার,
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর।
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ-সুখী,
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী।"

আখড়ায় যাতায়াত করিয়া চরণ কতকগুলি পদ শিখিয়াছিল। মনটা নিতান্ত আকুল হইলে সেই পদ গাহিয়া অশান্ত চিত্তকে শান্ত করিত। লোকে তাহার সে প্রার্থনা শুনিয়া 'বক-ধার্ম্মিক' বলিয়া উপহাস করিত এবং তাহার এই ভণ্ডামীর অন্তরালে যে কতক-গুলা দুষ্কর্ম্মের তীব্র বাসনা লুক্কায়িত রহিয়াছে, আকারে ইঙ্গিতে এমন কথাও প্রকাশ করিতে ছাড়িত না। সে কথাগুলা বুকে শেলের মত বিঁধিলেও চরণ ইহা হইতে অব্যাহতিলাভের কোন উপায়ই দেখিতে পাইত না; শুধু অন্তর্য্যামী দেবতার চরণে আপনার অন্তরের নিদারুণ ব্যথা জানাইয়া চুপ করিয়া থাকিত।

এইরূপে যখন কতক যন্ত্রণায় কতক শান্তিতে দিন কাটিতেছিল, তখন বাবাজী শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে বৃন্দাবনযাত্রার সঙ্কল্প করিলেন। শুনিয়া চরণও তাঁহার অনুগামী হইতে ইচ্ছুক হইল। বাবাজীর ইহাতে আপত্তি ছিল না। গ্রামের অনেক লোকই যাইবে, তাহার সহিত চরণ গেলে ক্ষতি কি? চরণের আনন্দের সীমা নাই। সে ঔৎসুক্য সহকারে গাহিতে লাগিল—

"হরি হরি কবে হব বৃন্দাবনবাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল রূপরাশি॥"

লোকে শুনিয়া খুব একচোট হাসিয়া লইল। তার পর চরণকে দেখিলেই তাহারা জিজ্ঞাসা করিত, "কি চরণ, এখানে আর সুবিধা হলো না না কি?"

চরণ সবিনয়ে উত্তর করিত, "মহাপাপী আমি, উদ্ধারের উপায় করা তো চাই।"

গোপাল চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানায় কথাটা উঠিলে বুড়া চক্রবর্ত্তী ঘাড় নাড়িয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—"ওহে, আমরা বুড়ো হয়ে মর্‌তে যাচ্ছি, আমাদের উদ্ধারের ভাবনা হ'লো না, আর যত ভাবনা হলো ঐ যমের মত পালোয়ান বেটা চাঁড়ালের। ওর উদ্দেশ্যটা কি জান, বেটা কোথাও দাঁও মার্‌বার চেষ্টায় আছে, আর সাধুর দলে ঢুকে গেলে পুলিসেরও সন্দেহ হবে না। থাম না, বেটার বৃন্দাবন যাওয়া বের ক'রে দিচ্ছি।"

বাস্তবিক গ্রামে এত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ভাল লোক থাকিতে এক বেটা জেল-ফেরৎ চাঁড়াল বৃন্দাবনে যাইবে, ইহা অনেকেরই নিকট নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল।

৪

যাত্রার দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, চরণের ততই উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। এক বৎসরে খাইয়া পরিয়া সে বাইশ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। এক দিন সে বসিয়া টাকাগুলি গুণিতেছিল, আর গরবীর কথা মনে করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল, এমন সময়ে গোপাল চক্রবর্ত্তী আসিয়া ডাকিলেন, "চরণ ঘরে আছিস্?"

চরণ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া উত্তর দিল, "বাবাঠাকুর যে?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "আজ আমার মজুর দিতে পার্‌বি?"

চরণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ তো হবে না বাবাঠাকুর, আজ রায়েদের ধান কাট্‌তে যাচ্ছি।"

চক্রবর্ত্তী ঈষৎ চিন্তিতভাবে বলিলেন, "তাই তো!"

চরণ বলিল, "কাল হ'লে চল্‌বে না, বাবাঠাকুর?"

একটু ভাবিয়া চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "কাজেই। তুই আমার কাছে একটা মজুরের দাম পাবি। নোট ভাঙ্গাতে পারি না; তোর টাকা আছে?"

দরজার সাম্‌নে ঘরের ভিতর টাকাগুলা তখনও চক্‌চক্ করিতেছিল এবং চক্রবর্ত্তীর তীক্ষ্ণদৃষ্টিটা তাহার উপর নিপতিত হইয়াছিল। চরণের নগদ টাকা ছিল, বলিল, "তা পারি বাবাঠাকুর।"

"তবে দে তো বাবা, বাঁচ্‌লাম। বাজারে ছুটতে হ'ল না।"

চক্রবর্ত্তী ছোট হাতকাটা জামার বুকের পকেটের ভিতর হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া চরণের হাতে দিলেন এবং চরণ টাকা দশটি আনিয়া দিলে তাহা বাজাইয়া লইয়া পকেটে রাখিলেন। তার

পর চরণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "খুচরা তো নাই ; তোর পাওনাটা—"

চরণ বলিল, "তা দেবেন এখন।"

চক্রবর্ত্তী প্রস্থানোদ্যত হইয়া সহসা ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে চরণ, তুই না কি বৃন্দাবনে যাচ্চিস্ ?"

চরণ মৃদু হাসিয়া হাতে হাত ঘষিতে ঘষিতে উত্তর করিল, "সে কথা পাপ-মুখে কেমন ক'রে বল্‌তে পারি, বাবাঠাকুর।"

চক্রবর্ত্তী গম্ভীরভাবে মস্তক-সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "তা হ'লে যাচ্চিস্ ?"

চরণ বলিল, "তিনি যদি নিয়ে যান।"

চক্রবর্ত্তী আর কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিলেন। চরণ ঘরে ঢুকিয়া টাকা ও নোট নেকড়ায় বাঁধিয়া চাউলের হাঁড়িতে রাখিল।

৫

ইহার পর দুই দিন পরে এক দিন চক্রববর্ত্তী পথে চরণকে দেখিয়া আক্ষেপ সহকারে বলিলেন, "হাঁ রে, বাবা চরণ, সে দিন সন্ধ্যার পর কেশেপুকুর হ'তে ফিরবার সময় তোর ঘরের সামনে বল্‌লেই হয়, এক বেটা আমার কুড়ি কুড়িটা টাকা কেড়ে নিলে। তোকে এত চেঁচিয়ে ডাকলাম, একটা সাড়াও দিলি না বাবা!"

বিস্ময়ের সহিত চরণ বলিল, "কৈ বাবাঠাকুর আমি কিছু শুন্‌তে পাই নি।"

অনুযোগের সুরে চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "আর বাবা, কাজের সময় শুন্‌তে পাবি কেন? হরি হে মধুসূদন, তোমারই ইচ্ছা।" বলিয়া তিনি চরণের মুখের উপর কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। চরণ বিস্মিতভাবে ঘরে ফিরিল।

পরদিন প্রভাতে পুলিস আসিয়া যখন চরণকে রাহাজানীর অপরাধে গ্রেপ্তার করিল, তখন চরণ তাহাতে একটুও বিস্মিত হইল না। কেন না, ইহা তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুলিসের সহিত গ্রামের কয়েক জন প্রবীণ ভদ্রলোক ছিলেন, চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের অন্যতম। খানাতল্লাসার পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তী দারোগাকে বলিলেন, "দেখুন দারোগা বাবু, দশটি টাকা, আর একখানি দশ টাকার নোট। নোটের পিঠে আমি নিজের হাতে শ্রীশ্রীদুর্গা লিখেছিলাম।"

সামান্য অনুসন্ধানেই চাউলের হাঁড়ীর ভিতর হইতে শ্রীশ্রীদুর্গা-স্বাক্ষরিত নোট এবং টাকা বাহির হইল। তবে দুইটা টাকা বেশী মাত্র। দারোগা বলিলেন, "এ আর কোন চুরীর বামাল নিশ্চয়।"

বামাল বাহির হইতে দেখিয়া চক্রবর্ত্তী যেন অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন, এমনই ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এ্যাঁ, চরণের এই কাজ? হাঁ রে বাবা চরণ, আমি বুড়ো বামুন—"

চরণ উত্তরে চক্রবর্ত্তীর মুখের উপর স্নিগ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৃদু হাস্য করিল মাত্র।

দারোগা বামাল সহ আসামীকে চালান দিলেন। রাস্তা দিয়া যাইবার সময় গ্রামের লোকে কত টিট্‌কারী দিতে লাগিল। গোবিন্দ মুখুয্যে বলিলেন, "কোথায় যাচ্চিস্ চরণ, বৃন্দাবনে না কি?"

চরণ হাতকড়ি শুদ্ধ হাত কপালে ছোঁয়াইয়া বলিল, "পেন্নাম, তিনি যেখানে নিয়ে যাচ্ছেন, সেইখানেই যাচ্ছি দা-ঠাকুর।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "উঃ, বেটা কি বদমায়েস! চোর, ডাকাত, বেটার ফাঁসী হওয়া উচিত। ইঃ, বেটা আবার হরিনাম করে। চোরের আবার হরিনাম।" বলিয়া চক্রবর্ত্তী লাঠী ঠক্‌-ঠক্ করিতে করিতে স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আখড়ার সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় শুনিলেন বাবাজীর জনৈক শিষ্য পাষণ্ড-দলনের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিতেছে—

"মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে।
ব্রাহ্মণ হয়ে চণ্ডাল হয় যদি হরি ত্যজে॥"

দিন দুই পরে চক্রবর্ত্তী এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাঠ হইতে ফিরিবার সময় দেখিলেন, এক জন মেয়েমানুষ একটা ছেলের হাত ধরিয়া চরণের কুটীর-সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে—"সোনার বাপ, সোনার বাপ!"

চক্রবর্ত্তী বলিয়া উঠিলেন, "বৃন্দাবনে গেছে গো, সে শ্রীবৃন্দাবনে গেছে। অধম পাতকী আমরা এই আমড়াগঞ্জে প'ড়ে আছি।"

তাঁহার সঙ্গের কৃষকেরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। গরবী উঠানের ধূলার উপর বসিয়া পড়িল।

সম্পূর্ণ

দাদামহাশয়

"মেন্‌কি, ও মেনি, লক্ষ্মীছাড়ি!"

"কেন গা, দাদামশায়?"

দাদামহাশয়ের সরোষ আহ্বানে মেনকা তাঁহার সম্মুখে আসিল। দাদামহাশয় কাঁধের চাদরটা দাওয়ার এক পাশে ছুড়িয়া ফেলিয়া উগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "মেনা! তোকে না রাস্তায় ছুটে বেড়াতে পই পই বারণ ক'রে দিইছি? তবু তুই রাস্তায় যাবি? হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে!"

মেনকা ঘাড় নীচু করিয়া ভারী গলায় বলিল, "আমি তো আর রাস্তায় যাই নে।"

দাদামহাশয় বলিলেন, "আবার মিথ্যে কথা! কাল রাস্তায় যাস্‌ নি?"

মেনকা সঙ্কুচিত-কণ্ঠে বলিল, "সে ত একবার গিয়েছিলাম, রাধী আমায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।"

"রাধী তোর মাথা খেয়েছিল" বলিয়া দাদামহাশয় দাওয়ায় বসিয়া পড়িলেন; চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "বৌমা! বৌমা!"

বধূ রমা রন্ধনশালায় ছিল। সে সকড়ী ডানহাতটা উঁচু করিয়া বাঁ হাঁতে মাথায় কাপড় টানিতে টানিতে বাহিরে আসিল। শ্বশুর তাহার দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "ঐ হতভাগা মেয়েটার তরে আমি গলায় দড়ি দেব, না দেশান্তরী হব বল দেখি? একে তো ঐ রূপের ধ্বজা মেয়ে, তার উপর যদি নেংটা কালীর মত রাস্তায় নেচে বেড়ায়, তা হ'লে কে ওকে নেবে বল দেখি? আমার যে চারিদিকে শত্রু!"

রমা কোন উত্তর করিল না, শুধু একবার বক্র সরোষ দৃষ্টিতে মেনকার দিকে চাহিল। শ্বশুর বলিতে লাগিলেন, "তাই তো বলি, ঘোষপুরের রাজীব ঘোষাল এক কথার মানুষ, কাল মেয়ে দেখে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবার কথা, সে মানুষ কেন এলো না? ভোরে উঠেই ছুটেছিলাম। ব্যাপার কি জান বৌমা, তারা এসেছিল। তার পর নিতে চক্রবর্ত্তী রাস্তার মাঝে ঐ রূপের ধুচুনীকে দেখিয়ে দেয়। ঐ নেংটা কালীমূর্ত্তি দেখেই তারা আস্তে আস্তে স'রে পড়েছে। আমি এখন কি করি বল তো বৌমা, তুমি কোথা হ'তে এ ফাঁসি এনে বুড়োর গলায় দিলে?"

রমা নিরুত্তরে বাঁ হাতে গাড়ুটা লইয়া শ্বশুরের কাছে আগাইয়া দিল। শ্বশুর পা ধুইয়া ঘরে ঢুকিয়া তেল মাখিতে বসিলেন।

ভরাহাটেই যজ্ঞেশ্বর বাপুলীর হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যাহাদের লইয়া কেনা-বেচা, তাহারা একে একে চলিয়া গেল, শোকজীর্ণ বুকে কর্ম্মভোগের বোঝা লইয়া বৃদ্ধ ভাঙ্গা হাটে বসিয়া রহিলেন; আর কতক্ষণে সূর্য্য অস্ত যায়, কতক্ষণে কালসন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু শুধু সেই সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, ভাঙ্গা হাটেও দোকান খুলিয়া তাঁহাকে কেনা-বেচা করিতে হইল। সাধ্বী সহধর্ম্মিণী চলিয়া গিয়াছিলেন, উপযুক্ত পুত্র নির্ম্মল, ঘর-আলো-করা পৌত্র গোপাল, কন্যা সরস্বতী সব চলিয়া গিয়াছিল, শুধু স্বামিপুত্রহীনা পুত্রবধূ রমা তাঁহারই মত শোকজীর্ণ হৃদয় লইয়া তাঁহার পাশে প'ড়িয়া রহিল। সুতরাং বাপুলী মহাশয়কে ভ'ঙ্গা-হাটেও আবার দোকান পাতিয়া বসিয়া থাকিতে হইল।

বাপুলী মহাশয়ের মত সাদাসিধা লোক গ্রামে ছিল না বলিলেও হয়, কিন্তু ইদানীং তাঁহার মেজাজটা বড় রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, একটুতেই রাগিয়া আগুন হইতেন। সংসারের আঘাতের পর আঘাতে হৃদয়টা এতই ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল যে, সেখানে একটু ঘা লাগিলেই তিনি অধীর হইয়া উঠিতেন। এ অধীরতা স্থায়ী না হইলেও সেই আঘাতের মুহূর্ত্তটি কিন্তু এমন ভয়ানক হইয়া উঠিত যে, বুড়ো বুঝি এবার পাগল হইবে।

বুড়া কিন্তু পাগল হইলেন না; শোকের ভারটা শোকতাপহারীর চরণে নিবেদন করিয়া, অনাথা বধূর মুখ চাহিয়া, সংসারের কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন; বধূও শোকাকুল জরাজীর্ণ শ্বশুরের সেবাকেই ইহলোকের একমাত্র কর্ত্তব্য ভাবিয়া লইল। উভয়েই ভাবিল, এইরূপে চলিতে চলিতেই এক দিন এই শুষ্ক মরুময় পথের প্রান্তসীমায় উপনীত হইবে। কিন্তু যাহা ভাবিল, তাহা হইল না। সহসা আর একটি ক্ষুদ্র হৃদয় তাহাদেরই মত সংসারচক্রের চাপে দলিত নিষ্পিষ্ট হইয়া, তাহাদের শূন্য বুকের এক পাশে স্থান লইল। সে রমার ভ্রাতুষ্পুত্রী মেনকা।

ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ যখন মারা গেল, তখন মেনকা পাঁচ বছরের মেয়ে। দেখিবার কেহ ছিল না, অগত্যা রমা তাহাকে আনিয়া নিজের কাছে রাখিল। শ্বশুর বলিলেন, "এ আপদ্ আবার জড়ালে কেন বৌমা ?"

রমা উত্তর করিল, দেখ্‌বার কেউ নেই ব'লে এনেছি, দিনকতক থাক্।"

কিন্তু দিনকতক পরে রমা যখন বলিল, "মেয়েটাকে আমার পিস্‌তুত বোনের কাছে পাঠিয়ে দেব বাবা ?" তখন বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "যখন এনেছ, তখন কি আব পাঠিয়ে দেওয়া ভাল দেখায় ? বল্‌বে, এক মুঠো ভাত দিতে পার্‌লে না। কুটুম্বের কাছে একটা লজ্জাব কথা। আর তোমারও তো মনবুঝ্ একটা থাকা দরকার।"

শ্বশুরের অভিপ্রায় বুঝিয়া রমা মৃদু হাসিল। মেনকা পিসীমা ও দাদামহাশয়ের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

এক এক সময় বাপুলী মহাশয় মেনকার ক্রন্দনে, উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিরক্তভাবে বলিতেন, "তুমি কেন এ আপদ্ জোটালে বৌমা, আমার সোনার সংসার ছারখারে গেল, শেষে কি না, এই লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটাকে নিয়ে কর্ম্মভোগ। দূর ক'রে দাও,—দূর ক'রে দাও!"

আবার কখন বা রমা মেয়েটাকে গালাগালি দিলে, বা মারিলে বাপুলী মহাশয় বলিতেন, "আহা, কেন ওকে গালমন্দ দাও, মারধর্ কর বৌমা, ওর আর মুখ চাইতে কে আছে ?"

রমা রাগিয়া বলিত, "কেউ যখন নেই, তখন হতভাগীও চুলোয় যাক্ না।"

বিষাদ-গম্ভীর-স্বরে বাপুলী মহাশয় বলিতেন, "চুলোয় তো সকলেই গেছে বৌমা, একটা পরের মেয়ে, সেও যদি চুলোয় যায়, তবে সংসারে আর থাক্‌বে কি ?"

এমনই আদর ও অনাদরের মধ্য দিয়া মেনকা যখন একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল, তখন সহসা বাপুলী মহাশয়ের চমক ভাঙ্গিল. মেনকার যে বিবাহ দিতে হইবে।

বিবাহ দেওয়া কিন্তু সহজ হইল না। একে কালো মেয়ে, তাহার উপর মা-বাপ-মরা! সুতরাং এরূপ কুরূপা লক্ষণহীনা মেয়েকে সহজে কেহ গ্রহণ করিতে রাজী হইল না। যে রাজী হইল, সে তাহার বিনিময়ে এরূপ কাঞ্চনমূল্য চাহিয়া বসিল যে, বাপুলী মহাশয় ভয়ে তাহাদের সম্মুখে অগ্রসর হইতেই সাহসী হইলেন না। তিনি গ্রামের পর গ্রাম ঘুরিয়া পাত্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পাত্র খুঁজিতে খুঁজিতে মেয়ে বারো বছরে পড়িল, তথাপি বাপুলী মহাশয় তাহার বিবাহ দিতে পারিলেন না। যতই অকৃতকার্য্য হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিতে লাগিল।

২

শ্বশুর ঘরে ঢুকিলে রমা একবার তীব্রদৃষ্টিতে মেনকার দিকে চাহিল; তার পর দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া কঠোরস্বরে ডাকিল, "মেনকি!"

মেনকা শঙ্কিত দৃষ্টিতে পিসীমার মুখের দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল। রমা ক্রোধকম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "পোড়াকপালী, তোর কি মরণ নেই ? সব খেয়ে শেষে আমাকে জ্বালাতে এসেছিস্ ? তোর জন্যে আমাকে কথা শুনতে হয় ?"

মেনকা মৃদু-গম্ভীর-স্বরে উত্তর দিল, "তা আমি কি কর্‌বো ?"

গর্জ্জন করিয়া রমা বলিল, "তুই কি কর্‌বি ? আমার শ্রাদ্ধ কর্‌বি। খ্যাংরা মেরে বিদেয় কর্‌বো, তা জানিস্ ?"

মেনকা মুখ তুলিয়া উদ্ধত কণ্ঠে বলিল, "কৈ, মার দেখি খ্যাংরা। যদি না মার—"

"তবে লা আবাগী" বলিয়া রমা ছুটিয়া আসিল এবং বাঁ হাত দিয়া মেনকার পিঠে কিল, চড় বসাইয়া দিল। মেনকা মুখে হাত চাপা দিয়া কাঁদিয়া উঠিল, রমা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল।

বাপুলী মহাশয় ঘরের বাহিরে আসিলেন এবং মেনকার দিকে চাহিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, ধীর-গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "মেনীকে মার্‌লে বৌমা ?"

রমা রন্ধনশালা হইতে ক্রোধগম্ভীর-স্বরে উত্তর দিল, "মার্‌বো না তো কি কর্‌বো ? পোড়াকপালী সকলকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে।"

বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "জ্বালালে আর কাকে বৌমা, আমাকে ? তা হ'লে ওটা তোমার মেনীকে মারা হ'লো না, আমাকেই মারা হ'লো। আমি রাগের মাথায় দু'কথা বলেছি বলেই তো মেয়েটাকে মার্‌লে।"

রমা আর কোন উত্তর করিল না, আপনার মনে গজ-গজ করিতে লাগিল। বাপুলী মহাশয় অভিমান-ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ঘুরে ফিরে এসে বড় রাগটা হয়েছিল বলেই দু'কথা বলেছিলাম। তাতে তুমি এত রাগ কর্‌বে জান্‌লে বল্‌তাম না। তা বৌমা,

এবার যদি কখনো কিছু বলি, তা হ'লে আমি বামুন হ'তে খারিজ।"

বাপুলী মহাশয় গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া দ্রুত-পদে স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। মেনকা দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ কাঁদিল, তার পরে আঁচলে চোখ মুছিয়া দাদামহাশয়ের খড়ম প্রভৃতি যথাস্থানে রাখিয়া দিল।

বাপুলী মহাশয় স্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুর-ঘরে ঢুকিলেন। ঠাকুর-ঘরে কোন দিনই তাঁহার এক ঘণ্টার বেশী দেরী হইত না; আজ কিন্তু মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল, তথাপি তাঁহার পূজা শেষ হইল না। রমা রাঁধাবাঁড়া শেষ করিয়া শ্বশুরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মেনকা গিয়া ঠাকুর-ঘরের দরজায় দাঁড়াইল। দেখিল, তখনও দাদামহাশয়ের পূজা শেষ হয় নাই, পূজাই হয় নাই। পুষ্পপাত্রে ফুল, চন্দন, তুলসী সব সাজানো রহিয়াছে। দাদামহাশয় শুধু উভয় জানুর উপর উভয় করতল স্থাপন করিয়া নির্নিমেষদৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া আছেন। মেনকা যে আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছে, তাহাও যেন তিনি জানিতে পারেন নাই।

মেনকা ধ্যানমগ্ন দাদামশায়ের নিশ্চল মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে ডাকিল, "দাদামশায়, দাদামশায়!"

বাপুলী মহাশয় চমকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন। মেনকা বলিল, "দুপুর যে গড়িয়ে গেল দাদামশায়!"

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সহিত "হুঁম্" শব্দ উচ্চারণ করিয়া, বাপুলী মহাশয় পুনরায় আচমন করিলেন এবং ফুল-চন্দন লইয়া ব্যগ্রহস্তে ঠাকুরের মাথায় চাপাইতে লাগিলেন। মেনকা দরজার বাজু ধরিয়া এক-পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

ফুল, চন্দন, তুলসী সব যখন নিঃশেষ হইল, তখন বাপুলী মহাশয় বাষ্পসজল-দৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে গভীর বেদনাপ্লুতকণ্ঠে বলিলেন, "দামোদর! মেয়েটার একটা গতি ক'রে দাও, এ অভাগা বুড়োকে শেষ ছুটী দাও ঠাকুর!"

বৃদ্ধের শোকদীর্ণ হৃদয়নিঃসৃত একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস সশব্দে গিয়া দামোদরের চরণপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িল। মেনকা ধীরে ধীরে সরিয়া আসিল।

৩

"হ্যাঁ রে মেনি!"

"কেন?"

"তোর বিয়ের ঠিক হয়ে গেল?"

"হোক না হোক, তোমার সে কথায় দরকার কি?"

কথাটা হইতেছিল, নিতাই চক্রবর্ত্তীর ভাগিনেয় ক্ষেত্রনাথ বা খেতুর সঙ্গে। খেতু ছিপ ফেলিতেছিল, আর মেনকা তাহার পাশে বসিয়া দুর্ব্বাঘাস খুঁটিতেছিল। খেতু মেনকার এক জন প্রধান সঙ্গী ছিল। সে খেতুর নিকট মার খাইত, গালি খাইত, খেতুকে গালি দিত, অথচ দিনের অধিকাংশ সময় তাহার পাছু পাছু ছুটিয়া বেড়াইত। খেতুও মেনকাকে মারিত, গালি দিত, কিন্তু আর কেহ মেনীকে একটা কথা বলিলে তাহার উপর বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িত। যদি সঙ্গীদের কেহ উপহাস করিয়া বলিত, "হ্যাঁ রে খেতু, তুই মেনীকে বিয়ে করবি?" তাহা হইলে খেতু রাগিয়া বলিত, "বোয়ে গেছে আমার বিয়ে করতে। এমন স্যাওড়াতলার পেত্নীকেও আবার বিয়ে করে?"

আপনাকে পেত্নী বলিতে শুনিয়া মেনকাও রাগিয়া উঠিত। সে খেতুকে সম্বোধন করিয়া বলিত, "আমি যদি স্যাওড়াতলার পেত্নী, তবে তুই কি আমড়াগাছের ভূত?"

খেতু বলিত, "আমি ভূতই হই, আর যা হই, তাই ব'লে তোর মত কালপেঁচাকে বৌ করব না।"

মেনকা রাগে চোখ কপালে তুলিয়া বলিত, "তোর বৌ যদি আমার চেয়ে কালপেঁচা না হয়, তবে আমার নাম মেনকাই নয়।"

খেতু হাসিয়া বলিত, "তোর নাম তো মেনকা নয়, মেনী।"

এ সব আগেকার কথা। এখন খেতুর বয়স হইয়াছিল, মেনকাও বড় হইয়াছিল। এখন আর বিবাহের কথা উঠিত না। মেনকাও আর সর্ব্বদা খেতুর সঙ্গে বেড়াইত না। তবে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্ত্তা হইত; ঝগড়াও যে না হইত, এমন নয়।

খেতুর মামা একে বড়লোক, তাহার উপর বাপুলী মহাশয়ের সহিত তাঁহার বনিবনাও ছিল না। আগে অনেক মামলা-মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে; এখন দলাদলি, ঘরাও ঝগড়া মাঝে মাঝে চলিত। সুতরাং খেতুর সহিত মেনকার বিবাহের সম্ভাবনা কোন পক্ষেরই মনে একবারও উঠে নাই। উঠিলেও কোন ফল হইত কি না, বলা যায় না। কেন না, খেতুর মামা ভাগিনেয়ের বিবাহ দিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

খেতু মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাল না তোকে দেখতে এসেছিল? দেখে কি বললে?"

মেনকা উবু হইয়া বসিয়া একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল, "বল্‌লে, দিব্যি মেয়ে।"

জলের উপর ফাতনা নড়িতেছিল; খেতু তাহার দিকে স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সহাস্যে বলিল, 'তার পর?"

মেনকা। তার পর কি, খেয়ে দেয়ে চ'লে গেল।

খেতু। কি খেলে? তোর মাথা?

মেনকা। না, একটা বড় রুই মাছের মাথা।

খেতু। রুইমাছটা কত বড় মেনি?

চারের কাছে একটা মাছ ঘাই দিল, মেনকা সেইখানে একটা বড় ঢিল ফেলিয়া সহাস্যে বলিল, "ঐ রকম বড়।"

খেতু ছিপ ছাড়িয়া মেনকার দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "চারে ঢিল ফেল্‌লি যে?"

মেনকাও গলায় জোর দিয়া উত্তর দিল, "তুমিও কা'ল লোকগুলাকে রাস্তা থেকে ফিরিয়ে দিলে যে?"

খেতু বলিল, "বেশ করেছি, আমার খুসী।"

মেনকা বলিল, "আমিও ঢিল ফেলেছি, আমার খুসী।"

হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া খেতু বলিল, "আচ্ছা, কেমন তোর খুসী দেখ্‌বি?"

মেনকা বলিল, "মার্‌বে না কি?"

খেতু বলিল, "মার্‌বো না তো তোকে ভয় কর্‌বো না কি?"

মেনকা তাহার মুখের দিকে অতি কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

খেতু একবার তাকাইয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল এবং ছিপ তুলিয়া বঁড়শীতে নূতন টোপ গাঁথিতে লাগিল।

মেনকা উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং তীব্রকণ্ঠে বলিল, "লজ্জা করে না? একটা বুড়ো মানুষ দায় থেকে উদ্ধার হবার জন্যে সারা দেশটা ছুটে বেড়াচ্চে, আর তুমি গেলে কি না তাতে ভাংচি দিতে? মুখ নেড়ে আজ আমায় আবার জিজ্ঞেসা কচ্চো? ছিঃ—"

খেতু দাঁত দিয়া ঠোঁটটা জোরে চাপিয়া ধরিল। মেনকা জোরে জোরে পা ফেলিয়া পুকুর-ধার হইতে চলিয়া গেল। কিছু দূর চলিয়া গেলে খেতু একবার ফিরিয়া তাহার দিকে চাহিল। তার পর চার, টোপ, সব জলে ফেলিয়া দিয়া, ছিপ গুটাইতে লাগিল।

৪

অপরাহ্লে বাপুলী মহাশয় ফুলগাছের বেড়া বাঁধিতেছিলেন। মেনকা বেড়ার অপর পাশে বসিয়া দড়ি গলাইয়া বেড়ার বাখারিটাকে সোজা করিয়া ধরিয়া তাঁহার সাহায্য করিতেছিল। সহসা মেনকা বলিল, "দাদামশায়!"

দাদামশায় উত্তর দিলেন, "কেন মেনি?"

মেনকা। আজকাল তোমার বড্ড বেশী রাগ হয়েছে, না দাদামশায়?

বাপুলী। বড্ড বেশী।

মেনকা। কেন এত রাগ হয়েছে দাদামশায়?

বাপুলী মহাশয় ঈষৎ হাসিলেন; বলিলেন, "সাধে কি রাগ হয় রে দিদি, এ'কে তো শোকে তাপে বুকের হাড়-পাঁজরাগুলো পর্য্যন্ত জ'লে খাক্ হয়ে আছে। তার উপর তোর বয়স বাড়্‌ছে, তোর একটা গতি কর্‌তে পার্‌ছি না। চারিদিকে শত্রু, তারা হাস্‌ছে। সারা দেশটা খুঁজে একটা পাত্র পাই না। এর উপর যদি আপনাদের দোষে হাতছাড়া হয়ে যায়, তা হ'লে রাগ হয় কি না, বল্ দেখি?"

মেনকাও মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা হয় দাদামশায়।"

বাপুলী। তবে?

মেনকা। তা তুমি রেগেছিলে, বেশ করেছিলে।

বাপুলী। রাগ চণ্ডাল, কি করি বল্, বুড়ো হয়েছি, এখন আর মাথার ঠিক রাখতে পারি না।

মেনকা কোন উত্তর দিল না। বাপুলী মহাশয় দড়ির ফাঁসটা টানিতে টানিতে বলিলেন, "আচ্ছা মেনি!"

মেনকা। কি দাদামশায়?

বাপুলী। আমার কথায় তোর সে দিন খুব দুঃখ হয়েছিল?

মেনকা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "একটুও না।"

বাপুলী। সত্যি?

মেনকা। সত্যি। পিসীমা খুব রেগে উঠেছিল।

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "ও বেটীর কথা ছেড়ে দে। শোকে-তাপে ও ভাজা-ভাজা হয়ে আছে।"

মেনকা একটু অভিমানের সুরে বলিল, "তা ভাজা হয়ে আছে ব'লে বুঝি আমাকে মারবে?"

সহাস্যে বাপুলি মহাশয় বলিলেন, "সে তোকে মারে না মেনি, নিজে নিজেকে মারে। তুই জানিস্ না, কিন্তু আমি জানি; তোর পিঠে যে মারটা পড়ে, তার দশগুণ পড়ে ওর উপর। ঐ যা, ফাঁসটা খুলে গেল, দে দিদি, দড়িটা ভাল ক'রে দে।"

মেনকা দড়িটা পুনরায় লাগাইয়া দিতে দিতে বলিল, "দেখ দাদামশায়!"

বাপুলী। কি?

মেনকা। সে দিন তাদের কে ফিরিয়ে দিয়েছিল, জান?

বাপুলী। বোধ হয়, ঐ চক্রবর্ত্তী, নয় তো সাধন ঘোষ।

মেনকা। না দাদামশায়, ওরা নয়।

বাপুলী। তবে কে?

মেনকা। ঐ খেতা ছোঁড়া।

মাথা নাড়িতে নাড়িতে বাপুলীমহাশয় বলিলেন, "না না, ও এমন কাজ করতে যাবে কেন?"

মেনকা দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ দাদামশায়, আমি তোমার দিব্যি ক'রে বলতে পারি।"

বাপুলী। বটে, তা হ'লে কেউ বোধ হয় শিখিয়ে দিয়েছিল। নৈলে ক্ষেত্তর তো তেমন ছেলে নয়।

মেনকা রাগত-স্বরে বলিল, "না, খুব ভাল ছেলে! তোমার কাছে সবাই খুব ভাল!"

বাপুলী মহাশয় নীরবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। মেনকা বলিল, "কিন্তু দাদামশায়, তুমি আর অত ছুটোছুটি কত্তে পাবে না, তা ব'লে দিচ্চি।"

বাপুলী মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ছুটোছুটি না করলে, বর জুটবে কোথা হ'তে রে পাগলি!"

জোরে মাথা নাড়িয়া মেনকা বলিল, "তা না জোটে না জুটবে।"

বাপুলী। বর না জুটলে বিয়ে হবে কেমন ক'রে?

মেনকা। যেমন ক'রে হয় হবে।

বাপুলী। কেমন ক'রে হবে বল্। তবে কি আমার গলাতেই মালা দিবি?

মেনকা। তাই দেব।

বাপুলী মহাশয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মেনকা লজ্জায় মুখ নীচু করিল। বাপুলী মহাশয় সহাস্যকণ্ঠে বলিলেন, "আরে ভাই, তুই যেন এই বুড়োর গলায় মালা দিলি, আমার কি আর সে সময় আছে দিদি, এখন যাত্রা করলেই হয়।"

অন্তর্নিহিত পুঞ্জীভূত বেদনা একটা দীর্ঘনিশ্বাস-রূপে বাহির হইয়া পড়িল। মেনকাও একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল। বাপুলী মহাশয় তখন বেড়া বাঁধিতে বাঁধিতে গুন্-গুন্ করিয়া গান ধরিলেন,—

"অবেলায় হাট ভাঙ্‌লি শ্যামা,
কি নিয়ে মা ঘরে ফিরি।
ভরা হাটের হেটো যারা, একে একে গেল তারা,
আমি কর্ম্মদোষে রইলাম ব'সে
পাপের বোঝা শিরে ধরি।"

মেনকা বলিল, "তুমি ত বেশ গাইতে পার দাদা-মশায়।"

বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "আর ভাই, এমন এক দিন ছিল, যখন তোর দাদামশায়ের গান শুনবার জন্য কত লোক হাঁ ক'রে থাকতো।"

মেনকা। কৈ, এদ্দিনের ভিতর এক দিনও তো তোমাকে গান গাইতে শুনি নি।

বাপুলী। শুনবি আর কোথা থেকে বল্, নিমে ছোঁড়া কি কিছু রেখে গিয়েছে; গান, সুর, তাল সব ভুলিয়ে চ'লে গেছে। আজ তোর সঙ্গে কথায় কথায় হঠাৎ মনটা কেমন হয়ে উঠলো, তাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

মেনকা আগ্রহের সহিত বলিল, "বেশ মিষ্টি গান, তুমি গাও দাদামশায়।"

"মিষ্টি!" বলিয়া বাপুলী মহাশয় মৃদু হাসিয়া গাহিতে লাগিলেন,—

"রবি যে বসেছে পাটে, কি করবো এই ভাঙ্গা হাটে,
নে মা কোলে অভাগারে, দে মা তোর ঐ চরণ-তরী।"

অস্তোন্মুখ রবি শেষ রক্তিমচ্ছটায় বৃদ্ধের গণ্ড রঞ্জিত করিয়া চক্রবালপ্রান্তে অদৃশ্য হইল। বৃদ্ধ উদ্বেল-প্রাণে বিহ্বল-কণ্ঠে বার বার আবৃত্তি করিয়া গাহিতে লাগিলেন,—

"নে মা কোলে অভাগারে, দে মা তোর ঐ চরণ-তরী।"

৫

"নমস্কার মহাশয়, আপনারই নাম বোধ হয়, যজ্ঞেশ্বর বাপুলী? এটি বুঝি আপনার দৌহিত্রী? তা দেখতে এমন মন্দই বা কি, রংটা একটু ময়লা, তা এর চেয়েও—বুঝলেন কি না, কালো মেয়ে অনেক আছে। আমি কিন্তু—বুঝ্‌লেন কি না—কালো মেয়েই পছন্দ করি; গেরস্ত ঘরে সুন্দরী নিয়ে কি হবে? কথাতেই আছে—'গাই কিনবে ঝাঁপড়ি, বৌ আনবে'—বুঝলেন কি না,—হা হা হা হা।—"

এক নিশ্বাসে এতগুলা কথা বলিয়া ফেলিয়া আগন্তুক হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। বাপুলী মহাশয় বিস্ময়বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে এই নবাগতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মেনকা দড়ি ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

আগন্তুক তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "দিব্যি মেয়েটি, কালো হ'লে কি হয়, লক্ষণযুক্ত।" তার পর বাপুলী মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমাকে বোধ হয় চিনতে পারবেন না, চিনবেনই বা কেমন ক'রে? দেশে ত থাকি না, কচিৎ কখনও যাই

আসি। কলকাতায় চাকরী করি, সেইখানেই এক প্রকার বসবাস। আমার নাম—বুঝ্‌লেন কি না—প্রাণকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, ঠাকুরের নাম ৺ধনকৃষ্ণ গাঙ্গুলী।"

বাপুলী মহাশয় ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আগন্তুক হাত নাড়িয়া বলিলেন, "আহা হা, ব্যস্ত হবেন না, আমি এইখানেই বস্‌ছি,—"বুঝ্‌লেন কি না – দিব্বি জায়গা, হা হা হা হা।"

হাসিতে হাসিতে আগন্তুক সেইখানে ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন। বাপুলী মহাশয় ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, "না না, এখানে বসাটা কি ভাল দেখায় ?"

আগন্তুক সহাস্যে বলিলেন, "মন্দই বা কি, আপনি বসুন, এইখানে বোসেই কথাবার্ত্তা স্থির হয়ে যাক্। আপনারও দেখ্‌ছি আমার মত ফুলগাছের সখ। তা কলকাতায় এমন ফাঁকা জায়গা কোথায় পাই বলুন, কাজেই –বুঝ্‌লেন কি না—টবেই বসাতে হয়েছে। দুধের স্বাদ—বুঝ্‌লেন, কি না—ঘোলেই মেটাতে হয়, হা হা হা হা।"

এই অদ্ভুত-প্রকৃতির লোকটিকে লইয়া বাপুলী মহাশয় যে কি করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। আগন্তুক কিন্তু আপন মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আপনি না কি নাতনীটি নিয়ে বড় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তা আপনার কোন চিন্তে নাই। আমারও এক ছেলে, পাশটাশ নাই বটে, কিন্তু লেখা-পড়ায় হিসাব-নিকাশে একেবারে হুমুরী। কত জায়গা থেকে সম্বন্ধ আস্‌ছে। তা বুঝ্‌লেন কি না—সম্বন্ধ কি এলেই হলো ? মেয়েটি লক্ষণযুক্ত, মনের মত, বংশটি ভাল, এ সকল চাই তো। টাকা—ছাই টাকা,—টাকায়—বুঝলেন কি না—কি আসে যায়। এই বয়সে কত টাকা রোজগার, কত টাকা খরচ কর্‌লাম। হা হা হা হা !"

বাপুলী মহাশয় এই নবাগতের সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন ; বলিলেন, "তা উঠে বৈঠকখানায় চলুন, একটু তামাক-টামাক—"

বাধা দিয়া আগন্তুক বলিলেন, "বল্‌ছি তো, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি তামাক খাই না। কোন নেশারই—বুঝ্‌লেন কি না—বশ হওয়া ভাল নয়। তামাক যে খেতাম না, তা নয় ; বল্‌লে না বিশ্বাস করবেন, দিনে একশ ছিলিম তামাক, রাত্রে ঘুমুতে ঘুমুতে উঠে তামাক খেতাম। তার পরে এক দিন—বুঝ্‌লেন কি না—ইষ্টিমারে কল্‌কাতায় যাচ্ছি, এক বেটা চাষা নারকেল-ছোবড়ায় আগুন ধরিয়ে তামাক খাচ্ছে। বড়ই ইচ্ছে হলো। গিয়ে হাত বাড়ালাম। তা বেটা চাষা বল্লে কি জানেন, 'থামো ঠাকুর, তোমার লেগে সাজা হয় নি।' মনে বড়ই ধিক্কার হলো। সেই দিন থেকে, বুঝ্‌লেন কি না—একেবারে ত্যাগ—হুঁকো, কল্‌কে, টিকে, তামাক সব গঙ্গার জলে—হা হা হা হা !"

অতঃপর বাপুলী মহাশয়ের অনুরোধে আগন্তুক প্রাণকৃষ্ণ গাঙ্গুলীকে উঠিয়া আসিয়া বৈঠকখানায় বসিতে হইল, সন্ধ্যার পর আর একবার মেয়ে দেখা হইল, মেয়ে দেখিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন। আদান-প্রদানের কথা উঠিলে বলিলেন, "এর আবার চুক্তি কি, যারা ইতর, যাদের টাকার খাই—তারাই, বুঝ্‌লেন কি না—আগে হ'তে চুক্তি ক'রে নেয়। আপনার আশীর্ব্বাদে আমার অভাব কি ? আপনার যেমন ক্ষমতা, তেমনি দেবেন, একটি হরিতকী দিয়ে, বুঝ্‌লেন কি না—কন্যা উৎসর্গ করবেন। আমাকে কি সেই রকম চামার পেয়েছেন ! হা হা হা হা !"

পাঁজি খুলিয়া বিবাহের দিন দেখা হইল। মাঘের ২৭শে, ২৮শে ছাড়া আর দিন নাই। ২৮শে যজুর্ব্বিবাহ--ফাল্গুন মাস অকাল। গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "তা হ'লে এই ২৭শে তারিখে শুভকার্য্য নির্ব্বাহ কর্‌তে হবে। ফাল্গুনমাস অকাল, অকালে বিবাহ হ'তেই পাবে না। আজকাল আর এ সব মানে না ; কিন্তু আমি—বুঝলেন কি না—এ সকল খুব মেনে চলি। আমাদের আর্য্য ঋষিরা যে সব ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, তার একটিও বাজে নয়। আজকালকার লোক সব মুখ্যু কি না, এ সকলের কি বুঝ্‌বে ? হা হা হা হা !"

অগত্যা ২৭শে তারিখেই দিনস্থির হইয়া গেল। মাঝে শুধু একটা দিন। পর দিন সকালেই বাপুলী মহাশয় বরের বাপের সঙ্গে গিয়া পাত্র দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। বিবাহের দিন সকালে গাত্র-হরিদ্রা হইয়া গেল।

৬

"বোষ্টম, বোষ্টম,—বেটা বোষ্টমের ছেলে।"

বাপুলী মহাশয় তখন হাতে আলোচাল লইয়া বরের হাঁটু ধরিয়া বরণ করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় একটা গোল উঠিল,—"বোষ্টম, বোষ্টম,—বেটা বোষ্টমের ছেলে।"

কলরব করিতে করিতে গ্রামের একপাল লোক সম্প্রদানস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাপুলী মহাশয়ের হাত হইতে চালগুলা মাটীতে পড়িয়া গেল। এক জন বরের হাত টানিয়া বলিল, "তবে রে বেটা বৈরাগী ?"

বাপুলী মহাশয় বিস্ময়রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "থাম, এ বোষ্টম নয়, প্রাণকৃষ্ণ গাঙ্গুলীর ছেলে অমরনাথ—"

যোগীন পাল চীৎকার করিয়া বলিল, "ওর কোন পুরুষে প্রাণকেষ্ট গাঙ্গুলীর ছেলে নয়, বেটা ডাহা বোষ্টমের ছেলে।"

বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "তার প্রমাণ ?"

ভিড়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়া খেতু বলিল, "তার প্রমাণ—আমি। এ সব আমার মামার কারসাজি বাপুলী মশায়, আপনাকে জাতঃপাত করবার ফন্দী। দেখুন দেখি, আপনি এই বেটাকেই আশীর্ব্বাদ ক'রে এসেছিলেন কি না ?"

এক জন আলোটা সরাইয়া আনিয়া বরের মুখের কাছে ধরিল; বাপুলী মহাশয় বেশ করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "উহুঁ, বোধ হয় যেন সে নয়, যেন একটু তফাৎ—"

খেতু উচ্চকণ্ঠে বলিল, "একটু কি, অনেকটা তফাৎ। সে বামুনের ছেলে, আর এ বেটা বৈরিগীর পুত। গয়ারাম বৈরিগীর ছেলে কেনারাম বৈরাগী। বেটা নাম গেয়ে বেড়ায়, আমি ওর সাতপুরুষের খবর জানি। আর প্রাণকৃষ্ণ গাঙ্গুলীটা কে জানেন ? মামার বেয়াই তাঁরাচাঁদ আকুলি।"

জনকয়েক লোক কেনারাম বৈরাগীকে টানিয়া লইয়া গেল। প্রাণকৃষ্ণ গাঙ্গুলী বা বরযাত্রদের কোনই উদ্দেশ মিলিল না। বাপুলী মহাশয় কুশাঙ্গুরী হস্তে বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

সহসা বাপুলী মহাশয় উঠিয়া দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঘরে মেনকা নবপট্টবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তখনও বসিয়াছিল। বাপুলী মহাশয় গিয়া তাহার হাত ধরিলেন; পাগলের মত চীৎকার করিয়া বলিলেন "আয় মেন্‌কি, তোকে আজ দামোদরের হাতে সম্প্রদান করবো।"

বৃদ্ধ কম্পিত হস্তে মেনকাকে টানিয়া আনিয়া কন্যার আসনে বসাইলেন। পুরোহিতকে বলিলেন, মন্ত্র পড়ান।"

বৃদ্ধের উন্মাদভাব দেখিয়া পুরোহিত ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বাপুলী মহাশয় বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "আপনি মন্ত্র পাঠ করান। লগ্ন অতীত হইয়া যায়।"

পশ্চাৎ হইতে খেতু বলিল, "দামোদর তো আর মন্ত্র বল্‌তে পারবে না, তার হয়ে মন্ত্র বল্‌বে কে ?"

বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "আমি বল্‌বো।"

খেতু বলিল, "তার চেয়ে আমি বলি না কেন ?"

খেতু ফস্ করিয়া বরের আসনে বসিয়া পড়িল। সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত, নির্ব্বাক্! অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "খেতু!"

খেতু হাসিতে হাসিতে বলিল, "যা বল্‌বার, পরে বলবেন, এখন লগ্ন বয়ে যায়।" শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। খেতু মেনকার দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তোর কথা রইল না মেনী, তোর চেয়ে কালপেঁচা আমার বৌ হ'ল না।"

সম্পূর্ণ

মায়ার অধিকার

১

বৃদ্ধ বলরাম দাস সংসারের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া যখন শুচিতা এবং জপ-আহ্নিককেই জীবনের সার করিয়া লইয়াছিল এবং পাপতাপময় সংসার-বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কবে বৃন্দাবনে গিয়া—

"ষড়রস ভোজন দূরেতে পরিহরি,
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইবে মাধুকরী।"

প্রতীক্ষা করিতেছিল, তখন সহসা ভ্রাতার দৌহিত্রী তুলসী চার বৎসরের ছেলেটি লইয়া বিষয়-বিরক্ত বৃদ্ধের তিক্ত চিত্তটাকে আবার সংসারের সহিত জড়াইয়া দিবার জন্য আসিল। বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া ভাবিল, এ আবার কি আপদ্! কিন্তু আপদ্ ভাবিলেও তুলসীকে কিছু বলিতে পারিল না। বলিলেও কোন ফল হইত না। কেন না, এই বৃদ্ধ ছাড়া সংসারে তুলসীর আর দ্বিতীয় অবলম্বন ছিল না। মা-বাপ নাই; বিধবা হইয়া বলরামেরই উদ্যোগে সাপুরের ব্রজদাসের সহিত কণ্ঠী বদল করিয়াছিল। কিন্তু ব্রজদাস যখন জনৈক সেবাদাসীকে লইয়া বামুনবাটীর আখড়ায় স্থায়ী আড্ডা গাড়িল, তখন দাদামশায় ছাড়া তুলসীর আর আশ্রয় রহিল না; সে চার বছরের ছেলে কেষ্টাকে লইয়া দাদামশায়ের দ্বারে উপস্থিত হইল।

মনে মনে বিরক্ত হইলেও বলরাম চক্ষুলজ্জার খাতিরে মৌখিক আদর দেখাইয়া তুলসীকে গৃহে স্থান দিল। তুলসীও যে দাদামশায়ের আদরের মৌখিকতা বুঝিতে পারিল না, এমন নয়, কিন্তু নিরুপায় বলিয়া তাহাকে ইহাই স্বীকার করিয়া লইতে হইল।

খাওয়া-পরার জন্য ভাবনা ছিল না। জমি-জায়গা যাহা ছিল, তাহাতে শুধু এই দুইটা লোকে কেন দশটা লোকের প্রতিপালনও অনায়াসে চলিতে পারিত। কিন্তু পাছে এই দুইটা লোককে লইয়া আবার সংসারে জড়াইয়া পড়িতে হয়, এইটুকুই বলরামের বিশেষ ভয়ের কারণ হইয়াছিল। হায়, যৌবনে পত্নীবিযুক্ত হইয়া সে যে সংসারটাকে মলিন গাত্রবাসের ন্যায় ত্যাগ করিয়াছিল, সেই পরিত্যক্ত ছিন্ন বাসটাকে বার্দ্ধক্যে পরপারে যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে বুঝি আবার জরা-বিশ্লথ স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হয়! হা গোবিন্দ! এ আবার তোমার কি মায়া!

বলরাম যতটা সম্ভব, এই মায়ার রাজ্য হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিত।

তুলসীর জন্য ততটা ভয় ছিল না, যতটা ভয় ছিল, এই ছেলেটার জন্য। ছেলেটা যে শুধু তাঁহার চিত্তে মায়াবন্ধনের ভীতি জাগাইয়া দিয়াছিল, তাহা নহে, তাহার শুচিতা-রক্ষার পক্ষেও যথেষ্ট বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল। সে নির্ব্বোধ শিশু কেবল আপনার শুচিত্বরক্ষায় উদাসীন ছিল না, মধ্যে মধ্যে বৃদ্ধের শুচিত্বপূর্ণ দেহটাকে স্পর্শ করিয়া অশুচি করিবার চেষ্টাও করিত। তাহার নামাবলী স্পর্শ করিত, জপের মালা লইয়া গলায় ঝুলাইত, আহ্নিকের সাজ লইয়া খেলিতে বসিত। তুলসীর যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও আহারের সময় বৃদ্ধকে ছুঁইয়া তাহার খাওয়া নষ্ট করিয়া দিত। বলরাম প্রথম প্রথম কিছু বলিত না বটে, মনে মনে উত্ত্যক্ত হইলেও মুখে তাহা প্রকাশ করিত না, কিন্তু শেষে যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন দুই এক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। তুলসী ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ছেলেকে মারিত; তখন আবার ছেলের চীৎকারে বাড়ীতে থাকা দায় হইয়া উঠিত।

বলরাম প্রথমটা মনে করিয়াছিল, দিনকতক পরেই ব্রজ আসিয়া ইহাদিগকে লইয়া যাইবে। কিন্তু মাসাধিককাল গত হইলেও ব্রজনাথ যখন স্ত্রী-পুত্রের সংবাদ পর্য্যন্ত লইল না, তখন বলরাম এক দিন তুলসীকে বলিল, "আচ্ছা তুলসি, বেজার আক্কেলটা কি, তোদের খবরটাও একবার নিলে না?"

হেঁটমুখে তুলসী উত্তর করিল, "কি জানি।"

ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে বলরাম বলিল, "এর আর জানাজানি কি, হতভাগা একেবারেই বোয়ে গেছে। ছি ছি, এমন অভাগার হাতেও তুই—"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ থামিয়া গেল। হঠাৎ তাহার স্মরণ হইল, এই হতভাগার হাতে তুলসীর পড়িবার কারণ সে নিজেই। তখন ঈষৎ অপ্রতিভভাবে যেন আপনার ত্রুটিটা সংশোধন করিয়া লইবার জন্য বলিল, "তা আমিই বা কি রকমে জান্‌ব বল, আমি তো অন্তর্য্যামী নই যে, লোকের মনের কথা বুঝবো।

তখন কি হাতে-পায়ে ধরা, যেন কতই না ভাল মানুষ। ছি ছি, মানুষকে চেনা দায়।"

বলিয়া বলরাম ক্রোধভরে ব্রজনাথের উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে থাকিত। তুলসী নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া দাদামশায়ের এই নিস্ফল তর্জ্জন নতমস্তকে শুনিত।

২

কেষ্টা কিন্তু বড় গোল বাধাইল। বৃদ্ধের সকল বিরক্তিকে উপেক্ষা করিয়া সে যেন বুড়াকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। বলরাম হয় তো নির্জ্জনে বসিয়া চৈতন্যমঙ্গল পুঁথিখানি খুলিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছে, কেষ্টা আস্তে আস্তে আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। বলরাম তাহার দিকে একবার বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক পাঠে মনোনিবেশ করিল। কেষ্টা এক এক পা অগ্রসর হইয়া একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। বলরাম তাড়াতাড়ি পুঁথিখানাকে কোলের দিকে টানিয়া লইয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "যাঃ।"

কেষ্টা কিন্তু গেল না, সে পাঠনিরত বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বলরাম পড়িতে পড়িতে এক একবার অপাঙ্গে তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং তাহার এই শান্তভাব দর্শনে একটু বিস্ময়ও অনুভব করিল। হঠাৎ পাঠ বন্ধ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে কেষ্টা?"

কেষ্টা কিছু বলিল না, শুধু সকাতর দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। "মা ডাক্‌চে, যা" বলিয়া বলরাম পুনরায় পাঠে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু খানিক পরে মুখ তুলিয়া দেখিল, কেষ্টা যায় নাই, সমানভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। বলরাম বলিল, "কি শুনছিস? পুঁথি?"

কেষ্টা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। বলরাম মৃদু হাসিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিল, "বুঝতে পাচ্ছিস?"

প্রফুল্লমুখে কেষ্টা পুনরায় ঘাড় নাড়িল। বলরাম বলিল, "আচ্ছা বল, হরিবোল।"

কেষ্টা বলিল, "হরিবোল।"

বলরাম কণ্ঠটাকে একটু উচ্চে তুলিয়া বলিল, "ভাল ক'রে বল,—হরিবোল।"

কেষ্টাও উচ্চকণ্ঠে বলিল, "হরিবোল।"

বলরাম হাত দুইটা তুলিয়া জোর গলায় বলিল, "হরিবোল, হরিবোল।"

কেষ্টাও তাহার অনুকরণে কচি কচি হাত দুইটি উপরের দিকে উঠাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "হরিবোল, হরিবোল।"

"হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।"

সহসা দরজায় তুলসীকে দেখিয়াই বলরামের উৎসাহ আবেগ সব যেন কোথা চলিয়া গেল এবং মুহূর্ত্তে মুখখানাকে ক্রোধগম্ভীর করিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা তুলসি, তোদের মতলবখানা কি বল্ তো? আমার অন্নধ্বংস করবি, আর আমার পরকালটারও মাথা খাবি?"

তুলসী ছেলের হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া গেল, বলরাম পুনরায় পাঠে মনোনিবেশ করিল। কিন্তু চৈতন্যমঙ্গল আর তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিল না; দৃষ্টিটা লুব্ধভাবে বার বার দ্বারের দিকে ছুটিয়া চলিল। বলরাম বিরক্তভাবে পুঁথি বাঁধিয়া নরোত্তম দাসের পদ ধরিল—

"দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে,
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে।
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু,
মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম হইনু।
ফল-রূপে পুত্র-কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে,
কাল-রূপে সংসারেতে পক্ষ বাসা করে।"

বলরাম জপে বসিয়াছে; কেষ্টা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। বলরাম ব্যস্তভাবে অস্ফুট শব্দ করিতে করিতে হস্তেঙ্গিতে তাহাকে সরিয়া যাইবার জন্য আদেশ দিতে লাগিল। কেষ্টা কিন্তু সরিল না, সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া সকাতর দৃষ্টিতে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বলরাম হাতে মালা ঘুরাইতে লাগিল, কিন্তু দৃষ্টিটা রহিল কেষ্টার উপর, পাছে সে আসিয়া ছুঁইয়া দেয়। তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে বলরাম বিরক্তির সহিত ভাবিতে লাগিল, "এ আপদ আবার কেন এলো? ডাকি নাই, চাই নাই, তবু হঠাৎ কোথা হ'তে ভূতের বোঝার মত কাঁধে এসে পড়েছে। শুধু তাই নয়, আমার পরকালের পথে কাঁটা দিতে বসেছে। এ হতভাগা ছেলে আমার কাছে আসে কেন? ও চায় কি? স্নেহ, মমতা, ভালবাসা? সে সকলের সঙ্গে আজ বিশ বৎসর সম্বন্ধ নাই; স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তি, যা কিছু সব গোবিন্দের চরণে অর্পণ করেছি। এখন গোবিন্দই আমার সব। মাঝ হ'তে এরা এসে তাঁকে আড়াল ক'রে দাঁড়ায় কেন?"

কেষ্টা বলিল, "হরিবোল।"

বলরাম চমকিয়া উঠিল। কেষ্টা একটু হাসিয়া কচি কচি হাত দুইটিতে তালি দিয়া মধুরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হরিবোল, হরিবোল।"

আহা, শিশুর মুখে হরিনাম কি মধুর! পঞ্চম বৎসরের ধ্রুবও বুঝি এমন মধুর স্বরে, এমনই অস্পষ্ট ভাষায় ডাকিয়াছিল—হরিবোল, হরিবোল। বৃদ্ধ মালাসমেত হাতটা বাড়াইয়া কেষ্টাকে ধরিতে উদ্যত হইল। সহসা বাহিরে কে গাহিয়া উঠিল,—

"এমনি মহামায়ার মায়া
রেখেছে কি কুহক ক'রে;
যাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য,
নরে কি তা জানতে পারে।"

বলরাম যেন সর্পদংষ্টের ন্যায় শিহরিয়া হাত গুটাইয়া লইল। সত্যই মহামায়ার মায়া! ছি ছি, এখনই তাহাকে পুনরায় বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিতে হইত! যে আটশত জপ হইয়াছে, তাহাও নষ্ট হইয়া যাইত। কি উন্মত্ততা! আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলরাম পুনরায় জপে মনোনিবেশ করিল; কিন্তু চিত্তটা যে ক্রমেই মায়ায় জড়াইয়া পড়িতেছে, তাহাই ভাবিয়া ভাবিয়া ভীত হইয়া পড়িল।

ইহাদিগকে লইয়া কি করা যায়? তাড়াইয়া দেওয়াও চলে না, লোকে কি বলিবে, মেয়েটাই বা দাঁড়াইবে কোথায়? তাহারই তো নাতিনী; সুনাম হউক, দুর্নাম হউক, তাহারই হইবে। তা ছাড়া, তুলসীরই বা দোষ কি? খায় দায়, এক পাশে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। সে থাকায় উপকার বই অপকার নাই। আজ বিশ বৎসর নিজে হাত পুড়াইয়া রাঁধিয়া খাইতে হইয়াছে, তুলসী আসিয়া সে পরিশ্রমটা বাঁচাইয়া দিয়াছে। এই বাঁধা-খাওয়ায় কতটা সময় নষ্ট হইত; এই সময়টা হরিনাম করিলে কত কাজ হইবে। কিন্তু যত আপদের মূল এই ছেলেটা। হা গোবিন্দ! এই সর্ব্বনেশে ছেলেটার হাত হ'তে আমায় রক্ষা কর।

৩

"তুলসি, ও তুলসি!"

দাদা মহাশয়ের ক্রুদ্ধ আহ্বানে ভীত হইয়া তুলসী ছুটিয়া আসিল এবং শঙ্কিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে দাদামশায়?"

বলরাম চীৎকার করিয়া বলিল, "হয়েছে আমার শ্রাদ্ধ। তোমার ছেলের তরে আমাকে বাড়ী-ছাড়া হ'তে হবে না কি, বল দেখি?"

তুলসী ভয়ে থমকিয়া দাঁড়াইল, এবং শঙ্কাজড়িত দৃষ্টিতে ঘরের ভিতর চাহিয়া দেখিল, সর্ব্বনাশ, কেষ্টা গিয়া দাদামশায়ের পূজার আসনে বসিয়াছে, চৌকী হইতে গোবিন্দের পট নামাইয়া লইয়াছে, ফুল-চন্দন, তুলসী কতক ঠাকুরের মাথায় দিয়াছে, কতক নিজের গায়ে মাথায় ছড়াইয়াছে। তুলসী স্তম্ভিত দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিল। কেষ্টা মাকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিল, কিন্তু ছেলের হাসির সঙ্গে মা হাসিল না; সে ক্রোধগম্ভীরভাবে অগ্রসর হইয়া ছেলের হাতটা চাপিয়া ধরিল এবং তাহার মুখে, পিঠে, মাথায় প্রহার আরম্ভ করিল। কেষ্টা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; বলরাম স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

তুলসী দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কেষ্টাকে টানিয়া ঘরের বাহিরে আনিতে লাগিল। কেষ্টা বৃদ্ধের মুখের দিকে সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকিল। বলরাম গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিল, "তুলসি!"

তুলসী কোন উত্তর না দিয়া ছেলেটাকে টানিয়া বাহিরে আনিল এবং একগাছা দড়ি আনিয়া তাহাকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিল। তার পর ঘরে ঢুকিয়া পুনরায় পূজার উদ্যোগ করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল। বলরাম গম্ভীরস্বরে বলিল, "আমি কি ছেলেটাকে এমন ক'রে মাত্তে বল্‌লাম, তুলসি?"

তুলসী নিঃশব্দে পূজার স্থান পরিষ্কার করিতে লাগিল। বলরাম বলিল, "এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয় তুলসী, এটা তো কেষ্টাকে মার হ'ল না।"

তুলসী অশ্রুসজল-দৃষ্টি তুলিয়া অভিমান-ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে তোমার ভাত খাওয়া কপালে সইলো না দাদামশায়।"

তুলসী এতক্ষণ যে চোখের জল চাপিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আর বাধা মানিল না; দুই গাল ভাসাইয়া হু হু করিয়া ছুটিল। তুলসী ছুটিয়া ঘরের বাহিরে পলাইয়া আসিল।

বলরাম পূজা করিতে বসিল এবং মধ্যে মধ্যে বাহিরে বন্ধনদশাগ্রস্ত কেষ্টার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেষ্টাও বৃদ্ধের মুখের উপর ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার কাছে যাইবার জন্য ছটফট্‌ করিতেছিল, কিন্তু দৃঢ়বন্ধন হইতে মুক্তিলাভে অক্ষম হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। তাহার সেই সকরুণ দৃষ্টিটা দেখিতে দেখিতে বলরামের হঠাৎ মনে হইল, মা যশোদাও এক দিন এমনি করিয়া গোপালকে বাঁধিয়াছিলেন, আর গোপাল—সেই গোলোকের পতি, জননীর ভক্তিরজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া এমনই সকাতর দৃষ্টিতে মাতার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। বলরাম শিহরিয়া উঠিল এবং আস্তেব্যস্তে উঠিয়া গিয়া কেষ্টার বাঁধন খুলিয়া দিল। বন্ধনমুক্ত হইয়া কেষ্টা

আস্তে আস্তে গিয়া বৃদ্ধের পাশে বসিল। বলরাম তাহার হাতে দুইখান বাতাসা দিয়া পূজা আরম্ভ করিল।

পূজা শেষ করিয়া বলরাম আহার করিতে বসিলে কেষ্টা গিয়া তাহার পাশে বসিল। তুলসী তাহাকে সরিয়া আসিবার আদেশ করিলে বলরাম বলিল, "থাক্ না তুলসি, বালক নারায়ণ, ওরা ছুঁলে কি দোষ আছে?"

দাদা মহাশয়ের এই অস্বাভাবিক উদারতায় তুলসী বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না।

সন্ধ্যার পর মালা করিতে বসিয়া বলরাম জিজ্ঞাসা করিল, "কেষ্টাকে যে দেখ্‌ছি না তুলসি, ঘুমিয়েছে বুঝি?"

তুলসী বলিল, "বিকাল থেকে জ্বর হয়েছে।"

"জ্বর হয়েছে?" শঙ্কাজড়িতস্বরে কথাটা বলিয়াই বলরাম মালা হাতেই যে ঘরে কেষ্টা শুইয়াছিল, সেই ঘরে ছুটিয়া গেল, এবং শুদ্ধাচারের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া শয্যাশায়িত কেষ্টার গাত্রস্পর্শ করিল। তাহার কপালে বুকে হাত দিয়া দেখিল, গা দিয়া যেন আগুন ছুটিতেছে। বলরাম মালাছড়া বিছানার উপর ফেলিয়া পাশে বসিয়া পড়িল এবং তাহার নাড়ী টিপিতে-টিপিতে ডাকিল, "কেষ্টা, কেষ্টা!"

কেষ্টা একবার চক্ষু মেলিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। বলরাম বাহিরে আসিয়া তুলসীকে ডাকিয়া বলিল, "জ্বরটা বড্ড বেশী হয়েছে, তুলসি।"

তুলসী কোন উত্তর দিল না। বলরাম একটু চুপ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "ছেলেটাকে কেন এত মারলি তুলসি?"

ক্রোধ-গম্ভীরস্বরে তুলসী উত্তর করিল, "মারবো না তো কি করবো?"

বলরাম নিঃশব্দে অন্ধকারে বসিয়া কোনরূপে জপ সারিয়া লইল। জপান্তে পুনরায় ঘরে ঢুকিয়া কেষ্টার নাড়ী টিপিল। তার পর বাহিরে আসিয়া বলিল, "বড্ড জ্বর তুলসি।"

তুলসী রন্ধনশালায় ছিল, কোন উত্তর দিল না। বলরাম রান্নাঘরের দরজায় গিয়া বলিল, "ডাক্তার ডাকবো?"

তুলসী বলিল, "এত তাড়াতাড়ি কেন, সবে তো বিকেলে জ্বর হয়েছে।"

বলরাম আর কিছু বলিল না, কিন্তু তাহার মনের ভিতর বড় অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। তুলসীর প্রহারই যে ছেলেটার জ্বরের মূল কারণ, তাহা বুঝিতে বলরামের বিলম্ব হইল না; কিন্তু সেই প্রহারের মূলে যে নিজের অসঙ্গত ক্রোধটা রহিয়াছে এবং তাহার ফলেই এই অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে, ইহাই একটা দুঃসহ স্মৃতির মত মনের ভিতর জাগিয়া উঠিতেছিল। তুলসী তো ছেলের উপর রাগিয়া ছেলেকে মারে নাই, তাহার উপর রাগিয়াই ছেলেকে মারিয়া রাগের শোধ লইয়াছে। এখন যদি ছেলেটার ভাল-মন্দ কিছু হয়, তবে শুধু তুলসীর নিকট নয়, নিজের কাছেও নিজেকে দোষী হইয়া থাকিতে হইবে। হায়, ইহারই নাম কি হরিভক্তি? ইহাই কি বৈষ্ণবের লক্ষণ? "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।" হা গোবিন্দ, কত দিনে এই ক্রোধরিপুর হাত হ'তে অব্যাহতি পাব?

পরদিনও জ্বর সমানভাবে রহিয়াছে দেখিয়া, বলরাম ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার আসিয়া রোগ পরীক্ষা করিয়া বলিল, "রোগটা একটু কঠিন, রক্ত সব মাথায় উঠেছে। খুব সাবধান!"

বলরাম পূজা-জপ ত্যাগ করিয়া বিছানার পাশে বসিয়া রোগীর সেবা করিতে লাগিল। রোগী প্রায়ই অজ্ঞান হইয়া থাকিত। একটু জ্ঞান হইলে বলরাম তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিত, "কেষ্টা—কেষ্টা!"

কেষ্টা রক্তবর্ণ চোখ দুইটা উপর দিকে তুলিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে চীৎকার করিয়া বলিত, "হরিবোল, হরিবোল।"

বলরামের দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িত। কাঁদিতে কাঁদিতে গোবিন্দের নিকট প্রার্থনা করিত, "কেষ্টাকে বাঁচিয়ে দাও ঠাকুর।"

গোবিন্দ তাহার প্রার্থনা শুনিলেন। ৪০ দিন পরে কেষ্টা সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল; বলরাম মহোৎসাহে গোবিন্দদেবের ভোগ দিয়া পাঁচ জন বৈষ্ণবকে খাওয়াইয়া দিল।

অনেক দিন পরে বলরাম আবার পুথি-পত্র লইয়া বসিয়াছিল। পুথিতে মধ্যে মধ্যে ছাতা ধরিয়াছিল; তাহা ঝাড়িতে ঝাড়িতে আপন মনে পড়িতেছিল,—

অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা,
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা।
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার,
কৃষ্ণ-নাম বিনা আর সকলি অসার।
কৃষ্ণ-নাম ভজ জীব আর সব মিছে,
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে।
ব্রহ্মা আদি দেব যারে ধ্যানে নাহি পায়,
সে হরি বঞ্চিত হ'লে কি হবে উপায়।"

কেষ্টা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। বলরাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে কেষ্টা ?"

কেষ্টা কাঁদিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল, "মা মেরেছে।"

এই সে দিন ছেলেটা রোগ-শয্যা হইতে উঠিয়াছে; এখনও সম্পূর্ণ সারিতে পারে নাই। তাহাকে মারিয়াছে শুনিয়া বলরাম ক্রুদ্ধভাবে ডাকিল, "তুলসি!"

তুলসী রন্ধনশালা হইতে উত্তর দিল, "কেন ?"

"ছেলেটাকে মেরেছিস্ ?"

"হাঁ, মেরেছি।"

এই স্পষ্ট উত্তরে বলরাম একটু বেশী রাগিয়া বলিল, "ভারি কাজই করেছিস্? এই রোগা ছেলেটা সে দিন যমের মুখ হ'তে ফিরে এলো, তাকে মার কেন বল্ তো ?"

তুলসীও রাগিয়া উত্তর করিল, "মার্‌বো না তো কি, ছেলে যে আদুরে-গোপাল হয়ে উঠেছে। এঁটো হাতে ছিষ্টি নোংরা কর্‌বে ?"

গর্জ্জন করিয়া বলরাম বলিল, "হাঁ, কর্‌বে।"

তুলসী রন্ধনশালার বাহিরে আসিল এবং সকড়ি হাত উঁচু করিয়া দাদামহাশয়ের মুখের উপর বিস্ময়-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "তুমি তাই খাবে ?"

বলরাম কেষ্টাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে বলিল, "হাঁ খাব, আমার খুসী!"

রাগে ঘাড়-মুখ নাড়িয়া তুলসী বলিল, "তোমার যা খুসী, তুমি কত্তে পার, কিন্তু আমি জেনে শুনে তোমার ইহকাল পরকাল নষ্ট কত্তে পারি না।"

বলরামের বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তুলসী বলিল, "আচ্ছা দাদামশায়, জিজ্ঞেস করি, ছেলেটাকে নিয়ে তুমি যে এত জড়িয়ে পড়েছ, তপ-জপ পূজো-আহ্নিক সব ছেড়ে দিয়েছ, কেষ্টা কি তোমার পরকালে সাক্ষী দেবে ?"

ভ্রূকুটী করিয়া বলরাম বলিল, "হাঁ, দেবে, তোর এত খোঁজে দরকার কি বল্ তো ?"

তুলসী দাদামশায়ের মুখের উপর একটা তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। বলরাম গম্ভীরভাবে বসিয়া পুঁথিগুলা নাড়িতে চাড়িতে লাগিল। তাহার এই গাম্ভীর্য্য দেখিয়া কেষ্টা আস্তে আস্তে কোল হইতে নামিয়া স'রিয়া গেল। পুঁথির পাতাগুলা ঠিক করিতে করিতে হঠাৎ নরোত্তম দাসের একটা কড়্চার উপর দৃষ্টি পড়িল—

"গোরা-পদ না ভজিয়া দিন গোঙায়নু,
প্রেম-রতন ধন হেলায় হারাইনু।
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু,
আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু।
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু,
শ্রীগৌর-কীর্ত্তনরসে মগন নহিনু।
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া,
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া।"

পুথির লেখাগুলার দিকে চাহিয়া বলরাম স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

কয়েক দিন পরে বলরাম বলিল, "দিন কতক ঘুরে আসি তুলসি।"

তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে ?"

বলরাম বলিল, "শ্রীধাম যাব মনে কচ্চি।"

তুলসী নীরবে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। বলরাম বলিল, "ভয় নাই, তোদের বন্দোবস্ত ক'রে যাব।"

তুলসী বলিল, "আমি সে ভয় কচ্ছি না। তবে—"

"তবে আর কি ?"

"তুমি আমার উপর রাগ ক'রে যাচ্চো দাদামশায় ?"

বলরাম হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোর উপর রাগ নয় তুলসি, নিজের উপর রাগ ক'রেই যাচ্চি।"

তুলসী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ফির্‌তে দেরী কত হবে ?"

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলরাম বলিল, "সে কথা এখন কি ক'রে বল্‌তে পারি, তুলসি ? দু'মাসেও ফির্‌তে পারি, নাও ফির্‌তে পারি।"

তুলসী বলিল, "কবে যাবে ?"

বলরাম বলিল, "কবে ? তার এখনো কিছু ঠিক নাই। যাওয়া বল্‌লেই তো যাওয়া নয়, জমী-জায়গাগুলোর বন্দোবস্ত কত্তে হবে, তোদের বন্দোবস্ত কত্তে হবে, তার পর তো যাওয়া। আর তাও মনে কর্‌লেই তো হয় না, কপালে যদি থাকে, তবে তো।"

অদূরে কেষ্টা বসিয়া খেলা করিতেছিল; তুলসী তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওরে কেষ্টা, দাদামশায় যে বৃন্দাবন যাচ্চে।"

কেষ্টা খেলা ফেলিয়া উঠিয়া আসিল এবং বলরামের হাত ধরিয়া বলিল, "আমি যাব।"

বলরাম হাসিয়া বলিল, "বেশ তো, আমার ঝোলা বইতে পার্‌বি ?"

কেষ্টা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হুঁ।"

বলরাম ও তুলসী উভয়েই হাসিয়া উঠিল।

ইহার পর প্রায় দুই মাস কাটিয়া গেল, কিন্তু ইহার মধ্যে জমী-জায়গার বন্দোবস্ত বা তুলসী ও কেষ্টার বন্দোবস্ত হইয়া উঠিল না। বৃন্দাবন-যাত্রার সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য শুনা গেল না। জপ. আহ্নিক আর কেষ্টাকে লইয়া বলরাম বেশ নিশ্চিন্তভাবেই দিন কাটাইতে লাগিল। তুলসী এক দিন পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার শ্রীধামে যাওয়ার কি হ'লো দাদামশায় ?"

বলরাম গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "হবে হবে, যাওয়া বল্লেই কি যাওয়া হয় ? এঁটোকুড়ের পাত কি সহজে স্বর্গে যায়, তুলসি ?" বলিয়া বলরাম ম্লান হাসি হাসিল। তুলসী বলিল, "কিন্তু তুমি গেলে কেষ্টার বড় কষ্ট হবে, দাদামশায়।"

বলরাম একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা হবে একটু কষ্ট। আমিও কি সেটা না ভাব্‌ছি তুলসি! সেই জন্যই তো ইতস্ততঃ কচ্ছি।"

তুলসী বলিল, "কাজ নাই দাদামশায় গিয়ে। কেন, ঘরে ব'সে কি ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না ?"

মৃদু হাসিয়া বলরাম বলিল, "পাওয়া যাবে না কেন, 'মন চাঙ্গা তো কেঠোয় গঙ্গা,' মন ঠিক থাক্‌লে, এই ঘরেই বৃন্দাবন হয় তুলসি।"

তুলসী সহাস্যে বলিল, "তা খুব হয়, কেষ্ট তো তোমার ঘরেই বাঁধা।"

বলরাম হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার হাসিটার যেন নিবৃত্তি না হইতেই আর এক জন আসিয়া ধীরে ধীরে বাড়ী ঢুকিল। যে আসিল, সে ব্রজনাথ। তাহাকে দেখিয়া বলরামের মুখের হাসিটা সহসা ঠোঁটের কোলেই মিলাইয়া গেল।

"বেজা কি বল্‌ছে তুলসি ?"

"বল্‌ছে যেতে হবে।"

"কেন, ওর সেবাদাসীর সেবা কত্তে ?"

"সে মাগী কোথায় চ'লে গিয়েছে।"

তীব্র শ্লেষের স্বরে বলরাম বলিল, "তাই বুঝি খোঁজ পড়েছে ?"

মুখ নীচু করিয়া মৃদুস্বরে তুলসী বলিল, "রোজ জ্বর হচ্ছে, মুখে জল দেবার কেউ নাই।"

তুলসীর দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলরাম বলিল, "কিন্তু এত দিন তোর মুখে জল দেবার তরে কটা লোক রেখেছিল ?"

তুলসী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া নখে নখ খুঁটিতে লাগিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলরাম একটু চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তোর কি মত ?"

তুলসী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমার আর মত কি, তুমি যা বল্‌বে।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলরাম বলিল, "আমি—আমি আবার কি বল্‌বো ? তোর ইচ্ছা হয় যাবি, না হয়, যা খুসী. তাই কর্‌বি, আমার তাতে কি ?"

তুলসী কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছিল, বলরাম তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেষ্টা কোথায় ?"

তুলসী যাইতে যাইতে বলিল, "ওর সঙ্গে কোথায় গিয়েছে।"

গম্ভীরস্বরে "হুঁ" বলিয়া বলরাম উঠিল এবং খুব জোরে জোরে পড়িতে লাগিল—

> "হা হা প্রভু শ্রীচৈতন্য দয়া কর মোরে,
> তোমা বিনা কে দয়ালু জগত-সংসারে।
> পতিত-পাবন হেতু তব অবতার,
> মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর।
> হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ-সুখী,
> কৃপাবলোকন কর আসি বড় দুখী।"

খানিক পরে বলরাম যখন বাহিরে আসিয়া বসিয়াছিল, তখন কেষ্টা বাপের সহিত ফিরিয়া আসিল। ব্রজনাথ বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল, কেষ্টা আসিয়া বলরামের কাছে দাঁড়াইল। বলরাম তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হা রে কেষ্টা, তুই তোর বাবার সঙ্গে যাবি ?"

কেষ্টা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হুঁ, বাবা দাব।"

বলরাম বলিল, "আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বি ?"

কেষ্টা বলিল, "হুঁ!"

বলরামের হৃদয় ভেদ করিয়া একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। কেষ্টা আহ্লাদের হাসি হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি বাবার থনে (সঙ্গে) তলে (চ'লে) দাব (যাব), তুমি এতলা (একলা) থাক্‌বে (থাকবে), বেত (বেশ) হবে, তুমি কাঁব্‌বে (কাঁদবে), হো হো।"

বলিয়া কেষ্টা হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। বলরাম স্থাণুর ন্যায় নীরব নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল। চারিদিক্ হইতে যেন তীব্র উপহাসের অট্টহাসি আসিয়া তাহার কানে বাজিতে লাগিল, "হো হো, পরের ছেলে, হো, হো।" বলরাম দুই হাত দিয়া বুকটা চাপিয়া ধরিল। সেই দিন সন্ধ্যার পর ব্রজনাথ তুলসীকে লইয়া

যাইবার প্রস্তাব করিলে বলরাম বলিল, "স্বচ্ছন্দে নিয়ে যাও ভাই, তুমি দেখ নি বলেই এত দিন আমায় দেখা-শোনা কত্তে হয়েছিল। নয় তো এখন কি আর আমার এত ঝঞ্ঝাট পোয়াবার সময় আছে? আমিও বাঁচি, এ সকল ঝঞ্ঝাটের হাত এড়িয়ে গোবিন্দকে প্রাণ ভ'রে ডাকতে পাই।"

বলরাম একটা ক্ষীণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল এবং সে যে শীঘ্রই জমী-জায়গা ঘরভিটা সব বিক্রয় করিয়া এই মায়ামোহময় সংসারবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনচন্দ্রের পদে গিয়া আশ্রয় লইবে, ইহাও ব্রজনাথকে জানাইয়া দিল।

একেবারে এমন সোজা উত্তরটা দিয়া বলরাম আপনার হৃদয়ের সরলতা অনুভব করিয়া যথেষ্ট গর্ব্ব অনুভব করিল। হাঁ, ইহাই তো পুরুষত্ব, বৈষ্ণবের প্রকৃত পথ। ছি ছি, এত দিন অন্ধ হয়ে ছিলাম। একটা পরের ছেলেকে নিয়ে, শৌচ, আচার, নাম, পূজা সব ছেড়ে নরকের গর্ত্তে ঝাঁপ দিয়েছিলাম, ছি ছি! এ কেষ্টাকে ভালবেসে ফল কি? কেষ্টার পরিবর্ত্তে যদি কৃষ্ণচন্দ্রকে এমন ভালবাসতে পারি, ইহকাল পরকালের কাজ হবে। যাক্, এখন নিশ্চিন্ত।

সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততা অনুভব করিলেও বলরাম কিন্তু সে রাত্রে নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতে পারিল না; কেষ্টা চলিয়া গেলে সে যে কতটা নিশ্চিন্ত, কত দিকে সুখী হইবে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে অনিদ্রায় রাত্রি কাটাইয়া দিল।

৭

সকালে গরুর গাড়ী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইতে কেষ্টা আগে হইতেই তাহাতে উঠিয়া বসিল। বলরাম তাহার কাপড়-চোপড় খেলানা সব গুছাইয়া একে একে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। তার পর তুলসী তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "একবার যেও না দাদামশায়।"

বলরাম মাথা নাড়িয়া স্থির কঠিন-স্বরে বলিল, "উহুঁ, দু'তিন দিনের মধ্যেই আমাকে বৃন্দাবনে যেতে হবে।"

তুলসী ধীরে ধীরে গিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী চলিল; কেষ্টা ছইয়ের পাশ দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিতে লাগিল, "টু—টু।"

বলরাম দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল।

গাড়ী অদৃশ্য হইল। বলরাম যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ী ঢুকিল। কিন্তু এ কি, বাড়ীখানা এমন শূন্য হইল কবে? সে তো চিরদিনই একা এই বাড়ীতে বাস করিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহার মধ্যে এত শূন্যতা, এমন ভীষণতা, কোন দিনই তো অনুভব করে নাই? বাড়ীখানা যেন খাঁ খাঁ করিয়া গিলিতে আসিতেছে। বলরাম ভীত অবসন্নভাবে উঠানের উপর বসিয়া পড়িল। বাহিরে ভিখারী বৈষ্ণব একতারা বাজাইয়া গাহিয়া উঠিল—

"হরি বিনে বৃন্দাবনে আর কি এখন সে দিন আছে,
ব্রজের সে সুখ-সাধ ব্রজনাথের সঙ্গে গেছে।"

পরদিন কেষ্টা নিজের বাড়ীতে খেলা করিতেছিল। হঠাৎ নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া মায়ের কাছে গিয়া বলিল, "ও মা, কে এয়েতে—কে এয়েতে।"

তুলসী ফিরিয়া চাহিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এ কি, দাদামশায় যে!"

বলরাম ক্রোধ-গম্ভীর-মুখে বলিল, "তোরা মায়ার সাগরে ডুবে আছিস্ তুলসি, স্বচ্ছন্দে আমাকে ছেড়ে আস্‌তে পারিস্; কিন্তু আমি কোথায় দাঁড়াই বল্ তো? বুড়ো ব'লে কি মায়ার রাজ্যে আমার একটুও অধিকার নাই?"

তুলসী হাসিয়া উঠিল। কেষ্টা বৃদ্ধের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে মায়ার অধিকারে টানিয়া আনিল।

সম্পূর্ণ

ব্রহ্মশাপ

১

গোয়া সর্দ্দারের স্ত্রী কুসী বামুনপাড়ায় চুপড়ী-ধুচুনী বেচিতে গিয়া যখন শুনিল, গোবিন্দ ঠাকুর সবিকী মামলায় তাহার স্বামীকে সাক্ষী মানিয়াছে, তখন সে রাগিয়া, চেঁচাইয়া পাড়া মাথায় করিতে করিতে গোবিন্দ ঠাকুরের বাড়ীতে উপস্থিত হইল, এবং ঠাকুরের সাক্ষাৎ না পাইয়া ঠাকুরাণীকে শুনাইয়া দিয়া আসিল যে, তাহারা ছোটলোক গরীব মানুষ, গতর খাটাইয়া খায়। ভদ্দর লোকেরা হলপ করিয়া পরের বিষয় কাড়িয়া লইতে পারে, কিন্তু ছোট লোক তাহারা, তাহারা বিষয়ের ধার ধারে না, কাহারও বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়া লোকের মর্ম্মান্তিক নিশ্বাস মাথা পাতিয়া লইতে চাহে না। সে নিশ্বাসের উত্তাপ সহ্য করিবার মত শক্তি তাহাদের নাই। সুতরাং সে বামুনের দরজায় মাথা কুটিয়া রক্তগঙ্গা হইবে, তথাপি তাহার মরদকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দিবে না।

নীচ ডোমের মেয়ের ধর্ম্মজ্ঞানের এই আতিশয্য দর্শনে ভদ্রপল্লীর অনেকেই তাহাকে উপহাস না করিয়া থাকিতে পারিল না। কুসী কিন্তু কাহারও কথায় কান দিল না। সে আপন মনে বকিতে বকিতে ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল এবং স্বামীর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি সাক্ষ্য দিও না। আমার সব গেছে, ঐ শিবরাত্তির সল্‌তেটুকু আছে; বামুনের মেয়ের নিশ্বেস পড়্‌লে বাছা আমার বাঁচ্‌বে না।"

গোরাচাঁদ তাহার বাহুবেষ্টন হইতে পা ছাড়াইয়া লইতে লইতে বলিল, "মর্ মাগী, ক্ষেপে এলি না কি? রোদে ঘুরে তোর মাথা গরম হয়ে গেছে, যা, ডুব দিয়ে আয়।"

কুসী তাহার পায়ের উপর মাথাটা গুজিয়া বলিল, "না গো, তুমি আগে বল, সাক্ষ্য দেবে না?"

বিরক্তভাবে গোরাচাঁদ বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে। এখন যা, ডুব দিয়ে এসে আখাটা জেলে দে। বেলা দেখ্‌ছিস্, দুপুর গড়িয়ে গেছে।"

কুসী উঠিয়া চোখের জল মুছিল এবং মাটীর কলসীটা কাঁখে লইয়া ডুব দিতে চলিল।

গোবিন্দচন্দ্র আকুলি মহাশয় পঞ্চাশ বৎসর বয়সেই যখন ঐহিক ধন, মান, পরিজন সকলের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সার বস্তুর অন্বেষণেই আপনার প্রবৃত্তি ও শক্তিকে নিয়োজিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, এবং কলুষ সংসারের সংস্রব পরিহার পূর্ব্বক স্বপাকভক্ষণে রত হইলেন, তখন রাষ্ট্র হইল, গোবিন্দ আকুলির ন্যায় সাত্ত্বিক-প্রকৃতি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ গ্রামে আর নাই। তাঁহার গলদেশে লম্বিত রুদ্রাক্ষমালা, ললাটে দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্র, দেখিলে তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি প্রদর্শন করিত না, গ্রামে এমন লোক খুব কমই ছিল এবং তিনি সর্ব্বদাই এই পাপতাপপূরিত কলুষ সংসারের অসংখ্য দোষ কীর্ত্তন করিয়া তাহার সংস্রব হইতে আপনাকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মোহময় সংসারের এমনই কুহক যে, তাহার নানা উৎপাত চারি দিক্ হইতে আসিয়া নিস্পৃহ ব্রাহ্মণকে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিত যে, তজ্জন্য ব্রাহ্মণকে সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইত।

এই ভাবে সংসার কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াও যখন আকুলি মহাশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে আপনার নিষ্ঠা ও পবিত্রতা বজায় রাখিয়া আসিতেছিলেন এবং লোকের নিকট প্রকাশ করিতেছিলেন যে, অতঃপর তিনি এই অসার সংসার ত্যাগ করিয়া, বিশ্বেশ্বরের পদে আত্মসমর্পণের জন্য যাত্রা করিবেন, তখন জ্ঞাতি ভ্রাতা অনুকূল আকুলি সহসা মহাযাত্রা করিয়া তাঁহার যাত্রার পথে বিষম কণ্টকরোপণ করিল।

অনুকূল শিশু পুত্র ননীলাল, বিধবা পত্নী এবং দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ষোল বিঘা জমী রাখিয়া গিয়াছিল। এই ষোল বিঘা জমীর মধ্যে ব্রহ্মোত্তর তের বিঘা জমী লইয়া একটু গোল ছিল। অনুকূলের বাপ কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সাত মাসের কড়ারে ছয় শত টাকার জন্য এই জমীগুলি মনোহর আকুলির নিকট বন্ধক দিয়াছিলেন। এই টাকা তিনি শোধ করিয়াছিলেন কি না, কেহ জানে না; বন্ধকী খতের পিঠেও কোন ওয়াশীল দেওয়া ছিল না এবং খতখানা মনোহরের নিকটেই ছিল। তবে কড়ারের সাত মাস অতীত হইলেও মনোহর বন্ধকী জমী স্বীয় অধিকারে আনিবার চেষ্টা করেন নাই। মনোহর নিঃসন্তান ছিলেন।

সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দ আকুলিই জ্যেষ্ঠতাতের সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হইলেন।

অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে এই বন্ধকী খতখানাও আকুলি মহাশয়ের হস্তগত হইল। তিনি একবার অনুকূলকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় অনুকূল বলিয়াছিল, "খতের টাকা সব দেওয়া হইয়াছে, তার প্রমাণ আমার কাছেই আছে।" প্রমাণ যে কি, তাহা অনুকূল খুলিয়া বলিল না। আকুলি মহাশয়ও খতখানাকে তুলিয়া রাখিলেন।

অনুকূলের মৃত্যুর পর আকুলি মহাশয় খতখানা বাহির করিয়া অনেককে দেখাইলেন এবং এই কড়ারী বন্ধকী কোবালাই যে বিক্রয়-কোবালাস্বরূপ হওয়ায় আবদ্ধ সমুদয় জমী তাঁহার অধিকারে আসিয়াছে, ইহাও বুঝাইয়া দিলেন। তবে এত দিন কেন দখল লওয়া হয় নাই, এ কৈফিয়ৎ কাহাকেও দিলেন না।

অনুকূলের বিধবা পত্নী আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। আকুলি মহাশয় ধীরভাবে তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এ সময়ে কি আমি অধর্ম্ম ক'রে নাবালকের বিষয় ফাঁকি দিয়ে নিতে পারি বৌমা? তবে নেহাৎ ন্যায্য যা, তাও তো ছাড়তে পারি না। সংসারে যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ তো সংসারীর মতই থাকতে হবে। তবে তুমি যখন কাঁদাকাটা কচ্ছো, তখন ননীকে দু'বিঘে জমী ছেড়ে দিচ্ছি। ননীও তো আমার পর নয়।"

বিধবা কিন্তু তাঁহার এই আত্মীয়তায় পরিতৃপ্ত হইতে পারিল না। সে গ্রামের পাঁচ জন ভদ্রলোকের কাছে গিয়া পড়িল। ভদ্রলোকেরা আকুলি মহাশয়কে বুঝাইতে আসিলে আকুলি মহাশয় মহাভারতের শান্তি-পর্ব্ব খুলিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের বিস্তৃত কাহিনী তাহাদিগকে শুনাইয়া দিলেন। তাহারা নিরস্ত হইল। কিন্তু দুই এক জন জেদী লোক এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল। তাহারা নাবালকের পক্ষ হইয়া জমীর নূতন প্রজাবিলি করিয়া দিল।

ধর্ম্মভীরু আকুলি মহাশয় জোরজবরদাস্তির দিকে গেলেন না। তিনি আদালতে গিয়া এই মর্ম্মে নালিস রুজু করিয়া দিলেন যে, মনোহর আকুলির নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত যে সকল জমী তিনি এ যাবৎকাল ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছিলেন, কয়েক জন দুষ্ট লোকের পরামর্শে অনুকূলের স্ত্রী তাঁহাকে সে সকল জমী হইতে বেদখল করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই জমীতে মনোহরের অধিকারের প্রমাণ-স্বরূপ তিনি বন্ধকী কোবলা দাখিল করিলেন এবং আপনার দখল প্রমাণের জন্য কয়েক জন প্রজা, জনকতক কৃষাণ, পার্শ্ববর্ত্তী জমীর চাষী গোঁরাচাঁদ সর্দ্দারকে সাক্ষী মানিলেন।

আগে বেতনের পরিবর্ত্তে চৌকিদারেরা যখন চাকরাণ জমী ভোগ করিত, তখন গোঁরাচাঁদের চৌকিদারী পদ ছিল। তার পর গবর্ণমেণ্ট চাকরাণ জমী খাসে আনিয়া বেতন-প্রথার সৃষ্টি করিলে, গোরাচাঁদ চৌকিদারী ছাড়িয়া জাতি-ব্যবসা ও মজুরি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। গোরাচাঁদের চাকরাণ জমীর অধিকাংশই এই সকল বিবাদী জমীর আশে পাশে ছিল, তা ছাড়া সে বর্ত্তমানে আকুলি মহাশয়ের মজুররূপে এই সকল জমীতে ধান রোয়া, ধান কাটা প্রভৃতি কাজ করিয়া আসিয়াছে এই জন্য আকুলি মহাশয় তাহাকে এক জন প্রধান সাক্ষী মানিয়া আসিলেন।

২

সন্ধ্যার পর কেরোসিনের ডিবার সম্মুখে বসিয়া গোরাচাঁদ ঝুড়ি বুনিতেছিল, আর গুন-গুন্ করিয়া গাহিতেছিল—

"মোন আমার, পাখীর বাচ্ছা পুষবি যদি খাঁচা সার,
খাঁ—চা—সার।"

বাঁ হাতে লণ্ঠন ধরিয়া, ডান হাতে ধরা লাঠিটা ঠক্-ঠক্ করিয়া মাটীতে ঠুকিতে ঠুকিতে আকুলি মহাশয় আসিয়া ডাকিলেন—"গোরাচাঁদ, ওহে গোরা!"

গোরাচাঁদের সঙ্গীত থামিয়া গেল, হাতের ঝুড়িটা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কে, বাবাঠাকুর? পেন্নাম হই!"

গোরাচাঁদ হাত দুইটা তুলিয়া কপালে ঠেকাইল। আকুলি মহাশয় উঠান হইতে একটু অন্তরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কল্যাণ হোক্, কেমন আছিস্ রে গোরা?"

গোরাচাঁদ কাপড়ের খুঁট দিয়া কাঠের খুরুসীটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "আপনকারদের চরণের আশীর্ব্বাদে ভালই আছি। এমন সময় কি মনে ক'রে বাবাঠাকুর?"

লাঠিটার উপর ভর দিয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, "তোদের একবার দেখতে এলাম। দিনে তো সময় পাই না, পূজা-আহ্নিকেই কেটে যায়। তাই বলি, এই সময় একবার তোদের খবরটা নিয়ে যাই।"

সহর্ষ কণ্ঠে গোরাচাঁদ বলিল, "তা আসবে বৈ কি বাবাঠাকুর, আমরা আপনকার চরণেই প'ড়ে আছি।"

খুরুসীটা উঠানের মাঝখানে পাতিয়া দিয়া গোরাচাঁদ বলিল, "বসতে আজ্ঞা হোক্।"

ব্যস্তভাবে আকুলি মহাশয় বলিলেন, "থাক্ থাক্, ওখানে আর যাব না, তোদের জলটল পড়ে।"

আকুলি মহাশয়ের কথায় তাঁহার শুদ্ধাচারিতার কথা গোরাচাঁদের মনে পড়িল; তাঁহার মত শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ যে ডোমের প্রদত্ত আসনে বসিতে পারেন না, ইহা জানিলেও গোরাচাঁদ ব্যস্ততায় সে কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহাকে বসিতে বলিয়া, সে যে কিরূপ অন্যায় আচরণ করিয়াছে, ইহাই ভাবিয়া গোরাচাঁদ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

আকুলি মহাশয় সহাস্য প্রশ্নে তাহার এই সঙ্কোচভাব দূর করিয়া দিয়া, তাহার ছেলেটি কেমন আছে, কাজ-কর্ম্ম কেমন চলিতেছে, এখন কোথায় কি মজুরিতে কাজ হইতেছে ইত্যাদি নানা সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিলেন। অতঃপর তিনি প্রস্থানোদ্যত হইয়া সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হাঁ, ভাল কথা মনে হয়েছে। তোমাকে বাপু আমার একটু বেগার দিতে হবে।"

গোরাচাঁদ হাত দুইটা জড় করিয়া সবিনয়ে বলিল,—"আজ্ঞে করুন।"

আকুলি মহাশয় সহাস্যে বলিলেন, "এমন কিছু কঠিন বেগার নয়। শুনেছ তো, অনুকূলের স্ত্রী পাঁচ জন দুষ্ট লোকের পরামর্শে আমার ন্যায্য সম্পত্তি হ'তে আমায় বেদখল করেছে। আমি গরীব ব্রাহ্মণ, আমার তো গায়ের জোর নাই, আমার জোর ভগবান্। আমার সহায় ধর্ম্ম। কাজেই আমাকে আদালত কর্‌তে হয়েছে। কিন্তু আদালতে গেলেই তো হয় না, প্রমাণ চাই, সাক্ষী সাবুদ চাই। তা আমার পাকা দলীলপত্র আছে, দরকার শুধু দু' একটা সাক্ষী। তা বাপু, তোমাকে সাক্ষ্যটা দিয়ে আস্‌তে হবে।"

গোরাচাঁদ চমকিত হইয়া ভীতিপূর্ণদৃষ্টিতে আকুলি মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিল। আকুলি মহাশয় বলিলেন, "তুমি পাশের চাষী ছিলে কি না, সুতরাং তোমার সাক্ষ্যটা খুব বলবৎ হবে। আমি যে বরাবর ও জমী দখল ক'রে এসেছি, তুমি শুধু এইটুকু ব'লে আস্‌বে। আজ শমন এসেছিল, তা আমিই বকলমে সই করিয়ে দিয়েছি, আস্‌চে মাসের সাতুই দিন। মনে থাকে যেন।"

আকুলি মহাশয় প্রস্থানোদ্যত হইলেন। গোরাচাঁদ বলিয়া উঠিল, "কিন্তু বাবাঠাকুর—"

ফিরিয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, "তোমার রোজ মারা যাবে না হে, সে আমি আগেই দিয়ে যাব।"

গোরাচাঁদ দৃঢ় গম্ভীরস্বরে বলিল, "না বাবাঠাকুর, আমি হলপ নিয়ে মিছে কথা বল্‌তে পারব না।"

সবিস্ময়ে আকুলি মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "পার্‌বে না?"

গোরাচাঁদ বলিল, "না। আমরা ছোট লোক, আমাদের এত পাপ সইবে না।"

তাহার মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আকুলি মহাশয় রোষ-গম্ভীর-কণ্ঠে বলিলেন, "আমাকে অপমান কর্‌বে?"

গোরাচাঁদ মাথা নীচু করিয়া বিনয়নম্রস্বরে বলিল, —"আমাকে মাপ কর বাবাঠাকুর, আমি এক ছেলে নিয়ে ঘর করি।"

ছোট লোকের এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞতা দেখিয়া আকুলি মহাশয় কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর স্থিরগম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "ছেলের তরে ব্রাহ্মণের কথা অমান্য কর্‌বে?"

গোরাচাঁদ ভীতি-কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "আমার ঐ একটি ছেলে বাবাঠাকুর।"

বজ্রগম্ভীরনাদে আকুলি মহাশয় বলিলেন, "কিন্তু তোমাকে ও ছেলে নিয়ে ঘর কর্‌তে হবে না! আমি যদি ত্রিসন্ধ্যাপূত ব্রাহ্মণ হই, ব্রহ্মণ্যদেব যদি সত্য হন, তবে তোমার ছেলে বাঁচ্‌বে না,—বাঁচবে না,—বাঁচ্‌বে না। এ না হয় তো আমি এই পৈতা ছিঁড়ে দীঘীর জলে ফেলে দেব।"

জোরে জোরে লাঠির ঠক্-ঠক্ শব্দ করিতে করিতে আকুলি মহাশয় চলিয়া গেলেন। গোরাচাঁদ হাত দুইটা বুকের কাছে রাখিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসী আসিয়া তাহার গা ঠেলিয়া বলিল, "দাঁড়িয়ে রইলে যে?"

শুষ্ক-জড়িত-কণ্ঠে গোরা বলিল, "বামুন কি শাপ দিয়ে গেল, শুনেছিস্?"

কুসী বলিল, "শুনেছি। কিন্তু আমরা তো কোন দোষে নাই। দিলেই বা শাপ, আমাদের মা আছে।"

আকুলি মহাশয়ের শুধু জমীজায়গার আয়েই যে সংসার চলিত, তাহা নহে, তাঁহার আয়ের আর একটা পথ ছিল। তাঁহার গৃহে শালগ্রামশিলা হইতে শীতলা, মনসা, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি অনেকগুলি দেবতারই ঘট-পট ছিল। গ্রামের লোক বিপদে-আপদে এই সকল দেবতাকে পূজা দিত, তাহাতে আকুলি মহাশয়ের আয় বড় মন্দ হইত না। সুতরাং আকুলি মহাশয় এই সকল গৃহ-দেবতাকে যথেষ্ট ভক্তি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিতেন না এবং তাঁহাদের জাগ্রত মহিমা সম্বন্ধে

বহুল উদাহরণ প্রচার করিতেন। আগে অনুকূলও এই আয়ের এক জন অংশীদার ছিল। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর হইতে সমগ্র আয়টাই গোবিন্দ আকুলির হাতে পড়িতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভক্তির পরিমাণও অনেক গুণ বাড়িয়া গেল।

সে দিন আকুলি মহাশয় স্নানান্তে পূজা করিতে গিয়া দেখিলেন, গোরাচাঁদের স্ত্রী কুসী একটি মেটে পাথরে পোয়াটেক চাউল, দুইটি কাঁঠালি কলা এবং এক পয়সার বাতাসা লইয়া ভিজে কাপড়ে ঠাকুরঘরের রোয়াকে বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া আকুলি মহাশয় রাগে জ্বলিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুই?—ঠাকুরঘরের দরজায়?"

তাঁহার সেই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ও ক্রোধ-কম্পিত স্বর শুনিয়া কুসী ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া সকাতরকণ্ঠে বলিল, "বাবা, আমার কালুর—"

গর্জ্জন করিয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, "আগে নেমে আয় বেটী, বেটীর আস্পর্দ্ধা দেখ, একেবারে ঠাকুরঘরের দরজায় গিয়ে উঠেছে! পাজি বেটী, ছোট-লোক বেটী!"

হাতের পাথরটা দরজার সামনে রাখিয়া কুসী ভয়ে ভয়ে নামিয়া আসিল। আকুলি মহাশয় ক্রোধ-কম্পিতপদে রোয়াকে উঠিয়া পাথরখানার দিকে চাহিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিলেন; "এটা এখানে রেখে গেলি যে?"

কুসী হাত দুইটা জড় করিয়া ভীতিকম্পিত স্বরে বলিল, "আমার কালুকে মায়ের অনুগ্রহ হয়েছে বাবা-ঠাকুর, তাই মায়ের পুজো এনেছি।"

দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, "পুজো এনেছে! তোর এই চালকলায় মায়ের পুজো হবে? বেটী ছোটলোক!"

আকুলি মহাশয় পা দিয়া জোরে পাথরখানা ঠেলিয়া দিলেন। পাথরখানা উঠানে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল, চাউল বাতাসা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কুসী সকাতরদৃষ্টিতে সেগুলার দিকে চাহিয়া রহিল। আকুলি মহাশয় হাতের ঘটির জলটা দরজার সামনে ঢালিয়া দিয়া স্থানটা পবিত্র করিয়া লইলেন। কুসী নিদারুণ অপরাধীর মত হাত যোড়া করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আকুলি মহাশয় ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া পূজায় বসিলেন। কুসী দুই পা অগ্রসর হইয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, "বাবা, মাকে জানাও, আমার কালুকে—"

বজ্রকঠোর-স্বরে আকুলি মহাশয় বলিলেন, "তোর কালু যাতে শীগ্‌গির 'মায়ের খর্পরে যায়, তাই দিবারাত্র মাকে জানাচ্ছি।"

কুসীর সর্ব্বশরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে মুহ্যমানভাবে স্তব্ধশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে যখন তাহার চৈতন্য হইল, তখন আকুলি মহাশয় পূজা শেষ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিতেছেন। কুসী সকাতরে বলিল, "বাবাঠাকুর, মায়ের একটু চন্নামেত্তর—"

"চন্নামেত্তর নাই" বলিয়া আকুলি মহাশয় দরজা বন্ধ করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। কুসী মন্দিরের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, যেখানে পূজার বাসি ফুল-বিল্বপত্র ফেলা হয়, সেইখানে চন্দনাক্ত অর্দ্ধশুষ্ক একটি বিল্বপত্র দেখিতে পাইল। কুসী সযত্নে সেইটি কুড়াইয়া লইয়া আঁচলে বাঁধিল এবং মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া সোপানপ্রান্তে মাথা কুটিয়া বলিল, "মা গো, আমরা গরীব, তুই ছাড়া আমাদের আর কোন ভরসা নাই। আমার কালুর গায়ে তোর পদ্মহাত বুলিয়ে দে মা, আমি বুক চিরে তোর এখানে রক্ত দিয়ে যাব।"

রুদ্ধদ্বার মন্দিরের মধ্যে বসিয়া দেবতা তাহার এই আকুল প্রার্থনা শুনিতে পাইলেন কি না, তাহা চিন্তা না করিয়াই কুসী দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিল।

"বাবা কালু!"

বসন্তের ভীষণ আক্রমণে কালু আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, ভাল করিয়া চাহিবার শক্তিও তাহার ছিল না, তথাপি পিতার আহ্বানে সে কষ্টে চোখ মেলিয়া চাহিল। গোরা তাহার মাথায় স্নেহশীতল হাতখানি বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কেমন আছিস্ বাবা?"

ক্ষীণস্বরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কালু বলিল, "সব জ্ব'লে পুড়ে গেল বাবা, জ্ব'লে মলুম!"

গোরা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "ভয় কি, মায়ের চন্নামেত্তর খেলেই সব ভাল হয়ে যাবে।"

কালু ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, মা কোথায়?"

গোরা বলিল, "সে মায়ের চন্নামেত্তর আন্‌তে গেছে।"

কালু চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার বসন্তের আক্রমণে বীভৎসদর্শন মুখের দিকে চাহিয়া গোরা বসিয়া রহিল।

কুসী আসিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল। গোরা তাহার রিক্তহস্তের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মায়ের চন্নামেত্তর?"

কুসী কোন উত্তর দিল না। সে একটা পাথরবাটি

লইয়া পুকুরঘাট হইতে জল আনিল। তার পর আঁচল হইতে বিল্বপত্রটি খুলিয়া সেই জলে ডুবাইয়া জলটুকু ছেলের মুখের কাছে ধরিল; ডাকিল, "বাবা কালু, মায়ের চন্নামেত্তরটুকু খেয়ে ফেল বাবা।"

কালু চোখ না খুলিয়াই হাঁ করিল; কুসী তাহার মুখে বাটির জলটুকু ঢালিয়া দিল এবং বিল্বপত্রটি লইয়া তাহার মাথায় গায় বুলাইয়া দিল।

কালু কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিল। তার পর সহসা চোখ মেলিয়া ডাকিল, "বাবা গো!"

গোরা তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, "কেন বাবা?"

কালু হাঁপাইতে হাঁপাইতে আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, কৈ, চন্নামেত্তরে তো ঠাণ্ডা হ'লো না বাবা? উঃ! জ্ব'লে মলুম বাবা, জ্বলে মলুম!"

গোরা বলিল, "মায়ের চন্নামেত্তর খেয়েছ বাবা, মা এবার ঠাণ্ডা ক'রে দেবেন। মাকে ডাক।"

কালু যাতনা-জড়িত কণ্ঠে ডাকিল, "মা, মা গো!"

পাশে কুসী স্তব্ধ পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিল। "হায়, কোথায় মায়ের চন্নামেত্তর! এ শুধু বেলপাতধোয়া জল। মায়ের চন্নামেত্তর পেলাম না, তাই ব'লে তোর দয়াও কি পাব না মা?"

কুসীর চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি চোখে আঁচল চাপা দিল। তীব্র-কণ্ঠে গোরা বলিল, "রোগা ছেলের পাশে ব'সে চোখের জল ফেলিস্ না কুসি!"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কুসী বলিল, "হাঁ গা, কবরেজ ডাকলে হয় না?"

কর্কশ-কণ্ঠে গোরা বলিল, "কবরেজে কিছু হবে না কুসি, এ ব্রহ্মশাপ! ব্রহ্মশাপের কাছে সাক্ষাৎ শিবও কিছু কত্তে পারে না।"

কুসীর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। গোরা পাখাখানা তুলিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কিন্তু বাতাসে অন্তরের জ্বালা প্রশমিত হইল না। কালু ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে আর্ত্ত-কণ্ঠে পিতাকে ডাকিতে লাগিল।

সহসা গম্ভীরস্বরে গোরা ডাকিল, "কুসি!"

কুসী মুখ তুলিয়া স্বামীর কঠোর মুখের দিকে চাহিল। গোরা বলিল, "কাল মামলার দিন। আমি আজ চল্লাম।"

কুসী বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়?"

"সাক্ষ্য দিতে।"

"মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে?"

তীব্র দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া গোরা কর্কশ-কণ্ঠে বলিল, "আমরা ছোটলোক, ডোম, আমাদের আবার সত্যি মিথ্যে কি? আমি ছেলেটাকে বেঘোরে মেরে ফেল্‌তে পার্‌বো না।"

কুসী বলিল, "কিন্তু আর একটা ছেলেকে পথে বসাবে?"

গোরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া দাঁতে-দাঁত চাপিয়া বলিল, "যে পথে বসে বসবে, আমার তাতে কি? আমার কালু গেলে তাকে আর ফিরে পাব না। আমি চল্লাম, তুই ছেলেটাকে দেখিস্।"

গোরা উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কুসী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার একবার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া স্বামীর পা জড়াইয়া বলে, "ওগো, তুমি যেও না,—যেও না।"

কিন্তু কালুর রোগবিকৃত মুখের দিকে চাহিতেই সে আর উঠিতে পারিল না; কে যেন শিকল দিয়া তাহার পা দুইটাকে পুত্রের রোগশয্যার সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিল।

গোরাচাঁদ এক প্রকার ছুটিয়াই আকুলি মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু আকুলি মহাশয় বাড়ীতে ছিলেন না; তিনি সাক্ষী-সাবুদ লইয়া মঙ্গলবারের বারবেলা পড়িবার পূর্ব্বেই মহকুমা আরামবাগ যাত্রা করিয়াছিলেন। আরামবাগ প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে; সুতরাং পূর্ব্বদিনে বাহির না হইলে যথাসময়ে আদালতে পৌঁছান যাইবে না, উকীলের সঙ্গেও পরামর্শ হইবে না। আকুলি মহাশয় চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া গোরা দ্রুতপদে আরামবাগ অভিমুখে চলিল।

গোবিন্দ আকুলির বাড়ীর পরই অনুকূলের বাড়ী। ননীর মা সদর-দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন। গোরাকে দ্রুতপদে যাইতে দেখিয়া ডাকিলেন, "গোরাচাঁদ!"

গোরা থমকিয়া দাঁড়াইল। ননীর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত ছুটাছুটি কোথা চলেছো?"

গোরা মাথাটা নীচু করিয়া বলিল, "আরামবাগ।"

ননীর মা বলিলেন, তুমিও সাক্ষী আছ বুঝি?"

গোরা একটু ইতস্ততঃ করিয়া, একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, "হাঁ।"

"তোমার ছেলে কেমন আছে?"

"ভাল নয়।"

"কবরেজ দেখাচ্ছ তো?"

"না।"

"কবরেজ দেখাও না? সে কি?"

গোরা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা আকুল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কবরেজ কিছু কত্তে পার্‌বে না

মা-ঠাকরুণ, ব্রহ্মশাপ—আমার কালুর উপর ব্রহ্মশাপ হয়েছে।"

চমকিতভাবে ননীর মা বলিয়া উঠিলেন, "ব্রহ্ম-শাপ!"

গোরা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ননীর মা বলিলেন, তুমি তো কারো ভালয় মন্দয় নাই গোরাচাঁদ, তোমার ছেলেকে কে এমন শাপ দিল?"

রুদ্ধস্বরে গোরা বলিল, "আকুলি মশায়।"

ননীর মা বিস্ময়-স্তব্ধনেত্রে গোরার মুখের দিকে চাহিলেন। গোরা তখন অভিশাপের কারণ বিবৃত করিল। ডোমের ছেলের এই ধর্ম্মভীরুতাশ্রবণে ননীর মার চক্ষু দুইটা বিস্ময়ে বিস্ফারিত, আনন্দে সমুজ্জ্বল হইয়া আসিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্‌ভাবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আজ যে আবার আরামবাগে যাবে?"

অশ্রু-উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে গোরাচাঁদ উত্তর করিল, "ছেলেটার কষ্ট আর সইতে পাচ্চি না। তাই মনে করেছি, সাক্ষ্য দেব। মা-ঠাকরুণ গো, ছেলের মায়া যে বড় মায়া!"

গোরাচাঁদের বড় বড় চোখ দুইটা দিয়া ঝর্-ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। ননীর মা'র চক্ষুও তখন শুষ্ক ছিল না। তিনি আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "তাই কর গোরাচাঁদ, সাক্ষ্য দাও, আহা, ছেলেটা যদি বাঁচে।"

মুখ তুলিয়া গোরা ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "কিন্তু মা-ঠাকরুণ, আপনকার ছেলে পথে বস্‌বে।"

ধীর প্রশান্ত স্বরে ননীর মা বলিলেন, "তা বসে বসুক, আমার ছেলে না হয় পথে বস্‌বে, কিন্তু তোমার ছেলে তো প্রাণে বাঁচ্‌বে। আমি বল্‌ছি গোরাচাঁদ, তুমি যা'ও, সাক্ষ্য দিয়ে ছেলেটাকে বাঁচাও।"

গোরা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বামুনের মেয়ে বলে কি? নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিতেছে, পরের ছেলের প্রাণের জন্য নিজের ছেলেকে পথে বসাইতে একটু কাতরতা প্রকাশ করিতেছে না। গোরা একটা কথাও বলিতে পারিল না; শুধু স্তব্ধদৃষ্টিতে এই ব্রাহ্মণকন্যার মহিমা-প্রদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহাকে এইরূপে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ননীর মা ধীরে ধীরে বলিলেন, "আর দাঁড়িয়ে থেকো না, বেলা যায়। তুমি কিছু ভেব না গোরাচাঁদ, আমার তাতে এক বিন্দু দুঃখ হবে না। আমি বামুনের মেয়ে, হুকুম দিচ্ছি, তুমি গিয়ে সাক্ষ্য দিয়ে এস। আমি কাপড় ছেড়ে মায়ের চানজল নিয়ে তোমার কালুকে দিয়ে আস্‌ছি। আহা, ছেলের চাইতে কি আর কিছু আছে গোরাচাঁদ?"

গোরার বুকটা বড় জোরে কাঁপিয়া উঠিল; সে আর এই ব্রাহ্মণ-কন্যার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া পাগলের মত টলিতে টলিতে গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল।

সাক্ষ্য-মঞ্চে উঠিয়া গোরাচাঁদ কি যে বলিল, তাহা সে নিজেই জানে না। সে তখন আদালত, হাকিম, উকীল, মোক্তার, বাদী, প্রতিবাদী কাহাকেও দেখিতেছিল না, তাহার দৃষ্টির সম্মুখে শুধু ব্রাহ্মণকন্যার সেই মহিমা-প্রদীপ্ত মুখখানা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতররূপে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। সুতরাং সে উকীলের প্রশ্নের উত্তরে—আকুলি মহাশয় ও তদীয় উকীলের যত্ন-শিক্ষিত কথাগুলা যেন সম্পূর্ণ বিস্মিত হইয়া এমন সব কথা বলিল, যাহাতে বিবাদী জমীতে ঐ অনুকূল আকুলির দখলই নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়া গেল। আকুলি মহাশয় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। গোরাচাঁদ সাক্ষ্যমঞ্চ হইতে নামিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

৬

গোরাচাঁদ সাক্ষ্যমঞ্চ হইতে যখন নামিল, তখন তাহার মনটা বেশ প্রফুল্লই ছিল, কিন্তু আদালতের প্রাঙ্গণ পার হইয়া রাস্তায় পড়িতেই যেন বিষাদের একটা গুরুভার মনের ভিতর একটু একটু করিয়া চাপিয়া বসিতে লাগিল। সাক্ষ্যমঞ্চে উঠিয়া অবধি সে যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, এতক্ষণ পরে সে ধীরে ধীরে জাগ্রত অবস্থায় উপনীত হইল। তাহার কালুর কথা মনে পড়িল, তাহার রোগের কথা মনে পড়িল, এখানে সাক্ষ্য দিতে আসিবার উদ্দেশ্য স্মরণ হইল। তার পর আকুলি মহাশয়ের কথা মনে পড়িল। গোরাচাঁদকে সাক্ষ্য দিবার জন্য উপস্থিত দেখিয়া তিনি কতই না আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন, তাহার ছেলের জন্য কোন চিন্তা নাই; তিনি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়া, মাকে জানাইয়া, কালুকে আরোগ্য করিয়া দিবেন। ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারে? ব্রাহ্মণ মনে করিলে লোককে রোষাগ্নিতে দগ্ধ করিতে পারে, আবার মনে করিলে, তাহাকে জ্বলন্ত বহ্নির করাল-কবল হইতে অক্ষতদেহে ফিরাইয়া আনিতেও পারে। সুতরাং কালুর জন্য গোরাচাঁদের ভয় কি?

কিন্তু হায়, গোরা এ কি করিল! সেই সর্ব্বক্ষমতা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের রোষাগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া

সে আপনার পুত্রের মরণের পথ প্রস্তুত করিয়া দিল! এতক্ষণ তাহার কালু কি আর আছে? ভূদেবতার বর্দ্ধিত রোষাগ্নিতে হয় ত সেই ক্ষুদ্র বালক এতক্ষণ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। আশঙ্কায় উদ্বেগে গোরাচাঁদের বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। দ্রুত চলিবার ইচ্ছা থাকিলেও অবসন্ন পা দুইটা যেন উঠিতে চাহিল না। গোরা প্রাণপণ চেষ্টায় অবসন্ন-কম্পিত পা দুইটাকে টানিয়া বহু কষ্টে গৃহাভিমুখে চলিল।

অবসাদ-মন্থর-পদে গোরাচাঁদ যখন গৃহপ্রান্তে উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি অনেক। শুক্লা দশমীর চাঁদ পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে। ক্ষীণ বনরেখার মধ্যে অস্পষ্ট দৃশ্যমান গ্রামখানা যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পথ, ঘাট, মাঠ সকলই একটা অসাড় নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গিয়াছে। ম্লান চন্দ্রালোক তাহাদের উপর স্বপ্নের সূক্ষ্ম আবরণ বিছাইয়া দিয়াছে। সেই স্বপ্নাবিষ্ট নিদ্রালস গ্রামখানার কোন এক প্রান্তভাগ হইতে শুধু শোকের একটা করুণ ক্ষীণ সুর উত্থিত হইয়া যেন রজনীকে বিষাদময়ী করিয়া তুলিতেছে।

গোরাচাঁদ কম্পিত-বক্ষে স্খলিতপদে যখন আপনার কুটীর-প্রাঙ্গণে গিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার আর দাঁড়াইবার শক্তি নাই, কথা কহিবার ক্ষমতা নাই, চিন্তা করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়াছে, সর্ব্বশরীর থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছে; চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে, অন্ধকারের কালো ছায়া আসিয়া প্রাঙ্গণে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

স্তব্ধ অন্ধকারময় কুটীর-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া হৃদয়ের সমস্ত শক্তি কণ্ঠে সংযোজিত করিয়া, অস্ফুটকণ্ঠে গোরা ডাকিল, "কালু!"

উত্তরে কুটীরমধ্য হইতে একটা শুধু আর্ত্তচীৎকার উত্থিত হইল। গোরা কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

পুত্রের সৎকার শেষ করিয়া গোরা যখন কাঁদিতে কাঁদিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, আকুলি মহাশয়ও তখন মহকুমা হইতে ফিরিতেছিলেন। গোরা তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "বাবাঠাকুর গো, আমার কালু যে চ'লে গেল গো!"

ভীষণ ভ্রূকুটিভঙ্গী করিয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, "ঠিকই হয়েছে! ব্রহ্মশাপ কি ব্যর্থ হয়, ওহে গোরাচাঁদ, ঘোর কলি হলেও এখনো ব্রাহ্মণ আছে, ব্রহ্মতেজ আছে। তোমরা মনে কর, বামুন বেটারা আবার কে, ধর্ম্মটাই সব। তার ফল দেখলে তো? কৈ, ধর্ম্ম এসে তোমার কালুকে রাখ্‌তে পার্‌লে না?"

গোরা তাঁহার সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িল; ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "অমন আজ্ঞে কর্‌বেন না বাবাঠাকুর। আপনারা কলির দেবতা, আপনাদের কি ধর্ম্মের নিন্দা কর্‌তে আছে, না, ছেলে গেছে ব'লে ধর্ম্মকে আমি অমান্য কর্‌তে পারি? আমার কালু গেছে, কিন্তু ধর্ম্ম তো যায় নি বাবাঠাকুর। ছেলে দু'দিনের, কিন্তু ধর্ম্ম যে চার যুগের।"

গোরার স্থির প্রশান্ত মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক "বেটা বোকা ছোটলোক!" বলিয়া আকুলি মহাশয় দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। গোরা তাঁহার পদাঙ্কিত স্থানের ধূলা তুলিয়া মাথায় দিল।

সম্পূর্ণ

ঘর-জামাই

(সামাজিক উপন্যাস)

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত

শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র মিত্র

করকমলেষু—

প্রিয় সতীশবাবু,

প্রকাশকের সহিত গ্রন্থকারের যতটা নিকট সম্পর্ক, পাঠকের সহিত বোধ হয় ততটা নয়। তাই 'ঘর-জামাই'এর ভার আপনার হাতেই দিলাম।

কৃতজ্ঞ

গ্রন্থকার

ঘর-জামাই

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভবানীপুরের গোকুল মুখুয্যে অনেক খুঁজিয়া-পাতিয়া যখন আহিরীটোলার গোপাল গাঙ্গুলীর ছেলে শরতের সঙ্গে ছোটমেয়ে সুভাষিণীর বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন তিনি জানিতেন না যে, মেয়ে-জামাইকে ঘরে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে হইবে। গোপাল গাঙ্গুলীর বাড়ী ছিল, নিজে সত্তর টাকা মাহিনা পাইত। ছেলেও এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিল। ফল বাহির না হইলেও সে যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিল না। সুতরাং গোপালবাবু সাধ্যমত খরচপত্র করিয়া সুভাষিণীর বিবাহ দিলেন।

কিন্তু বিবাহের এক মাস পরেই গেজেট বাহির হইলে দেখা গেল, শরৎ পরীক্ষায় ফেল হইয়াছে। শুধু এইখানেই শরতের দুর্ভাগ্যের অবসান হইল না, মাস ছয়েকের মধ্যেই বাপ মারা গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, বাড়ীখানা সাত হাজার টাকায় মর্টগেজ দেওয়া আছে। গোপালবাবু চাকরীর সঙ্গে সঙ্গে চাউলের কারবার করিয়াছিলেন এবং তাহাতে ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়া বাড়ী বাঁধা দিয়া ঋণমুক্ত হইয়াছিলেন, সে ঋণ শোধ যায় নাই, চাকরীর সত্তরটি টাকা সংসার-খরচেই ফুরাইয়া যাইত। সংসারটা যে বড় ছিল, তাহা নহে, শুধু বিধবা ভগ্নী, আর মাতৃহীন পুত্র শরৎ। কিন্তু বাবুয়ানীর চাল চালিতে গিয়া গোপালবাবু সত্তরটি টাকার এক পয়সাও বাঁচাইতে পারিতেন না। সুতরাং ঋণের সাত হাজার টাকা সুদে আসলে দশ হাজারে উঠিলেও তিনি তাহার কোন উপায়ই করিতে পারেন নাই।

গোপালবাবু মারা গেলে মহাজন নালিশ করিয়া বিশ হাজার টাকা দামের বাড়ীটা দশ হাজার টাকায় বেচিয়া লইল। শরৎ দিনকতক এখানে সেখানে ঘুরিয়া, শেষে শ্বশুরের অনুরোধে শ্বশুরবাড়ীতেই আশ্রয় লইল। বিধবা পিসী অন্যত্র গমন করিলেন।

শরৎ দিনকতক শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়াই বুঝিতে পারিল, সংসারে এই স্থানটা প্রিয় হইলেও স্থায়ী বসবাসের পক্ষে এটা আদৌ উপযুক্ত নহে। এখানে স্থায়ী বাস করিতে হইলে চক্ষু-কর্ণ নামক ইন্দ্রিয় দুই-টার দ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিতে হয় এবং বাটীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আত্মমর্য্যাদা-নামক জিনিসটাকে দর-জার বাহিরে রাখিয়া আসিতে হয়। বুঝিলেও অন্য আশ্রয় না থাকায় শরৎকে চোখ-কান বুজিয়াই সেখানে থাকিতে হইল।

শ্বশুর গোকুলবাবুর পরিবারটিও নিতান্ত ছোট ছিল না। দুই পুত্র, তিন কন্যা, জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ, একটি পাঁচ মাসের পৌত্র, স্ত্রী, স্ত্রীর খুল্লতাতপুত্র বৈদ্যনাথ। তা ছাড়া এক জন ঝি, একটি চাকর। এক শত টাকা মাহিনায় এতগুলি পোষ্যবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইয়া কিছুই উদ্বৃত্ত থাকিত না। ইহার উপর জামাই শরৎ যখন আর একটি পোষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিল, তখন তাহার জন্য এমন কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতে পারিল না, যাহাতে অপরের সহিত জামাতার কিছুমাত্র পার্থক্য থাকিতে পারে।

মানুষের একটা স্বভাব এই যে, যাহার যেখানে যেটুকু প্রাপ্য, সে সেখানে সেই প্রাপ্যটুকু কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করিয়া লইতে চায়, তাহার কিছুমাত্র ব্যতি-ক্রমও সে সহ্য করিতে পারে না। যে ভৃত্য অপরের আদেশ পালন করিতে গিয়া দশটা কটু কথাও অনা-য়াসে মাথা পাতিয়া লয়, সে আপনার ঘরে নিজের স্ত্রীপুত্রের বিন্দুমাত্র অবহেলাতেও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়ে। সুতরাং যেখানে তার সকলের চেয়ে আপনার আদরটা একটু বেশী প্রাপ্য, সেখানে অন্য পাঁচ জনের সমান হইয়া থাকিতে শরৎ যে দিন দিন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

শুধু এইটুকুই যে শরতের ক্ষোভের কারণ ছিল, তাহা নহে। সে দেখিত, অবস্থার গতিকে তাহার এই ঘরজামাই হওয়ার অপরাধটা আর সকলের কথা দূরে থাক, পত্নী সুভাষিণী পর্য্যন্ত যেন ক্ষমা করিতে পারে নাই। সুভাষিণী যদিও প্রকাশ্যে সে ভাবটা প্রকাশ করে নাই, বরং সাধ্যমত আদরযত্ন দেখাইয়াই স্বামীর অন্তরের ক্ষোভটাকে দূর করিবার চেষ্টা করিত, তথাপি শরৎ যেন তাহার সেই চেষ্টার মধ্যেই

একটা অবজ্ঞার ভাব দেখিয়া বেশী মর্ম্মাহত হইয়া পড়িত এবং শাশুড়ী, শ্যালক, শ্যালকপত্নী প্রভৃতির তাহার সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনাগুলা পর্য্যন্ত যেন তাহার নিকট খুব ছোট বলিয়াই বোধ হইত। কিন্তু স্বার্থ-পর শরৎ জানিত না, যাহাকে সে পত্নীর অবজ্ঞা বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছিল, সেটুকু ঠিক অবজ্ঞা নয়, আহত অন্তরের রুদ্ধ অভিমান মাত্র। ঘরজামাই হওয়ায় তাহারই যে মাথা নীচু হইয়াছিল, তাহা নহে, তাহার জন্য সুভাষিণীকেও বাড়ীর সকলের কাছে কতটা ছোট হইয়া থাকিতে হইত, তাহার অপরাধে সুভাষিণী কি শাস্তিভোগ করিত, তাহা সে জানিত না; সুতরাং সুভাষিণীর ব্যবহারটাই তাহার চোখে সব চেয়ে বিশ্রী হইয়া উঠিয়াছিল।

সুভাষিণী বাপের কাছে যত আদর পাইত, মায়ের কাছে তাহার কিছুই পাইত না। ইহার উপর মেয়ে-জামাইকে লইয়া যখন বিব্রত হইতে হইল, তখন মেয়ের উপর মায়ের অনাদরের মাত্রাটা খুব যেন বাড়িয়া উঠিল। তিনি এখন মেয়ের প্রতি কথায়, প্রতি কার্য্যে দোষ দেখিতে লাগিলেন এবং তাহার পোড়া কপালের উল্লেখ করিয়া তাহাকে ধিক্কার দিতেও ছাড়িতেন না। সুভাষিণী কখন নীরবে মায়ের কথা সহিয়া যাইত, কখন বা চড়া গলায় তাহার উত্তর দিত। তখন মাতা ও কন্যার মধ্যে বিবাদ বাধিয়া যাইত। বধূ সৌদামিনী শেষে মধ্যস্থ হইয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দিত। সুভাষিণীর কিন্তু মায়ের ক্রোধোচ্চারিত তীব্র কথাগুলার চেয়ে সৌদামিনীর মধ্যস্থতার কথাগুলা বেশী তীব্র বোধ হইত। নিদারুণ অপমানে সে মাথা হেঁট করিত।

শরৎ কিন্তু এতটা জানিত না, সুতরাং সে পত্নীর উপরেই একটা দারুণ ক্ষোভ অন্তরে পোষণ করিত।

পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলেও গোকুল বাবু জামাতাকে আশ্বাস দিয়া পুনরায় পড়াইতে লাগিলেন। শরৎও এবার পড়ার জন্য খুব পরিশ্রম করিতে লাগিল। কিন্তু মাসকতক পরেই তাহার এই পরিশ্রমটুকু আপনা হইতেই যেন শিথিল হইয়া আসিল।

সকালে নয়টা পর্য্যন্ত পড়িয়া শরৎ উঠিয়া স্নান করিল, এবং ভাতের জন্য তাগাদা করিতে সুভাষিণীকে আদেশ দিল। সুভাষিণী গিয়া সৌদামিনীকে ভাত বাড়িতে বলিল। শুনিয়া সৌদামিনী যেন আকাশ হইতে পড়িল; বলিল, "ও মা, ভাত আর কোথায়? যা ছিল, পটলাকে দিলাম যে। আবার ভাত চড়েছে, একটু সবুর কর্ত্তে বল।"

সুভাষিণী ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "ও ভাত নামাতে কি তর সইবে? সাড়ে ন'টা বেজে গেছে।"

গৃহিণী অদূরে বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন; তিনি ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "তা বাছা, এতক্ষণ কি মুখে গুয়ো দিয়ে ছিলে? না তিনিই ঘুমুচ্ছিলেন? যার এত সকাল ভাতের দরকার, তাকে সকাল সকাল খোঁজ নিতে হয়।"

সুভাগিণী ফিরিয়া গিয়া গম্ভীরমুখে শরৎকে জানাইল যে, এইমাত্র ভাত চড়িয়াছে। শরৎ ব্যস্ত অথচ রুক্ষভাবে বলিল, "সে কি, দশটা যে বাজে।"

সুভাষিণী নিরুত্তরে সরিয়া গেল। ভাত নামিলে, ভাত খাইয়া শরৎ যখন স্কুলে গেল, তখন এগারটা, ক্লাস বসিয়া গিয়াছে। দুই চারি দিন দেখিয়া শেষে পত্নীর উপদেশে শরৎ নয়টার আগেই আহার শেষ করিয়া লইত। যে দিন কোন কারণে ঘটিয়া উঠিত না, সে দিন না খাইয়াই স্কুলে চলিয়া যাইত। ইহাতে অকর্ম্মণ্য জামাতার ব্যর্থ ক্রোধ-প্রকাশ জন্য কেহ যে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিত, তাহা নহে, শুধু সুভাষিণী-কেই দুই চারিটা কথা শুনিতে হইত। কেন না, শরতের উপবাসে সুভাষিণীর ক্ষুধাটা সে দিন বড়ই কমিয়া যাইত।

বৈদ্যনাথ মাঝে মাঝে শরৎকে উপদেশ দিত, "বাবাজী, শ্বশুরের ভাত আর বোনায়ের ভাত খেতে হ'লে রাগতাপগুলাকে আগে দূর ক'রে দিতে হয়।"

শুধু আহারাদির বিষয়ে যে অসুবিধা হইত, তাহা নহে, অন্যান্য বিষয়েও এক আধটু অসুবিধা ঘটিত। রাত্রিতে শরৎ আলো জ্বালিয়া পড়িতেছে, এমন সময় হয় তো সৌদামিনী আসিয়া সুভাষিণীকে ডাকিয়া বলিল, "হাঁ ঠাকুরঝি, সন্ধ্যেবেলাই বল্লাম, বেশী তেল নাই। তা যেটুকু ছিল, নিজের চিম্‌নীতে ঢেলে দিয়েছ, আর আমার ঘরে অন্ধকারে ছেলেটা ঘুমুতে পাচ্ছে না। ভাল আক্কেল যা হোক।"

সুভাষিণী আস্তে আস্তে আলোটি লইয়া সৌদামিনীর ঘরে দিয়া আসিত। শরৎ যদি জিজ্ঞাসা করিত, "আলো দিয়ে এলে, আমার যে এখনো পড়া হয় নি।" তাহা হইলে সুভাষিণী রাগিয়া উত্তর করিত, "যার এক পয়সার তেল কিনিবার ক্ষমতা নাই, তার আবার পড়ার সখ কেন?"

শরৎ অন্ধকারে খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত; তার পর ধীরে ধীরে গিয়া শুইয়া পড়িত।

এইরূপে ব্যাপারগুলা যখন নিতান্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিল, তখন শরৎ পড়া ছাড়িয়া চাকরী করিবার সঙ্কল্প করিল এবং আপনার সঙ্কল্পের কথা শ্বশুরকে

জ্ঞাপন করিয়া একটা চাকরী দেখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল। গোকুলবাবু ভিতরের সব কথা জানিতেন না, সুতরাং তিনি জামাতার সঙ্কল্পে অনুমোদন করিলেন না। জামাতাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "আগে পাশটা কর, তার পর চাকরীর যোগাড় দেখা যাবে। বিনা পাশে আজকাল কুলীগিরী ছাড়া অপর কোন চাকরী জোটে না।"

কিন্তু জামাতা যে তখন কুলীগিরী করিতেও পশ্চাৎপদ নহে, তাহা তিনি বুঝিলেন না। শ্বশুরের নিকট জবাব পাইয়াও শরৎ হতাশ হইল না। বাপের দুই এক জন বন্ধু ছিল। তাহাদের নিকট উমেদারী করিয়া একটি চাকরীর যোগাড় করিয়া লইল। আপাততঃ মাসকতক এপ্রেন্টিস্ খাটিতে হইবে। শরৎ তাহাতেই রাজী হইল।

পড়া ছাড়িয়া জামাইকে চাকরীতে ঢুকিতে দেখিয়া গোকুলবাবু বিরক্ত হইলেন এবং জামাতাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শরৎ কিন্তু তাঁহার কথা কানে তুলিল না। অধিকন্তু সে সুভাষিণীর নিকট এত বেশী উৎসাহ পাইতে লাগিল যে, সে উৎসাহের নিকট আর সকলের নিন্দা ও তিরস্কারের তীব্রতা হ্রাস পাইয়া আসিল।

তিন মাস এপ্রেন্টিস্ খাটিবার পর চতুর্থ মাসে শরৎ মাহিনার প্রথম দশটি টাকা আনিয়া সুভাষিণীর হাতে দিলে সুভাষিণী সে দশটি টাকা কালীর পূজার জন্য তুলিয়া রাখিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"সুবি, ওলো সুবি!"

"কেন মা!"

"বাবু গেলেন কোথায়?"

ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সুভাষিণী বলিল, "নেয়ে এসে কাপড় ছাড়্‌ছে।"

কথাটা শুনিয়া গৃহিণী যেন খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন, এমনই ভাবে বলিলেন, "ওঃ, এরি মধ্যে নাওয়া হয়ে গিয়েছে।"

কিছু বুঝিতে না পারিয়া সুভাষিণী জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গৃহিণী ক্রোধগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তাড়াতাড়ি বাজার ক'রে এসে এর মধ্যে নাওয়া হয়ে গেল, কিন্তু ও বাজার এসেছে না ছাই এসেছে! যাবার সময় তিনশোবার কান কামড়ে ব'লে দিলাম, আজ বিপিন (মধ্যম জামাতা) আস্‌বে, মাছ একটু ভাল দেখে আন্‌বে। গল্‌দা চিংড়ী—"

ঘরের ভিতর হইতে শরৎ উত্তর দিল, "এ বাজারে গল্‌দা চিংড়ী নাই।"

গৃহিণী বলিলেন, "এ বাজারে গল্‌দা চিংড়ী আবার কোন্‌কালে থাকে? দু পা এগিয়ে জগু বাবুর বাজারে গেলে কি পায়ে বেদনা হ'তো?"

শরৎ উত্তর করিল, "পায়ে বেদনা হ'তো না, কিন্তু আমার আফিসের বেলা হয়ে যেতো!"

তীব্রস্বরে গৃহিণী বলিলেন, "ওঃ, তাই বল, নিজের খাওয়ার সময় হ'তো না।"

শরৎ মাথা আঁচড়াইবার জন্য আয়না-চিরুণী হাতে লইয়াছিল; কিন্তু হাত আর মাথায় উঠিল না, তাহা হাতে ধরিয়াই স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রন্ধনশালা হইতে সৌদামিনী ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিল, "সত্যিই তো বাবু, একটু নজরও তো আছে। এই বাগদা চিংড়ী কি জামায়ের পাতে দেওয়া যায়? একটু আক্কেলও কি নাই?"

মধ্যমা সরলা সেখানে ছিল; সে বলিল, "তা কি করবে বল বৌদি, বাজারে থাক্‌লে তো আনবে, হোক না বাগদা, নেহাৎ ছোট তো নয়?"

সৌদামিনী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "না, ছোট নয়, ওর চেয়ে ছোট চিংড়ী আবার থাকে না কি? না বাবু, আমি তো ও মাছ ভদ্রলোকের পাতে দিতেই পার্‌বো না।"

সরলা হাসিয়া বলিল, "তুমি দিতে না পার, আমি দেব।"

গৃহিণী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "না বাবু, মাথা খুঁড়ে মত্তে ইচ্ছে হচ্ছে। মিন্‌ষেকে বল্‌লাম, নিজে বাজার যাও, তা নয়, শরৎ আন্‌বে। শরৎ ওঁর ছাদ্দ কর্‌বে, পিণ্ডী চট্‌কাবে।"

আরশী-চিরুণী যথাস্থানে রাখিয়া শরৎ বাহিরে আসিয়া গম্ভীর-স্বরে বলিল, "টাকা দিন।"

নাসা কুঞ্চিত করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "আর এতক্ষণে টাকা দিয়ে কি হবে বল। খেয়ে আপনার কাজে যাও। আমি তো জানি, সব খাওয়ার কুটুম।"

গৃহিণী প্রস্থানোদ্যত হইলেন। শরৎ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "রাগ কর্‌বেন না, টাকা দিন, আমি এক্ষুণ এনে দিচ্ছি।"

মুখ ঘুরাইয়া গৃহিণী বলিলেন, "রাগ ক'রেই কার কি কচ্ছি বল। যা হয় কর গে বাছা। আবার এর পর বল্‌বে, বেলা হয়ে গেল, খাওয়া হ'লো না।"

বলিয়া তিনি আঁচল হইতে টাকা খুলিয়া শরতের

সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। শরৎ টাকাটা কুড়াইয়া লইল। বৈদ্যনাথ আসিয়া বলিল, "আমায় টাকা দাও, আমি মাছ এনে দিচ্ছি।"

শরৎ পাশ কাটাইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। গৃহিণী বলিলেন, "দেখ্‌লে, বাবুর রাগ হয়ে গেল। হয় তো আজ আর খাচ্চেন না।"

বৈদ্যনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল, "না খায়, বাছাধনের নিজের পেট জ্বল্‌বে, আর কারও কিছু ক্ষতি হবে না!"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "হবে না আবার? কানে যদি ওঠে, তবে আমাকে দু'শো ঝাঁটা মার্‌বে। আমার হয়েছে আগেও মরণ, পিছেও মরণ।"

শরৎ যখন মাছ লইয়া ফিরিল, তখন দশটা বাজিতে দশ মিনিট বাকী। রান্নাঘরের সামনে মাছগুলা ফেলিয়া দিয়া সে তাড়াতাড়ি আপনার ঘরে গেল এবং সার্টটা গায়ে দিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। সুভাষিণী ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খাবে না?"

শরৎ কোন উত্তর দিল না, শুধু পত্নীর মুখের উপর একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল মাত্র। সুভাষিণী তাহার সার্টের প্রান্তটা ধরিয়া বলিল, "বেশী না খাও, একবার ভাতের কাছে বস্‌বে চল, বৌদি ভাত বেড়ে দিচ্ছে।"

শরৎ গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "সময় নাই।"

সুভাষিণী বলিল, "সময় নাই, তা জানি, তবু একবার গণ্ডুষ ক'রে বস্‌বে চল।"

"কেন?"

"নয় তো আমাকে দু'শো কথা শুন্‌তে হবে।"

"তোমার বাপ-মার কাছে যদি তোমাকে কথা শুন্‌তে হয়, তার জন্য আমি দায়ী হ'তে পারি না।"

শরৎ সার্টের প্রান্তটা সুভাষিণীর হাত হইতে টানিয়া লইল। এবার স্বামীর কথায় সুভাষিণীরও যেন একটু রাগ হইল; সে ভ্রূভঙ্গী করিয়া একটু তীব্র কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, না খেয়ে ক'দিন থাক্‌বে? এ বেলা না খাও, ও বেলা এসে তো খেতে হবে।"

শরৎ কোন উত্তর দিল না, শুধু পত্নীর মুখের উপর একবার তীব্র দৃষ্টিটা নিক্ষেপ করিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া বাহির হইয়া গেল।

তাহাকে বাহির হইতে দেখিয়া সৌদামিনী বলিল, "ও মা, আমি সাত তাড়াতাড়ি ভাত বাড়্‌লুম, আর বাবু যে বেরিয়ে গেলেন!"

গৃহিণী শরতের পুনরানীত গলদা চিংড়ীগুলা তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "রাগ হ'লো বোধ হয়। আচ্ছা বৌমা, তোমরাই বল দেখি, এর ভিতর রাগের কথাটা কি হ'লো?"

সৌদামিনী বলিল, "বিষ না থাক, কুলোপানা চক্করটুকু আছে।"

শরতের না খাইয়া আপিসে যাওয়া আজ নূতন নহে। মধ্যে মধ্যে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। যে দিন ঘটিল, সে দিনটা সুভাষিণীর একটু কষ্টেই কাটিত। উঠিতে বসিতে স্বামীর ক্ষুধাক্লিষ্ট মুখখানা মনে পড়িত, খাইতে বসিলে অভুক্ত স্বামীর কথাটা মনের ভিতর জাগিয়া উঠিয়া তাহার ক্ষুধার বেগটা কমাইয়া দিতে; যতক্ষণ না স্বামী আপিস হইতে ফিরিয়া কিছু খাইত, ততক্ষণ তাহার কিছুই ভাল লাগিত না। আজ কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা করিল, অভুক্ত স্বামীর জন্য একটুও কষ্টবোধ করিবে না।

পিত্রালয়ে কন্যার আদর চিরপ্রসিদ্ধ। বড়-দি, মেজ-দি আসিয়া এখানে কি আদর-যত্ন পায়! কিন্তু তাহার এত অনাদর কেন? আদর দূরে থাক্, পদে পদে তাহার এত লাঞ্ছনা-ভোগ কেন? একটা দাসী-চাকরাণীরও যে সম্মান আছে, তাহার সে সম্মানটুকুও নাই। সে সকলের অধম, বাপমায়ের গলগ্রহ। স্বামীর অক্ষমতাই তাহার এই অনাদরের, এই লাঞ্ছনার একমাত্র কারণ নয় কি? তাহার স্বামী যদি মেজদির স্বামীর মত রোজগারী হইত, যদি শ্বশুরবাড়ীর অন্নদাস হইয়া না থাকিত, তাহা হইলে সেও কি আজ মেজদিদির সমান আদর পাইত না? স্নেহময়ী মাতাও কি আজ স্বাভাবিক অপত্যস্নেহ বিস্মৃত হইয়া তীব্র বাক্যবাণে তাহাকে এমন জর্জ্জরিত করিতে পারিতেন? ছি ছি, এমন স্বামীর স্ত্রী হওয়া মেয়েমানুষের কি দুর্ভাগ্য!

অথচ যাহার অপরাধে সে আদরের স্থলে এত অনাদর, সম্মানের স্থানে এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে, সেই স্বামী তাহার মুখের দিকে ফিরিয়া চায় না; তাহাকে লাঞ্ছিত হইতে হইবে জানিয়াও সে আপনার রাগটুকু বজায় করিবার জন্য তাহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়; তাহার সুখদুঃখটাকে আদৌ গ্রাহ্য করে না। এই উপেক্ষাপরায়ণ অক্ষম স্বামীর জন্য ভাবিয়া আপনার লাঞ্ছিত জীবনটাকে আরও লাঞ্ছিত করিবে না, সুভাষিণীর ইহাই স্থির-প্রতিজ্ঞা হইল। আজ সে জোর করিয়া বিষণ্ণভাবটাকে দূরে রাখিয়া বেশ প্রফুল্লতা দেখাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা করা যত সহজ, প্রতিজ্ঞা বজায় রাখা যে তত সহজ নয়, ভাত খাইতে বসিয়া সুভাষিণী ইহা

স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। এক গ্রাস ভাত মুখে তুলিতেই যখন মনে পড়িল, অভুক্ত স্বামী ক্ষুধার তীব্র যাতনায় এতক্ষণ ছট-ফট করিতেছে, তখন তাহার হাতের ভাত কিছুতেই মুখে উঠিতে চাহিল না। অন্য দিন এরূপ অবস্থায় সে দুই এক আনা স্বামীর পকেটে জোর করিয়া ফেলিয়া দেয়, কিন্তু আজ রাগের বশে তাহাও দেয় নাই। এক পয়সার কিছু মুখে দিয়া যে জল খাইবে, তাহারও উপায় নাই। সুভাষিণীর চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল, মুখের ভাতগুলা যেন গলা দিয়া নামিতে চাহিল না, উদ্‌গত বাষ্পরাশি তাহাকে উপরের দিকে ঠেলিয়া দিতে থাকিল।

সরলা পাশে খাইতে বসিয়াছিল; সে বলিল, "ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া কচ্ছিস্ যে সুবি, খা না।"

সৌদামিনী বলিয়া উঠিল, "ওঃ, কত্তা আজ খেয়ে যায় নি, আজ ওর খাওয়া হবে? তুমি আছ ঠাকুর-ঝি, তাই, নইলে খেতে বস্‌বার জন্যই কত সাধ্যসাধনা কত্তে হ'তো।"

ধরা গলায় সুভাষিণী বলিল, "তা বৈ কি, আমার ক্ষিদে নেই, তা কি কর্‌বো।"

গৃহিণীও অদূরে খাইতে বসিয়াছিলেন। তিনি তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "দেখ সুবি, তোর আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচি না। তবু যদি ভাত-কাপড় যোগাতে পাত্তো! খেয়ে নে।"

ঈষৎ হাসিয়া সরলা বলিল, "সত্যিই তো সুবি, আজ তোর ক্ষিদেটা হঠাৎ ক'মে গেল কেন? কি খেয়েছিস্?"

"আমার মাথা। জ্বালিয়ে খেলে মা, জ্বালিয়ে খেলে। যেমন দ্যাবা, তেমনি দেবী! ঘরে ভাত নাই, অথচ ওদের খাওয়ার তরে দু'টি বেলা গুষ্টীশুদ্ধকে জ্বালাতন হ'তে হবে।"

রাগে চোখ কপালে তুলিয়া সুভাষিণী বলিল, "কে তোমাদের জ্বালাতন হ'তে বলে?"

গৃহিণী বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া, উচ্ছিষ্ট হাতটা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "আহা হা, কে বলে? বলে তোমাদের দু'জনের দুটি পেট। কথা শোন না, কে বলে? গলায় দড়ি।"

সুভাষিণী হাতের ভাতগুলা পাতে আছাড়িয়া ফেলিল; রাগে ফুলিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু গলা দিয়া স্বর বাহির হইল না। তখন সে বাঁ হাতে আঁচলটা টানিয়া আনিয়া চোখ দুইটা চাপিয়া ধরিল। সরলা বাঁ হাত দিয়া তাহার চোখের কাপড় টানিতে টানিতে বলিল, "ছি ভাই, খেতে ব'সে কাঁদতে আছে?"

সুভাষিণী আরও জোরে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সরলার স্বামী বিপিনবাবু উকীল। ওকালতীতে পসার না হইলেও তিনি উকীল জামাই; বিনা নিমন্ত্রণে কখনও শ্বশুরবাড়ীতে পদার্পণ করিতেন না, সুতরাং তাঁহার আগমনে বাড়ীতে যে আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল, রাত্রি দশটার পূর্ব্বে তাহার নিবৃত্তি হইল না। তাঁহার আহার সমাপ্ত হইলে তিনি যখন শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং গোলমাল অনেকটা কমিয়া আসিল, তখন গোকুলবাবু আহারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরতের খাওয়া হয়েছে?"

গৃহিণী পরিবেশন করিতেছিলেন; তিনি অবজ্ঞা-পূর্ণ মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "কখন্ আর হ'লো? এই তো বিপিনের খাওয়া শেষ হয়েছে, ওলো সুবি, সুবি!"

সুভাষিণী কাছে আসিয়া উত্তর দিল, "কেন মা?"

মা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "বাবুকে ডেকে দাও না। খেতে হবে না? না সারা রাত হেঁসেল নিয়ে ব'সে থাক্‌বো?"

সুভাষিণী মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "এখনো তো আসে নি মা।"

মা সপ্তমে গলা চড়াইয়া বলিলেন, "এখনো আসে নি মা। কখন্ আস্‌বে? বাবুর জন্যে বুঝি রাত দুপুর পর্য্যন্ত হাঁড়ী নিয়ে থাক্‌তে হবে? আমি আর পারি না বাবু, এক মেয়ে-জামাই নিয়ে আমার যেন হাড়মাস পর্য্যন্ত জ্ব'লে গেল।"

সুভাষিণী নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। গোকুলবাবু বলিলেন, "তা সে জন্য ওকে বকলে কি হবে? আর সে-ই বা এত রাত পর্য্যন্ত এলো না কেন?"

গৃহিণী তীব্রস্বরে বলিলেন, "কেন এলো না, তা আমি কেমন ক'রে জান্‌বো বল। যে জানে, তাকে জিজ্ঞেস কর।"

ঈষৎ রুক্ষস্বরে গোকুলবাবু বলিলেন, "তাকেই জিজ্ঞাসা কচ্চি। কোথাও যাবার কথা ব'লে গিয়েছে সুবা?"

সুভাষিণী অবনতমস্তকে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে উত্তর দিল, "না।"

গোকুলবাবু বলিলেন, "তবে? সন্ধ্যার পর কোন দিনই তো সে বাইরে থাকে না?"

সুভাষিণী আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। গোকুলবাবু চিন্তিতভাবে আহার শেষ করিয়া উঠিলেন। বাহিরে গিয়া বড় ছেলে ব্রজনাথকে বলিলেন, "আজ এখনো শরৎ আফিস হ'তে ফেরে নি।"

অনাথ একটুও না ভাবিয়া উত্তর দিল, "আজ নিবার, বোধ হয় থিয়েটার দেখতে গিয়েছে।"

"টাকা পাবে কোথায়?"

"কারো কাছে ধার কত্তে পারে, পাশেরও যোগাড় ত্তে পারে।"

গোকুলবাবু সকালবেলার ঘটনা জানিতেন না; তবাং ব্রজনাথের অনুমানই সম্ভব বিবেচনা করিয়া তকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

এ দিকে পুরুষদের খাওয়া শেষ হইলে মেয়েরা াইতে বসিল। সুবারও ডাক পড়িল। সুবা খাইতে াহিল না; বলিল, "আমার ক্ষিদে নাই।"

সরলা কিন্তু ছাড়িল না, তাহাকে টানিয়া রান্না-রে আনিল এবং জোর করিয়া পাতের কাছে বসা-ইয়া দিল। মা রাগিয়া বলিলেন, "তোদের রকমটা ক সুবি? ঢলাঢলির কি আর দিন পাস্ না? আজ বাড়ীতে একটা জামাই-কুটুম রয়েছে, আর আজই তোদের রাগের পালা পড়লো? আমি কি কিছু বুঝ্তে পারি না? আজ বিপিন আস্বে, সেই হিংসায় সে ও-বেলা না খেয়ে বেরিয়ে গেল, এ-বেলা বাড়ীতে পর্য্যন্ত ঢুক্লো না। তার উপর তোর এই রাগ। এ সব কি ভাল?"

সুবা পাতের কাছ হইতে হাত গুটাইয়া লইল। সরলা খাইবার জন্য তাহাকে সাধাসাধি করিতে লাগিল। গৃহিনী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "দেখ্ সুবি, ভাল াস্ তো খেয়ে নে।"

সুবাও এবার গর্জ্জন করিয়া বলিল, "যদি না খাই?"

গৃহিনী ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "না খাস্, চুলোয় যা। আমার কিন্তু আর এই আধিখ্যেতা সহ্য হয় না, খেংরা মেরে দূর ক'রে দেব।"

সুবা রাগে মুখখানা লাল করিয়া ক্রোধগম্ভীরস্বরে বলিল, "তাই দাও মা, এক জনকে তো খেংরা মেরে তাড়িয়েছ, আমিই আর বাকী থাকি কেন?"

ঘটীর জলে হাত ধুইয়া সুবা দ্রুতপদে রন্ধনশালা ত্যাগ করিল। গৃহিনী খানিকটা স্তব্ধভাবে থাকিয়া সরলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখলি সবি, মেয়ের কথা শুন্লি? অথচ যত দোষ আমার। আমি যদি একটি কথা বলি, উনি যেন আমায় মাত্তে আসেন।"

ইহার অধিক আর যে কি বলা যায়, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া সরলা বিস্মিতভাবে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সৌদামিনী এতক্ষণ নীরব ছিল; এক্ষণে সে গম্ভীরভাবে বলিল, "তুমি রাগ কর কর্বে মা, উচিত কথা বল্বো, তোমার ছোট মেয়ের আজ-কাল বড্ড কথা হয়েছে।"

গৃহিনী বলিলেন, "তা হবে না? বাবুর দশ টাকা মাইনে হয়েছে। তবু যদি মাথা পেতে থাক্বার জায়গা থাকতো। ও কি সরি, তোর ও কি খাওয়া হ'লো? না না, তা হবে না, মাছের মুড়োটা খেয়ে নে, আমার দিব্যি, আমার মাথা খাস্, চিংড়ী দু'টো ফেলিস্ না। লক্ষ্মী মা আমার, ব'সে ব'সে খা।"

সৌদামিনী হাসিতে হাসিতে বলিল, "কৈ, ফেলে উঠে যাও দেখি, আমি সব তুলে ঘরে দিয়ে আস্বো। তুমি না পার, ঠাকুরজামাইকে খেতে হবে।"

সরলা হাসিয়া বলিল, "সে মন্দ যুক্তি নয় বৌদি।"

সুভাষিণী তখন আপনার অন্ধকার ঘরে বিছানার উপর পড়িয়া ছট্-ফট্ করিতেছিল। শরৎ অনেক দিন না খাইয়া বাহির হইয়াছে সত্য, কিন্তু আজিকার দিনটা তাহার যে উদ্বেগ, যে কষ্টে কাটিয়াছে, এমন উদ্বেগ, এত কষ্ট এক দিনও হয় নাই। অন্য দিন সময়ে ভাত না খাইয়া শরৎ অনাহারে বাহির হইয়াছে মাত্র, আজ কিন্তু সেই সঙ্গে এমন কতকগুলা কথা শুনিয়া গিয়াছে, যাহাতে তাহার প্রত্যাগমন সম্বন্ধে সুভাষিণীর অনেকটা সন্দেহ জন্মিয়াছিল। সে স্বামীকে চিনিত, তাহার দারিদ্র্যজনিত সহিষ্ণুতার অন্তরালে কি যে এক তীব্র অভিমান প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাও সে বুঝিত; এই প্রচ্ছন্ন অভিমানটা কোন্ দিন কোন্ আঘাতে ভীষণভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া এতটা তুমুল বিপ্লব উপস্থিত করিবে, তাহাই ভাবিয়া শঙ্কিত হইত। সুতরাং যত সন্ধ্যা হইতেছিল, সুভা-ষিণীর উদ্বেগটাও ততই বাড়িয়া উঠিতেছিল।

এ দিকে মধ্যম জামাতার আগমন জন্য বাড়ীতে যে একটা আনন্দ-উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, সুভাষিণীকে বাধ্য হইয়া সে উৎসবেও যোগদান করিতে হইয়াছিল। অন্তরের উদ্বেগ অন্তরে চাপিয়া তাহাকে মাতার ও সৌদামিনীর আদেশ প্রতিপালন করিতে হইতেছিল। কিন্তু মানসিক চাঞ্চল্যবশতঃ কাজগুলা সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে না পারিয়া সকলের নিকট তীব্র তিরস্কার পাইতেছিল। গরম-মশলা বাটিতে আদিষ্ট হইয়া লঙ্কা বাটিতেছিল, চিনি আনিতে গিয়া লুণ আনিয়া দিতেছিল, ঘি দিতে তেলের ভাঁড়টা উল্টাইয়া ফেলিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মাতা ও ভ্রাতৃবধূর তীব্র তিরস্কারে জর্জ্জরিত হইয়া লজ্জামিশ্রিত ক্রোধে মনে মনে গুমরিয়া উঠিতেছিল।

সাতটার আগেই শরতের ফিরিবার কথা। কিন্তু সাতটা বাজিল, সাড়ে সাতটা বাজিল, আটটা—সাড়ে আটটা বাজিয়া গেল, তথাপি শরৎ ফিরিল না। সুভাষিণী কাজের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে ঘন ঘন

বাহিরের দিকে চক্ষু নিক্ষেপ করিতে লাগিল, আর সকলের পদশব্দের মধ্যে স্বামীর জুতার শব্দ শুনিবার জন্য কানটা খাড়া করিয়া রাখিল। ক্রমে নয়টা বাজিলে সুভাষিণী আপনার উদ্বেগটা আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে আপনার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল, মায়ের ডাকে আর সাড়া পর্য্যন্ত দিতে পারিল না।

তার পর সরলার জেদে সে আসিয়া খাইতে বসিল বটে, কিন্তু কিরূপে খাবার মুখে তুলিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। শেষে মায়ের যে সকল তিরস্কার সে এত দিন নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছে, তাহারই উত্তর দিয়া, রাগ দেখাইয়া আহারের স্থান হইতে পলাইয়া আসিল।

রাত্রি এগারটা, বারটা, একটা বাজিয়া গেল, সুবার চোখে ঘুম আসিল না। লোকটা গেল কোথায়? তাহার তো যাইবার জায়গা কোথাও নাই? থাকিলে সে কখন অপমান সহ্য করিয়া এখানে থাকিত না। সুভাষিণীও তাহাকে থাকিতে দিত না। আজ রাগটা বড় বেশী হইয়াছে বলিয়াই কি আসিল না, কোন বন্ধু-বান্ধবের ঘরে আশ্রয় লইয়াছে? কিন্তু তেমন বন্ধুই বা কে আছে? সে তো কোন দিনই কাহারও সঙ্গে মিশে না? কাজের সময়টুকুমাত্র বাহিরে থাকে, বাকী সময় এই ঘরখানির ভিতর থাকিয়াই কাটাইয়া দেয়। আজ রাগটা অতিরিক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু লোকটা কোথায় রহিল?

পরদিন রবিবার। গোকুলবাবু সকালে উঠিয়াই প্রয়োজনবশতঃ বাহিরে চলিয়া গেলেন। ব্রজনাথ মৎস্য শীকারে বহির্গত হইল। সুভাষিণী বৈদ্যনাথকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল, "কি হবে মামা?"

বৈদ্যনাথ তাহার উদ্বেগকাতর মুখের দিকে চাহিয়া আশ্বাস দিয়া বলিল, "ভয় নাই সুবা, আমি খুঁজে দেখ্‌ছি।"

মহিম ঘোষ শরতের সঙ্গে এক আফিসে কাজ করিত। বৈদ্যনাথ তাহার নিকট গিয়া জানিল যে, পূর্ব্বদিন শরৎ আফিসে গিয়াছিল বটে, তবে লেট হওয়ায় সাহেবের নিকট ধমক খাইয়া সমস্ত দিন খুব বিষণ্ণভাবেই কাটাইয়াছিল এবং পাঁচটার পর আর সকলের সঙ্গে আফিস হইতে বাহির হইয়াছিল।

অতঃপর বৈদ্যনাথ শরতের যে দুই এক জন বন্ধুকে চিনিত, তাহাদের নিকট গিয়াও শরতের কোন সংবাদ পাইল না। এইরূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া সে যখন বাড়ী ফিরিল, তখন বেলা বারোটা। গৃহিণী তাহাকে দেখিয়াই তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "সকালে উঠেই কোথায় গিয়েছিলি? শরৎ নাই, আজ বাজারটা কত্তে হবে, তা জানিস্ না?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "কি ক'রে জান্‌বো দিদি, আমি তো গণৎকার নই, বল্‌লেই তো পার্‌তে।"

গৃহিণী বলিলেন, "দেখা পেলে তো বল্‌ব। সকালে বেরিয়েছিলি, আর বারোটায় বাড়ী ঢুক্‌লি। শরৎকে খুঁজতে গিয়েছিলি বুঝি?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "যদিই গিয়ে থাকি। ঘর-জামাই হ'লেও জামাই তো বটে।"

গৃহিণী হাত-মুখ নাড়িয়া বলিলেন, আরে আমার জামাই! বাবু রাগ ক'রে যাবেন, তাঁকে খুঁজতে দরোয়ান রাখি।"

বৈদ্যনাথ দিদিকে চিনিত, সুতরাং উৎকণ্ঠার সময় কথা না বাড়াইয়া সে স্নানাহারের চেষ্টায় গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঁচটার পর শরৎ আফিস হইতে বাহির হইয়া যখন রাস্তায় আসিল, তখন তাহার শ্রমখিন্ন ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর দেহখানা যেন ঝিম্‌-ঝিম্ করিতেছে। সে বাড়ীর দিকে না গিয়া গঙ্গার ধারের রাস্তা ধরিয়া চলিল এবং হাবড়ার পুল ছাড়াইয়া একটু অগ্রসর হইয়া গঙ্গাগর্ভে বাঁধান চাতালের উপর বসিয়া পড়িল।

আজ শরতের চক্ষে পৃথিবীটা এমন কঠোর হইয়াছিল যে, পিতার মৃত্যুতে, মাতার মরণে, পিতৃগৃহ হইতে নির্ব্বাসনেও তাহা ততটা কঠোর হয় নাই। আজ যেন সে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অসহায়, সব চেয়ে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছিল। অতি দুঃখী মানুষেরও একটা আশ্রয় থাকে, একটু আহা করিবার লোক থাকে, তাহার তাহাও নাই। থাকিয়া থাকিয়া শাশুড়ীর তীব্র তিরস্কারগুলা মনের ভিতর গুমরিয়া উঠিতেছিল; সেই সঙ্গে পত্নীর কঠোর প্রশ্নটা—এ-বেলা না খাও, ও-বেলা খেতে হবে—মনের ভিতর জাগিয়া উঠিয়া তাহার সকল সহিষ্ণুতাকে যেন পিষিয়া দিতেছিল। কেন, কি জন্য সে এত অপমান সহ্য করিবে? নিতান্ত নিরুপায় লোকও আপনার পেটের ভাতের যোগাড় করিতে পারে, আর সে কি এতই অকর্ম্মণ্য, এত হীন যে, শুধু এক মুঠা পেটের ভাতের জন্য এই সকল অপমান মাথা পাতিয়া লইয়া আপনার পুরুষত্বের গর্ব্বকে সম্পূর্ণ হীন করিয়া ফেলিবে?

সে কি শুধু পেটের ভাতের জন্যই এত দিন এতটা হীনতা স্বীকার করিয়াছিল? কিন্তু যাহার জন্য এতটা ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছে, সেই পত্নীই যখন অবজ্ঞা ও অনাদরের তীব্র কশাঘাতে তাহার ব্যথিত চিত্তটাকে

আহত করিতে ইতস্ততঃ করে না, তখন সে আর কেন ত্যাগ-স্বীকার করিয়া আপনাকে দুর্ব্বল প্রতিপন্ন করিতে যাইবে? সে এবার আহত বিষধরের ন্যায় ফণা উদ্যত করিয়া দেখাইবে, পৃথিবীতে সে-ও মানুষ, তাহারও ক্ষমতা আছে, আত্মমর্য্যাদা আছে। শুধু সে পৃথিবীতে একা।

শরৎ উঠিয়া জলে নামিল এবং মুখ-হাত ধুইয়া মাথায় খানিকটা জল চাপড়াইয়া দিল। তার পর তীরে উঠিয়া পকেট দুইটা হাতড়াইয়া দেখিল, একটি পয়সা এবং একটি আধলা ছাড়া তাহার আর কোন সম্বল নাই। সম্মুখে এক হিন্দুস্থানীর দোকান ছিল। সেখান হইতে এক পয়সার চালভাজা কিনিয়া খাইয়া শরৎ জল খাইল। তার পর পুল পার হইয়া হাবড়ার ষ্টেশনে উপস্থিত হইল।

কোথায় যাইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। যাইবারও স্থান নাই, থাকিবারও স্থান নাই। শরৎ অন্যমনস্কভাবে খানিকটা ষ্টেশনে ঘুরিয়া বেড়াইল। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন দেখিল, বৰ্দ্ধমান-লোক্যাল ট্রেণখানার শেষ ঘণ্টা পড়িয়াছে, তখন ছুটিয়া গিয়া একখানা ইণ্টার ক্লাসের গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

গাড়ী সেওড়াফুলী পৌছিলে, টিকিট-চেকার যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা করিতে লাগিল। শরতের টিকিট ছিল না। চেকার তাহাকে নামাইয়া ষ্টেশনে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। পরদিন ষ্টেশন-মাষ্টার তাহাকে নিঃসম্বল দেখিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

মুক্তি পাইয়া শরৎ কোথায় যাইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মনে হইল, সেওড়াফুলীর নিকটবর্ত্তী বাসুদেবপুরে তাহার মামার বাড়ী। মামার বাড়ীতে মাতুল, মাতুলানীরা বা মাতামহ কেহই ছিল না, শুধু মায়ের এক খুড়া ছিল। খুড়ার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন কেহই ছিল না, শুধু হাতে কিছু পয়সা ছিল। তবে ইহাও প্রবাদ ছিল যে, তাঁহার মত কৃপণ সে বাটীতে আর কেহ ছিল না। শরতের মা যখন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি দুই একবার শরতের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। শরৎ স্থির করিল, আপাততঃ সে এই বুড়ার কাছে গিয়াই আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

জ্ঞান হওয়ার পর শরৎ কখন মামার বাড়ী যায় নাই, সুতরাং বাসুদেবপুরের পথ-ঘাট তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সে যখন তথায় উপস্থিত হইল, তখন মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে। যাইতে যাইতে এ কথাটাও শরতের মনে আসিয়াছিল, যাহার উদ্দেশে সে যাইতেছে, সেই বুড়া যদি এত দিন বাঁচিয়া না থাকে? না থাকে, তখন অন্য চেষ্টা দেখিবে। এখনই বা সে কোন্ একটা নির্দ্দিষ্ট আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইতেছে?

কিন্তু মামার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া শরৎ যখন এক ষষ্টিবর্ষীয় বৃদ্ধকে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে ধূমপানে নিরত দেখিল, তখন তাহার সকল শঙ্কা তিরোহিত হইল এবং একেবারে বৃদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন দাদামশায়?"

বৃদ্ধ মুখের কাছ হইতে হুঁকাটা সরাইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শরতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। "চিনতে পাল্লেন না?" বলিয়া, শরৎ তাঁহার পাশে বসিয়া পড়িল এবং সংক্ষেপে আপনার পরিচয় দিল। বুড়া হুঁকাটা রাখিয়া হর্ষমিশ্রিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "শরৎ, তুই কোথা হ'তে এলি ভাই? বয়স হয়েছে, চোখের জোর নাই, চিনতে পারি না।"

অতঃপর তিনি শরতের পিতার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শরতের মুখে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। তার পর শরৎকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়া তাহার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বাড়ীতে স্ত্রীলোক বা পুরুষ আর কেহ ছিল না! বৃদ্ধ স্বহস্তে পাক করিতেন এবং এক বেলা রাঁধিয়া দুই বেলা খাইতেন। সুতরাং তাঁহার মধ্যাহ্নভোজন শেষ হইলেও রাত্রির জন্য যে ভাত ছিল, তাহাই শরৎকে খাইতে দিলেন। দুই দিন পরে ভাত খাইয়া শরতের যেন ধড়ে প্রাণ আসিল।

আহারান্তে বৃদ্ধ খুঁটিয়া খুঁটিয়া শরতের সকল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। শরৎ তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিল, শুধু তাহার যে বিবাহ হইয়াছে এবং শ্বশুরবাড়ীতে লাঞ্ছিত হইয়া এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিয়াছে, এই কথাটা গোপন করিল। খেয়ালের বশে দাদামশায়কে দেখিবার ইচ্ছা হওয়াতেই সে এখানে উপস্থিত হইয়াছে, কথায় কথায় এমনই ভাব প্রকাশ করিল। বৃদ্ধ হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "বেশ, যখন এসেছিস্, তখন দিনকতক থাক্।"

শরতের থাকিতে আপত্তি ছিল না, সুতরাং সহজেই তাহাতে সম্মতি দিল। বুড়ার সম্বন্ধে সে কতকগুলা যে অলীক কথা শুনিয়াছিল, তাহার কোন লক্ষণই দেখিতে পাইল না। বরং কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে খুব ভাল লোক বলিয়াই মনে হইল।

বাস্তবিক বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বর বাপুলী লোক যে মন্দ ছিলেন, তাহা নহে। কথায়-বার্ত্তায়, সৌজন্যে, সততায় তাঁহার মত লোক প্রায় দেখা যাইত না। গ্রামের কেহ কখন তাঁহার মুখ দিয়া একটা রূঢ় কথা বাহির

হইতে দেখে নাই। দোষের মধ্যে তিনি টাকাকড়ির বিষয়ে একটু অতিরিক্ত সতর্ক ছিলেন নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত তিনি একটি পয়সা খরচ করিতেও কাতরতা প্রকাশ করিতেন। হাতে বেশ দুই পয়সা থাকিলেও কেহ তাঁহার নিকট একটি পয়সার সাহায্য পাইত না। সাহায্য চাহিলে তিনি সাহায্যপ্রার্থীকে স্পষ্ট কথায় বুঝাইয়া দিতেন যে, পরকে দিবার জন্য তিনি গায়ের রক্ত জল করিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন নাই।

চিরদিন তিনি অর্থকে এতটা মমতার দৃষ্টিতে দেখিতেন না। দুই হাতে না উড়াইলেও টাকাপয়সা যে বিশেষ একটা রক্ষণীয় বস্তু, এমন জ্ঞান তাঁহার ছিল না। কিন্তু শেষে এমন এক দিন আসিল, যে দিন তাঁহার প্রাপ্তযৌবনা সহধর্ম্মিণী, একমাত্র গৃহলক্ষ্মী বিনা চিকিৎসায়, বিনা ঔষধে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। পত্নীর মৃত্যুতে বাপুলী মহাশয় অর্থের মহিমা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, সংসারে বাঁচিয়া থাকা যেমন দরকার, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অর্থের তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন।

লোকে বাপুলী মহাশয়কে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারধর্ম্ম করিতে উপদেশ দিল। বাপুলী মহাশয় কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলেন, আগে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরে সংসারধর্ম্ম করিব।

অর্থের জন্য বাপুলী মহাশয় দেশত্যাগ করিয়া একেবারে জয়পুরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে প্রথমে ফেরীওয়ালার কাজ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ফেরীওয়ালা হইতে দোকানদার, দোকানদার হইতে আড়তদার হইলেন। এইরূপে একাদিক্রমে বাইশ বৎসর কাটাইয়া যখন দেশে ফিরিলেন, তখন তাঁহার হাতে নগদ বিশ হাজার টাকা।

প্রচুর অর্থ হস্তগত হইল, কিন্তু সংসারধর্ম্ম করা হইল না। কেন না, অর্থোপার্জ্জনের তীব্র নেশার ভিতর দিয়া বয়সটা কখন্ যে চল্লিশ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল, তাহা খেয়াল ছিল না। যখন খেয়াল হইল, তখন দেখিলেন, শাস্ত্রে তাঁহাকে সংসারবাস ত্যাগ করিয়া বনবাসের উপদেশ দিতেছে।

দেশেও তখন কেহ ছিল না। ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি সকলেই সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। শুধু শূন্য ভিটাটা পড়িয়া ছিল। বাপুলী মহাশয় সেই শূন্য ভিটার মধ্যে কষ্টার্জ্জিত অর্থরাশি যখের মত আগলাইয়া বসিয়া রহিলেন। পৈতৃক জমী-জমা যাহা ছিল, তাহাতেই একটা পেটের খরচ চলিয়া যাইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাপুলী মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, শরৎ পাঁচ সাত দিন থাকিয়াই চলিয়া যাইবে। কিন্তু দশ পনর দিনেও যখন সে যাইবার জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ততা দেখাইল না, তখন বাপুলী মহাশয় তাহাকে সে কথাটা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই বলিলেন, "বাড়ীতে একখানা চিঠি দিলে না কেন হে?"

শরৎ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কাকে লিখবো, সেইটাই ভেবে পাই না, এই জন্যই চিঠি লিখতে পাচ্ছি না।"

উত্তর শুনিয়া বাপুলী মহাশয় একটু অপ্রতিভ হইলেন। সত্যই তো, বাড়ীতে তাহার কে আছে, কাহাকে চিঠি লিখিবে? সুতরাং সে এখানে স্থায়ী বাস করিবার জন্য কোনরূপ মতলব আঁটিয়া আসিয়াছে কি না, ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল। তবে সে চিন্তাটা যে নিতান্ত কষ্টকর হইল, এ কথা বলা যায় না। কেন না, এই কয় দিনের মধ্যেই শরৎ তাঁহার নিঃসঙ্গ জীবনের এতখানি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল যে, এই কয় দিনের পরিচিত সঙ্গীটিকে ছাড়িয়া থাকাও তাঁহার নিকট একটু চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং শরতের এখানে স্থায়ী বাসের কল্পনাই তাঁহার নিকট খুব অপ্রীতিকর হইল না। শরতের আগমনে তাঁহার চিরশূন্য শ্মশানপ্রায় বাড়ীখানার মধ্যে জীবন্ত সংসারের যে একটু সাড়া উঠিয়াছিল, সে সাড়াটুকু বৃদ্ধের উদাসহৃদয়ে যেন একটি মমতার ধ্বনি তুলিয়া দিয়াছিল।

এই কয়েক দিনে শরৎ গ্রামের অনেকেরই নিকট শুধু যে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল, এমন নহে, তাহাদের চিত্তটাকেও আপনার দিকে আকৃষ্ট করিয়া লইয়াছিল। সে যে তাহাদের গ্রাম ছাড়া অন্য স্থানের লোক, কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় সহসা তাহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে এবং আবার এক দিন সহসা তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারে, এমন কথাটা তাহাদের মনেই আসিত না।

এইরূপে গ্রামের লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া, বৃদ্ধ দাদামহাশয়ের নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গপ্রিয়তার আগ্রহ জাগাইয়া দিয়া শরৎ যখন এই বাসুদেবপুর গ্রামখানাকেই আপনার করিয়া লইতে লাগিল, তখন তাহার হৃদয় হইতে কলিকাতার স্মৃতিটা যে সম্পূর্ণ মুছিয়া গেল, এমন কথা বলা যায় না। সে স্মৃতিটাকে অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা থাকিলেও শরৎ তাহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, সময়ে সময়ে তাহার

মনের একপাশে উঁকি দিয়া মনটাকে আকুল করিয়া তুলিত। সন্ধ্যায় পল্লীভ্রমণ শেষ করিয়া ঘরে আসিয়া যখন স্বহস্তে সন্ধ্যা-দীপ জ্বালিত, তখন সেই সান্ধ্য-প্রদীপের সঙ্গেই আর একখানা আলোকোজ্জ্বল ঘরের কথা মনে পড়িয়া যাইত। সহসা মনে পড়িত, সে প্রত্যহ এমনি সময় আফিস হইতে ঘরে ফিরিত এবং ফিরিয়া দরজার উপর তাহারই প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠা-পূর্ণ চিত্ত লইয়া যে এক জন দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহার মুখে নিশ্চিন্ততার একটু হাসি নিত্য দেখিতে পাইত। সে কি এখনও সেই ক্ষুদ্র গৃহখানিতে সন্ধ্যা-দীপ জ্বালিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করে? শেষে ক্লান্ত হইয়া নিরাশ চিত্তে ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দেয়? শরতের বুকের ভিতর হইতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস খুব জোরে ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিত। সেটাকে সবলে চাপিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া পড়িত।

কখন বা স্তব্ধ মধ্যাহ্নে নির্জ্জন গৃহমধ্যে পড়িয়া পড়িয়া রবিবারের মধ্যাহ্নটা মনে আসিত, শরতের প্রাণটা চঞ্চল হইয়া উঠিত। সেই সঙ্গে শাশুড়ীর তীব্র বাক্যবাণগুলা, সুভাষিণীর সগর্ব্ব ব্যবহার মনে আসিলেই প্রাণের ভিতর প্রতিশোধের একটা অস্থির উন্মাদনা অনুভব করিত। ওঃ, কি নির্য্যাতন, কি অবজ্ঞা! কোন দিন যদি ইহার উপযুক্ত প্রতিশোধ দিতে পারা যায়, তবেই পুনরায় সাক্ষাৎ। নতুবা—শরৎ ক্রোধে ক্ষোভে দাঁতে দাঁতে ঘষিতে থাকিত।

শরৎ প্রথম দিন-কতক দাদামহাশয়ের কাছে যে একটু সঙ্কুচিতভাবে থাকিত, ক্রমে সে সঙ্কোচটুকু অন্তর্হিত হইলে সে যেন জীবনের একটা নূতন অধ্যায় আরম্ভ করিল। এ অধ্যায়ে জীবনের অতীত ইতিহাসের জেরটা টানিয়া আনিতে তাহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং সে কলিকাতাকে স্মৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া বাসুদেবপুর গ্রামখানাকেই জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহারই মধ্যে কলিকাতার ক্ষীণ স্মৃতিটুকু আসিয়া চিত্তকে উদ্বিগ্ন করিবার চেষ্টা করিলে শরৎ তাহাকে ক্রোধের আগুনে ছাই করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিত।

বুড়া বাপুলী মহাশয় কিন্তু এত কথা জানিতেন না। তিনি জীবনের নিঃসঙ্গ অপরাহ্নে এই ক্ষুদ্র সঙ্গীটিকে পাইয়া আসন্ন অন্ধকারের মধ্যেও যেন একটু দিনের আলো দেখিতে পাইলেন। সুতরাং অপরের যে সকল অসদ্ব্যবহার তিনি কোন দিনই সহ্য করিয়া আসেন নাই, শরতের সেই সকল ব্যবহারই স্নেহের অত্যাচাররূপে খুব সহজেই সহ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন।

খাওয়া-পরার উপর বাপুলী মহাশয়ের কোন দিনই লক্ষ্য ছিল না। এই দুইটা ব্যাপার কোনরূপে সম্পন্ন হইলেই চলিয়া যাইত। কিন্তু শরতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই দুইটা বিষয়ে একটু লক্ষ্য রাখিতে হইল। শরৎ নিজে কিছু না বলিলেও সে কলিকাতার ছেলে, ভাল খায়, ভাল পরে, এই সিদ্ধান্তটুকু নিজেই করিয়া লইয়া বাপুলী মহাশয় নিজেই তদনুরূপ মনোযোগী হইয়াছিলেন। খাওয়ার সময় একটু ভাল মাছ, ভাল তরকারী না হইলে তাঁহার যেন তৃপ্তি হইত না। শরৎ যদি বলিত, "এ সব কেন দাদামহাশয়?" তাহা হইলে বাপুলী মহাশয় হাসিয়া বলিতেন, "আরে দাদা, পেট ভ'রে খাওয়াটা চাইত। খাওয়ার জন্যই সব। একে তো পাঁচ শালায় আমাকে কঞ্জুষ খেতাব দিয়েছে, শেষে তুইও কি ঐ অপবাদ দিয়ে পালাবি?"

পলাইবার কথাটা বলিতে বৃদ্ধের মুখখানায় যেন একটা শঙ্কার ছায়া ভাসিয়া উঠিত। শরৎ উত্তর করিত, "না দাদামশায়, দু' এক দিনের কুটুম্বিতা হ'লে সব চলে, কিন্তু বারো মাস থাকতে হ'লে বাড়াবাড়ি ভাল নয়।"

প্রফুল্লমুখে বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "ওরে ভাই, চিরকাল তো ছাই-ভস্ম খেয়ে আসছি। তবু তোর অছিলায় যদি দু'দিন একটু ভালমন্দ মুখে ওঠে, তাতে ক্ষতি কি? জামায়ের নামে মারে হাঁস—বুঝলি কি না।"

বলিয়া বৃদ্ধ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেন। ব্যয়কুণ্ঠ বৃদ্ধের ব্যয়ে এই অসঙ্কোচের ভাব দেখিয়া শরৎ বিস্মিত হইত।

এক দিন শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাদামশায়, আমি চ'লে গেলে তোমার মনে কষ্ট হবে?"

ম্লানমুখে বাপুলী মহাশয় উত্তর করিলেন, "কষ্ট এমন কি! কত এলো, কত গেল। তবে একটা পাখী পুষলেও—বুঝেছিস্ কি না?"

শরৎ হাসিয়া বলিল, "বেশ বুঝেছি, কিন্তু আমি ঠিক পাখী নই দাদামশায় যে, হঠাৎ এক দিন শিকলী কেটে পালাব! আমি মানুষ।"

বাপুলী মহাশয় হাসিলেন। কিন্তু মানুষও যে সুবিধা পাইলে পাখীর মতই হঠাৎ এক দিন উধাও হইয়া যাইতে পারে না, এ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। বরং পোষমানা পাখী অপেক্ষা পোষমানা মানুষ আরও সহজেই চলিয়া যাইতে পারে। সুতরাং শরতের মত চঞ্চলপ্রকৃতির যুবক যে সহসা এক দিন পক্ষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহার ক্ষণিকোজ্জ্বল অপরাহ্নটাকে

নিবিড় অন্ধকারে ঢালিয়া দিয়া অনায়াসেই চলিয়া যাইতে পারে, এই চিন্তাটা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিলেন না এবং এই মানুষটিকে কোন্ সুদৃঢ় শৃঙ্খলে বাঁধিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"আর ভাল লাগে না দাদামশায়!"

"কি ভাল লাগে না শরৎ?"

"এই মেয়েলী কাজগুলা।"

উচ্চ হাসি হাসিয়া বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "এক কলসী জল তুলে কোমরে দিলে হাত, এই মুখে খেতে চাও বাগ্দিনীর ভাত? আমি তো আগেই বলেছি ভাই, এ সকল তোমার কাজ নয়।"

ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে শরৎ বলিল, "তুমি তো বল্লে; কিন্তু তুমি বুড়ো মানুষ, দু'বেলা রেঁধে দেবে, আর আমি ব'সে ব'সে খাব?"

"তাই বুঝি ঠিক কর্‌লে, জোয়ান ছোকরা তুমি রেঁধে-বেড়ে বুড়াকে বসিয়ে খাওয়াবে? কিন্তু ভায়া, খাওয়া কাজটি খেতে যেমন তৃপ্তিকর, তৈরী কর্‌তে তেমনই বিরক্তিজনক।"

"সে কথা খুব সত্যি দাদামশায়। আমি তাই ভাবি, তুমি কেমন ক'রে বারোমাস এই বিরক্তির কাজটা চালাও।"

"আমি নিরুপায়।"

"একেবারে যে উপায় নাই, তা নয়। একটা রাঁধুনী রাখ্‌লে তো পার?"

সহাস্যে বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "ছেলেবেলায় মা'র হাতে খেয়েছি, তার পর দিনকতক তোর দিদি রেঁধে খাইয়েছিল। আর কারো হাতে খেতে এ পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি হয় নি।"

ঈষৎ হাসিয়া শরৎ বলিল, "এই তো আমার হাতে খাচ্চো।"

"তুই—তোর সঙ্গে বাইরের রাঁধুনীর সঙ্গে তুলনা?"

"তা হ'লে এখন উপায়? আমার তো আর এ হাঁড়ী ঠেলা মোটেই ভাল লাগে না?"

"তোর ভাল না লাগে, যার ভাল লাগে, তার হাতে ছেড়ে দে।"

"তুমি রেঁধে দেবে? তা আমি পার্‌বো না।"

"তা হ'লে 'মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থা'!—একটা রাঁধুনীর চেষ্টা দেখ্‌তে হয়।"

"রাঁধুনীর হাতে খাবে?"

"যে সে রাঁধুনীর হাতে কি খেতে পারি দাদা?"

"কি রকম রাঁধুনী আবার?"

একটু প্রফুল্লতার হাসি হাসিয়া বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "এমন একটি রাঁধুনী আন্‌বো, যে বিনা বেতনে আমাকে শেষ কটা দিন, আর তোকে সারা জীবনটা রেঁধে দিতে পারে।"

বাপুলী মহাশয় শরতের মুখের উপর সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। শরৎ শিহরিয়া উঠিল। বাপুলী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লেই সকল গোল-যোগের নিষ্পত্তি হয়, না?"

শরৎ কোন উত্তর দিতে পারিল না। নিঃশব্দে নতমুখে আহার-কার্য্য শেষ করিল।

তার পর শরৎ যখন দেখিল, দাদামহাশয় সত্যই তাহার বিবাহের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন সে যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহার এক একবার প্রতিবাদ করিবার, সকল কথা খুলিয়া বলিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু সেই সঙ্গে আহত অভিমানটা এমনই মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল যে, শরৎ আর কোনই প্রতিবাদ করিতে পারিল না। কাহার জন্য সে প্রতিবাদ করিবে? যে দিন সে অপমানের তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া অনশনে বাহির হইয়াছিল, সে দিন একটা স্নেহের কথা বলিয়া কেহই তো তাহার আঘাত-বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে সান্ত্বনার একটুও প্রলেপ প্রদান করে নাই! বরং আঘাতের উপর কঠোর আঘাত করিয়া তাহার অন্তরের বেদনাকে আরও তীব্র করিয়া দিয়াছিল। আজ সে নিষ্ঠুরতার কঠোর প্রতিশোধ লইবার অবসর। সে পুনরায় বিবাহ করিয়া দেখাইবে যে, ভবানীপুরের গোকুল মুখুয্যে ছাড়া আরও অনেকে তাহাকে কন্যা দান করিতে প্রস্তুত। শুধু তাহাই নয়, সেই সঙ্গে প্রচুর অর্থাগম। যৌতুকের দুই হাজার টাকা, আর বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বর বাপুলীর বিশ হাজার টাকার কোম্পনীর কাগজ। শরৎ কোন্ আশায় জীবনের এই মাহেন্দ্র সুযোগ ত্যাগ করিবে?

কিন্তু সুভাষিণী! সুভাষিণীর নিকটেও কি সে কোন দিন স্ত্রীর উপযুক্ত আদর-যত্ন স্নেহ-ভালবাসা পাইয়াছে? সে বরং তাহার দারিদ্র্যের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া তাহার মর্ম্মবেদনার গুরুত্ব আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। সে যখন স্ত্রী হইয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করে নাই, তখন শরৎ একাই কেন স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করিয়া দারিদ্র্য ও অপমানকে বরণ করিয়া লইবে?

এইরূপ চিন্তার মধ্যে হঠাৎ যখন এক দিন

আশীর্ব্বাদ সম্পন্ন হইয়া গেল, তখন আর কোন উপায় নাই ভাবিয়া শরৎ ঘটনাস্রোতে গা ভাসাইয়া দিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"ও দিদি!"

"কেন রে বোদে?"

ঈষৎ রাগতভাবে বৈদ্যনাথ বলিল, "বোদে? কেন, বদ্দিনাথ বল্‌তে পার না?"

গৃহিণী তীব্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "তোকে আবার বদ্দিনাথ বল্‌তে হবে? কেন বল্ দেখি?"

গম্ভীরভাবে বৈদ্যনাথ বলিল, "কেন আবার কি, মানুষের কি সব দিন সমান যায়? আজ বোদে আছি, কাল বৈদ্যনাথ বাবু হ'তে পারি। আজ তোমার ভাতে আছি ব'লে কাল যে আমি বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকার মালিক হয়ে বসতে পারি না, এমন কথা কে বল্‌তে পারে?"

গৃহিণী একটু তাচ্ছীল্যসূচক হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমি বল্‌তে পারি। তুই আবার মানুষ হবি, কপাল আমার!"

বৈদ্যনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "তোমার কপাল নয় দিদি, হ'তে হ'লে আমার নিজের কপালেই হবে। বুঝলে?"

মুখ ঘুরাইয়া গৃহিণী বলিলেন. "খুব বুঝেছি। আজ কি তোর গাঁজার নেশা কম পড়েছে?"

মুখখানাকে ভারী করিয়া বৈদ্যনাথ বলিল, "তোমাদের ঐ এক কেমন দোষ, আমি কথা কইলেই গাঁজাখোর ব'লে উড়িয়ে দাও। কেন, গাঁজা খাই ব'লে আমি কথা কইতে জানি না বুঝি?"

"এই বুঝি তোর কথা?"

"কি এমন মন্দ কথা? শরৎ যদি বড় লোক হ'তে পারে, তবে আমিই কি পারি না?"

"কোন্ শরৎ রে?"

"তোমাদের জামাই শরৎ গো, যাকে দু'বেলা তুমি ঝাঁটা মেরে ভাত দিতে।"

গৃহিণী স্তব্ধ দৃষ্টিতে ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সৌদামিনী অদূরে বসিয়া ছেলেকে স্তন্যদান করিতেছিল। সে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "শরৎ বড় লোক হয়েছে? সত্যি?"

সহাস্যে বৈদ্যনাথ বলিল, "খুব সত্যি। একবারে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকার মালিক।"

বিস্ময়ে গৃহিণীর চক্ষু দুইটা অধিকতর প্রসারিত হইয়া আসিল। তিনি বিস্ময়াপ্লুত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বলিস্ কি রে বোদে, সে টাকা কোথায় পেলে?"

বৈদ্যনাথ মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক গম্ভীরস্বরে বলিল, "মাটী ফুঁড়ে এলো। কপালে থাকলে, কে ঠেকায় বল। তার কোথাকার কে এক বুড়ো দাদামশায় আছে, মায়ের খুড়ো। বিস্তর টাকার মালিক; কিন্তু ভোগ করবার কেউ নাই। শরৎ ছোঁড়াই এখন তার ওয়ারিশই বল, আর তেরাত্রির শ্রাদ্ধাধিকারী বল, সব।"

সৌদামিনী গালে হাত দিল। গৃহিণী ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই তার এত খোঁজ পেলি কোথায়?"

বৈদ্যনাথ উত্তর করিল, "খোঁজ কি আর আপনি আসে দিদি, খোঁজ নিতে হয়। ছোঁড়াটা চ'লে গেল, দেখলুম, তোমরা তেমন খোঁজ নিলে না। তা না নাও, আমারও তো ভাগ্নী-জামাই বটে, কাজেই আমাকে খোঁজ নিতে হ'লো। তাও কি সহজে পেয়েছি, কত ঘুরে-ফিরে সন্ধান নিতে হয়েছে।"

প্রফুল্লকণ্ঠে গৃহিণী বলিলেন, "আহা, বেশ হয়েছে!"

ঘাড় নাড়িয়া বৈদ্যনাথ বলিল, "উহুঁ, বেশ যে হয়েছে, এমন কথা আমি তো বল্‌তে পারি না।"

গৃহিণী তাহার মুখের উপর জিজ্ঞাসাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন. বৈদ্যনাথ বলিল. "সে বড়লোক হয়েছে, বর-জামায়ের আদর হ'তে বেঁচে গেল। কিন্তু তাতে আমাদের কি দিদি?"

"মেয়েটার ভাবনা তো আর ভাবতে হবে না; তাই আমাদের যথেষ্ট।"

"মেয়েটার ভাবনা ভাব্‌তে না হ'লে যথেষ্টই হ'তো, আর তা হ'লে আমি এতক্ষণ আহ্লাদে বোধ হয় নেচে উঠতাম। কিন্তু এ যে উল্টা ব্যাপার।"

"আবার কি ব্যাপার?"

"ব্যাপার বড় শক্ত, আবার বিয়ে কচ্চে।"

গৃহিণী দাঁড়াইয়াছিলেন. বসিয়া পড়িলেন। রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বলিস্ কি রে, বিয়ে কচ্চে?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "শুনলাম তো তাই। বিয়ের সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। বোধ হয়, এখান পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ-পত্র আসবে। কেন না, বাছাধন যে এখানকার ঝাঁটার স্বাদ ভুলেছে, এমন তো মনে হয় না।"

গৃহিণী উগ্রস্বরে বলিলেন, "তুই বলিস্ কি রে বোদে, আমি তাকে ঝাঁটা মারতাম? হাজার হোক,

জামাই। শুন্‌লে বৌমা, বোদের কথা শুন্‌লে? আমি জামাইকে ঝাঁটা মেরেছি।"

সহাস্যে বৈদ্যনাথ বলিল, "ভুল হয়েছে দিদি, মার্‌বে বলেছ, মার নি।"

সৌদামিনী বলিল, "না না, মামা, এটা তোমার মিছে কথা। মা তো জামাই জামাই ক'রে পাগল হ'তেন, আমরা বরং বাবু একটু আধটু ব্যাজার হতাম।"

"তা হবে" বলিয়া বৈদ্যনাথ হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। গৃহিণী রাগে দুঃখে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ও মা গো, শেষে আমার নামে বদ্‌নাম! আমার মাথা খুঁড়ে মত্তে ইচ্ছে কচ্চে। আমি ঝাঁটা মেরেছি? মুখে কুড়িকিষ্টি হবে, জিভ খ'সে যাবে।"

দিদির অভিশাপে কর্ণপাত না করিয়া বৈদ্যনাথ দ্রুতপদে সুভাষিণীর ঘরে উপস্থিত হইল এবং দরজার কাছে গিয়া ডাকিল, "সুবা!"

সুবা ছুটিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া অতিমাত্র আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি মামা?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "সব শুন্‌তে পেয়েছিস্?"

ব্যগ্রকণ্ঠে সুবা বলিল, "পেয়েছি। কিন্তু আমার দিব্যি, কথা সব সত্যি?"

বৈদ্যনাথ ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "সত্যি। কিন্তু—"

বাধা দিয়া সুবা অশ্রুজড়িতকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু ছেড়ে দাও মামা, তুমি শুধু বল, তার আর খাওয়া-পরার ভাবনা নাই?"

সুবার চোখ দুইটা ছল-ছল করিতে লাগিল। বৈদ্যনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সে ভাবনা একটুও নাই। সে এখন পঞ্চাশ হাজার টাকার মালিক। কিন্তু সে যে আবার বিয়ে কচ্চে।"

ব্যস্ততার সহিত সুবা বলিল, "তা করুক, কিন্তু তাকে আর তো উপোস দিতে হবে না।"

ম্লানহাসি হাসিয়া বৈদ্যনাথ বলিল, "পাগল মেয়ে!"

সুবা অশ্রু-কাতরকণ্ঠে বলিল, "সে না খেয়ে চ'লে গেছে মামা।"

সুবার চোখ দিয়া ঝর-ঝর জল গড়াইয়া পড়িল। বৈদ্যনাথের চোখেও জল আসিল। সে নীরবে নত-মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুবা আঁচলে চোখ মুছিয়া ইতস্ততঃ করিয়া মৃদু-স্বরে বলিল, "আমি তোমাকে একটা টাকা দিব মামা, তুমি চুপি চুপি কালীঘাটে পূজো দিয়ে আস্‌বে?"

এবার আর বৈদ্যনাথ চোখের জল সামলাইতে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া ভারি গলায় বলিল, "তা পার্‌বো। কিন্তু তোর হাতে আর টাকা আছে?"

"তার মাইনের তিরিশ টাকা আছে।"

"তাই থেকে আমাকে একটা টাকা দে দেখি। একবার সেওড়াফুলী পর্য্যন্ত ঘুরে আসি।"

"কেন?"

"শরতের সঙ্গে একবার দেখা কর্‌বো। দেখি, যদি বিয়েটা বন্ধ কত্তে পারি।"

সুবা নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। বৈদ্যনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "দিবি?"

সুবা নতমুখে উত্তর দিল, "না।"

একটু ভাবিয়া বৈদ্যনাথ বলিল, "আচ্ছা, কারো কাছে ধার পাই কি না দেখি।"

বৈদ্যনাথ প্রস্থানোদ্যত হইল। সুবা ছুটিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "না মামা, তোমার যাওয়া হবে না।"

বৈদ্যনাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। সুবা বলিল, "বল, তুমি যাবে না? আমার দিব্যি।"

বৈদ্যনাথ বলিল, "না গেলে বিয়েটা যদি হয়ে যায়?"

দৃঢ়স্বরে সুবা বলিল, "হোক্।"

"কিন্তু এই কি অভিমানের সময় সুবা?"

"হাঁ। বল, তুমি যাবে না?"

সুবার দৃঢ়তা দেখিয়া বৈদ্যনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে একটু ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "একবার যাব; কিন্তু তার বিবাহে বাধা দেব না।"

সুবা সরিয়া দাঁড়াইল। বৈদ্যনাথ চিন্তিতভাবে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সুবা কিয়ৎক্ষণ স্থিরনিস্পন্দ-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল। ঘরের দেয়ালে কালীঘাটের কালীর একখানা পট ছিল। সুবা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্‌গদস্বরে বলিল, "হে মা কালি, তাই যেন সত্যি হয় মা, তাকে যেন আর উপোস দিয়ে আফিসে যেতে না হয়।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গোকুলবাবু আফিস হইতে ফিরিয়া সংবাদটা যখন শুনিলেন, তখন তিনি রাগিয়া, মাথায় হাত চাপড়াইয়া বাড়ীখানা যেন মাথায় করিয়া তুলিলেন। গৃহিণী সান্ত্বনা করিতে গেলে তাঁহাকে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া

দিলেন। তাঁহার রাগ দেখিয়া কেহই সম্মুখীন হইতে সাহস করিল না। তিনি বৈদ্যনাথকে ডাকিয়া সকল সংবাদ অবগত হইলেন এবং কি উপায়ে শরতের পুনরায় বিবাহ বন্ধ করা যায়, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। সে দিন তিনি আর জলস্পর্শ করিলেন না।

অনেক চিন্তার পর গোকুলবাবু স্থির করিলেন, বাসুদেবপুরে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত; তথায় গিয়া যে কোন উপায়ে বিবাহ বন্ধ করিবেন। সম্ভবতঃ শরৎ প্রথম বিবাহের কথাটা গোপন করিয়াছে; তাহা প্রকাশ করিয়া দিলে আর কেহ তাহাকে কন্যাদান করিবে না। কিন্তু বৈদ্যনাথ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, সে চেষ্টা বৃথা, এমন অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত লোক আছে, যাহারা সপত্নীর উপরেও কন্যাদান করিয়া দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পশ্চাৎপদ নহে। বিশেষতঃ শরৎ এখন অনেক টাকার মালিক। উপস্থিত বিবাহটা বন্ধ করিলেও টাকার জোরে অনায়াসে অন্যত্র বিবাহ করিতে পারিবে। এ অবস্থায় বাধা দিতে গিয়া তাহাকে উত্ত্যক্ত করা হইবে মাত্র।

বৈদ্যনাথের কথা শুনিয়া গোকুলবাবু হতাশ হইয়া পড়িলেন, তখন বৈদ্যনাথ তাঁহাকে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিয়া যাতায়াতের রেলভাড়া লইয়া বাসুদেবপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

বৈদ্যনাথ অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া বাসুদেবপুরে উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া শুনিল যে, বিবাহের সমস্তই প্রস্তুত, পরদিন বিবাহ, সে দিন গাত্রহরিদ্রা হইয়া গিয়াছে। বৈদ্যনাথ ম্রিয়মাণভাবে বাপুলী মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া শরৎ যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কিন্তু চতুর বৈদ্যনাথ যখন বাপুলী মহাশয়ের নিকট আপনাকে শরতের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিল, তখন সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

তার পর নিভৃতে বৈদ্যনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর মামা, হঠাৎ কি মনে ক'রে?"

বৈদ্যনাথ হাসিয়া উত্তর করিল, "উপোসের পর তোমার পারণটা কি রকম হচ্চে, তাই দেখতে এলাম।"

শরৎ হাসিল। বৈদ্যনাথ সহাস্যে বলিল, "দেখছি, তোমাদের এ অঞ্চলে বিয়ের বাজার খুব সস্তা। আমার তরে একটা যোগাড় ক'রে দিতে পার বাবাজী?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া শরৎ বলিল, "তা পারি। কিন্তু তোমার আসল মতলবটা কি? বিয়ে কত্তে, না বিয়ে বন্ধ কত্তে আসা?"

"বিয়ে বন্ধ কর্‌বার মতলব থাক্‌লে বুড়োর কাছে বোধ হয় আসল পরিচয়টাই দিতাম।"

"দাও নাই যে, সেইটাই আশ্চর্য্য।"

"তোমার মত নিমকহারাম ছোকরার পক্ষে আশ্চর্য্য হবারই কথা।" বলিয়া বৈদ্যনাথ শ্লেষের হাসি হাসিল। শরৎ একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আসল উদ্দেশ্যটা কি মামা?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "আমার যা আসল উদ্দেশ্য ছিল, সেটা তোমার পক্ষে আদৌ ভাল নয় বাবাজী। কিন্তু দৈব তোমার সহায়।"

শরৎ জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে বৈদ্যনাথের মুখের দিকে চাহিল। বৈদ্যনাথ বলিল, "তুমি মনে করো না বাবাজী, আমাদের ফাঁকি দিয়ে এত সহজে বিয়ে কত্তে পার্‌তে।"

শরৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কত্তে?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "আর কিছু কত্তে না পারি, তোমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী যে এখনো বর্ত্তমান এবং শ্বশুরের ভাতে অরুচিই যে এই বিবাহের একমাত্র কারণ, এ সংবাদটাও প্রচার ক'রে যেতে পার্‌তাম।"

"প্রচার কর্‌লে না কেন?"

"বলেছি তো, দৈব তোমার সহায়। এ সুসমাচার প্রচার কত্তে এক জনের মাথার দিব্যি দিয়ে নিষেধ আছে।"

"কার?"

"যার উপর রাগ ক'রে তুমি এই শুভকাজটা সম্পন্ন কত্তে বসেছ।"

"কে, সুবা?"

"তা হ'লে এখনো মনে আছে?" বলিয়া বৈদ্যনাথ মৃদু হাসিল। শরৎ মাথা নীচু করিল।

বৈদ্যনাথ সহাস্যে বলিল, "মেয়েমানুষ জাতটা বড় অকৃতজ্ঞ বাবাজী। তারি তরে আজ একমাস যাবৎ ছুটাছুটি ক'রে কত কষ্টে তোমার খোঁজ-খবর পেয়েছিলাম, কিন্তু হতভাগা বেটী এক মাথার দিব্যি দিয়ে আমার সব কষ্ট, সব শ্রম নিষ্ফল ক'রে দিলে।"

বৈদ্যনাথ শ্লেষপূর্ণ কটাক্ষে শরতের মুখের দিকে চাহিল। শরৎ মুখ না তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে দিব্যি দিলে কেন?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "মেয়েমানুষের পেটের কথা বুঝে ওঠা আমার মত গাঁজাখোরের বুদ্ধিতে কুলিয়ে ওঠে না বাবাজী। তবে তোমাকে যে আর উপোস দিয়ে আপিস যেতে হবে না, এইটুকুই বোধ হয় তার সান্ত্বনা।"

শরতের মুখখানা ম্লান হইয়া গেল। সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না।

বৈদ্যনাথ পরদিন সকালে উঠিয়া প্রস্থান করিল। বাপুলী মহাশয় সে দিনটা থাকিয়া শরতের বিবাহে বরযাত্রী হইবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু বৈদ্যনাথ প্রয়োজনের গুরুত্ব জানাইয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। সে চলিয়া গেলে শরৎ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

বৈদ্যনাথের কথাগুলা যে শরৎকে বিচলিত করে নাই, তাহা নহে। সুবা তাহার বিবাহে বাধা দিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহাকে আর উপবাস দিতে হইবে না, এই সান্ত্বনাটুকু লইয়াই সে আর সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছে, এই কথাগুলা ভাবিতে সে হৃদয়ে বৃশ্চিকদংশনের যাতনা অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু এ যাতনা স্থায়ী হইল না। বহু চিন্তার পর সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, বৈদ্যনাথের কথাগুলা শুধু অলীক নয়, সম্পূর্ণ অলৌকিক ও অস্বাভাবিক। কোন স্ত্রীলোক কখন প্রিয়তম স্বামীকে অপরের হাতে বিলাইয়া দিতে পারে না। এতটা স্বার্থত্যাগ স্ত্রীজাতির পক্ষে, বিশেষতঃ তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ন্যায় রমণীর কন্যার পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। সুতরাং কথাটা হয় বৈদ্যনাথের গঞ্জিকা-ধূমবিকৃত মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়াছে, নতুবা সুবা তাহাকে ভালবাসে না। ভালবাসিলে ভালবাসার পাত্র স্বামীকে এমনভাবে কখনই হস্তান্তরিত করিতে পারিত না।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া শরৎ আপনার দুর্ব্বল চিত্তকে সবল করিয়া লইল বটে, কিন্তু বিবাহসভায় নববধূর কণ্ঠে মালা পরাইবার সময় হস্তের অস্বাভাবিক কম্পনবেগ কিছুতেই রোধ করিতে পারিল না। শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনির মধ্য হইতে যেন একটা মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের সুর উত্থিত হইয়া সকল উৎসব ম্লান করিয়া দিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

আঘাতটা পড়িবার পূর্ব্বে তাহার গুরুত্ব সম্যক্ অনুভব করা যায় না, যেমন অনুভব করা যায় আঘাত পড়িবার পর। শরতের পুনরায় বিবাহসংবাদে সুভাষিণী ততটা বিচলিত হয় নাই, বরং এ আঘাতটাকে সে খুব ধীরভাবেই সহ্য করিয়া যাইবে, ইহাই মনে করিয়াছিল। কিন্তু সে বুঝিতে পারে নাই যে, তখনও বিবাহ সম্বন্ধে একটু অনিশ্চয়তার আশা ছিল বলিয়াই সে আঘাতটাকে এত সহজ জ্ঞান করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু বৈদ্যনাথ যে দিন বাসুদেবপুর হইতে শরতের বিবাহ সম্বন্ধে নিশ্চয়তার সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিল, সে দিন সুভাষিণী বুঝিতে পারিল, এ আঘাতটা কিরূপ গুরুতর, কত দুর দুঃসহ। সুভাষিণী যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল। আজ আর স্বামীর লাঞ্ছনার কথা, উপবাসের কথা মনে হইল না, সেই নিরীহ অসহায় লোকটির উপর বাড়ীশুদ্ধ লোকের নিদারুণ অত্যাচারের কথা মনে পড়িল না, শুধু একটা রুদ্ধ অভিমান, ভালবাসার নিদারুণ ক্ষোভ মনের ভিতর ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে থাকিল।

এ দিকে মাতা ও ভ্রাতৃজায়া সৌদামিনী ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে, মেয়েটার অনাদরে ও অবজ্ঞায় মর্ম্মাহত হইয়াই জামাতা এই অস্বাভাবিক কাজটাকে সম্ভব করিয়া ফেলিয়াছে। আহা, মেয়েটার অদৃষ্ট কি মন্দ! আজ সে রাজরাণী হইয়াও পথের কাঙ্গালিনী হইল! মা মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেন, সৌদামিনী মুখ বাঁকাইত, আত্মীয়া প্রতিবেশিনীরা সমবেদনা প্রকাশ করিত। কিন্তু এই সমবেদনাটাই যে সুভাষিণীকে অধিকতর আঘাত করিত, ইহা তাহারা বুঝিত না।

ইহার উপর গৃহিণী যখন শরতের সুশীলতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, তখন সুভাষিণী আর চোখের জল রাখিতে পারিত না এবং সেই অসাধারণ সহিষ্ণুতাসম্পন্ন মানুষটি যে কত দুঃখে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া এই বাড়ীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, তাহাই স্মরণ করিয়া সে আকুল হইয়া পড়িত। তবে এই আকুলতাটুকু সে অন্তরের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখিত, বাহিরের কাহাকেও জানিতে দিত না। শরতের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের জন্য কেহ তাহার সম্মুখে আক্ষেপ প্রকাশ করিলে সে যেন গভীর উপেক্ষার সহিত ইহাই জানাইয়া দিত যে, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু আছে কি না, মা তাহা বুঝিয়াছিলেন ; মেয়ের ম্লান মুখ, শুষ্ক হাস্য, গভীর বেদনাব্যঞ্জক দৃষ্টি তাঁহাকে ইহা বুঝাইয়া দিয়াছিল।

ইহার উপর জামাতার প্রতি অসঙ্গত ব্যবহারের স্মৃতিটাও তাঁহার মনে একটু অনুতাপ জাগাইয়া দিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার অনুতপ্ত চিত্তটা কন্যার উপর সদয় ব্যবহার দ্বারা জামাতার প্রতি অনাদররূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে উন্মুখ হইয়াছিল। তিনি এক্ষণে স্নেহের কোমল আবরণ দিয়া কন্যার সকল দুঃখ-কষ্ট ঢাকিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই অসাময়িক চেষ্টাটুকুই যে সুভাষিণীর হৃদয়কে দুঃখের

তারে আরও পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

মেয়ে খাইতে বসিলে মা তাহার পাতে ভাল মাছ-তরকারী তুলিয়া দিতেন এবং সুবাকে ভাল করিয়া খাইবার জন্য অনুরোধ করিতেন। সুবা খাইবে কি চোখের জল মুছিবে, স্থির করিতে পারিত না। মা খাইবার জন্য যত অনুরোধ করিতে থাকিতেন, সুবার বিরক্তি ততই বাড়িয়া উঠিত। অবশেষে ভাত-তরকারী পাতে আছড়াইয়া ফেলিয়া উঠিয়া যাইত। মা তিরস্কার করিতে থাকিতেন। সৌদামিনী বলিত, "তুমি যা-ই বল মা, এততেও ছোট্‌ঠাকুঝির গুমোর একটু কমে নি। এদানী বরং যেন আরও বেড়ে উঠেছে।"

গৃহিণী রাগিয়া বলিতেন, "ছাই গুমোর! গুমোরের আর আছে কি? মনের গুণে ফলও তো হয়েছে।"

সুবা শুনিয়া নিঃশব্দে অশ্রু বিসর্জন করিত।

সান্ত্বনা দিতে শুধু বৈদ্যনাথ। সে বলিত, "কাঁদিস্ না সুবা, শরৎ সাতটা বিয়ে কর্‌লেও তোকে ত্যাগ কর্‌বে না। আমি তাকে চিনি।"

সুবাও যে চিনিত না, এমন নহে; কিন্তু বুকের ভিতর যে নারীত্ব বাস করিত, তাহাই মাঝে মাঝে গুমরিয়া উঠিয়া বড় গোল বাধাইত। সেই নারীত্বটুকু যখন জাগিত, তখন হৃদয়ের সকল ধৈর্য্য, স্বামীর উপর সকল সহানুভূতি বিলুপ্ত করিয়া তাহার আকুল ক্রন্দনের করুণ প্রতিধ্বনিই শুধু চারিদিকে বাজিতে থাকিত এবং সেই সর্ব্বংসহ নিরীহ লোকটার ভিতর যে এতটা নিষ্ঠুরতা থাকিতে পারে, তাহাই ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইত। কিন্তু সেই সঙ্গে সে যে একটা বিষম লাঞ্ছনার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, ইহাও না ভাবিয়া থাকিতে পারিত না। স্বামীর নিষ্ঠুরতা স্মরণে তাহার প্রাণটা যখন নিতান্তই আকুল হইয়া উঠিত, তখন সে স্বামীর উপর বাড়ীর সকলের কঠোর অত্যাচারগুলা খুব বেশী করিয়া ভাবিবার চেষ্টা করিত।

কিন্তু অত্যাচারের পরিবর্ত্তে অত্যাচার, ইহাই কি মানব-নীতিশাস্ত্রের রীতি? সুবার ইচ্ছা হইত, সে একবার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, তাহার প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ হইয়াছে কি না। সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার উপায় ছিল না। উপায় থাকিলে কিন্তু সুবা উত্তর পাইত যে, শরতের সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।

সুবা মনের ভিতর এইরূপ একটা ব্যাকুলতা লইয়া যখন দিন কাটাইতেছিল, তখন সহসা এক দিন বৈদ্যনাথ আসিয়া তাহাকে জানাইল যে, শরৎ কলিকাতাবাসী হইয়াছে, এবং পত্র দ্বারা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। নিমন্ত্রণ শুনিয়া সুবা আশ্চর্য্য বোধ করিল।

দশম পরিচ্ছেদ

"সুরো!"

"কি?"

"তোমার মনে কি দুঃখ সুরো?"

সুরমা নিরুত্তর। শরৎ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি দুঃখ সুরো, আমায় বল্‌বে না?"

উদাস গম্ভীরস্বরে সুরমা বলিল, "কি দুঃখ আবার?"

শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি সর্ব্বদা এ রকম গম্ভীরভাবে থাক কেন?"

নাসা কুঞ্চিত করিয়া সুরমা বলিল, "কে বল্‌লে, সর্ব্বদা গম্ভীরভাবে থাকি?"

"অন্ততঃ আমার কাছে তো থাক।"

"থাক্‌বো না তো কি কর্‌বো?"

"একটু হাসিখুসী কর্‌লে তো পার।"

"আমার এত হাসিখুসী ভাল লাগে না।" বলিয়া সুরমা যেন ঘৃণার সহিত মুখ ফিরাইয়া লইল। শরৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

শরৎ নিঃস্ব ছিল, সম্পত্তি পাইল, কিন্তু সুখ পাইল না। স্নেহ-যত্নের অভাব ছিল, তাহার পূরণের জন্য দ্বিতীয়বার স্ত্রী গ্রহণ করিল, কিন্তু স্নেহযত্ন মিলিল না। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলধির কাছে ছুটিয়া গেলাম, জল পাইলাম, কিন্তু তৃষ্ণা মিটিল না, শুধু কটু লবণাস্বাদে কণ্ঠের প্রদাহ উপস্থিত হইল। দারুণ আতপতাপে দগ্ধ হইয়া মেঘ চাহিলাম, মেঘ উঠিল, কিন্তু স্নিগ্ধতা পাইলাম না, বজ্রের তীব্র জ্বালায় হৃদয় জ্বলিয়া গেল। হায় মানুষের অদৃষ্ট!

যেমন বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে সূর্য্যকিরণের মাধুর্য্য মনে পড়ে, তেমনই সুরমার স্নেহশূন্য ব্যবহারের মধ্যে সুবার ব্যবহারের কথা মনে পড়িত। সুবার ব্যবহারেও কঠোরতা ছিল বটে, কিন্তু তাহা এত কঠোর, এমন স্নেহসম্পর্কশূন্য নয়। তাহার সেই কঠোরতার মধ্যেও এমন একটু স্নেহের ধারা প্রচ্ছন্নভাবে বহিয়া যাইত, যাহা তত কষ্টের মধ্যেও শরৎকে সহসা ধৈর্য্যচ্যুত হইতে দিত না। আহত হৃদয়ের যন্ত্রণা যখনই অসহ্য হইয়া উঠিত, তখনই অলক্ষ্য ভালবাসার একটি কোমল প্রলেপ আসিয়া অন্তরের সকল ব্যথা মুহূর্ত্তে মুছাইয়া দিত। আর সুরমা! সে শুধু ব্যথা দিতে জানে, সান্ত্বনা দিতে জানে না; আঘাত দিতে পারে, আঘাতের

উপর প্রলেপ দিতে পারে না। শরতের নিকট ঐশ্বর্য্য যেন উপহাস, অর্থ যেন দুঃখের উপকরণ হইয়া উঠিল।

শরতের কলিকাতায় জন্ম, কলিকাতাতেই সে লালিত-পালিত; সুতরাং দিনকতক পল্লীবাসের পরই পল্লীগ্রাম তাহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু বৃদ্ধ বাপুলী মহাশয়কে ছাড়িয়া, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া আসিতে পারিল না, কোন-রূপে দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার এ কষ্ট অধিক দিন রহিল না। বৃদ্ধ যেন আপনার সম্পত্তি-টুকু শরৎকে অর্পণ করিবার জন্যই অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। শরতের বিবাহ দিয়া যে দিন তিনি তাহার নামে উইল লিখিয়া দিলেন, তাহার অল্পদিন পরেই মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন এবং শরৎকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নিশ্চিন্তমনে পরলোকের যাত্রী হইলেন।

শরৎ বৃদ্ধের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিল। তার পর জমী-জায়গা সব বিক্রয় করিয়া, সুরমাকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল। সে প্রথমতঃ ভবানীপুরে শ্বশুরবাড়ীর কাছাকাছি একটা বড় বাড়ী ভাড়া লইয়া জাঁক-জমকের সহিত থাকিতে মনস্থ করিল। কিন্তু কি ভাবিয়া সে সংকল্পের পরিবর্ত্তন করিয়া লইল এবং দর্জ্জিপাড়ায় বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিতে লাগিল। বাড়ীতে ঝি রাখিল, চাকর রাখিল, রাঁধুনী রাখিল, সস্তায় একটা গাড়ী-ঘোড়া ক্রয় করিল। বাবুগিরীর কোন উপকরণই বাদ রহিল না। কেবল সুখ এবং শান্তিই বাদ রহিয়া গেল।

অর্থ, স্বাধীনতা, রূপলাবণ্যময়ী পত্নী, সকলই শরতের আয়ত্ত হইয়াছিল, শুধু পত্নীর হৃদয়টাই যেন অনায়ত্ত রহিয়া গেল। কুক্ষণে সে ফুলশয্যার মধুময়ী রজনীতে সুরমার নিকট আপনার প্রথম বিবাহের কথা প্রকাশ করিয়াছিল। স্বেচ্ছায় করে নাই, সেই মধুময়ী যামিনীতে যখন আর একটি জ্যোৎস্না-প্রফুল্ল রজনীর প্রথম প্রিয়সম্ভাষণের চিত্র স্মৃতির দ্বার উদ্ঘা-টিত করিয়া মানসনেত্র-সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠিল, তখন সে হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করিতে পারিল না; লজ্জানম্র নববধূর সম্মুখে বসিয়া, স্বীয় অতীত জীবনের দুঃখময় কাহিনী একে একে ব্যক্ত করিয়া যেন বর্ত্তমান নূতন জীবনযাত্রায় নবীনা পত্নীর নিকট করুণা, সহানু-ভূতি ভিক্ষা করিল। ভিক্ষা কিন্তু মিলিল না; ইহার ফলে সেই লজ্জানতা নববধূ সহসা আহতা সিংহীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল, মধুময়ী রজনীর সকল মাধুর্য্য, সকল শোভা বিষাদের তপ্তশ্বাসে পরিণত হইল। সেই দিন হইতে সুরমার হৃদয় অনায়ত্ত হইয়া গেল।

তার পর শরৎ কত চেষ্টা করিয়া কত প্রকারে আপনার অনুরাগ জানাইয়া সুরমার হৃদয় আকর্ষণের প্রয়াস পাইল, কিন্তু তাহার প্রয়াস সফল হইল না; অনেক চেষ্টাতেও সে সুরমার হৃদয়ের আর সন্ধান পাইল না। শুধু একটা অন্তঃসারশূন্য রূপ হৃদয়ে অনুরাগ-তৃষ্ণা জাগাইয়া ছায়ামূর্ত্তির মত দৃষ্টির সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যেন একটা রক্তমাংসহীন কঙ্কাল শুধু শূন্য সজীবতাটুকু লইয়া দিন-রাত উপহাসের অট্টহাসিতে সংসারটাকে ভীষণ করিয়া তুলিল। শরৎ হতাশ হইয়া ভাবিল, সুখ জিনিসটা খুঁজিলেই পাওয়া যায় না।

ভাবিলেও কিন্তু শরৎ সুখ খুঁজিতে বিরত হইল না। কেই বা হয়? অপ্রাপ্য জানিয়াও কেহই সুখের অনুসন্ধানে বিরত হয় না।

শরৎ পত্নীকে কলিকাতায় আনিল; তাহার সুখের উপাদান একে একে সংগ্রহ করিয়া দিল; বস্ত্র, অল-ঙ্কার, দাস-দাসী, পাচক, কিছুরই অভাব রাখিল না। থিয়েটার, সার্কাস, বায়োস্কোপ দেখাইল, গাড়ী চড়াইয়া গড়ের মাঠে ঘুরাইয়া আনিল, পড়িবার জন্য নূতন নূতন উপন্যাস কিনিয়া দিল। কিন্তু যে দেবীর জন্য প্রসন্নতার এত আয়োজন, সে দেবী প্রসন্ন হইলেন না।

ইহাতেও কিন্তু শরতের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির পরি-তৃপ্তি হইল না। তাহার ইচ্ছা ছিল, সুরমাকে লইয়া একবার পুরাতন শ্বশুরবাড়ীটা ঘুরিয়া আসে। কিন্তু সুরমার কাছে সে প্রস্তাব করিবামাত্র সুরমা ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গীর ন্যায় এমনই প্রচণ্ডভাবে গর্জ্জিয়া উঠিল যে, শরৎকে আপাততঃ সে বাসনা ত্যাগ করিতে হইল। অগত্যা সে নিজেই এক দিন মোটর ভাড়া করিয়া বকুলতলা রোড দিয়া ঘুরিয়া আসিল, কিন্তু রাস্তার গায়ে সরু গলির ভিতরকার সেই ছোট বাড়ীটা হইতে কেহ যে তাহাকে লক্ষ্য করিল, এমন বোধ হইল না। গলির মোড়ে এক মিনিটের জন্য গাড়ী-খানা দাঁড় করাইল, কিন্তু কেহই বাড়ীর বাহিরে আসিল না। বিরক্তিপূর্ণ-চিত্তে শরৎ গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। গাড়ীখানা কাহার, কেন আসিল, কেন দাঁড়া-ইল, কোথায় গেল, কোন প্রতিবেশীও এ সন্ধান লইবার জন্য ব্যগ্র হইল না। শুধু একটা ভূনীওয়ালার ছেলে গাড়ী চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। শরৎ ভাবিল, পাড়ার লোকগুলা কি অলস! যে ঘোষাল বুড়া মোড়ের বাড়ীর রোয়াকে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া তামাক টানিত এবং মধ্যে মধ্যে শরৎকে দেখিলেই টিট্‌কারী দিত, আজি সে বুড়াটাও সেখানে ছিল না। বুড়া মারা গেল না কি? অবশেষে শরৎ

বুঝিল, যে দিন ময়লা পোষাকে সঙ্কুচিতভাবে সকলকে এড়াইয়া রাস্তায় চলিতে হয়, সেই দিনই যত বন্ধু-বান্ধব সম্মুখবর্ত্তী হইয়া অভ্যর্থনা করিতে আসে; কিন্তু যে দিন সুসজ্জিত-পরিচ্ছদে পথে বাহির হইয়া বন্ধু-বান্ধবের সম্মুখীন হইবার জন্য আগ্রহ জন্মে, সে দিন আর কাহারও দেখা পাওয়া যায় না। সংসারের লোক-গুলা কি অন্ত !

অবশেষে শরৎ নিজের বাড়ীতে এক দিন ভোজের আয়োজন করিয়া বৈদ্যনাথের নামে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়া দিল। বৈদ্যনাথ ছাড়া আর কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিতে সাহসী হইল না। বৈদ্যনাথ আসিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া গেল। কিন্তু সে শরতের উন্নতিদর্শনে একটুও উল্লাস প্রকাশ করিল না, অথবা তাহার ব্যবহারে বাড়ীর কেহ যে দুঃখিত, এমন কোন কথাও বলিল না। শরতের ক্ষোভের সীমা রহিল না। যাহাদের অন্তরে আঘাত দিবার উদ্দেশ্যে তাহার এত আয়োজন, তাহারাই যদি ব্যথা না পাইল, তবে তাহার এই উদ্যোগ-আয়োজনের সার্থকতা কি? তাহার পরিশ্রমই সার হইল, প্রতিশোধ লওয়া হইল না। লাভের মধ্যে সুরমা মাঝে দাঁড়াইয়া তাহার অন্তরের বেদনাকে দ্বিগুণ করিয়া তুলিতে লাগিল।

সুবার নিকট শরতের মাহিনার পঁচিশ টাকা সাত আনা জমা ছিল। এক দিন বৈদ্যনাথ সেই টাকা প্রত্যর্পণ করিতে আসিল। শরৎ সগর্ব্বে বলিল, "আমার এখন টাকার অভাব নাই, এ টাকা সুবাকেই রাখতে ব'লো।"

বৈদ্যনাথ টাকা ফেরৎ লইয়া গেল। কিন্তু পরদিন আসিয়া বলিল, "সুবা একটি পয়সা রেখে বাকী সব ফেরৎ দিয়েছে। বলেছে, আমি মেয়েমানুষ, টাকায় আমার দরকার নাই।"

শরৎ ক্রোধে ভ্রূকুটী করিয়া টাকাগুলা ফেরৎ লইল। কিন্তু সেই দিন সে বুঝিতে পারিল, দুই দিকের দুইটা হৃদয়ের কোনটাতেই তাহার স্থান নাই। শরৎ নিজের দুর্ভাগ্য-স্মরণে নিজেই ভীত হইয়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দর্জ্জিপাড়ায় সুভাষিণীর এক মাসী ছিলেন। মায়ের আপনার ভগ্নী নহে, মাসতুত ভগ্নী। মাসীর কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহে সুভাষিণী মাতার সহিত তথায় গমন করিয়াছিল। বিবাহের পর মা চলিয়া আসিলেন, মাসীর অনুরোধে সুভাষিণী কয়েক দিনের জন্য তথায় রহিল।

প্রায় প্রত্যহই অপরাহ্নে সুবা ছাদে আসিয়া বেড়াইত এবং পাশের বাড়ীর ছাদে আর একটি যোল সতের বছরের মেয়েকে বেড়াইতে দেখিত। মেয়েটির বেশভূষা বা চাল-চলন অনেকটা বড়মানুষী ধরণের; সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও সুবা তাহার সহিত আলাপ করিতে সাহসী হইত না, কেবল তাহার নিত্য নূতন সাজসজ্জা এবং সগর্ব্ব গতিভঙ্গী লক্ষ্য করিতে থাকিত। তাহার এইরূপ অহমিকাপূর্ণ চালচলনে সুবা কতকটা বিরক্ত হইত সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে এই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিবার জন্যও যে প্রবল ইচ্ছা জন্মিত না, তাহা নহে। কিন্তু সাধিয়া এক জন অপরিচিতার সঙ্গে আলাপ করিতে কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকিত।

এক দিন এই লজ্জাটুকু দূর হইল। সে দিন সুবা ছাদের আলিসার কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পাশের ছাদের মেয়েটিও তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই উভয়ের চোখাচোখি হইয়া গেল। তখন সেই মেয়েটি ঠোঁটের কোলে একটু মিষ্ট হাসি আনিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে এ বাড়ীতে নতুন দেখ্‌ছি না?"

সুবাও একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "হাঁ, এটা আমার মাসীর বাড়ী।"

"তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

"ভবানীপুরে।"

"এঁদের বাড়ীর বিয়েতে বুঝি এসেছ?"

"হাঁ।"

মেয়েটি চুপ করিয়া সুবার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন সুবা সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এটা বুঝি আপনাদের বাড়ী?"

মেয়েটি মুখখানাকে বিকৃত করিয়া বলিল, "হাঁ, নিজের বাড়ী নয়, ভাড়া দিয়ে আছি। ভাড়াও বড় কম নয়, মাসে পঞ্চাশ টাকা।"

সুবা বলিল, "তা বাড়ীটি মন্দ নয়।"

মেয়েটি বলিল, "না, বাড়ীখানা খুব ভালই। ভাল ব'লেই তো বাবু এত টাকা ভাড়া স্বীকার ক'রে বাড়ীটা নিয়েছেন। খারাপ বাড়ীতে উনি থাকতে পারেন না। কেবল উনি কেন, আমিও পারি না।" বলিয়া মেয়েটি একটু গর্ব্বের হাসি হাসিল। সুবা শুধু নীরবে একবার মস্তক সঞ্চালন করিল। মেয়েটি বলিতে লাগিল, "বাড়ীখানার একটা গুণ এই যে, খুব হাওয়া, ঘরগুলাও বড় বড়। তুমি এক দিন আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে এস না। আসবে?"

মৃদু হাসিয়া সুবা বলিল, "যাব।"

মেয়েটি আর কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এমন সময় সিঁড়ি হইতে ঝি ডাকিয়া বলিল, "ছাদে মা, তুমি ছাদে বেড়াতে নেগেচ, এ দিকে বাবু এসে যে তোমাকে খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হয়ে পড়লেন।"

মেয়েটি ফিরিয়া উত্তর দিল, "বাবু এসেছে, তা আমি-গিয়ে করবো কি ? তোরা তো আছিস্ ?"

ঝি বলিল, "কও কথা মা, হাজার হোক্ কেম্নে, আমরা হচ্চি 'ঝি-চাকর, তুমি হলেন মা-ঠাক্‌রোণ। আমরা থেকে কি করবো বল তো ?"

অতঃপর সুবার দিকে ফিরিয়া মেয়েটি সহাস্যে বলিল, "অমনিতর ভাই, যতক্ষণ বাড়ী থাক্‌বে, এক পা নড়বার যো নাই।"

উত্তরে সুবা একটু হাসিল। মেয়েটি বলিল, "কাল দুপুরবেলা এসো না। আসবে ?"

সুবা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলে মেয়েটি "আসি তবে" বলিয়া ছাদ হইতে নামিয়া গেল। সুবাও ধীরে ধীরে নীচে নামিল।

পরদিন আহারান্তে সুবা বেড়াইতে যাইবে কি না, ইতস্ততঃ করিতেছিল, এমন সময় পাশের বাড়ীর ঝি আসিয়া মা-ঠাকরুণের আমন্ত্রণ জানাইল। সুবা মাসীর অনুমতি লইয়া তাহার সহিত বেড়াইতে গেল; বেড়াইতে গেল বটে, কিন্তু সে জানিল না, এই তাহার স্বামীরই বাড়ী এবং এই মেয়েটিই তাহার সপত্নী। না জানিলেও বাড়ীতে ঢুকিতেই তাহার বুকটা যেন ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

সুরমা তাহাকে সমাদর করিয়া বসাইল। সুবা দেখিল, বাড়ীখানা তেমন বড় না হইলেও বেশ বড়-মানুষী কায়দায় সাজান। বাহিরে বৈঠকখানা, উপরে বসিবার ঘর, শুইবার ঘর, সকলই বেশ সুসজ্জিত; কৌচ, টেবিল, চেয়ার, আলমারী, দেশী বিলাতী ছবি প্রভৃতি আসবাবে ভরা। আলমারীতে ইংরাজী বাঙ্গালা বিস্তর বহি। সুবা মনে মনে গৃহস্বামীর প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না।

সুরমা তাহাকে লইয়া একে একে সকল ঘর এবং ঘরের আসবাবপত্র দেখাইল, এবং কোন্ আসবাবটা কত দামে কেনা হইয়াছে, তাহার পরিচয় দিতেও ছাড়িল না। সে এক একখানা ছবির এত দাম বলিল যে, সুবা তাহা শুনিয়া কষ্টে হাস্য সংবরণ করিল।

কথায় কথায় সুবা মেয়েটির কতক পরিচয় পাইল। মেয়েটির নাম সুরমা; পল্লীগ্রামে তাহাদের বাড়ী, কয়েক মাস হইল, তাহারা এখানে আসিয়াছে। তাহার স্বামী চাকরী করে না, ব্যবসায় করে। চাকর—পরের গোলামী; ভদ্রলোক কি এরূপ নীচ কাজ করে ? এ জন্য তাহার স্বামী বিশ হাজার টাকা দিয়া এক তেলের অংশীদার হইয়াছে। এ বাড়ীতেও তাহারা বেশী দিন থাকিবে না, একখানা নিজস্ব বাড়ী খরিদ করিবার প্রস্তাব হইতেছে। দুই তিনখানা বাড়ী দেখা হইয়াছে, এখনও দর-দস্তর ঠিক হয় নাই। এখানে আসিবার পর তাহার তিনখানিমাত্র গহনা প্রস্তুত হইয়াছে; এক ছড়া নেকলেস, দুই ছড়া ডায়মন-কাটা তাবিজ এবং এক জোড়া পার্শী মাকড়ী। নেকলেস ছড়াটা কিন্তু তাহার পছন্দ হয় নাই। বারো ভরিতে কি নেকলেস হয় ? অন্ততঃ কুড়ি ভরি না দিলে চেন-প্যাটর্ন নেকলেস এক ছড়া মনের মত হয় না। বাবু বলিয়াছেন, শীঘ্রই উহাকে ভাঙ্গিয়া মনোমত করিয়া গড়াইয়া দিবেন।

এই সকল পরিচয় দিয়া সুরমা বলিল, "এখানকার সবই ভাল, কিন্তু ভাই, মানুষের মুখ দেখ্‌বার উপায় নাই। আমাদের পাড়াগাঁয়ে এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় লোক বেড়াতে আসে; এখানে কিন্তু পাশের বাড়ীরও কেউ খোঁজ-খবর রাখে না। এই দু'মাসের মধ্যে আজ যা তোমার সঙ্গে আলাপ হলো।"

সুবা হাসিয়া বলিল, "কিন্তু এ আলাপও মিছে। আমি এখানে আর ক'দিন আছি ?"

সুরমা একটু ব্যস্ততার সহিত বলিল, "ও মা, তাই না কি ? না ভাই, তুমি এখানে দিনকতক থাক।"

সুবা বলিল, "থাক্‌লেও দশ পনরো দিনের বেশী নয় তো। এরি মধ্যে বাবা না নিতে পাঠান।"

সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বাপের বাড়ীতে থাক কেন ভাই ? শ্বশুরবাড়ী যাও না ?"

সুবা একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিল, "হাঁ, না, যাই বৈ কি। তবে যাবার দরকার হয় না।"

সুরমা বলিল, "কেন, তোমার স্বামীও ঐখানে থাকেন না কি ?"

"হাঁ, মাঝে মাঝে থাকেন বটে।"

"ঘর-জামাই ?"

"প্রায়" বলিয়া সুবা একটু ম্লান হাসি হাসিল। অতঃপর সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, তাহার স্বামী কি কাজ করে ? কত টাকা মাহিনা ? ঘর-জামাই হইয়া রহিয়াছে কেন, ইত্যাদি। ইহার উত্তরে সুবা বলিল, তাহার স্বামী চাকরী করেন, বেতন অল্প, এই জন্য তাহাকে বাপের বাড়ীতেই রাখিয়াছেন; মাহিনা বেশী হইলেই নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইবেন। এইরূপে পরিচয় দিয়া এবং পরদিন আসিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সুবা সে দিনের মত বিদায় গ্রহণ করিল। বাড়ীতে

আসিয়া দেখিল, বৈদ্যনাথ আসিয়া বসিয়া রহিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কখন্ এলে মামা ?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "অনেকক্ষণ। তুই কোথায় গিয়েছিলি সুবা ?"

সুবা আঙ্গুল বাড়াইয়া উত্তর দিল, "ঐ পাশের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়াছিলাম।"

চমকিতভাবে বৈদ্যনাথ বলিল, "ঐ বাড়ীতে ?"

সুবা তাহার চমকটুকু লক্ষ্য না করিয়াই বলিল, "হাঁ, ঐ বাড়ীতে। ও-বাড়ীর বৌ আমায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটি বেশ মামা, দোষের মধ্যে একটু দেমাকে।"

বৈদ্যনাথ নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। সে জানিত, ও-বাড়ীটা কাহার। ঐ বাড়ীতে সুবা বেড়াইতে গিয়াছিল শুনিয়া সে একটু ভীত হইল। সুবা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আমায় নিয়ে যেতে এসেছ ?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "যাবি না ?"

সুবা মাথা নীচু করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আর দিনকতক থাকি না কেন ?"

মাসীও তাহার কথার পোষকতা করিয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ, দিনকতক থাক্। নিয়ে যাবার তরে ওর মায়ের এত তাড়া কেন ? ও গিয়ে কর্‌বে কি ?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "তবে থাক্।"

সুবা একটু ভাবিয়া বলিল, "কিন্তু বাবা তো রাগ কর্‌বেন না ?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "না না, রাগ কিসের ? সে আমি তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌বো।"

নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে যেন একটু ক্ষীণ আশার আলোক দেখিতে পাইয়া বৈদ্যনাথ কিঞ্চিৎ প্রফুল্লচিত্তেই ফিরিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিনও সুবা বেড়াইতে গিয়াছিল। সে দিন শরতের বসিবার ঘরে বসিয়া সুরমার সহিত গল্প করিতে করিতে হঠাৎ একখানা বাঁধান বহির দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বহিখানার নীচে সোনালী জলে নাম লেখা আছে, শ্রীশরচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। লেখাটা পড়িয়াই সুবা চমকিয়া উঠিল এবং কথাবার্ত্তার মধ্যে সে বার বার চমকিত দৃষ্টিতে সে সেই বইখানার দিকে চাহিতে লাগিল। সুরমা তখন স্বীয় পিত্রালয়ের অতুল ঐশ্বর্য্য এবং মাতাপিতার অপরিমেয় স্নেহের গল্প করিতেছিল। সুবা গল্প শুনিতেছিল, কিন্তু তাহাতে মনোযোগ দিতে পারিতেছিল না এবং গল্পের সঙ্গে সঙ্গে সুরমার মুখে যে একটা গৌরবের আভা ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাও তাহার লক্ষ্য হইতেছিল না। তাহার লক্ষ্য ছিল শুধু সেই বইখানার উপর।

কিন্তু এক নামের মানুষ কি দেশে থাকে না ? এই যে তাহাদেরই পাড়ায় দুই যোগেশ দত্ত আছে, তিন জন হরি বাবু আছে। কিন্তু সে শুনিয়াছিল, শরৎ পল্লীগ্রামে গিয়া বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক কলিকাতাবাসী হইয়াছে। সুরমারও পিত্রালয় পল্লীগ্রামে এবং সে-ও স্বামীর সহিত কয়েক মাস মাত্র কলিকাতায় আসিয়াছে। সুবার মনটা সংশয়দোলায় দুলিতে লাগিল। এক একবার ইচ্ছা হইল, সুরমাকে তাহার স্বামীর নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না। এই সংশয়টা জন্মিবার আগে হয় তো সে এ কথাটা অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিতে পারিত, কিন্তু এখন আর তাহা পারিল না।

শ্রোত্রীর মনোযোগের অভাব থাকিলেও সুরমার গল্পের বিরাম ছিল না এবং নিতান্ত দরিদ্রের কন্যা হইলেও সে সুবার নিকট পিতাকে একটি ছোটখাট জমীদার প্রতিপন্ন করিতে ছাড়িতেছিল না। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই কলিকাতাবাসিনী শ্রোত্রীটি কোন কালেই হুগলী জেলার অন্তর্গত ক্ষুদ্র শুক্‌নাগাছি গ্রামে গিয়া তাহার পিতার স্বরূপ পরিচয় অবগত হইতে চেষ্টিত হইবে না। সুতরাং সে নির্ভয়চিত্তে আপনাকে ধনিতনয়া প্রতিপন্ন করিয়া যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু হঠাৎ বুড়া ঝি আসিয়া তাহার এই আত্মপ্রসাদলাভরূপ সুখে বাধা দিল। সে সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতেই উচ্চকণ্ঠে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হ্যাঁদে মা, সেই কোন্ দুপুর হ'তে গল্প কত্তে নেগেচো, আর একটা মানুষ যে কাল কোন্ সকালে না খেয়ে বেরিয়ে গেল, তার একটা খোঁজ-খবরও নিলে না ? হ'লেই বা গা রাগারাগি, পুরুষমানুষ রাগ ক'রে গেল ব'লে তুমিও নিচিন্দি রইলে। মেয়েমানুষের রাগ কি ভাল ?"

গল্পের মাঝখানে বিরাম দিয়াই সুরমা একবার অপ্রতিভভাবে সুবার দিকে চাহিল। তার পর ঝির দিকে ফিরিয়া অতিমাত্র ক্ষুদ্রস্বরে বলিল, "আমার ভালমন্দ আমি বুঝ্‌বো, তুই আপনার কাজ দেখ তো। পুরুষমানুষ রাগ ক'রে কোথায় গেল, আমি মেয়েমানুষ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে তার খোঁজ নিতে যাব ? মরণ আর কি, বেরো আমার সাম্‌নে হ'তে।"

ঝি আর অগ্রসর হইতে পারিল না; সে আপন মনে গজ-গজ করিয়া, এই ঘোর কলিকালে কাহাকেও যে হিত উপদেশ দিতে নাই, ইহাই প্রকাশ করিতে করিতে সরিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে সুরমা সুবার দিকে ফিরিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "ঝিগুলোর ঐ এক কেমন স্বভাব, সকল কথায় কর্ত্তৃত্ব না দেখিয়ে থাকতে পারে না!"

মৃদু হাসিয়া সুবা বলিল, "বাবু বুঝি বড্ড রাগী?"

সুরমা বলিল, "কথায় কথায় রাগ ভাই, কথায় কথায় রাগ। তা তুমিই বল তো ভাই, আমি কোথায় খুঁজতে যাব?"

সুবা বলিল, "ও মাগীর যেমন কথা।"

কথাটা বলিয়াই সুবা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার মনে পড়িল, তাহার স্বামীও এক দিন এমনি না খাইয়া চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তজ্জন্য অন্তরে একটা নিদারুণ উদ্বেগ পোষণ করিলেও সে তাহাকে খুঁজিতে যাইতে পারে নাই। হায়, ক্ষমতা-হীনা রমণী! সুরমার মানসিক উদ্বেগের গুরুত্ব অনুভব করিয়া সুবা অন্তরে ব্যথা অনুভব করিল।

তাহার আকস্মিক মলিন মুখের দিকে চাহিতেই সুরমা মনে মনে যেন বড়ই লজ্জিত হইল। ছি ছি, মাগীটা নির্ব্বোধ। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে রাগারাগির কথাটা প্রকাশ করিয়া সে তাহাকে সুবার নিকট কতটা ছোট করিয়া দিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা হইল, মাগীকে এখনই বাড়ী হইতে দূর করিয়া দেয়। কিন্তু সে পরের কথা। আপাততঃ উপস্থিত লজ্জাটার হাত এড়াইবার জন্য সে সুবাকে ক্ষণকাল বসিতে বলিয়া একটা কাজের অছিলায় তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া পড়িল।

সে বাহির হইলে সুবা কিয়ৎক্ষণ স্থির-দৃষ্টিতে বইখানার মালিকের নামের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা হইল, একবার বইখানা হাতে লইয়া দেখে। কিন্তু আলমারীর ভিতর থাকায় তাহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া টেবিলের উপরকার কাগজগুলা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। সামনেই একখানা ছোট খাতা ছিল। সামান্য ছোট-খাট জমা-খরচের খাতা; কিন্তু সেই ছোট খাতাখানার দিকে চাহিতেই সুবা তাহা হইতে আর দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না; তাহার সকল ইন্দ্রিয়ই যেন অবশভাবে দৃষ্টিশক্তিকে অবলম্বন করিয়া সেই খাতাখানা জড়াইয়া ধরিল। এ কি, এ যে চিরপরিচিত হস্তাক্ষর, তাহার স্বামীর হাতের লেখা। তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল, বক্ষের দ্রুত স্পন্দনশব্দও যেন তাহার নিজেরই কর্ণগোচর করিতে লাগিল।

একটু পরে সুরমা পুনরায় তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এবার সুবা যেন তাহার মুখের দিকে আর ভাল করিয়া চাহিতে পারিল না। তাহার মনে হইল, তাহার দৃষ্টিতে সখীত্বের পরিবর্ত্তে যে একটা বিদ্বেষের আগুন ফুটিয়া উঠিয়াছে, সুরমা হয় তো এখনি তাহা ধরিয়া ফেলিবে। সে আর সেখানে দাঁড়াইতেও পারিল না; তাড়াতাড়ি বিদায় লইয়া পলাইয়া আসিল। বাড়ীর বাহিরে আসিয়া সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। কি সর্ব্বনাশ, এটা তাহার স্বামীরই বাড়ী, আর সেই বাড়ীতে সে অতিথিভাবে উপস্থিত হইয়াছিল। কথাটা ভাবিতে সুবার সর্ব্ব-শরীর যেন কণ্টকিত হইয়া আসিল। সুবা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, প্রাণ থাকিতে সে আর ঐ বাড়ীর দর-জায় পা দিবে না।

কিন্তু সুরমা যদি তাহাকে ডাকিয়া পাঠায়, সে কি বলিয়া সেই আহ্বানের প্রত্যাখ্যান করিবে? সে কি বলিবে, আমি আর যাব না? কেন যাইব না? তোমার ঐ গৃহটা আমারই স্বামি-গৃহ, তুমি আমার সপত্নী, এই কথাটাই কি সে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিবে? ছি ছি, সে কথা কি বলা যায়? তাহার অপেক্ষা এখান হইতে পলায়নই শ্রেয়ঃ।

সুবা বাড়ীতে আসিয়া মাসীকে জানাইল যে, সে ভবানীপুরে যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছে। মাসী অবাক্ হইয়া বলিলেন, "ও মা, সে কি কথা! এই কাল বৈদ্যনাথ এসেছিল, তাকে ব'লে দিলাম, এখন দিনকতক যাওয়া হবে না। আবার এরি মধ্যে কি যাওয়া হয়? কেন সুবা, এখানে কি তোর কষ্ট হচ্চে?"

"ওগো, কষ্ট কিছুতেই নাই, কিন্তু এ বাড়ীর পাশে যারা আছে, তাদের এত কাছে আমি কেমন করিয়া থাকিব?" এ কথা কিন্তু সুবা বলিতে পারিল না। সে মাসীর কথায় একটু লজ্জিত হইয়া জানাইল যে, তাহার কষ্ট কিছুই হয় নাই, তবে বাপের জন্য তাহার মন কেমন করিতেছে।

উত্তরে মাসী বলিলেন, "আচ্ছা, কাল নরেনকে আফিসে তোর বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে আস্তে বল্‌বো। তবে তোর কষ্ট যদি হয় তো বল বাছা!"

সুবা একটু হাসিয়া বলিল, "তুমি পাগল হয়েছ মাসীমা।"

সে রাত্রিতে সুবা বিছানায় পড়িয়া কত কথাই তোলাপাড়া করিতে লাগিল। যে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কেবল ত্যাগ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, পুনরায় আর এক জনকে তাহার স্থানে বসাইয়াছে, আজ সে সেই স্বামীর কত নিকটে! যাহাকে একবার

দেখিবার জন্য সে আজ প্রায় এক বৎসর যাবৎ দারুণ উৎকণ্ঠা পোষণ করিতেছে, এখন সে ইচ্ছা করিলেই তাহাকে দেখিতে পারে; নিজেও তাহাকে দেখা দিতে পারে। সুবার ইচ্ছা হইল, একবার দেখা দেয়, তাহার সম্মুখ গিয়া জিজ্ঞাসা করে, "কেমন, এখন তুমি সুখী হইয়াছ তো? এখন আর তোমার উপবাসে দিন কাটাইতে হয় না তো? ইচ্ছা থাকিলেও আমি তোমার কষ্ট দূর করিতে পারি নাই, কিন্তু সুরমা তোমার সে কষ্ট দূর করিয়াছে তো?"

কথাটা জিজ্ঞাসা করিলে শরৎ কি মনে করিত বা ইহার কি উত্তর দিত, বলা যায় না, কিন্তু সুবার নিজের কথাটা নিজের কাছেই যেন তীব্র উপহাসের মত বোধ হইল এবং এ কথাটা তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যে শ্লেষ ছাড়া আর কিছুই নহে, ইহাও বুঝিতে পারিল। স্বামীর প্রতি এত শ্লেষপ্রয়োগের সুযোগ উপস্থিত হইলেও সে ইহা প্রয়োগ করা নিদারুণ নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে পারিল না। ওগো, অদৃষ্টে সুখ না থাকলে সুখ পাওয়া যায় না, এ কথাটা তুমি কেন বুঝিলে না? আমি রাগ বা অভিমান করিয়া বলিতেছি না, তোমার চেষ্টার নিষ্ফলতা দেখিয়া বাস্তবিকই আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমি কেন তোমাকে সুখী দেখিলাম না? তোমার কিসের অভাব? তোমার হাতে এখন অগাধ অর্থ, গৃহে সুন্দরী স্ত্রী, বাটীতে দাসদাসী, পাচক-পাচিকা। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও তোমাকে উপবাস দিয়া বাহির হইতে হয় কেন? গৃহের বাহিরে বাহিরে দিন কাটাইতে হয় কেন? কেন যে হয়, ইহার উত্তর সুবা জানিত না, শরৎও জানিত না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মানুষের যখন অর্থের অভাব থাকে, তখন সে অর্থ পাইলে যে কত কাজ করিতে পারে, কত উপায়ে আপনাকে উন্নত, সুখী করিতে পারে, তাহাই কল্পনা করিতে থাকে। কিন্তু দৈবক্রমে যদি সহসা প্রচুর অর্থ হস্তগত হয়, তখন সে ঠিক পথভ্রান্ত পথিকের মত হাতড়াইয়া বেড়ায়, এখন সে কোন্ পথে যাইবে, কোন্ উপায়ে অর্থগুলাকে আপনার সুখের উপকরণে পরিণত করিবে। এমনি হাতড়াইতে হাতড়াইতে সে হয় তো এমন বিপথে গিয়া পড়ে, যে পথে সুখের লেশমাত্র নাই।

শরতেরও ঠিক এমনি অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। সে যখন দারিদ্র্য-নিপীড়িত হইয়া শ্বশুরগৃহে লাঞ্ছিত হইত, তখন অর্থ পাইলে এই লাঞ্ছিত জীবনটাকে কিরূপ সুখময় করিবে, তাহাই অনেক সময়ে কল্পনা করিত। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষিত অর্থ যখন প্রচুররূপে হস্তগত হইল, তখন সে এত দিনের লাঞ্ছিত জীবনটাকে একেবারে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে সযত্ন হইল। যত্নবান্ হইল বটে, কিন্তু কিরূপে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে, তাহাই খুঁজিয়া পাইল না। এ সময়ে এক জন পথিপ্রদর্শকের আবশ্যক হয়। যদি সুবা থাকিত, তাহা হইলে হয় তো সে সুখের ঠিক পথ দেখাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু সুরমা তাহা পারিল না। বরং সে স্বামীর স্বার্থের চেয়ে নিজের স্বার্থটাকেই বড় করিয়া লইয়া স্বামীকে আরও দিশেহারা করিয়া তুলিল। সে স্বামীকে দিতে কিছু পারিল না, শুধু তাহার কাছে চাহিতে লাগিল। শরৎ কিছুতেই তাহার অভাব পূর্ণ করিতে পারিল না, অধিকন্তু নিজে যেন আরও রিক্তহস্ত হইয়া পড়িল।

বন্ধুলোকেরা উপদেশ দিল, "ওহে, সুখ ঘরে নাই, বাহিরে।" পথভ্রান্ত শরৎ বাহিরে সুখানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। ইহাতে ঘরে যেটুকু সুখ ছিল, সেটুকুও নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। প্রত্যহ সুরমার তর্জ্জনে শরৎ নিতান্তই অশান্তি বোধ করিতে লাগিল।

এক দিন শরতের ফিরিতে রাত্রি একটু বেশী হইয়াছিল, তাহার উপর দৈহিক অবস্থাটাও ভাল ছিল না। সুতরাং সে রাত্রে উপরে না গিয়া বৈঠকখানাতে শুইয়াই রাত্রি কাটাইল।

কিন্তু সকালে উঠিয়া উপরে যাইতেই সুরমার মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দর্শনে আসন্ন প্রলয়ের সূচনায় একটু ভীত হইয়া পড়িল। সুরমা কিন্তু একটি কথা বলিল না, শরৎ ঘরে ঢুকিতেই সে আস্তে আস্তে ঘরের বাহির হইয়া গেল। শরৎ জানালার ধারে চৌকী টানিয়া বসিয়া পড়িল এবং একটা সিগারেট ধরাইয়া তাহাতে মৃদু মৃদু টান দিতে লাগিল।

খানিক পরে, চাকর চা দিয়া গেল। শরৎ চা খাইয়া পুনরায় একটা সিগারেট ধরাইল। ইহার মধ্যে সুরমা দুই একবার ঘরে আসিয়াছিল, কিন্তু নিঃশব্দে আপনার কাজ সারিয়া বাহির হইয়া গেল। শরৎ একবার তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "কাল একটু রাত হয়ে গেল, ভাবলাম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। তাই তোমাকে আর বিরক্ত না ক'রে বৈঠকখানাতেই—"

সবটা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই সুরমা দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। তার পর একে একে তিনটা সিগারেট পুড়িল, কিন্তু সুরমা আর দেখা দিল না।

দরজার সম্মুখ দিয়া ঝি যাইতেছিল, শরৎ তাহাকে ডাকিয়া, সুরমা কোথায় জিজ্ঞাসা করিল। ঝি বলিল, "মা-ঠাকরুণ রান্নাঘরে আছে, ডেকে দেব?"

শরৎ হাঁ না কিছুই বলিল না। কতকক্ষণ পরে সুরমা আসিয়া ঘরে ঢুকিল এবং দরজার কাছে নিঃশব্দে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। শরৎ কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার সঙ্গে কথা কইবে না সুরো?"

সুরমা কোন উত্তর করিল না। একটু অপেক্ষা করিয়া শরৎ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি রাগ করেছ সুরো?"

মুখ ফিরাইয়া গভীর ঔদাস্যব্যঞ্জক স্বরে সুরমা উত্তর দিল, "রাগ কিসের?"

শরৎ সিগারেটের ছাইটা জানালার বাহিরে ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "কাল একটু কাজের গতিকে—"

বাধা দিয়া তীব্রস্বরে সুরমা বলিল, "আমার কাছে তোমার কোন কাজের কৈফিয়ৎ দেবার দরকার নাই।"

মৃদু হাসিয়া শরৎ বলিল, "সত্যি?"

তাহার মুখের উপর ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া উগ্রকণ্ঠে সুরমা বলিল, "তিনশোবার সত্যি। যাদের কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার, তাদের কাছে যাও।"

"যাব?"

'যাও' কথাটা রাগের বশেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু শরৎ যখন সেই অনিচ্ছা-সত্ত্বেও উচ্চারিত কথাটার উপর জোর প্রশ্ন করিল, তখন সুরমা আরও বেশী রাগিয়া উত্তর করিল, "স্বচ্ছন্দে।"

ঈষৎ অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে শরৎ বলিল, "আমি গেলে কি তুমি সুখী হও সুরো?"

সুরমা গ্রীবা উন্নত করিয়া, দুই চোখ কপালে তুলিয়া ক্রোধপরুষকণ্ঠে বলিল, "হাঁ হই, খুব সুখী হই।"

কিন্তু এই ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে যে একটা অভিমানের রুদ্ধ ক্রন্দন বুকের ভিতর ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, শরৎকে সেটা বুঝিবার অবসর না দিয়াই সে ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

খানিক পরে শরৎকে জামা-কাপড় পরিয়া বাহিরে যাইতে দেখিয়া পাচিকা সুরমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ও মা, তুমি ভাতের তরে তাড়া দিচ্চো, আর বাবু যে বেরিয়ে যাচ্চেন?"

সুরমা তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "যাচ্চেন তো আমি তার কি করবো? গিয়ে পায়ে ধরবো?"

একটু উচ্চকণ্ঠে "আমি এ বেলা ফিরবো না" বলিয়াই শরৎ বাহির হইয়া গেল। সুরমা মাছের ঝোলের আলুগুলাকে জোরে পাচিকার দিকে ঠেলিয়া দিয়া উপরে চলিয়া গেল।

সে দিন সুরমা সকাল সকাল আহার করিয়া আপনার ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল এবং একখানা বই লইয়া তাহাতে মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মন চঞ্চল থাকায় পুস্তকে মন বসিল না। খানিকটা ছটফট করিয়া উঠিয়া বসিল এবং ঝিকে দিয়া সুবাকে ডাকিতে পাঠাইল। সুবা আসিলে তাহার সহিত কথায় বার্তায় বিকালবেলাটা এক রকমে কাটিয়া গেল। তার পর সে চলিয়া গেলে সুরমা চুল বাঁধিয়া গা ধুইয়া আসিল এবং ভাল দেশী কাপড়খানা বাহির করিয়া পরিল, কয়েকখানা গহনাও সে দিন পরিল, কপালে সোনা-পোকার টিপ দিল। এইরূপে বেশভূষা করিয়া সে বড় আরসিখানার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল এবং ঘাড়-মুখ ফিরাইয়া আপনাকে কিরূপ সাজাইয়াছে, অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাই নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু এত সাজসজ্জাতেও একটা অস্বাভাবিক বিষণ্ণতা মুখখানাকে মলিন করিয়া রাখিয়াছে দেখিয়া তাহার ক্ষোভের সীমা রহিল না। সে বিরক্ত:ভাবে দর্পণের সম্মুখ হইতে সরিয়া আসিল।

পাচিকা আসিয়া রাত্রির খাবারের কথা জিজ্ঞাসা করিল। সুরমা বাবুর জন্য লুচি ও মাছের দম প্রস্তুত করিতে বলিয়া ছাদে চলিয়া গেল।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। অপরাহ্নের রক্তিম কিরণে পশ্চিম আকাশ রঞ্জিত হইয়া শুভ্রা সপ্তমীর চাঁদটা ইহারই মধ্যে আকাশের মধ্যভাগ অধিকার করিয়া বসিয়াছে; পাশের বাড়ীর বারান্দা হইতে টাটকা বেলফুলের গন্ধ মৃদু বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। সুরমা খানিকটা ছাদের এদিক্ ওদিক্ করিয়া নীচে নামিয়া আসিল। ঝি তখন ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়াছে। সুরমা আলমারী খুলিয়া একটা বিলাতী এসেন্সের শিশি বাহির করিল এবং তাহার কতকটা আপনার কাপড়ে ঢালিয়া দিল। পুষ্প-নির্য্যাসের মিষ্ট-গন্ধে ঘরখানা সুবাসে ভরিয়া উঠিল। তখন সুরমা একখানা নূতন উপন্যাস লইয়া আলোর কাছে বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার চোখ দুইটা উপন্যাসের উপর দৃঢ়-নিবদ্ধ থাকিলেও কান দুইটা যেন খাড়া হইয়া রহিল।

ক্রমে রাত্রি সাতটা, আটটা, নয়টা বাজিল। পাচিকা বাবুর খাবার ঘরে রাখিয়া গেল এবং সুরমা এখন খাইবে কি না জিজ্ঞাসা করিল। সুরমা নিজের

খাবারও ঘরে রাখিয়া যাইতে বলিল; পাচিকা বাবুর খাবারের পাশে তাহার খাবার চাপা দিয়া রাখিয়া গেল।

ঘড়ীতে ঠং ঠং করিয়া দশটা বাজিল। সুরমা দেখিল, এই কয় ঘণ্টায় বইখানার পঁচিশখানি মাত্র পাতা পড়া হইয়াছে। নিতান্ত বিরক্তির সহিত আলোটা কমাইয়া দিয়া সে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

শুইল বটে, কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না। বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ হয় কি না, শুনিবার জন্য কান পাতিয়া রহিল। এক একবার মনে হইতে লাগিল, দূর হউক, কেন এত উদ্বেগ? যাহার জন্য আমার এত ভাবনা, সে কি আমার কথা একবারও ভাবে? সুরমা বিছানায় পড়িয়া তাহার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, কিন্তু সে হয় তো এতক্ষণ কোথায় আমোদের ফোয়ারা ছুটাইয়া তাহার এই দুর্ব্বিষহ চিন্তাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতেছে। দূর হউক, আর সে ভাবিবে না।

ভাবিবে না ভাবিলেও সুরমা না ভাবিয়া থাকিতে পারিল না এবং ভাবিতে ভাবিতেই কথন্ যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহারও জ্ঞান রহিল না। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন শুধু সকাল নয়, অনেকটা বেলা হইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাল বাবু কত রাত্রে ফিরিয়াছিলেন এবং এখনও তিনি বৈঠকখানায় শুইয়া আছেন, না বাহির হইয়া গিয়াছেন?"

চাকর বিস্ময়ের সহিত জানাইল যে, বাবু তো কাল ফিরেন নাই। কথন্ ফিরেন, কথন্ আসিয়া দরজা খুলিতে ডাকেন, এই চিন্তায় সে সারারাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই; এক প্রকার বসিয়াই রাত কাটাইয়াছে।

সুরমা শুনিয়া ভ্রূকুটি করিল, সে কেন সারারাত জাগিয়া বসিয়া ছিল, কে তাহাকে জাগতে বলিয়াছিল, ইত্যাদি কারণের উল্লেখ করিয়া ধমক দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল।

ঝি ঘর পরিষ্কার করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খাবারগুলোর কি হবে মা?"

সুরমা তর্জ্জন সহকারে সেগুলা রাস্তায় ফেলিয়া দিবার জন্য আদেশ দিল।

বৈকালে সুবা বেড়াইতে আসিলে সুরমা তাহার সহিত গল্প করিয়া যখন মনের উদ্বেগটা বলিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন সহসা বুড়া ঝি আসিয়া স্বামীর কথাটা স্মরণ করাইয়া দিলে তাহার সেই উদ্বেগটা সকল চেষ্টাকে পরাভূত করিয়া আবার যেন প্রবল হইয়া উঠিল, সে বুড়ীর উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া মনের উদ্বেগটাকে দূর করিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু সেটা মনের উপর এমনই জাঁকিয়া বসিল যে, কিছুতেই তাহা দূর হইল না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

তার পর সুবা চলিয়া গেল। সুরমা কাপড়-চোপড় কাচিয়া পূর্ব্বদিনের মত সাজগোজ করিল, ধোয়া কাপড়খানা পরিল, গহনা গায়ে দিল, অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা সোনা পোকার টিপ্ মনের মত করিয়া কাটিয়া কপালে পরিল। কিন্তু সে দিন আর দর্পণের কাছে গেল না, যাইতে ইচ্ছা হইল না। বারান্দায় আসিয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন সূর্য্য ডুবুডুবু হইয়াছে, একটা লাল আভায় পশ্চিম আকাশটা ভরিয়া উঠিয়াছে। দূরে কাহার বাটীতে খাঁচায় বসিয়া একটা কোকিল কুহু কুহু রবে প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে। কিন্তু তাহার সে ডাকের উত্তর কেহই দিতেছে না। সুরমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মূর্খ কোকিলের এই প্রাণ-ফাটা ব্যর্থ চীৎকার শুনিতে লাগিল।

পাচিকা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি খাবে মা?"

সুরমা তাহার দিকে না ফিরিয়াই ক্রোধগম্ভীরস্বরে উত্তর করিল, "ছাই।"

পাচিকা একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া গেল। সুরমা রেলিঙের উপর কনুয়ের ভর দিয়া, করতলের উপর গণ্ডদেশ স্থাপন করিয়া স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মানুষের এত রাগ! হোক্ না পুরুষমানুষ, হোক্ না রাগ, কিন্তু রাগ করিয়া আজ দুই দিন বাড়ী-ছাড়া? মানুষে কি এত রাগ করিতে পারে, রাগ করিয়া এমন গোটা দুইটা দিন বাড়ী ছাড়িয়া থাকিতে পারে! সে-ও তো কত দিন রাগ করিয়াছে, রাগ করিয়া এক ঘণ্টা, বড় জোর এক বেলা কথা কয় নাই, কিন্তু তার পর তাহার সে রাগ কোথায় চলিয়া গিয়াছে, রাগ না গেলেও সে নিজে রাগটাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু দুই দিন—সারা দুইটা দিন রাগ, রাগ করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া থাকা—ভগবান্, কি দিয়া তুমি পুরুষগুলাকে তৈরী করিয়াছ?

ঝি আসিয়া ডাকিল, "ও মা, এমন সাঁজের বেলা তোমার চোখে জল কেনে?"

সুরমা তীরের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইল এবং

ঝির মুখের উপর একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

রাত্রি তখন প্রায় এক প্রহর, তখন বাহিরে গাড়ীর শব্দ শুনিয়া সুরমা ছুটিয়া গিয়া জানালায় দাঁড়াইল। তাহার একটু পরেই ঘরের দরজায় আসিয়া শরৎ বিকৃতকণ্ঠে ডাকিল, "সুরমা!"

সুরমা ফিরিয়া দরজায় পৌঁছিবার আগেই শরৎ ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। আর একবার অস্ফুট কণ্ঠে ডাকিল, "সু-র-মা!"

সুরমা ছুটিয়া গিয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িল এবং শরতের আর কোন সাড়া না পাইয়া আর্ত্ত-স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার সে চীৎকার সুপ্ত পল্লীর আর কাহারও কানে না গেলেও এক জন তাহা শুনিল, শুনিয়া ভয়ে বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিল। সে সুবা।

তার পর সুবা সমস্ত রাত্রি কান খাড়া করিয়া জাগিয়া রহিল। কিন্তু আর কিছুই শুনিতে পাইল না।

সকালে উঠিতেই সুবার মনে হইল, সে একবার ও-বাড়ীতে ছুটিয়া যায়। কিন্তু সারা রাত্রির মধ্যে আর কোন সাড়া-শব্দ না পাওয়ায় শ্রুত চীৎকারটাকে সে স্বপ্ন কি প্রকৃত, তাহা স্থির করিতে পারিল না। স্থির কিছু না হইলেও একটা অজ্ঞাত উদ্বেগ আসিয়া মনটাকে ব্যস্ত করিতে লাগিল।

সুবা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সে আর ও-বাড়ীতে পদার্পণ করিবে না, এখন সেই প্রতিজ্ঞাটা বজায় রাখিবে কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিল। একটু বেলা হইলে সে ছাদে উঠিল, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া ছাদে বেড়াইয়াও পাশের বাড়ীর ছাদে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, আলিসার কাছে আসিয়া কিছুক্ষণ মুখ বাড়াইয়া রহিল, কিন্তু সেখান হইতে পাশের বাড়ীর ভিতরের কোন অংশই দেখা যায় না। অগত্যা সে নীচে নামিয়া আসিল।

মধ্যাহ্নে সে যখন আহার করিতে বসিয়াছিল, তখন ও-বাড়ীর ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, "মাঠাকরুণ তাহাকে ডাকিতেছেন, বাবুর শক্ত ব্যামো।" সুবার আর খাওয়া হইল না, সে হাতের ভাত পাতে ফেলিয়া কলে হাত ধুইয়া সেই আলু-থালু বেশেই ছুটিয়া গেল, পরণের ছেঁড়া কাপড়টা বদলাইয়া যাইবার সময় হইল না। মাসী খাইতে খাইতে অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া শরৎ যখন বাড়ী হইতে বাহির হইল, তখন রাস্তায় যাইতে যাইতে তাহার নিজের উপর এমন একটা বিরক্তি আসিল যে, তাহার ইচ্ছা হইল, দাদামশায়ের সব টাকাগুলা এক জায়গায় জড় করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়, তার পর নিজে সেই আগেকার ময়লা জামা-কাপড়, আর ছেঁড়া জুতা জোড়াটা খুঁজিয়া লইয়া এক দিকে চলিয়া যায়। যে অর্থে সুখ নাই, অসুখ আছে, শান্তি নাই, অশান্তি আছে, সে অর্থে প্রয়োজন কি? এ সুখের চেয়ে যে স্বস্তি ভাল ভগবান্!

কিন্তু আর এক দিন শরৎ এমনি ভাবে রাস্তায় যাইতে যাইতে ভগবান্‌কে ডাকিয়া সকাতরে প্রার্থনা করিয়াছে, কিছু টাকা দাও ভগবান্। সে কথাটাও আজ শরতের মনে পড়িল। কিন্তু তখন কে জানিত যে, টাকার সঙ্গে ভগবান্ সুরমাকে তাহার স্কন্ধে ঠিক ভারী বোঝার মতই চাপাইয়া দিবে। উঃ, মেয়েমানুষ এতই হৃদয়হীন হয়! ইহা অপেক্ষা একটা কুড়ি টাকা মাহিনার চাকরী আর সুবাকে লইয়া সে যদি খোলার ঘরে পড়িয়া থাকিত, তাহাতেও যে যথেষ্ট সুখ ছিল। হায় অভাগিনী সুবা! অর্থাগমের সঙ্গে সে কত-গুলা জিনিস—যেমন তেমন জিনিস নয়, কতকগুলা রত্ন হারাইয়া ফেলিয়াছে! প্রথম সুবা, দ্বিতীয় চরিত্র, তৃতীয় শান্তি; তবু মানুষ অর্থ চায়? ছি ছি, মানুষের কি ভুল!

কিন্তু মানুষ যে জানিয়া শুনিয়াই ভুলটা করে, ইহা শরৎ আপনাকে দিয়াই বুঝিতে পারিল,—যখন দেখিল, ভাবিতে ভাবিতে সে ঠিক মিলের দরজাতেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শরৎ বুঝিল, মানুষ চিন্তায় দুঃখে যতই বিক্ষিপ্তচিত্ত হউক, তাহার মনটি ঠিক কম্পাসের কাঁটার মতই একটি দিক্ লক্ষ্য করিয়া থাকে, সেটি অর্থের দিক্; এই দিক্ হইতে সহজে তাহাকে বিচালিত করা যায় না। আপনার মনে আপনি হাসিয়া শরৎ কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

কাজকর্ম্ম কিন্তু সে দিন ভাল লাগিল না। একে মনের অশান্তি, তাহার উপর অনাহার। বেলা দুইটা না বাজিতেই শরৎ উঠিয়া পড়িল এবং বাহিরে আসিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু কয়েক পদ যাইতেই সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। এ কি, সে যে বাড়ীর দিকে চলিয়াছে! কেন, বাড়ীতে এমন কি আছে যে, মনের এই বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সেখানে যাইতে হইবে? তবে কোথায় যাইবে? একবার মনে হইল, ডালিমের ঘরেই যাওয়া যাক্। কিন্তু চরিত্র নষ্ট করিলেও শরৎ এখনও চক্ষুলজ্জাটাকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই; সুতরাং এই বেলা ২টার সময় সেখানে যাইতে সাহসী হইল না। তবে কোথায় যাইবে? যমালয়ে! সম্মুখ দিয়া একখানা

খালি সেকেণ্ডক্লাস গাড়ী যাইতেছিল। শরৎ গাড়ী থামাইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁহা যানে হোগা হুজুর?"

উত্তরে শরৎ তাহাকে কোথায় যাইতে বলিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু কতক দূর যাইবার পর গড়ের মাঠ পাশে রাখিয়া চৌরঙ্গী রোড দিয়া গাড়ী যখন ছুটিতে লাগিল, তখন যেন তাহার হুঁস হইল। সে গাড়োয়ানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে? উত্তরে গাড়োয়ান জানাইল, হুজুরের হুকুমমতই সে তাঁহাকে ভবানীপুরে লইয়া যাইতেছে। কিন্তু শরৎ যে কখন্ তাহাকে ভবানীপুর যাইতে বলিয়াছে, তাহা মনে করিতে পারিল না। গাড়োয়ান ঘোড়ার রাশ টানিয়া ধরিল। শরৎ মুহূর্ত্তমাত্র ভাবিয়াই উচ্চকণ্ঠে বলিল, "জোর্‌সে চালাও।"

গাড়ী পুনরায় দ্রুতবেগে পূর্ব্বপথে ছুটিল। শরৎ গাড়ীর ভিতর বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি উন্মত্ততা! ভবানীপুরে গিয়া কি হইবে? আর কিছু না হউক, খানকটা ঘুরিলে মনটাও স্থির হইতে পারে। আর সেই সঙ্গে যদি একবার সুবার সঙ্গে দেখা হয়। সুবার সঙ্গে দেখা? ছিঃ! কেন, ক্ষতি কি? আর সকলে ত্যাগ করিলেও সুবা বোধ হয়, তাহাকে এমন নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করিতে পারিবে না; বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই পারিবে না। সে তো তাহার সম্পদের সঙ্গিনী নয়, দুঃখের দুঃখিনী। এই দুঃখের সময়ে সে নিশ্চয়ই তাহাকে আদর করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু ঘটনার কি অদ্ভুত সামঞ্জস্য! এক দিন সে অনাহারেই তাহার সম্মুখ হইতে চলিয়া আসিয়াছিল, আজিও আবার সে অনাহারে—ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত হইয়াই তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। ঘটনাচক্রের এই অদ্ভুত সাদৃশ্যে শরৎ আপন মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।"

ভবানীপুরে উপস্থিত হইয়া শরৎ বকুলতলা রোডে যাইতে বলিল। গাড়ী বকুলতলা রোডে উপস্থিত হইলে গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া শরৎ গাড়ী হইতে নামিল এবং অগ্রসর হইয়া শ্বশুরবাড়ীর সরু গলিটার মোড়ে উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া সে একটু দাঁড়াইল এবং আর অগ্রসর হইবে কি ফিরিয়া যাইবে, এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিয়া লইল। তার পর গলির ভিতর অগ্রসর হইল। কিন্তু কয়েক পদ যাইতেই মনে হইল, শ্বশুরের বাড়ীটা হইতে কে যেন বাহির হইতেছে। শরৎ ব্যস্তভাবে পিছাইয়া মোড়ে আসিল। একটু দাঁড়াইল, আবার দুই পা অগ্রসর হইল, আবার পিছাইল। দুই তিনবার এই-রূপ করিয়া সে যেন নিজের উপরেই বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং এবার মাথা গুঁজিয়া অগ্রসর হইল।

পিছন হইতে কে আসিয়া জড়াইয়া ধরিল, এবং ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তবে রে বেল্লিক বেটা, চোর বেটা।"

চমকিত হইয়া শরৎ পিছনে ফিরিয়া চাহিল, দেখিল বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথ হাসিয়া উঠিল, শরৎও একটু হাসিল। তখন বৈদ্যনাথ তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর জামাইবাবু, কি মনে ক'রে?"

শরৎ একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিল, "এ দিকে এসেছিলাম, তাই।"

বৈদ্যনাথ বলিল, "মিথ্যা ব'লো না বাবাজী, এ দিকে এসেছিলে, না সোজা এইখানেই আস্‌ছো?"

বলিয়া বৈদ্যনাথ পুনরায় হাসিয়া উঠিল। শরৎ অপ্রতিভভাবে বলিল, "তাই যদি আসি?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "দু'শো বার আসতে পার। কিন্তু মতলবটা কি বল দেখি?"

শরৎ বলিল, 'তোমাদের মেয়ে চুরী করা।"

"জীতা রও বাবাজী" বলিয়া বৈদ্যনাথ তাহার হাত ধরিয়া একটি ঝাঁকুনি দিল। তার পর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিল, "সে মতলব যে একটুও নাই, এমন কথা বল্‌তে পারি না। কিন্তু বাবাজী, তাই মনে ক'রেই যদি এসে থাক, তা হ'লে আপাততঃ আজ ফিরে যেতে হচ্ছে।"

শরৎ ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। বৈদ্যনাথ বলিল, "পাশের বাড়ীর খবর রাখ না বাবাজী, আর কলকাতা হ'তে ভবানীপুরে এসেছ মেয়ে চুরী কর্ত্তে? সে তো এখানে নাই।"

বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে শরৎ বলিয়া উঠিল, "নাই!"

বৈদ্যনাথ বলিল, "সে ক'দিন হ'তে তার মাসীর বাড়ীতে আছে।"

একটা গভীর নৈরাশ্যে শরতের মুখখানা যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া বৈদ্যনাথ বলিল, "ব্যাপারটা কি বাবাজী?"

বিরক্তভাবে "কিছু না" বলিয়া শরৎ প্রস্থানোদ্যত হইল। বৈদ্যনাথ তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "যখন এতটা পথ এসেছ, তখন শ্বশুরবাড়ীতে মিষ্টি মুখটাই ক'রে যাও। মুখখানাও শুক্‌নো দেখছি। ভয় নাই, এখন যে শাশুড়ীর আদর তোমার নেহাত অমনোনীত হবে না, এ কথা আমি তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌তে পারি।"

শরৎ তাহার মুখের উপর বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাতখানা ছাড়াইয়া লইল এবং দ্রুতপদে গিয়া গাড়ীতে উঠিল। সে দেখিল, আজ যেন সমগ্র সংসারটা তাহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে এবং সে শান্তির আশায় যেখানে যাইতেছে, সেইখান হইতেই নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। প্রত্যাখ্যানে শরতের হৃদয় যেন জ্বলিয়া উঠিল; উত্তেজিতভাবে গাড়োয়ানকে আদেশ দিল, "চালাও, রূপোগাছি।"

গাড়োয়ান ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া গাড়ী ছুটাইয়া দিল।

গাড়ী যখন রূপোগাছিতে উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। যে আদর-যত্নের প্রত্যাশায় শরৎ সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইল, এখানে আসিয়া তাহা, বরং তদপেক্ষা অধিক আদর-যত্ন পাইল। এই অত্যধিক আদর-যত্নটাকে সুস্থচিত্তে পরিপাক করিয়া লইবার জন্য শরৎ আগে খানিকটা লাল জল পেটে ঢালিয়া দিল। তখন সৃষ্টির চারিদিকে সোনালী রং ফুটিয়া উঠিল, চিম্‌নীর আলোয় চাঁদের আলো দেখা দিল, বাসী গোলাপের পাপ্‌ড়ী হইতে পারিজাতের গন্ধ ছুটিল, ডালিমমণির ঘষা-মাজা রূপের ভিতর দিয়া উর্ব্বশী-তিলোত্তমার কান্তি ঝরিতে লাগিল। ডালিমমণি গাহিল—

"তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব ব'লে
আসিয়াছি তোমার নিদান;
এমন চাঁদের আলো,
মরি যদি সেও ভাল,
সে মরণ স্বরগ সমান।"

সকালে শরৎ বিছানা হইতে উঠিতে গিয়া দেখিল, মাথা ভার; এত ভার যে, কে যেন মাথায় বিশ মণ বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে। সে উঠিতে গিয়া আবার শুইয়া পড়িল। ডালিমমণি গায়ে হাত দিয়া বলিল, "গা দিয়ে যে আগুন ছুট্‌ছে। তোমার জ্বর হয়েছে।"

জড়িতস্বরে শরৎ বলিল, "কুচ পরোয়া নেই, লেও সাকী দেও ভর পিয়ালা—"

সমস্ত দিন শরৎ জ্বরে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যার পর ডালিম বলিল, "তোমার বড্ড জ্বর শরৎ বাবু, বাড়ী যাও।"

শরৎ তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "নেহি।"

বলিয়া সে বিকৃতকণ্ঠে গাহিল—

"তোমার নয়নতলে,
শয়ন লভিব ব'লে,
আসিয়াছি তোমার নিদান।"

খানিক পরে সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। ডালিম জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাও?"

শরৎ উত্তর দিল, "বাড়ী।"

ডালিম তাহাকে বহু কষ্টে শোয়াইয়া গাড়ী ডাকিতে পাঠাইল। গাড়ী আসিলে দুই তিন জনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। গাড়ী চলিয়া গেলে ডালিম নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

"সুরো!"

"কি?"

"আজ ক'দিন আমি শয্যাগত?"

"সাত দিন।"

"এত!" বলিয়া শরৎ চক্ষু মুদ্রিত করিল। একটু পরে আবার চোখ মেলিয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল, "এই ক'দিন আমি স্বপ্নে কি দেখছিলাম জান সুরো?"

সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখ্‌ছিলে?"

শরৎ বলিল, "দেখ্‌ছিলাম দেখ্‌ছিলাম, সে যেন এই সাত দিন আমার মাথার শিয়রে ব'সে—"

সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "সে কে?"

শরৎ বলিল, "সুবা।"

সুরমা একটু ভ্রূকুটী করিল। শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "রাগ কর্‌লে সুরো?"

মুখে প্রফুল্লতা দেখাইয়া সুরমা একটু ব্যস্তভাবেই বলিল, "না না, রাগ কর্‌বো কেন?" একটু থামিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমরা মেয়েমানুষ, পুরুষদের মত অত রাগ আমাদের নাই।"

শরতের রোগপাণ্ডুর ওষ্ঠপ্রান্তে হাস্যরেখা দেখা দিল। সুরমা তাহার মুখের উপর সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "মা গো মা, এমন রাগও মানুষে করে? দু'রাত বাড়ী-ছাড়া। তার পর যখন ফিরে এলে—উঃ, সে কথা ভাব্‌তেও গা শিউরে উঠে। ভাগ্যে সুবা দিদি ছিল।"

শরৎ একটু বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কে ছিল?"

সুরমা বলিল, "সুবালা দিদি গো, ও বাড়ীর সুবালা দিদি। তুমি তো এসে বেহুঁস হয়ে পড়্‌লে। তার পরদিন তোমার গা দিয়ে মায়ের অনুগ্রহ ফুটে বেরুল। আমি তো ভয়েই আকুল। সুবালা দিদিকে ডাক্‌তে পাঠালাম, সে খেতে বসেছিল, ভাত ফেলে ছুটে এল। তার পর এই সাত দিন সাত রাত তোমার মাথার শিয়রে ব'সে—"

ব্যগ্রকণ্ঠে শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "সে কে সুরো?"

ঘাড়টা একটু দোলাইয়া সুরমা বলিল, "সুবালা দিদি গো। এখানে তার মাসীর বাড়ী, বাপের বাড়ী ভবানীপুরে।"

শরৎ ধড়মড় করিয়া বিছানার উপরে উঠিয়া বসিল, অতিমাত্র ব্যস্ততার সহিত বলিল, "ভবানীপুরে বাপের বাড়ী? সে কে?"

সুরমা বলিল, "সে সুবালা দিদি। ও কি, তুমি উঠে বস্‌লে যে?"

"না" বলিয়া শরৎ আবার শুইয়া পড়িল এবং অবসন্নভাবে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কৈ, তোমার সুবালা দিদি আজ আসেন নি?"

সুরমা বলিল, "না, কাল কবিরাজ আর ভয় নাই বল্‌লে, সে বাড়ী গিয়েছে।"

শরৎ বলিল, "তুমি আর ডেকে পাঠাওনি?"

সুরমা বলিল, "ক'দিন না খেয়ে না ঘুমিয়ে খেটেচে, একটু বিশ্রাম করুক ভেবে আর ডাকি নাই। আজ ঝিকে ডাক্‌তে পাঠাচ্চি।"

বলিয়া সুরমা বাহির হইয়া গেল।

শরৎ নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। আজ সাত দিন সে শয্যাগত। শুধু শয্যাগত নয়, অজ্ঞান। তাহার মনে পড়িল, সেই সে দিন রাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গমন; তার পর মানসিক চাঞ্চল্যে ভবানীপুরে যাওয়া, সেখানে বৈদ্যনাথের সহিত সাক্ষাৎ, তথা হইতে ডালিমের গৃহে প্রত্যাগমন। তার পর সাত দিন সাত রাত চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে তাহার কিছুই জানে না। সাত দিন আগেকার ঘটনাগুলা তাহার নিকট কল্যকার ঘটনা বলিয়া বোধ হইতেছে। শুধু তাহাই নয়, তেমন অস্বাভাবিক ঘটনাগুলা কিরূপে যে ঘটিল, কেমন করিয়া যে সে ভবানীপুরে গেল, তাহা এখন তাহার নিকট যেমন আশ্চর্য্য, তেমনই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল। ছি ছি, মনের খেয়ালের বশে সে দিন সে কি করিতে বসিয়াছিল? ভাগ্যে সুবা ঘরে ছিল না, ভাগ্যে বৈদ্যনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নতুবা সে খেয়ালের পরিণাম যে কি ঘটিত, তাহা বলা যায় না।

কিন্তু সুবালা দিদি কে? সে কেন দিন-রাত তাহার মাথার শিয়রে বসিয়া সেবা করিল? যে সে রোগ নয়, ভীষণ সংক্রামক বসন্ত রোগ, যে রোগে আত্মীয়েরা পর্য্যন্ত কাছে আসিতে ভয় পায়, সেই কাল ব্যাধি। সুবালার এমন কি দায় যে, সে এই কাল ব্যাধিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিজের প্রাণের ভয় না রাখিয়া সেবা করিতে আসিল? কে এই সেবাতৎপরা, পরদুঃখকাতরা রমণী?

সুবালার এখানে মাসীর বাড়ী, বাপের বাড়ী ভবানীপুরে। বৈদ্যনাথ বলিয়াছিল, সুবা তাহার মাসীর বাড়ীতে গিয়াছে। শুধু তাই নয়, সে একটু শ্লেষ করিয়া বলিয়াছিল, 'বাবাজী, পাশের বাড়ীর খবর রাখ না, আর এখানে এসেছ মেয়ে চুরী কর্‌তে?' পাশের বাড়ীর কি খবর? তবে এই সুবালাই কি— শরতের বুকটা দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

খুব সম্ভব এই সুবালাই সুবা। নতুবা আর কোন্ রমণী নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া এক জন নিঃসম্পর্কীয়ের সেবা করিতে আসিবে? সুবা ভিন্ন আর কে অনাহারে অনিদ্রায় তাহার মাথার শিয়রে বসিয়া সাত দিন সাত রাত কাটাইতে পারিবে? তবে সে স্বপ্ন দেখে নাই। সেই সুদীর্ঘ অজ্ঞানতার মধ্যেও জ্ঞানের যে একটু ক্ষীণ আভাস ছিল, সেই আভাসটুকু দিয়াই সে সুবাকে চিনিতে পারিয়াছে। গাঢ় সংজ্ঞাহীনতার মধ্যে যখনই একটু সংজ্ঞা আসিয়াছে, তখনই সে নিজের মুখের উপর কাহার তীব্র ব্যাকুলতাপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ দেখিয়াছে; সে দৃষ্টি, সে ব্যাকুলতা সুবা ভিন্ন আর কাহারও হইতে পারে না। রোগের যাতনায় যখনই যে অঙ্গে প্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে, তখনই সেই অঙ্গে কাহার স্নেহশীতল করস্পর্শ অনুভব করিয়াছে; সে স্পর্শ তাহার পরিচিত। তেমন স্নিগ্ধ সুকোমল স্পর্শ সুবা ছাড়া আর কাহারও হইতে পারে না। হায় সুবা, ধরা পড়িবার ভয়ে জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তুমি পলাইয়াছ, কিন্তু তোমার দৃষ্টি, তোমার স্পর্শ তোমাকে ধরাইয়া দিয়াছে।

শরৎ চীৎকার করিয়া ডাকিল, "সুরো, সুরো!"

সুরমা ঘরের বাহিরেই ছিল; ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো, কি বল্‌ছো?"

শরৎ বলিল, "কৈ, তোমার সুবালা দিদি এলো না?"

সুরমা বলিল, "সে এখানে নাই, আজ সকালে ভবানীপুরে চ'লে গিয়েছে।"

শরৎ মৃদু হাসিল। সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "হাস্‌লে যে?"

শরৎ বলিল, "তার নিষ্ফল সতর্কতা দেখে।"

সুরমা কিছু বুঝিতে পারিল না। শরৎ বলিল, "সে আর কেউ নয় সুরো, সে সুবা। ধরা পড়্‌বার ভয়ে পালিয়েছে।"

সুরমা বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"মামা!"

"কেন সুধা?"

"মানুষ কি এত কঠিন হ'তে পারে?"

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বৈদ্যনাথ বলিল, "হয় বৈ কি সুধা, তা নইলে মানুষ এত কষ্ট পায় কেন?"

একটু শান্ত হাসি হাসিয়া সুধা বলিল, "কষ্ট, সুখ, সে সব যার যেমন কর্ম্মফল, তাতে অপরের দোষ কি মামা?"

একটু ভাবিয়া বৈদ্যনাথ বলিল, "দেখ সুধা, আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, এত কথার উত্তর দেবার ক্ষমতা আমার নাই। তবে আমি এইটুকু বুঝি যে, এক জন যদি আর এক জনের উপর অত্যাচার করে, তবেই সে কষ্ট পায়।"

সুধা বলিল, "কিন্তু সে-ও তো স্বেচ্ছায় অত্যাচার করে না মামা, হয় তো আর এক জন তার উপরে আরও বেশী অত্যাচার করেছে।"

বৈদ্যনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তাই ব'লে সে আর এক জনের উপর অত্যাচার করবে? রামা আমাকে মেরেছে, কাজেই আমি শ্যামাকে মারবো। এ নীতি মানুষের নয় সুধা, অন্ততঃ আমাদের মত গাঁজাখোরদের তো নয়ই।"

বলিয়া বৈদ্যনাথ একটু হাসিয়া বলিল, "তাই ভাবি সুধা, মানুষগুলো যদি এক আধ ছিলিম গাঁজা খেতে শেখে, তা হ'লে জগতের অনেক উপকার হয়। খুব বেশী কিছু না হোক, অন্ততঃ এই কামড়া-কামড়িগুলো থেমে যায়, কেউ দুটো কথা বল্লেই রাগে তার মাথাটা কাট্‌বার জন্য উঠে প'ড়ে লাগে না।"

বৈদ্যনাথ হাসিয়া উঠিল। সুধা জিজ্ঞাসা করিল, "আজ গিয়েছিলে মামা?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "হাঁ, সে অনেকটা সেরে উঠেছে।"

সুধা। দেখা করেছিলে?

বৈদ্য। না।

সুধা। দেখা করলে না কেন?

বৈদ্য। সে আবাগের বেটার মুখ দেখ্‌তে ইচ্ছা হ'লো না।

সুধা ভ্রূকুটি করিল। বৈদ্যনাথ ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "তা তুই রাগই কর, আর যাই কর, আমি কিন্তু সে বেটাকে গাল না দিয়ে জলগ্রহণ করবো না। আমার এই বড় দুঃখ সুধা, তুই আবার সেই বেল্লিক বেটার সেবা কত্তে গেলি?"

মৃদু হাসিয়া সুধা বলিল, "এই না বল্লে মামা, গাঁজা খেলে রাগ থাকে না?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "কিন্তু বেশী গরমে পাথরও ফেটে যায়, তা জানিস্?"

সুধা নিরুত্তরে পাশ ফিরিয়া শুইল।

দার্জ্জিপাড়া হইতে আসিয়াই সুধা জ্বরে পড়িল এবং এক দিনের জ্বরেই গায়ে বসন্ত দেখা দিল। বাড়ী শুদ্ধ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তবে সে যে বসন্ত-রোগীর সেবা করিয়া আসিয়া রোগাক্রান্ত হইয়াছে, এ কথা বৈদ্যনাথ ছাড়া বাড়ীর আর কেহই জানিল না। সুতরাং উদ্বেগের সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর যে তিরস্কারটা হইত, তাহা আর হইল না।

রোগটা একটু প্রবলভাবেই হইল; ইহার উপর কবিরাজ আসিয়া জানাইয়া গেল, জাতটা ভাল নয়, তবে মায়ের হাত। গোকুলবাবু এক জন ভাল অভিজ্ঞ কবিরাজ আনিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। ঔষধের গুণে যে সকল গুটী একটু উঠিয়াই ডুবিয়া যাইতেছিল, তাহারা আবার উঠিয়া পড়িল। দেহে তিলধারণের স্থান রহিল না।

মা প্রাণপণে কন্যার সেবা করিতেন। সাংসারিক কার্য্যের জন্য তিনি যেটুকু অবকাশ লইতেন, সেটুকু সময় বৈদ্যনাথ আসিয়া কাছে থাকিত। সৌদামিনী এ ঘরের দিক্ দিয়াও যাইতেন না এবং যে এ ঘরে যাইত, তাহার সংস্পর্শে আসিতে চাহিতেন না।

রোগ শেষে কঠিন আকার ধারণ করিল। যে সকল গুটী উঠিয়াছিল, তাহা পাকিবার মুখে বসিয়া যাইবার মত হইতে লাগিল। ইহাতে কবিরাজ চিন্তিত হইলেন, বাড়ীর সকলেই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। বৈদ্যনাথ, ভবানীপুরের যেখানে যত শীতলা আছে, সকলেরই চরণামৃত আনিয়া খাওয়াইতে লাগিল এবং সে প্রত্যেক শীতলার কাছেই যোড়া পাঁটা দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসিল।

সুধা আপনার মৃত্যু সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিল, কিন্তু মামার এই আগ্রহ দেখিয়া তাহার যেন বাঁচিবার জন্য একটু একটু সাধও হইতেছিল। সে মরিলে এই গাঁজাখোর লোকটি কতটা যে ব্যথা পাইবে, তাহাই ভাবিয়া সে একটু কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। সে যদি বৈদ্যনাথকে বলিত, "আচ্ছা মামা, তুমি এতটা কচ্চো কেন? আমার বাঁচায় লাভ কি?"

তাহা হইলে বৈদ্যনাথ জোর গলায় বলিত, "বেঁচে

বাঁচাটাই মস্ত লাভ। মরেই বা তোর লাভটা কি হল্ তো ?"

সুধা ম্লান হাসি হাসিয়া উত্তর করিত, "লাভ হোক আর লোকসান হোক, মরণ তো ছাড়বে না মামা, সে যে আমাকে আঁকড়ে ধরেছে।"

বৈদ্যনাথ দৃঢ়স্বরে বলিত, "ধরলেও এতগুলো শেতলার হাত থেকে নিয়ে যাবার সাধ্য তার বাবারও নাই; এ কথা আমি এই জোর গলায় বল্‌ছি।"

সুধা মুখে মৃদু হাসত, কিন্তু মামার এই দৃঢ় বিশ্বাসের নিষ্ফলতা স্মরণে অন্তরে অন্তরে ব্যথা অনুভব করিত। বৈদ্যনাথ তাহাকে আশ্বাস দিত এবং সে ইহা অপেক্ষাও কঠিন-কঠিন রোগীকে মা শীতলার কৃপায় রোগমুক্ত হইতে দেখিয়াছে, তাহার গল্প বলিত।

সে দিন সুধার যন্ত্রণাটা যেন বাড়িয়াছিল। তাহার যাতনা দেখিয়া বৈদ্যনাথের মনেও যেন কেমন একটা নিরাশার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। কবিরাজ বলিয়া গিয়াছিল, "তিন দিনের মধ্যে যদি গুটীগুলি মুখ তুলে পেকে উঠে, তবেই রক্ষা, নতুবা আশা নাই।" আজ তাহার শেষ দিন। বৈদ্যনাথ বার বার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিল, কৈ, একটিও তো পাকে নাই। বৈদ্যনাথের চোখে মুখে একটা নৈরাশ্যের ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সুধা বলিল, "একবার যাবে মামা ?"

বৈদ্যনাথ একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "গিয়ে কি হবে সুধা ? সে কি আসবে ?"

এ কথার উত্তর সুধা দিতে পারিল না। সে যেমন পাশ ফিরিয়া মুখ গুঁজিয়া শুইয়া ছিল, তেমনই শুইয়া রহিল। হঠাৎ বৈদ্যনাথ বলিয়া উঠিল, "ভাল কথা, একটা কথা তোকে বলা হয় নি।"

সুধা ব্যস্তভাবে পাশ ফিরিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা মামা ?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "সে বেল্লিক বেটা এক দিন এসেছিল।"

ব্যস্তভাবে সুধা বলিয়া উঠিল, "এসেছিল ? কবে ? কখন্ ?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "সে আজকালকার কথা নয়, প্রায় দিন কুড়ি আগেকার কথা, তুই তখন ওখানে। এক দিন হঠাৎ বাবু এসে হাজির।"

রুদ্ধশ্বাসে সুধা জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর ?"

বৈদ্যনাথ সহাস্যে বলিল, "তার পর আর কি! বেলা তিনটের সময় ও-পাড়া হ'তে ফিরে আস্‌ছি, দেখি, বাবু গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে। এক পা এগুচ্ছে তো তিন পা পেছুচ্ছে। এমন সময় আমি এসে হাজির। আমাকে দেখে যেন একটু থতমত খেয়ে গেল।"

সুধার চোখে মুখে যেন একটা আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কেন এসেছিল ?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "কেন আবার, তোর সঙ্গে দেখা কর্‌তেই বোধ হয় এসেছিল। দেখ্‌লাম, মনটা ভার ভার, মুখখানাও শুক্‌নো। বাড়ীতে বোধ হয় রাগারাগি হয়েছিল, দ্বিতীয় পক্ষ বটে তো। তাই বোধ হয়, রাগের মাথায় বাবু এখান পর্য্যন্ত ছুটে এসেছিল।"

সুধা স্মরণ করিয়া দেখিল, যে সময়ে বাড়ীতে রাগারাগি করিয়া দুই দিন বাড়াবাড়ি হইয়াছিল, ইহা ঠিক সেই সময়ের ঘটনা বটে। তবে তাহাকেও মনে আছে ? দুঃখ-তাপের সময়ে তাহার কাছেও ছুটিয়া আসিতে পারে ? হর্ষপ্রফুল্ল কণ্ঠে সুধা বলিল, "তার পর ?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "তার পর যখন আমার কাছে শুনলে, তুই এখানে নাই, তখন মুখখানাকে অন্ধকার ক'রে সটান গিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়্‌লো। আমি বাড়ীতে আন্‌বার জন্য যত্ন করেছিলাম, কিন্তু এলো না।"

সুধা খানিকটা চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। তার পর চোখ মেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি আর এক-বার যাও মামা, ব'লো, আর একবার দেখা—"

স্বরটা গাঢ় হইয়া আসিল, কথা শেষ হইল না। বৈদ্যনাথ তাহাকে আশ্বাস দিয়া চলিয়া গেল।

এখনও তবে মনে আছে ? এখনও সে ভাবিতে পারে, এমন এক জন আছে, দুঃখ-কষ্টের সময়ে যার কাছে গেলে সান্ত্বনা পাব। তবে আর দুঃখ কি ? মরণ তো এখন সুখের। সান্ত্বনা—সে কিসের অধিকার পাইয়াছে ? সে তো সুখের সঙ্গিনী; কিন্তু দুঃখের সঙ্গিনী আমি। দুঃখে সে আমার কাছে সান্ত্বনা চায়, রোগশয্যায় আমার হাতের সেবা তার যাতনা দূর করে। আমার মত সুখী কে ? স্বামীর রোগ নিজের দেহে টানিয়া আনিয়া, তাহার অমঙ্গল নিজের মাথায় লইয়া মরিতে বসিয়াছি, এই তো সকল মরণ, এমন মরণই তো স্ত্রীলোকের কাম্য। কিন্তু আর একবার দেখা—তাহাকে রোগ-শয্যায় দেখিয়াছি, একবার নিজের রোগ-শয্যার পাশে তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা পূরিবে না কি ? সে আসিবে না কি ?

মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছিস্ সুধা ?"

সুধা বলিল, "অনেকটা ভাল মা।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

"হাঁ গা, সত্যি ?"

"কি সত্যি সুরো ?"

তাহার মুখের কথাটা কাড়িয়া লইয়া শরৎ ধীর-গম্ভীর-স্বরে বলিল, "তাতে কোনই সন্দেহ নাই সুরো ।"

সন্দেহ যে নাই, তাহা সুরমাও বুঝিয়াছিল, বুঝিলেও সে কিন্তু যেন জোর করিয়াই সন্দেহটাকে টানিয়া আনিতেছিল। সপত্নী আসিয়া যে এমন ভাবে স্বামীর সেবা করিয়া গেল, অথচ তাহাকে বিন্দুবিসর্গও জানিতে দিল না, তাহাকে কাছে পর্য্যন্ত যাইতে দিল না, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে ? শুধু আশ্চর্য্য নয়, সম্পূর্ণ অপমানজনক, ইহা একটা নিদারুণ প্রতিশোধ। তাহারই সপত্নী—যাহাকে স্বামী উপেক্ষা করিয়া ঠেলিয়া দিয়াছিল, সে-ই আসিয়া তাহারই সমক্ষে, তাহাকে যেন সম্পূর্ণ উপহাস করিয়াই রুগ্ন স্বামীর সেবা করিতে গেল, আর সে কাঠের পুতুলের মত এক পাশে দাঁড়াইয়া এই কার্য্যে আপনার অক্ষমতা জানাইয়া দিল, ইহা অপেক্ষা লজ্জার, অপমানের বিষয় আর কি থাকিতে পারে ? সে তো শুধু সেবা করিয়া গেল না, সেই সঙ্গে ইহাও যেন সগর্ব্বে জানাইয়া গেল, দেখ, তোমরা নিতান্ত অসার জ্ঞানে যাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলে, সে তোমাদের এখন কত প্রয়োজনীয় ; দেখ, সে কিরূপে তোমাদের নিদারুণ অবজ্ঞার নিদারুণ প্রতিশোধ লইয়া গেল ।

কথাটা সুরমা যতই ভাবিত, ততই এই প্রতিশোধ তাহার নিকট অসহ্য বোধ হইত। হায়, ইহা অপেক্ষা সে যদি সুরমাকে দূর করিয়া দিয়া তাহার স্থান অধিকার করিত, তাহা হইলেও যে এতটা দুঃখ ছিল না। কিন্তু স্ত্রীকে স্বামীর সেবায় বঞ্চিত করা—উঃ, ইহা হইতে গুরুতর অপমান আর কি থাকিতে পারে ?

কিন্তু রমণীর হৃদয়টা কি পাষাণ ! এত দিন ধরিয়া স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেবা করিয়া গেল, স্বামীর যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে চাহিয়া দিন-রাত্রি কাটাইয়া দিল, অথচ ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিল না যে, তাহাদের মধ্যে স্বামি-স্ত্রীর একটা নিকট-সম্পর্ক আছে। যখন স্বামীর জীবন-মরণের সন্ধিস্থল, তখন এমন একটু অধীরতা প্রকাশ করিল না, যাহাতে এই সম্পর্কের বিন্দুমাত্র আভাসও পাওয়া যায়। উঃ, কি কঠিন-হৃদয়া এই রমণী ! এরূপ কঠিন-হৃদয় দ্বারাই এরূপ প্রতিশোধ সম্ভব। কিন্তু রমণীতে কি এতটা কঠিনতা সম্ভব হইতে পারে ? সুরমার কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছিল না যে, ইহা কোন দিনই সম্ভব হইতে পারে।

সুতরাং স্বামীর কথার উত্তরে সুরমা বলিল, "কিন্তু সে পরিচয় দিলে না কেন ?"

মৃদু হাসিয়া শরৎ বলিল, "স্ত্রীলোক হ'লে আমি এ কথার উত্তর দিতাম সুরো ।"

সুরমা মুখ ভার করিয়া বলিল, "ছাই উত্তর দিতে। আমি দিব্যি ক'রে বল্‌তে পারি, সে কখনো নয় ।"

সহাস্যে শরৎ বলিল, "বেশ, হওয়াতেই যখন তোমার এইটা আপত্তি, তখন আমিও তার প্রতিবাদ কত্তে চাই না। কেন না, সে বাদ-প্রতিবাদে কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই ।"

সুরমা ঘাড়টা বাঁকাইয়া শ্লেষগম্ভীর-স্বরে বলিল, সত্যিই কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই কি ?"

শরৎ এ কথার কোন উত্তর না দিয়া খোলা জানালার দিকে চাহিয়া রহিল ।

শরৎ তখন অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। ভগ্ন স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ফিরিয়া না পাইলেও চলিতে ফিরিতে পারিত, কাজেও এক দিন বাহির হইয়াছিল। স্বাস্থ্যটা এত শীঘ্র ফিরিয়া পাইবার কারণও ছিল। সুরমা যেন স্বামীর স্বাস্থ্য ফিরিয়া আনিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছিল। তাহার এই প্রাণান্ত আগ্রহ দেখিয়া শরৎ যে বিস্মিত না হইল, এমন নহে, তবে সে এই আগ্রহের সূক্ষ্ম কারণটুকুও বুঝিতে পারিল। বুঝিলেও সে সুরমার আদর-যত্নটুকু বেশ আনন্দের সহিতই গ্রহণ করিতে লাগিল। এই আনন্দের মধ্যে শুধু একটা স্মৃতি আসিয়া মাঝে মাঝে খোঁচা দিত। শরৎ সে আঘাতটুকু নীরবেই সহ্য করিয়া যাইত।

স্বামীকে নিরুত্তর দেখিয়া সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছো ?"

একটু হাসিয়া শরৎ বলিল, "বল দেখি ?"

সুরমা বলিল, "এটা বলা তেমন শক্ত নয়। তার কথা ভাবছো ।"

মৃদু হাস্যের সহিত শরৎ বলিল, "ঠিক ।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সুরমা ধীরে ধীরে বলিল, "দেখ, এক কাজ কর ।"

শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ ?"

সুরমা স্বামীর আর একটু কাছে সরিয়া আসিয়া, একটু হাসিয়া বলিল, "তাকে নিয়ে এস ।"

বিস্ময়ের সহিত শরৎ বলিল, "কোথায় ?"

সুরমা বলিল, "এইখানে ।"

ভ্রূকুটি করিয়া শরৎ বলিল, "ছিঃ !"

সুরমা গম্ভীর-স্বরে বলিল, "যাকে দিনরাত মনে স্থান দেওয়া যায়, তাকে কি ঘরে স্থান দেওয়া যায় না ?"

শরৎ কোন উত্তর করিল না। সুরমা বলিল, "বোধ হয়, তাকে সতীনের কাছে রাখতে বিশ্বাস হয় না।"

শরৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টির সম্মুখে সুরমা মাথা নীচু করিল।

এমন সময় বেহারা আসিয়া জানাইল, এক জন বাবু নীচে অপেক্ষা করিতেছেন। শরৎ উঠিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল। সুরমা সরিয়া গিয়া দুই হাতে জানালার গরাদে ধরিয়া বাহিরে রৌদ্রতপ্ত প্রকৃতির দিকে চাহিয়া রহিল।

খানিক পরে শরৎ ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "আমাকে এখনি ভবানীপুরে যেতে হবে।"

সুরমা বিস্মিতভাবে স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। শরৎ ব্যগ্রস্বরে বলিল, "তার কঠিন ব্যারাম, বাঁচে কি না সন্দেহ।"

সুরমার বিস্ময়স্তব্ধ কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "ব্যারাম!"

শরৎ বলিল, "হাঁ, আমার রোগ সে নিজের দেহে টেনে নিয়ে আমায় বাঁচিয়ে গিয়েছে।"

বলিয়া শরৎ কাপড় ছাড়িতে উদ্যত হইল। সুরমা দ্রুতপদে সম্মুখে আসিয়া তাহার হাত ধরিল এবং তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যাচ্ছো না কি?"

শরৎ তাহার মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ঈষৎ বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "তুমি কি যেতে বারণ কর?"

স্থিরস্বরে সুরমা বলিল, "হাঁ, করি।"

শরতের মুখে-চোখে একটা তীব্র ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিল। সুরমা যেন তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়াই বেশ সহজ স্বরে বলিল, "তুমি এই রোগ-শয্যা হ'তে উঠেছ।"

ক্রোধগম্ভীর-কণ্ঠে শরৎ বলিল, "কিন্তু সে না থাকলে এ শয্যা হ'তে আর যে উঠতে হ'তো না, তা বোধ হয় ভুল নাই।"

বলিয়া সে সুরমার হাত হইতে নিজের হাতটা টানিয়া ছাড়াইয়া লইল। সুরমা মুহূর্ত্তকাল তীব্র দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তার পর শরৎ কাপড় ছাড়িয়া ঘরের বাহির হইতে গিয়া দেখিল, সুরমা কাপড়-চোপড় পরিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথাও যাবে না কি?"

সুরমা বলিল, "হাঁ, ভবানীপুরে যাব।"

তীব্রকণ্ঠে শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সেখানে কি কত্তে যাবে?"

"প্রতিশোধ দিতে।"

শরৎ তাহার মুখের উপর একটি তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইল; সুরমা তাহার অনুসরণ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অর্দ্ধনিদ্রিত অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় পড়িয়া সুবা স্বপ্নে দেখিতেছিল, যেন শরৎ পূর্ব্বের মতই ঘরজামাই হইয়া তাহাদের বাড়ীতে রহিয়াছে, তেমনই সে প্রত্যহ মাতা বা ভ্রাতৃবধূ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইতেছে, কোন দিন খাইয়া, কোন দিন না খাইয়া আফিসে যাইতেছে। সুবা ঠাকুরকে মানসিক করিতেছে, "হে ঠাকুর, আমি আমার সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত আছি, আমার স্বামীর এই কষ্ট দূর ক'রে দাও।" সহসা যেন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে শত সহস্র বিদ্যুতের আলো ফুটিয়া উঠিল, কালীঘাটের কালীর পটখানা ভূকম্পনে অট্টালিকার ন্যায় প্রবল বেগে দুলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পটস্থা দেবীমূর্ত্তি দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া মেঘগম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "সাবধান, যা দিতে পারবি না, তাই নিয়ে দেবতার সঙ্গে রহস্য করিস্ না।"

সুবা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে যোড় হাত করিয়া বলিল, "রহস্য নয় মা, স্বামীর জন্য আমি সব দিতে পারি।"

দেবী ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "স্বামীর জন্য স্বামীকে ত্যাগ কর্ত্তে পারিস্?"

সুবা ভয়ে বিস্ময়ে শিহরিয়া দেবীর ভ্রূভঙ্গিভীষণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেবী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "শীঘ্র বল্, পারিস্ কি না?"

সুবার ভীতিবিহ্বল কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "পারি।"

দেবী খল্ খল্ হাসিয়া উঠিলেন; সমগ্র চরাচর তাহার প্রতিধ্বনি তুলিয়া বিকট নাদে হাসিয়া উঠিল। দেবী অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "তবে ঐ দেখ্।"

সুবা চাহিয়া দেখিল, আর এক দৃশ্য; এক প্রকাণ্ড সুসজ্জিত অট্টালিকায় রত্নময় আসনে তাহার স্বামী উপবিষ্ট, আর তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া আর এক সুন্দরী যুবতী। সুবা চক্ষু মুদ্রিত করিতে গেল, কিন্তু পারিল

মা দেবী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কেমন, তোর সাধ পূর্ণ হয়েছে তো?"

সুবা সকাতর-কণ্ঠে ডাকিল, "মা!"

দেবী বলিলেন, "দেবতার কাছে কারো আন্তরিক প্রার্থনা বিফল হয় না। তুই কায়মনোবাক্যে দেবতার কাছে যা চেয়েছিলি, তা পেয়েছিস্. এখন চ'লে আয়।"

সুবা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাব মা?"

দেবী বলিলেন, "আমার কাছে।"

সুবা হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। দেবী বলিলেন, "দেখ্‌ছিস্ তো, স্বামীর পাশে আর তোর স্থান নাই।"

শঙ্কাজড়িত-কণ্ঠে সুবা বলিল, "পায়েও কি স্থান নাই মা?"

সুবা দেখিল, দেবীর নেত্রদ্বয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছে; মুখমণ্ডল নিবিড় কৃষ্ণকাদম্বিনীর ন্যায় ভীষণ হইয়াছে; দেবী এবার বজ্রনাদে বলিলেন, "হতভাগিনি, স্বামীর পায়ে প'ড়ে থাক্‌বি, তবু আমার কাছে আস্‌বি না? স্বর্গসুখের চেয়ে স্বামীর পায়ের কাছে স্থানটা তোর বড় হ'লো?"

সুবা এ-কথার উত্তর দিতে পারিল না, শুধু দেবীর ক্রোধরুদ্র মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দেবী অঙ্গুলিহেলনে আদেশ দিলেন, "চ'লে আয়।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুবা অগ্রসর হইল; কে যেন তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে আহ্বান আসিল, "সুবা!"

সুবা পশ্চাতে ফিরিতেই স্বামীর হাস্যপ্রফুল্ল মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে আর দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। দেবী বলিলেন, "কি দেখ্‌ছিস্?"

সুবার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, সে অনিমেষনেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেবী অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "ছি সুবা, ও দিকে কি চাইতে আছে? তুই আমার কাছে আয়। সে কেমন সুখের স্থান! সেখানে যাবার জন্য কত লোক জন্মজন্মান্তর ধ'রে তপস্যা করে।"

পশ্চাৎ হইতে আবার স্নেহকোমল কণ্ঠের আহ্বান আসিল, "সুবা?"

সুবা এবার সেইখানে আছাড় খাইয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিয়া বলিল, "তোমার স্বর্গ তোমার থাক্ মা, আমি সেখানে যেতে চাই না, স্বামীর পায়ের কাছে একটু স্থান চাই।"

ভীম-গর্জ্জনে বিশ্ব কাম্পিত করিয়া "দূর হও হতভাগিনি" বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে গভীর অন্ধকারে চারিদিক্ সমাচ্ছন্ন হইল। সে সূচিভেদ্য নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সুবা কোন দিকেই পথ দেখিতে পাইল না; সে ভয়ে আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্ধকার-সমুদ্র আলোকিত করিয়া আবার মৃদুমধুর কণ্ঠের আহ্বান আসিল, "সুবা!".

সুবা এবার প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। তাহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অন্ধকারস্তূপ অন্তর্হিত হইল, দিবার মৃদুমন্দ আলোক ফুটিয়া উঠিল; আর সেই আলোকে স্বামীর সৌম্যমধুর মূর্ত্তি তাহার ব্যাকুল দৃষ্টিপথে পতিত হইল। শরৎ বলিল, "আমাকে ডেকেছ সুবা?"

সুবা কথা কহিতে পারিল না, শুধু প্রাণপণ শক্তিতে যতদূর পারিল, চক্ষু দুইটাকে বিস্তৃত করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শরৎ আস্তে আস্তে আসিয়া বিছানার এক পাশে বসিল এবং সুবার মাথায় হাত রাখিয়া ধীর-কোমল স্বরে বলিল, "আমাকে ডেকেছ?"

সুবা আপনার ক্ষতপূর্ণ হাত দুইটা দিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, ভীতিতাড়িত কণ্ঠে বলিল, "ওগো, আমি কোথাও যাব না, তোমার পায়ের কাছে প'ড়ে থাকবো।"

সহসা আর এক জন দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়াই সুবা একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া উভয় হস্তে চক্ষু আবৃত করিল।

সুরমা বলিল, "ভয় পেলে না কি সুবালা দিদি?"

সুবা চোখ হইতে হাত সরাইয়া বিস্ময়জড়িত-স্বরে বলিল, "তুমি—তুমি এখানে?"

ধীর-গম্ভীর-কণ্ঠে সুরমা বলিল, "হাঁ, আমি এখানে এসেছি প্রতিশোধ দিতে।"

কিছু বুঝিতে না পারিয়া, সুবা জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুরমা বিছানার উপর তাহার পায়ের কাছে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল, গম্ভীর-মুখে বলিল, "নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে, আমার স্বামীর সেবা ক'রে আমাকে যে লজ্জা দিয়ে এসেছ, আজ আমি তার শোধ দিতে এসেছি।"

সুবার রোগশীর্ণ ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল, ধীরে ধীরে বলিল, "সে তো তোমারি কাজ ক'রে এসেছি বোন্।"

ঘাড় দোলাইয়া অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে সুরমা বলিল, "কে তোমাকে আমার কাজ কত্তে বলেছিল? আমি কি জানি না? আমার বাড়ী চড়াও হয়ে আমার কাজ ক'রে আসা—সতীনের উপর কি এমনি গায়ের ঝাল ঝেড়ে আসতে হয়?"

সুরমার চোখ দুইটা জলে টল-টল করিতে লাগিল। সুধার চক্ষুও জলে ভরিয়া আসিল। কষ্টে তাহা চাপিয়া, ঠোঁটে একটু হাসি আনিয়া সুধা বলিল, "পরিচয় না দেওয়াটা আমার অন্যায় হয়েছে বটে, কিন্তু বড় অসময়ে প্রতিশোধ দিতে এসেছ বোন্, আমার যে প্রতিশোধ নেবার সময়ও আর নাই।"

সুরমা তীরের মত উঠিয়া দাঁড়াইল; অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তাই বুঝি খবর দিয়েছ? স্বামীর পায়ে মাথা রেখে চোখ বুজে সতীনকে আপনার সৌভাগ্য দেখিয়ে যাবে, এই বুঝি তোমার সাধ? উঃ, কি নিষ্ঠুর সতীন তুমি! কিন্তু আমিও তোমার সতীন, আর তোমার চেয়েও নিষ্ঠুর। আমি কখনো তোমাকে সে সৌভাগ্য পেতে দেব না। কৈ, যাও দেখি তুমি?"

বলিয়াই সুরমা ছুটিয়া গিয়া সুধার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। সুধার চোখ দিয়া ঝর-ঝর জল গড়াইতে লাগিল।

শরতের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না; সে আস্তে আস্তে উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল এবং রুমাল বাহির করিয়া চোখ দুইটা মুছিয়া ফেলিল। হায়, কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও সে এই সুরমাকে হৃদয়হীনা ভাবিয়া লইয়াছিল।

এমন সময় বৈদ্যনাথ কবিরাজকে লইয়া আসিল। কিন্তু সে ঘরের দরজায় পা দিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সুধা তাহাকে দেখিতে পাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "একে চিন্‌তে পার মামা?"

সুরমা পিছনে চাহিয়াই ব্যস্তভাবে মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিল। বৈদ্যনাথ তাহাকে চিনিত না, সুতরাং সে হতবুদ্ধির ন্যায় একবার সুধার মুখের দিকে, আরবার জানালার পাশে দণ্ডায়মান শরতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সুধা হাসিয়া বলিল, "চিন্‌তে পার্‌লে না? আমার আর একটি ছোট বোন্।"

সুরমা বস্ত্রাদি সংযত করিয়া পাশে বসিল। বৈদ্যনাথ হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া কবিরাজকে ডাকিয়া লইয়া গেল। কবিরাজ রোগীর সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া, নাড়ী টিপিয়া হর্ষপ্রফুল্ল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আর কোন ভয় নাই; মা রক্ষা করেছেন, সব গুটী পেকে উঠেছে। কিন্তু এমনতর পরিবর্ত্তন নেহাৎ দেবতার কৃপা। না হ'লে হয় না।"

বৈদ্যনাথ আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। কবিরাজ ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। সুরমা হর্ষসমুজ্জল-নেত্রে সুধার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এবার দিদি!"

সুধা মৃদু হাসিল। সুরমা বলিল, "এবার তো আমি শোধ না নিয়ে ছাড়্‌ছি না।"

সুধা তাহার হাতখানা নিজের বুকের উপর রাখিয়া বলিল, "কিন্তু সে প্রতিশোধটা যে তোমার নিজের উপরেই লওয়া হবে বোন্।"

হাস্যপ্রফুল্ল মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য আনিয়া সুরমা বলিল, "আমার উপর? তুমি পাগল হয়েছ দিদি, আমার কিছু হবে না। যার উপর হবে, সে ঐ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাব্‌ছে।"

বলিয়া সুরমা স্বামীর দিকে মৃদু কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। শরৎও একবার সে দিকে চাহিয়াই হাসিতে হাসিতে মুখ ফিরাইয়া লইল। সুরমা বলিল, "এবার ওর বড় সহজ ভাবনা নয় দিদি, এক জনের জ্বালায় তিন দিন বাড়ী-ছাড়া; এবার দু'সতীনে প'ড়ে জ্বালাব। দেখি কত দিন বাড়ী ছেড়ে থাকে।"

শরৎ ফিরিয়া সহাস্যে বলিল, "দোহাই সুরো, তিন দিন বাড়ী ছেড়ে আবার সেই ঘর-জামাই—পুনর্মূষিকো ভব, এবার ছাড়্‌লে আরো কি হবে, বল্‌তে পারি না। আমি দিব্যি ক'রে বল্‌ছি, বাড়ীর বাইরে যদি আর পা দিই—"

বৈদ্যনাথ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "তা হ'লে নিজে না পার, মামার একটা বিয়ে দিয়ে দিও। কিন্তু দোহাই বাবা, ঘর-জামাই নয়।"

আনন্দের হাস্যরোলে কক্ষে বহুদিনের সঞ্চিত নিরানন্দ মুহূর্ত্তে দূরীভূত হইল।

সম্পূর্ণ

ঠাকুরের মূল্য

সকালে ছেঁড়া বালাপোষখানা গায়ে জড়াইয়া বাড়ীর বাহিরে ভাঙ্গা চণ্ডীমণ্ডপের দাবায় বসিয়া মথুরা-নাথ বাপুলী মহাশয় তামাক টানিতেছিলেন, আর টানের ফাঁকে ফাঁকে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে-ছিলেন—,

"সকলি তোমারই ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা,
লোকে বলে করি আমি॥"

ফাল্গুনের প্রথম, শীত একটু একটু ছিল। তাহার উপর আকাশটা থম্‌থমে মেঘে ভরা ছিল; উত্তরে বাতাসও মৃদু মৃদু বহিতেছিল। পাশে গোশালার বাহিরে অস্থিপঞ্জরসার গাভীটা শীতে জড়সড় হইয়া সকাতর দৃষ্টিতে তৃণ-ভোজন-পাত্রের দিকে চাহিয়া ছিল। বাপুলী মহাশয় এক একবার সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, আর তামাক টানিতে টানিতে গাহিতে-ছিলেন,—

"তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা,
লোকে বলে করি আমি।"

"পেন্নাম দাঠাকুর!"

"জয়োহস্তু" বলিয়া ফিরিয়া চাহিতেই বাপুলী মহা-শয়ের মুখখানা যেন শুকাইয়া গেল। এতক্ষণ ইচ্ছা-ময়ীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া মুখে যে প্রফুল্লতাটুকু আনিয়াছিলেন, পাওনাদার গৌর মুদীকে দেখিয়া সে প্রফুল্লতা মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল। তিনি শুষ্ককণ্ঠে বলি-লেন, "কে, গৌর যে, এত সকালে কোথায় চলেছ?"

"এই আপনকারই কাছে" বলিয়াই গৌর তাল-পাতার চাটাইখানা টানিয়া লইয়া এক পাশে বসিয়া পড়িল। বাপুলী মহাশয় হুঁকার মাথা হইতে কলিকা খুলিয়া তাহার হাতে দিলেন। গৌর হস্তসংযোগে ধূম-পান করিয়া কলিকাটি ফিরাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "তা হ'লে দাঠাকুর, গা তুল্‌বেন কি?"

বাপুলী হুঁকাটা মুখের কাছে রাখিয়া মাথা নীচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কত পাওনা গৌর?"

গৌর মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল, "পাওনা সাত টাকা পাঁচ আনা পৌনে তিন পাই।"

বাপুলী মহাশয় নিরুত্তরে হুঁকায় একটা শুষ্ক টান দিলেন। গৌর বলিল, "আজ কিন্তু আমায় নিদেন পাঁচটা টাকাও দিতে হবে।"

বাপুলী মহাশয় ম্লানস্বরে বলিলেন, "আজ?"

গৌর এবার গলায় একটু জোর দিয়া বলিল, "হাঁ, আমাকে মাল গস্ত কত্তে যেতে হবে।"

বাপুলী মহাশয় হুঁকাটা রাখিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিলেন। গৌর একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল, "বেলা হয়ে যাচ্ছে দাঠাকুর, এর পর আমাকে তিন কোশ রাস্তা রামজীবনপুর যেতে হবে।"

বাপুলী মহাশয় কাসিয়া, গলাটাকে একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "আজ তো হবে না গৌর।"

গৌর এবার রাগিয়া উঠিল; চড়া গলায় বলিল, "আজ হবে না, কাল হবে না, তবে কবে হবে বল দেখি? আজ এক মাস ধ'রে হাঁটাহাঁটি কচ্চি, রোজই আজ নয় কা'ল। এখন দেবে কি না, তাই বল দেখি?"

বাপুলী মহাশয় কষ্টে দীর্ঘ-নিশ্বাসটা চাপিয়া জড়িত-স্বরে বলিলেন, "দেব না তো এই সাতটা টাকার জন্যে তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাক্‌বো গৌর?"

গৌর মুদীর এবার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্র কণ্ঠে বলিল, "রেখে দাও ঠাকুর তোমার ও সব চাল-চিবানো কথা। তুমি যত ধর্ম্মিষ্ঠি, তা জানতে কারো বাকী নাই। কিন্তু আমার সঙ্গে এ জুচ্চুরী চল্‌বে না। আমি গৌর মুদী।"

জুচ্চুরী! বাপুলী মহাশয় ছল্ ছল্ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার সে দৃষ্টিতে যে কত-খানি বেদনা, কতটা কাতরতা ছিল, তাহা গৌর মুদী দেখিতে পাইল না, কিন্তু আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই একটি ষোল সতের বছরের বিধবা মেয়ে গোবর-মাখা হাতখানা উঁচু করিয়া সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল এবং মৃদুমধুর-কণ্ঠে বলিল, "তুমি এ বেলা যাও মুদী কাকা, বিকেলে এসো, সব না হয়, পাঁচটা টাকাও তোমাকে দেব।"

গৌর অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইল এবং বৈকালে আসিয়া টাকা না পাইলে সে যে একটা ভয়ানক কাণ্ড করিবে, ইহা বুঝাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। যাইবার সময় রাগে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া যাইবার কথাটাও তাহার মনে রহিল না।

সে চলিয়া গেলে বাপুলী মহাশয় ফিরিয়া রুদ্ধ-কণ্ঠে ডাকিলেন, "ভবানি!"

ভবানী বলিল, "তুমি কিছু ভেবো না বাবা, আমি যে রকমে হয়, ওর টাকা মিটিয়ে দেব।"

বাপুলী মহাশয়ের শুষ্ক অধরপ্রান্তে একটু ম্লান হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি স্নেহ-মাখা দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তা তুমি দিতে পার মা, তুমি যে আমার অন্নপূর্ণা।"

ভবানী একটু লজ্জার হাসি হাসিল। বাপুলী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু মা অন্নপূর্ণে, আজকার দিন চল্‌বার কি উপায় করেছ?"

সহাস্যে ভবানী বলিল, "তুমি বাবা দিন দিন যেন কি হচ্চো? আজ যে একাদশী।"

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসে অন্তরের সকল বেদনাগুলা বাহির করিয়া দিয়া বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "ঠিক! কিন্তু মা, কা'ল তো একাদশী হবে না।"

মুখে একটা কৃত্রিম রোষের ভাব আনিয়া ভবানী ঈষৎ তিরস্কারের স্বরে বলিল, "তাই বুঝি তুমি ভাব্‌তে বসেছ? আজ দিন-রাত কাট্‌লে তো কা'ল। আমি এবার দিব্যি দেব বাবা, তুমি যদি এত ভাবনা ভাব।" বলিয়াই ভবানী দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। বাপুলী মহাশয় হুঁকাটা তুলিয়া তাহাতে একটা টান দিলেন; কিন্তু কলিকার আগুন তখন নিবিয়া গিয়াছিল; ধোঁয়া বাহির হইল না। বাপুলী মহাশয় যথাস্থানে হুঁকাটি রাখিয়া পুনরায় গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিলেন,—

"পঙ্কে বদ্ধ কর করী,
পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও মা রাজ্যপদ, কারে কর অধোগামী।"

গান-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া টপ্ টপ্ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের ধূলার উপর পড়িল।

২

সে বৎসর উমেশ রায়ের পুত্র যোগেশ রায় শিল্প-শিক্ষার জন্য জাপান ও আমেরিকা ঘুরিয়া যখন দেশে ফিরিল, তখন তাহাকে লইয়া সমাজের মধ্যে খুব একটা আন্দোলন পড়িয়া গেল। তাহাকে সমাজে গ্রহণ করা যায় না, ইহাই প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন হইল এবং এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য গোপী বাবুর বাড়ীতে সামাজিকগণের মজলিস বসিল। গোপী বাবু জমীদার, গ্রামের বা সমাজের হিতসাধনে তাঁহার বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য না থাকিলেও তিনি গ্রামের ও সমাজের মাথা। তাঁহার অর্থে কলিকাতা চৌরঙ্গীর দোকানদারেরা ছাড়া আর কেহ লাভবান্ না হইলেও অর্থের জন্য সমাজের বরেণ্য। সুতরাং এই প্রধান সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তিনিই প্রধান উদ্যোগী হইয়া উঠিলেন।

মজ্‌লিসে সমাজের ছোট বড় অনেকেই উপস্থিত হইল। অধ্যাপক মধুসূদন চূড়ামণি মহাশয় সুবৃহৎ নস্যাধার লইয়া গোপী বাবুর পার্শ্বভাগে জাঁকাইয়া বসিলেন। তিনি সভার স্বস্তিবাচনস্বরূপ গোপী বাবুর দালানের ঝাড়, লণ্ঠন, দেয়ালগিরী হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার অজ্ঞাতনামা পূর্ব্বপুরুষগণের পর্য্যন্ত প্রশংসা-কীর্ত্তন দ্বারা বাবুর গর্ব্বস্ফীত মুখমণ্ডলকে অধিকতর স্ফীত করিয়া তুলিলেন। তার পর আসল কথা পড়িল। অনেক বাদানুবাদ ও তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, যোগেশ যদ্যপি শুদ্ধাচার হইয়া শাস্ত্রীয় বিধানমতে প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহা হইলে সে সমাজে ব্যবহার্য্য হইতে পারে।

এই সিদ্ধান্তে সকলেই সায় দিল, কেবল এক জন সায় দিলেন না, তিনি মথুরানাথ বাপুলী। তিনি ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "যদি যোগেশকে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে সমাজে চল্‌তে হয়, তবে তার আগে গোপী বাবুর প্রায়শ্চিত্তও করা দরকার।"

এই প্রতিবাদটা যেন আকস্মিক বজ্রপাতের ন্যায় সকলকে বিস্মিত করিয়া দিল। সকলেই সোৎসুক দৃষ্টিতে বাপুলী মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিল। বাপুলী মহাশয় উচ্চ সতেজকণ্ঠে বলিলেন, "যদি বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়ে অখাদ্য খেলে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হয়, তবে আমোদের জন্য ইংরাজের হোটেলে খেয়ে গোপী বাবু প্রায়শ্চিত্ত না কর্‌বেন কেন?"

গোপী বাবুর মুখখানা ভ্রূকুটিভঙ্গে ভীষণ হইয়া উঠিল। চূড়ামণি একবার সে দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "বাবু যে হোটেলে গিয়ে অখাদ্য খেয়েছেন, তার প্রমাণ?"

বাপুলী বলিলেন, "প্রমাণ আপনারা। এই সভায় এমন কে আছে যে, বুকে হাত দিয়ে বল্‌তে পারে, আমার কথা মিথ্যা?"

কিন্তু কেহই একটি টুঁ-শব্দ করিল না। তখন চূড়ামণি মহাশয় বাপুলীকে উন্মাদ, অর্ব্বাচীন প্রভৃতি আখ্যা দিয়া সভাভঙ্গ করিলেন।

যোগেশ কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিল না; সে সরকারী চাকরী লইয়া বিদেশে চলিয়া গেল; যাইবার সময় বলিয়া গেল, সে অতঃপর ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবে।

তাহার প্রস্থানে সামাজিক গোলযোগ থামিয়া গেল, কিন্তু বাপুলী মহাশয়ের অদৃষ্টাকাশে যে কুগ্রহটি উদিত হইয়াছিল, তাহা তিরোহিত হইল না, এইবার তাহার ভোগকাল আরম্ভ হইল। কয়েক দিন পরে জমীদারের নিযুক্ত আমীন আসিয়া তাঁহার নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর-জমীর নূতন জরিপ আরম্ভ করিল। তার পর গোপী বাবু এক দিন বাপুলী মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন, তিনি এত দিন নিষ্কর বা ব্রহ্মোত্তর বলিয়া যে পঞ্চাশ ষাট বিঘা জমী দখল করিতেছিলেন, জরিপী চিঠা দৃষ্টে জানা যায় যে, এ সকলই মাল। সুতরাং জমীগুলিকে মালভুক্ত করিয়া লওয়া হইল। যদি তাঁহার তায়দাদপত্র কিছু থাকে, তবে তাহা আদালতে দাখিল করিয়া আপনার স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া লইতে পারেন।

তায়দাদপত্র তেমন কিছু ছিল না; থাকিলেও তাহার সাহায্যে গোপী বাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া জমীগুলাকে উদ্ধার করা, আর বাঘের গলার ভিতর হাত দিয়া হাত টানিয়া আনা যে একই ব্যাপার, ইহা বাপুলী মহাশয়ের অগোচর ছিল না। সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়েই তিনি এ সকল ছাড়িয়া দিলেন।

কিন্তু তিনি শুধু জমী ছাড়িয়া দিয়াই অব্যাহতি পাইলেন না; তিন বৎসরের বাকী খাজনা বাবদ তাঁহার নামে সাত শত তিরাশী টাকা চৌদ্দ আনা তের গণ্ডা দু'কড়া দু'ক্রান্তি নালিশ রুজু হইল এবং এই নালিশের সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই একতরফা ডিক্রী হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডিক্রী জারি করিয়া অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পরোয়ানা লইয়া নায়েব নিত্যানন্দ ঘোষ আদালতের পেয়াদাসমেত তাঁহার দরজা চাপিয়া বসিল। গ্রাম-শুদ্ধ লোক মজা দেখিতে ছুটিয়া আসিল। কেহ বলিল, "আহা!" কেহ বা বলিল, "জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বাদ!"

বাপুলী মহাশয় এ সকল কথায় কান দিলেন না; তিনি স্ত্রীকন্যাকে ঠাকুরঘরের ভিতর রাখিয়া নিজে তাহার ছোট দাবাটির উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

গোলার ধান, গোয়ালের গরু, ঘরের বাক্স, সিন্দুক, পেঁটরা, সোনা-রূপার জিনিস, ঘটী-বাটি, এমন কি, হাঁড়ীর চাল-ডাল, ভাঁড়ের তেল-লুণ পর্য্যন্ত ঢালিয়া লইয়া আদালতের পেয়াদা আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিল। বাপুলী মহাশয় সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। দর্শকমণ্ডলীদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণের এই সর্ব্বনাশে বিষণ্ণ হইয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু যিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, তাঁহার মুখে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হইল না। সকলে চলিয়া গেলে তিনি স্ত্রীকন্যাকে বাহিরে আসিতে বলিয়া আদেশ দিলেন, "বেলা যায়, ঘরদ্বার পরিষ্কার ক'রে রঘুনাথের ভোগ চড়িয়ে দাও।"

গৃহিণী ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, কিন্তু স্বামীর মুখের একটা তীব্র-গম্ভীর "ছিঃ" শব্দ শুনিয়াই তাঁহাকে উদ্গত ক্রন্দনবেগ রোধ করিতে হইল।

কিন্তু এইখানেই দুষ্ট গ্রহের ভোগ শেষ হইল না। কয়েক মাস পরেই গৃহিণী সহসা তিন দিনের জ্বরে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। গৃহিণীর মৃত্যু বৃদ্ধ বাপুলী মহাশয়ের হৃদয়ে দুর্ব্বিষহ শেল বিদ্ধ করিল; কিন্তু তখনও তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, বিধাতা ইহা অপেক্ষাও কি বিষাক্ত শেল তাঁহার জন্য উদ্যত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

গৃহিণীর শ্রাদ্ধের সময় জামাতা আসিল। কিন্তু শ্রাদ্ধের পরদিন তাহার ভেদ বমি আরম্ভ হইল। বাপুলী মহাশয় ব্যস্ত হইয়া ডাক্তারের কাছে ছুটিলেন, কিন্তু ডাক্তারকে পাইলেন না, অন্যত্র জরুরী ডাক আছে বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। বাপুলী মহাশয় এ জরুরী ডাকের অর্থ বুঝিলেন। গোপী বাবুর বেতনভোগী ডাক্তার, গোপী বাবুর অনুমতি ভিন্ন তাঁহার বাড়ীতে যাইতে পারেন না। অনন্যোপায় হইয়া বৃদ্ধ মান-অভিমান সকল বিস্মৃত হইয়া জমীদারের বাড়ীতে ছুটিলেন। হায়, তাঁহার সংসারের একমাত্র অবলম্বন কন্যার সীমন্তের সিন্দূর যে মুছিয়া যায়!

তাঁহার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। বাবুর সহিত সাক্ষাতের জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর ভৃত্য আসিয়া জানাইল যে, বাবুর শরীর ভাল নয়, তিনি আজ আর বাহিরে আসিবেন না। হায়, মানুষের প্রতিহিংসা! বাপুলী মহাশয় একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আসিলেন।

ভিন্নগ্রামে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে এক জন ডাক্তার আছে। কিন্তু কে তাহাকে ডাকিতে যাইবে? ততক্ষণ বিলম্ব সহিবে কি? বাপুলী মহাশয় ঘরে ফিরিয়া রঘুনাথের চরণামৃত আনিয়া জামাতাকে খাওয়াইয়া দিলেন এবং মনে মনে তাহার কাছে জামাতার জীবন ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ কিন্তু তাঁহার কাতর প্রার্থনা শুনিলেন না। জামাতা সমস্ত রাত্রি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শেষ রাত্রিতে চক্ষু মুদ্রিত করিল। বাপুলী মহাশয় স্ত্রীলোকের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

বৎসরের মধ্যে ধনজন-পূর্ণ শান্তিময় গৃহ শ্মশানে

শুনিয়া বাপুলী মহাশয় যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, অতিমাত্র বিস্ময়ে দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া তিনি হতবুদ্ধির ন্যায় কর্ম্মচারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কর্ম্মচারী তখন বিনীতভাবে জানাইল যে, বাবুর একমাত্র পুত্র আজ প্রায় এক বৎসর রোগ ভোগ করিতেছে, ডাক্তার-কবিরাজে কিছুই করিতে পারিতেছে না। বাবুর স্ত্রী স্বপ্নেও দেখিয়াছেন, বাপুলী মহাশয়ের গৃহদেবতা রঘুনাথকে লইয়া বাটীতে প্রতিষ্ঠা করিলে তাঁহার পুত্র আরোগ্য লাভ করিবে। এই জন্যই বাবু এই প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন।

বাপুলী মহাশয় এ প্রস্তাবের কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; ক্রোধে ক্ষোভে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি শুধু প্রস্তাবকারীর মুখের উপর ঘৃণাপূর্ণ তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলেন।

পরদিন পথে চূড়ামণি মহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, চূড়ামণি তাঁহাকে বলিলেন, "ওহে ভায়া, গোপী বাবু যখন তোমার ঠাকুরটি নিতে চাইছেন, তখন তাঁকে ঠাকুরটি দাও না কেন? তিনি শুন্‌ছি তোমার জমী-জায়গা সব ছেড়ে দেবেন, তার উপর নগদও দু' একশো দিতে পারেন। তোমার তো আর সে অবস্থা নাই, দেবতার সেবার ত্রুটি যে মহাপাপ।"

ক্রোধরুদ্ধ-কণ্ঠে বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "যে দিন ঠাকুরের পায়ে ফুল-চন্দন দিতেও অক্ষম হব, সে দিন তাঁকে গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়ে আস্‌বো।"

বলিয়া তিনি ক্রোধভরে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। চূড়ামণি নস্যগ্রহণ পূর্ব্বক 'বাতুল, বাতুল' বলিতে বলিতে স্বকার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার সময় ঠাকুরের আরতি দিয়া বাপুলী মহাশয় সবেমাত্র ঠাকুর-ঘরের বাহিরে আসিয়াছেন, এমন সময় একখানা পাল্কী আসিয়া তাঁহার বাড়ীর দরজায় থামিল, এবং তাঁহার উদ্গত বিস্ময়কে শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া গোপী বাবুর গৃহিণী বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া তাঁহার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িলেন। আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিলেন, "বাবা গো, আমার স্বামীর শত অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমার নলিনের প্রাণভিক্ষা দাও।"

বাপুলী মহাশয় ব্যস্তভাবে হাত ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন; ধীর প্রশান্তকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার পুত্র শতবর্ষজীবী হোক্ মা, তুমি স্বামি-পুত্রের সৌভাগ্যে ভাগ্যবতী হও, কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি, আমার দ্বারায় তোমায় কি উপকার হ'তে পারে মা?"

বাবুর স্ত্রী হাতযোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তুমিই আমার নলিনের প্রাণদান দিতে পার বাবা। আমি স্বপ্নে দেখেছি, তোমার গৃহদেবতা রঘুনাথকে নিয়ে গিয়ে যদি নিজের ঘরে প্রতিষ্ঠা কত্তে পারি, তা হ'লেই বাছা আমার প্রাণ পাবে। বাবা, আজ আমি জমীদার-গৃহিণী নই, ভিখারিণী; তোমার কাছে পুত্রের প্রাণভিক্ষা কত্তে এসেছি। আমার নলিনকে বাঁচাও, তোমার রঘুনাথকে দাও।"

বলিয়া তিনি পুনরায় ব্রাহ্মণের পা জড়াইয়া ধরিলেন। বাপুলী মহাশয়ের মুখ দিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; তিনি স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আমার স্বামী তোমার কাছে সহস্র অপরাধে অপরাধী হ'লেও আমার পুত্র নিরপরাধ। মহাভারতে শুনেছি, দধীচি মুনি নিজের অস্থি দিয়ে দেবতাদের রক্ষা করেছিলেন, তুমি ঠাকুর দিয়ে আমার ছেলেকে রক্ষা কর বাবা!"

আপনার পা হইতে হাত ছাড়াইয়া দিয়া বাপুলী মহাশয় গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই তুমি স্বপ্ন দেখেছ মা?"

বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি বাবা, ছেলের জন্য দেবতাদের কাছে মানত কত্তে চোখ বুজেছি, হঠাৎ দেখি, পিতলের একটি ছোট সিংহাসনে রাঙ্গা বনাতের গদীর উপর একটি শালগ্রামমূর্ত্তি, গলায় কুশের পৈতা—"

বাপুলী মহাশয় শিহরিয়া উঠিলেন। গৃহিণী রোমাঞ্চিতদেহে গদ্‌গদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বাবা আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, 'তুই ভাবিস্ কেন, আমাকে এনে প্রতিষ্ঠা কর্, তোর ছেলে ভাল হবে।' আমি ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্‌লাম, 'বাবা, তুমি কে?' বাবা হেসে বল্‌লেন, 'আমায় চিনিস্ না? আমি রঘুনাথ। তোর স্বামী যে বামুনের সর্ব্বনাশ করেছে, আমিই সেই মথুর বাপুলীর ঠাকুর। সোনার সিংহাসনে বসিয়ে আমায় প্রতিষ্ঠা কর্, তোর ছেলে ভাল হবে।' ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে চোখ চেয়ে দেখি, বাবা অন্তর্দ্ধান হয়েছেন।"

বাপুলী মহাশয়ের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। মনে মনে বলিলেন, "ঠাকুর, এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের জল-তুলসী আর তোমার পছন্দ হ'লো না? তোমার এ কি মায়া মায়াময়!"

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া গৃহিণী ব্যাকুলিতভাবে বলিলেন, "কি হবে বাবা?"

বাপুলী মহাশয় গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীর-গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তাই হোক মা, গরীবের ঠাকুরকে সোনার সিংহাসনে বসিয়ে পুত্রের জীবন লাভ কর।"

গৃহিণী ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিলেন। বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "আজ চল্লিশ বৎসর পূজা ক'রে যাঁর দেখা পাই নি, প্রাণের কাতরতার ভাবে তুমি তাঁর দেখা পেয়েছ। তুমিই তাঁর সেবার উপযুক্ত পাত্রী, ধন্য তোমার সৌভাগ্য মা!"

হর্ষোচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে গৃহিণী বলিলেন, "দধীচির উপাখ্যান গল্প নয় বাবা, যথার্থই তোমাদের জাত পরের জন্য জীবন দিতে পারে।"

অতঃপর ঠাকুরের বিনিময়ে কি দিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিলে, বাপুলী মহাশয় একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আপাততঃ এক ভরি সোনা পাঠিয়ে দিও মা।"

গৃহিণী বলিলেন, "এক ভরি কেন বাবা, দশ ভরি পাঠিয়ে দেব।"

মৃদু হাসিয়া বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "কোন প্রয়োজন নাই মা, আপাততঃ এক ভরিই যথেষ্ট।"

কল্য প্রাতেই এক ভরি গিনি পাঠাইয়া দিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়া গৃহিণী শিবিকারোহণে প্রস্থান করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে ভবানী পিতার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "ঠাকুর বেচবে বাবা?"

ম্লান হাসি হাসিয়া বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "লোকে পেটের জ্বালায় স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করে, আর আমি ঠাকুর বেচতে পারি না?"

ভবানী বলিল, "তা তুমি পার না বাবা।"

বাপুলী মহাশয় বিষাদগম্ভীর-কণ্ঠে বলিলেন, "আমি না দিলেও ঠাকুর যে নিজেই যাবে ভবানি! গরীবের সেবা যে তাঁর আর মনোমত হবে না।"

ভবানী নিঃশব্দে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। বাপুলী মহাশয় কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ন' বৎসর বয়সে উপনয়ন হয়েছে। দশ বৎসর বয়স হ'তে রঘুনাথের সেবা ক'রে আসছি। আজ কি দোষে ঠাকুর আমায় ত্যাগ কল্লেন ভবানি?"

বাপুলী মহাশয় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

৬

জমীদারের বাড়ীতে বিপুল উদ্যমে ঠাকুর-প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছিল। দরজায় নহবৎ বসিয়াছিল, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, দান-ধ্যানের, ব্রাহ্মণ-ভোজনের বিপুল উদ্যোগ হইতেছিল। দেখিয়া লোকে আগে হইতেই প্রশংসার সুর তুলিয়াছিল, "হাঁ, জমীদার বাড়ীর কাজ বটে!" জমীদার-বাড়ীর কাজে সারা গ্রামেই যেন কাজের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। সে সাড়া বাপুলী মহাশয়ের কানে গেলে তাঁহার বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া যাইত। হায়! এক জন যাঁহার প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছে, আর এক জন তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে। কিন্তু সকলই কর্ম্মফল। এক দিন হয় তো এই বংশেরই কোন ভাগ্যধর পুরুষ এই দেবতার প্রতিষ্ঠার জন্য এমনই উৎসবের সাড়ায় গ্রামখানাকে মাতাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু লক্ষ্মীনাথ, যেখানে লক্ষ্মী, সেইখানে তুমি; এই লক্ষ্মীশ্রী-শূন্য দগ্ধ শ্মশানে তুমি থাকিবে কেন?

চূড়ামণি মহাশয় আসিয়া গোপীবাবুকে বলিলেন, "উদ্যোগ-আয়োজন তো যথেষ্ট কচ্ছেন, কিন্তু ঠাকুর কোথায়?"

গোপী বাবু উত্তর করিলেন, "বাপুলী মহাশয়ের ঘরে।"

চূড়ামণি বলিলেন, "দর-দস্তুর ঠিক হয়েছে?"

গোপী বাবু বলিলেন, "না; দু' তিনবার লোক পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি বলেন, 'তার জন্য আট্‌কাবে না; সে পরে দেখা যাবে'।"

গম্ভীরভাবে মস্তক-সঞ্চালন করিয়া চূড়ামণি সন্দিগ্ধস্বরে বলিলেন, "তবেই তো, আপনি যেমন সরল অমায়িক! যদি আপনার জমীদারীটা চেয়ে বসে?"

মৃদু হাসিয়া গোপী বাবু বলিলেন, "তাও কি সম্ভব?"

চিন্তিতভাবে চূড়ামণি বলিলেন, "সম্ভব অসম্ভব বলা তো যায় না। কিন্তু ঠাকুর দেবে তো?"

গোপী বাবু বলিলেন, "দেবে ব'লে তো ব্রাহ্মণ স্বীকার পেয়েছে।"

একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া চূড়ামণি বলিলেন, "আপনিও যেমন, ওর স্বীকারের উপর নির্ভর ক'রে আছেন। ব্রাহ্মণ! বামুনের ছেলে হয়ে যে বিনা প্রায়শ্চিত্তে বিলাত-ফেরতের ঘরে খেতে চায়, তার বিন্দুমাত্র ব্রাহ্মণত্ব আছে, না তার ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান একটুও আছে?"

চূড়ামণির কথায় গোপী বাবু একটু চিন্তিত হইলেন। চূড়ামণি বলিলেন, "আমি কিন্তু একটা কথা ভাবছি।"

ব্যগ্রভাবে গোপী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা?"

চূড়ামণি বড় এক টিপ নস্য গ্রহণ করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আপনার সঙ্গে ও যে রকম শত্রুতা

আচরণ করেছে, তাতে শেষে আপনার উদ্‌যোগ-আয়োজন সব পণ্ড ক'রে আপনাকে লোকসমাজে হাস্যাস্পদ করবে না তো! ও যে রকম ভয়ানক লোক, তাতে বোধ হয়, এই রকমই ওর অভিপ্রায়। হয় তো শেষে ঠাকুর দেবে না, হয় তো তখন বলবে, তোমার জমীদারীটা লিখে দাও।"

ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে গোপী বাবু বলিলেন, "তাই যদি হয়, তবে আমারও সঙ্কল্প—বামুনের ভিটার মাটী এক এক ঝুড়ি ক'রে নিয়ে রূপনারায়ণের জলে ফেলবো।"

গোপী বাবু কেবল এই সঙ্কল্প লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি গৃহিণীর নিকট স্বীয় সন্দেহ ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন, "ছি ছি, তুমি কার কথা শুনেছ? যদি পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হয়, তথাপি ব্রাহ্মণের কথা টলবে না। তিনি যে দয়া ক'রে ঠাকুর দিবেন, এই আমাদের সৌভাগ্য!"

অগত্যা গোপী বাবুকে নিরস্ত হইতে হইল। কিন্তু তিনি একেবারে নিরস্ত রহিলেন না, ব্রাহ্মণের গতিবিধির উপর নজর রাখিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ ঠাকুর লইয়া পলাইয়া না যায়। গ্রামে ঠাকুর থাকিলে গোপী বাবু যে উপায়ে হউক, তাহা হস্তগত করিতে পারিবেন।

৭

প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে লোক পাঠাইলে বাপুলী মহাশয় বলিয়া দিলেন, "বাবুকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলি ও, যথাসময়ে ঠাকুর উপস্থিত হইবে।"

গোপী বাবু সে রাত্রিতে চারি জন পাইককে বাপুলী মহাশয়ের বাড়ীর আশে পাশে কড়া পাহারায় রাখিয়া দিলেন।

প্রতিষ্ঠার দিন প্রভাতে বাড়ী লোকে লোকারণ্য। গ্রামের ছেলে-বুড়া ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা দেখিতে ছুটিয়া আসিতেছে; নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ প্রতিষ্ঠামণ্ডপের সম্মুখে সভা জাঁকাইয়া বসিয়াছেন; হোতৃগণ স্নাত শুভ্রবাসপরিহিত হইয়া ক্রিয়ার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে চূড়ামণিই প্রধান। তিনি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া নামাবলীতে বিশাল কায় আচ্ছাদনপূর্ব্বক ঘন ঘন নস্য গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু যাঁহার প্রতিষ্ঠা, তিনি কোথায়? তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষায় সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

গোপী বাবু মণ্ডপসম্মুখে গম্ভীরভাবে পদচারণা করিতেছেন। চূড়ামণি মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের জন্য তাগাদা করিয়া তাঁহার সন্দেহটাকে উত্তিক্ত করিয়া দিতেছিলেন বটে, কিন্তু, গোপী বাবু তাঁহার কথার একটিও উত্তর দিতেছিলেন না, তাগাদার জন্য বাপুলীর বাড়ীতে লোকও পাঠাইতেছিলেন না। তিনি যেন আজ একটা অস্বাভাবিক ধৈর্য্যে চিত্তকে দৃঢ় করিয়া শুধু ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব-পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

কিন্তু তাঁহার এই অস্বাভাবিক ধৈর্য্যে চূড়ামণির ধৈর্য্য ক্রমেই বিচলিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বাবু তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না দেখিয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণের নিকট আপনার সন্দেহের কথা অনুচ্চস্বরে ব্যক্ত করিতেছিলেন এবং মথুর বাপুলী যে বাবুর উপর একটা ভয়ানক প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য ঠাকুর দিবে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল, ইহাই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার সন্দেহে সায় দিয়া বলিল, "শুনেছি নাকি, এক ভরি সোনাও নিয়েছে।"

চূড়ামণি বলিলেন, "যথালাভ। এক ভরি গিনি সোনার দাম কম নয় তো, তেইশ টাকা।"

ব্রাহ্মণ যেন তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিলেন, "তেইশ টাকা কেন, তেইশ টাকা ছ' আনা।"

কথাগুলা অনুচ্চস্বরে হইলেও গোপী বাবুর কানে গেল। শুনিয়া তিনি ভ্রূকুটি করিলেন। চূড়ামণি ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আর আধ ঘণ্টা পরেই বারবেলা। বুধে বাণতৃতীয়কম্।"

এবার বুঝি গোপী বাবুর ধৈর্য্য বিচলিত হইল। তাঁহার পাদক্রমণের বেগটা কিছু দ্রুত হইয়া আসিল। এখন তিনি লোকজন লইয়া জোর করিয়া ঠাকুর আনিবেন, কি প্রতারণার অভিযোগে পুলিসের সাহায্য গ্রহণ করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

সহসা বাহিরে গোল উঠিল, "ঐ ঠাকুর আসছে।" সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিল। দেখিল, বৃদ্ধ বাপুলী মহাশয় পিতলের ক্ষুদ্র সিংহাসনখানিতে রঘুনাথকে বসাইয়া, সিংহাসনটিকে আপনার বুকের উপর ধরিয়া, মা যেমন সন্তানকে বুকে করিয়া থাকেন, তেমনই ভাবে লইয়া আসিতেছেন, দ্বারে নহবৎ বাজিয়া উঠিল, মহিলাগণের শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনিতে প্রতিষ্ঠামণ্ডপ মুখরিত হইল। বাপুলী মহাশয় হর্ষোৎফুল্ল জনমণ্ডলীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া

বেদীর উপর রক্ষিত স্বর্ণ-সিংহাসনে রঘুনাথকে স্থাপন করিলেন।

তার পর আস্তে অস্তে সরিয়া আসিয়া, যেখানে গোপী বাবু বিস্ময়স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইয়া সহাস্যে বলিলেন, "কিছু মনে করবেন না বাবু, মেয়েটাকে সান্ত্বনা ক'রে আস্‌তে একটু দেরী হয়ে গেল। আমি প্রাণ ধ'রে ঠাকুর দিতে পারলাম, কিন্তু সে তা পারে না। স্ত্রীলোক কি না। আমি চললাম বাবু, মেয়েটা উঠানের ধুলায় প'ড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে।"

ব্রাহ্মণের হাস্যমণ্ডিত মহিমাসমুজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া গোপী বাবু সঙ্কুচিতকণ্ঠে বলিলেন, "আপনার ঠাকুরের মূল্য?"

বাপুলী মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মূল্য? আমি তো ঠাকুর বিক্রয় করি নাই বাবু, আপনার পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্যই আমার প্রাণের দেবতাকে দান ক'তে এসেছি। আপনার পুত্র শতবর্ষজীবী হোক্, আপনি পুত্র-পৌত্র নিয়ে কাল-যাপন করুন, তাই আমার ঠাকুরের মূল্য।"

ব্রাহ্মণ বলে কি? এই কি সেই দধীচির বংশধর? এই বশিষ্ঠ-বাল্মীকির, জাবালি-যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিরূপ? অত্যাচারীর উপর এত উদারতা কি মানুষে করিতে পারে? বিস্ময়ে গোপী বাবুর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

চূড়ামণি বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু মূল্য গ্রহণ না করিলে কার্য্য অসিদ্ধ হইবে।"

বাপুলী মহাশয় ফিরিয়া একবার চূড়ামণির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পাশেই সঙ্কল্পের জন্য হরীতকী পড়িয়া ছিল; তারই একটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "তবে এই আমার ঠাকুরের মূল্য। এ ছাড়া ঠাকুরের আর কোন্ মূল্য হ'তে পারে চূড়ামণি মহাশয়?"

চূড়ামণি মস্তক নত করিলেন। বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "আমি আর দাঁড়াতে পারব না, মেয়েটা একা প'ড়ে কাঁদছে।"

বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন। সহসা গোপী বাবু ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, উত্তেজিত-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, এ তোমার পরিহাস, না সত্য? যে অত্যাচারী, যে তোমাকে সর্ব্বস্বান্ত করেছে, তাকে তুমি কিরূপে এত সহজে ক্ষমা করলে?"

বাপুলী মহাশয় হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। সে হাস্যধ্বনিতে গোপী বাবু শিহরিত হইলেন। বাপুলী মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যে যার স্বাভাবিক ধর্ম্ম গোপী বাবু। তুমি শূদ্র, প্রতিহিংসা তোমার ধর্ম্ম; কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ, আমার ধর্ম্ম ক্ষমা।"

গোপী বাবু উপুড় হইয়া পড়িয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বাপুলী মহাশয় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

"বাতুল বাতুল" বলিয়া চূড়ামণি মহাশয় হোতৃগণকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আদেশ দিলেন।

সম্পূর্ণ